সুরাট থেকে সুতানুটি

নারায়ণ দত্ত



বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
কান্তিরঞ্জন ঘোষ

প্রচ্ছদ ঃ
পঞ্চানন মালাকর

প্রকাশকাল ঃ
কার্তিক — ১৩৬৮

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীগোপালচন্দ্র পাল
স্টার প্রিন্টিং প্রেস
২১/এ, রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা—৬

যাঁর কোলে বসে আমার শিক্ষা শুরু এবং যাঁর তুল্য শিক্ষক
আমি এখনও
দেখিনি—
আমার স্বর্গত মাতামহ আনন্দগোপাল সিংহের পুণ্যস্মৃতির
উদ্দেশে

এই গ্রন্থের বেশ কিছু রচনা রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, সমকালীন, অমৃত, দেশ
এবং অন্য কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত

ঃ লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

দরবারী কানাড়া

•জনকোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী

কথারম্ভ

রোম একদিনে গড়ে ওঠেনি। বহু রাজন্যবৃত্তের প্রচেষ্টায় বহু শিল্পী-স্থপতি, কারিগরের স্বেদে, শ্রমে, প্রতিভার অবদানে এই মহৎ নগরীর বিকাশ, প্রস্ফুটন। এই কাহিনী শুধু রোমের নয়। অন্যেরও। কলকাতারও। যদিও নগর কুলপঞ্জীতে সে নিতান্তই অর্বাচীন। এবং লজ্জা এবং অনুশোচনার কথা এই সেদিনের শহর কলকাতার আদিকালের—তার সূতিকাগৃহের সংক্ষিপ্ত সময়ের ইতিহাসও যত্ন বা নিষ্ঠা সহকারে বস্তুনিষ্ঠভাবে আজও লেখা হল না।

কিন্তু সেকথা থাক। প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের যে বানিজ্য প্রবাহ প্রায় আবহমান কালের। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় নৌবানিজ্যের এই ধারা দুর্ধর্ষ আরব জাতির হাতে গিয়ে পড়ে। এবং য়ুরোপীয়রা আসার আগে তারাই ছিল এই বানিজ্যক্ষেত্রের মূল ইজারাদার। মাঝে কিছুদিন নিয়ন্ত্রণ করত পর্তুগীজরা। একেবারে প্রায় শেষ দিকে এল ইংরেজরা। ইংরেজরা ভারতবর্ষের মাটিতে পা দেবার প্রায় শ দুই বছর পরে তাদের বাণিজ্য রণতরী নোঙর করে সুতাণুটির হাটে। এবং এই শ দুই বছর ধরে তারা ঘুরেছে বন্দরে বন্দরে। কুর্নিশ করে দাঁড়িয়েছে দরবারে দরবারে। জমি কিনেছে কোথায় বা জবর দখল করেছে কুঠি বানিয়েছে তুলে নিয়েছে, আবার বানিয়েছে। কোথাও বা হুকুম নিয়ে কোথাও বা বিনা আদেশেই। তবে প্রায় কোথাওই নির্বিঘ্নে নয়। রাজদরবারের আনুকূল্য লাভ করলেও হয়ত মুঘল আমলার হাতে নিগৃহীত হয়েছে। আল্লায় দেয় তো মোল্লায় দেয় নি—এ সব কিছুর ফয়সলা করেছে আখেরে হয়ত তলোয়ারের ডগায়। কূটবুদ্ধির দাপটে। সেই আপদসঙ্কুল সন্দেহ-সংশয়ের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বহু ঘটনাবর্ত, নানা ঘোরাঘুরি। শেষ পর্যায়ে তারা পৌঁছায় সুতানুটি—আজকের কলকাতা—একদা বৃটিশ ভারতবর্ষের রাজধানী।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন, য়ুরোপীয় শক্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের আধুনিক অধ্যায়ের সূত্রপাত। যদিও এরা কেউই ভারতবর্ষের অন্যান্য বহিরাগত শক্তির মত স্থলপথে আসেনি। বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর বা লোহিত সাগরের রক্তাক্ত জলধারার একটানা তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ তটভূমির হেথায় হোথায় এরা। বাসা বেঁধেছে এবং একসময়ে যুযুধান রাজদরবারের কোন একটির পক্ষাবলম্বন করে স্থানীয় রাষ্ট্রশাসনে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছে এই কাজ শুধু ইংরেজরাই করেনি। এই ব্যাপারেও অগ্রদূত সেই

পর্তুগীজরাই, যারা কালিকটের নারিকেলবাগ মমরিং বন্দরে নোঙর করেছিল ভাস্কোডাগামার নেতৃত্বে সতেরই মে চোদ্দশ আটানব্বই। মধ্যযুগের ইতিহাসে এতবড় যুগান্তকারী ঘটনার নজির নেই। হিন্দুরাজা জামোরিনের দরবারে আশ্রয় পেলেও ক্ষমতালিপ্সু পর্তুগীজ বণিকেরা অচিরেই প্রতিপক্ষ কোচিনের দরবারের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে পশ্চিম-ঘাট উপকূলে দেশীয় রাজন্যবর্গের মাঝে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। কয়েক বছরের মধ্যেই আবির্ভূত হলেন আফোনসো ড আলবুকার্ক। এসেছিলেন সে বছরের কর্তা হয়ে [illegible] বিজাপুরের কাছ থেকে গোয়া কেড়ে নিয়ে হয়ে বসলেন সেই পর্তুগীজ উপনিবেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। সারা পশ্চিমঘাট উপকূলের বুক জুড়ে দিগন্ত নৌজগতের অপ্রতিহত শক্তি নিয়ামক। কার মুসলিম বিদ্বেষী এই পর্তুগীজ নায়ক ভারতবর্ষের বুকে য়োরোপীয় উপনিবেশের সূচনা করেছিলেন। রচনা করতে চেয়েছিলেন প্রথম ইউরো-ভারতীয় সমাজ [illegible] বন্দিদের ভারতীয় স্ত্রী গ্রহণে উৎসাহিত করেছিলেন। কালক্রমে পর্তুগীজ শক্তি গোয়া থেকে দমন দিউ সালসেট [illegible]। [illegible] কাছে সানথোম আর নাগাপত্তমে ছড়িয়ে পড়েছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি এসে [illegible] রাজবংশের মত পর্তুগীজ [illegible] ভেঙে পড়ে। সালসেট আর বেসিন কেড়ে নেয় মারাঠারা। শাজাহানের আমলে কাশিম খাঁ কেড়ে নেয় হুগলী।

কিন্তু ততদিনে ইংরেজরা এসে গেছে ডাচেরা এসে গেছে। দেরীতে—কিন্তু এসেছে ফরাসীরাও। এবং এই সব বিদেশীদের মধ্যে ব্যবসায়ের দিক দিয়ে ডাচেরা অবশ্যই সবচেয়ে নিপুণ এবং করিৎকর্মা। গুজরাট হয়ে, করমণ্ডল উপকূল ঘুরে তারা এসে বাংলার একান্ত গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছিল। একের পর এক তারা কুঠি বানিয়েছিল মছলিপত্তম্ পুলিকট সুরাট বিমলিপত্তম্ কারিকল, চুঁচুড়া কাশিমবাজার বরানগর পাটনা বালেশ্বর নেগাপত্তম্ এবং কোচিন। মাত্র আটান্ন বছর সময় লেগেছিল তাদের এই বাণিজ্যজাল বিস্তার করতে। পর্তুগীজদের সরিয়ে য়োরোপীয় মশলার বাণিজ্যে নিরঙ্কুশ অধিকার একছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে। বয়সে ডাচ বা ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জন কোম্পানী থেকে বছর দুয়েকের ছোট কিন্তু এরাও চেয়েছিল ইংরেজদের মতই পূবদেশে বাণিজ্যের মনোপলি। বলাবাহুল্য, অপস্রিয়মান পর্তুগীজদের জায়গা দখলে তাদের অসুবিধা হয়নি। কিন্তু একাধিপত্যের প্রশ্নে সংঘাত লাগল ইংরেজদের সঙ্গে। এবং সে লড়াই চরম পর্যায়ে পৌঁছলো বিদরে—চুঁচুড়া ও চন্দননগরের মাঝে এক জায়গায়। এর ফলাফল চূড়ান্তভাবে স্থির করে দিল ইতিহাসের গতি।

ওলন্দাজদের স্বপ্ন সৌধ ধূলিসাৎ করে ইতিহাস বিধাতা যেন বরাভয় দিলেন ইংরেজদের—'তোমাদের জয় হোক'।

তবে ইংরেজরা বেশ কেতা দুরস্ত জাত। এতটা সাজগোজ করে কোন বিদেশী জাতই পা দেয়নি ভারতবর্ষের মাটিতে। তারা যে রাজার জাত একটা রাজকীয় আভিজাত্য তাদের আচার আচরণে, আদব কায়দায় সারে সারে বাঁচাতে চেয়েছিল। নেপোলিয়ন যতই তাদের বেনের জাত বলে নিন্দে করুন না কেন তারা যে কেবল পাল্লা বাটখারা নিয়ে এদেশে পদার্পণ করেনি সেটা তারা বরাবরই বলতে চেয়েছিল। তাদের রাষ্ট্রদূত স্যার টমাস রো এদেশ ছেড়ে যাবার সময় [illegible] দিয়ে সরকারি ভাবে চার চারটে কুঠি রেখে গিয়েছিলেন—সুরাট, আগ্রা আহমদাবাদ আর [illegible] পাঁপরের সেই ব্রোচ। ধীরে ধীরে তাদের কুঠি বসল বম্বে মছলিপত্তম্‌ মাদ্রাজ উত্তরসরকার পশ্চিমে হরিহরপুর বালেশ্বর আর হুগলী। তারপর পাটনা, কাশিমবাজার। মাঝে মালদা ঢাকা রাজমহল। এবং অবশেষে সুতানুটি।

ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছিল আরও অনেকে য়ুরোপীয় জাতি—জার্মান দিনেমার এবং মুখ্যত ফরাসীরা। তবে ফরাসীদের পুরোপুরি সরকারী প্রচেষ্টা। একেবারে পাবলিক সেক্টর। সম্রাট, চতুর্দশ হেনরী, রিশলু আর কোলবার্ট প্রমুখ রাষ্ট্রনায়করা প্রাচ্যদেশে বাণিজ্যের মাহাত্ম্য অনুধাবন করে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পত্তন করেন। এবং তাদের প্রথম কুঠি ইংরেজদের মতই বসে সুরাটে—ষোলশ চৌষট্টি খৃষ্টাব্দে। সুরাট থেকে মছলিপত্তম্‌। পর্তুগীজদের তখন দৈন্যদশা। কাজেই সহজে মাদ্রাজের কাছে সানথোম তারা কেড়ে নিলে। কিন্তু পর বছরই গোলকুণ্ডার সুলতান আর ডাচদের যৌথ আক্রমণে সেটা বেহাত হয়ে চলে যায় ডাচদের হাতে। কিন্তু এই বছরই তারা ভালিকোণ্ডাপুরমের মুসলিম সুলতানের কাছে একটি ছোট্ট গ্রামের মালিকানা পেয়ে যায়—সেই গ্রামই আজকের পণ্ডিচেরী। আর বাঙলাদেশে নবাব শায়েস্তা খাঁকে জপিয়ে তারা নতুন আর একটি উপনিবেশ গড়ে তুলল ভাগীরথীর তীরে—আজকের চন্দননগর। পণ্ডিচেরী সানথোমের মত সাময়িকভাবে ডাচেরা কেড়ে নিলেও আবার ফিরে পায় ফরাসীরা। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকেই হারিয়ে যায় তাদের প্রভুত্ব সুরাট আর মছলিপত্তমের কুঠি থেকে। কয়েক বছরের মধ্যেই অবশ্য তারা অধিকার করে মাহে আর কারিকল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাদের নজর এদেশে অধিকারের দিকে নয়, তার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারটার দিকে। কিন্তু

কালক্রমে এলেন ডুপ্লে। ওদিকে লর্ড ক্লাইভ। কর্ণাটকের পর পর লড়ায়ে ঠিক হয়ে গেল বীরভোগ্যা এই বসুন্ধরায় ইংরেজরা থাকবে ফরাসীরা নয়। কলকাতাই থাকবে চন্দননগর নয়।

নীল মেখলা সমুদ্রের বন্দরে বন্দরে ঘুরে ঘুরে ইংরেজদের সুরাট থেকে সুতানুটি পৌঁছানর অনধিক একশ' বছরের পরিক্রমণের কাহিনী মোটামুটি ক্রমানুসারে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই অগ্রথিত তথ্যভিত্তিক ইতিহাস পরিবেশনে একদিকে দুঃসহ এক বিদেশী জাতির অসামান্য সাফল্যের কথা বিবৃত করা হয়েছে, তেমনি তুলে ধরা হয়েছে তাদের লোভ লালসা, নিষ্ঠা নিষ্ঠুরতা একাগ্র কামনা ও বাসনার বৃত্তান্ত এবং তুলে ধরা হয়েছে, সেকালের সমকালীন সামাজিক বিবর্তনের স্বল্পালোকিত অলিন্দের অজস্র ঘটনাপুঞ্জ। তবে বলা দরকার ইংরেজদের সব কুঠির জন্ম-মৃত্যু-বিস্তারের গল্প বলা যায় নি। কেবল ইতিহাসের দিক দিয়ে মুখ্য কুঠিগুলির কাহিনী বলা হয়েছে। তারই ভোক্তান হিসেবে সুতানুটির শৈশব-যৌবনের কিছু কাহিনীও পরিবেশন করা হ'ল।

বলাবাহুল্য, এই অনুবর্তন, ইতিহাস নয়, ইতিহাসের পরিপূরক কথা। যতদূর জানা যায়, ভারতবর্ষে ইংরাজ আগমনের ধারাবাহিক এ কাহিনী ইতিপূর্বে অনালোচিত। কাজেই এই পথ নিতান্তই অপরিচিত অগমিত বত্ম। নতুন পথিকের অবশ্যই ভ্রান্তির অবকাশ আছে। তবু নতুন দিগদর্শনের এই অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টা সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এবং সাধারণ পাঠকের আনন্দের কারণ হলে কৃতকৃতার্থ হব।

অলমতিবিস্তারেণ,

নারায়ণ দত্ত

"To the men of London and of Devon the unmapped world beyond the ocean seemed an archipelago of fairy islands, each hiding some strange wonder of its own, each waiting to be discovered by some adventurous knight vowed to leave his bones far away or to come back rich and tell his tale in the tavern."
—*G M. Trevelyan*

'লণ্ডন এবং ডেভনের লোকেদের কাছে সমুদ্রের ওপারে অজানা পৃথিবী ছিল কতকগুলি গুচ্ছ গুচ্ছ পরীর দ্বীপের মতন—প্রত্যেকেই বুকের মাঝে কিছু না কিছু বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষা করছে—তার দুঃসাহসী রাজকুমারের জন্যে—যে হয় তার কাছে জীবন সঁপে চিরকালের জন্যে ঘুমিয়ে থাকবে—নয়ত ফিরে যাবে রাশি রাশি ঐশ্বর্যের প্রসাদ নিয়ে তার দেশে আর কোন এক পান্থশালায় তার সেই অজানার উদ্দেশে অভিযানের কাহিনী রসিয়ে রসিয়ে বলবে।'

বলা বাহুল্য এই হচ্ছে মহারাণী এলিজেবেথের লণ্ডন, প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইংলণ্ড, শেক-স্পীয়রের ইংলণ্ড। সেই ইংলণ্ড, সেই ইংরেজ যারা আরমাডাকে পর্যুদস্ত ক'রে আত্ম বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত। সাতসমুদ্র শাসন করার নেশায় মাতোয়ারা। বিশ্ব থেকে সম্পদ আহরণ ক'রে আনবার দুর্বার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত। উদ্দাম। তরুণ গরুড়সম সারা পৃথিবীকে গ্রাস করার ক্ষুধার আবেগ করছে তাদের। 'ব্রিটানিকা রুল দি ওয়েভস'!

কিন্তু এটা পটভূমিকা মাত্র। আশু কারণ ইংলণ্ডে তখন গোলমরিচের দাম বাড়িয়ে দিলে ডাচেরা। যেখানে ছিল তিন শিলিং—একলাফে বাড়িয়ে করল ডবল—ছয় শিলিং; তাতেও হ'ল না—আবার বাড়ল, বেড়ে দাঁড়াল আট শিলিং। সারা ইংলণ্ডের গৃহিণীকুল ক্ষুব্ধ। গৃহস্থরা ব্যতিব্যস্ত। একটা বিহিত করতে হয়। মহারাণীরও বোধকরি টনক নড়ে থাকবে।

কি করা যায়, কি করা যায়—ভাবতে ভাবতে শহর লণ্ডনের বড় বড় ব্যবসায়ীরা একটা মিটিং করে ফেললে। স্থান ফিলপট লেন। বাড়ীটা অলডাম্যান রবার্ট স্মাইথের। কাল—সেপ্টেম্বরের বাইশে। পনেরশ' নিরানব্বই খ্রীষ্টাব্দ। মশলা না হলে তো রসুই বন্ধ ইংলণ্ডে। তখন তার খাবার বলতে কেবল মাংস। আলুর মুখ দেখেনি ইংলণ্ড। শাক-সবজির তখনও চলন হয়নি ভাল। ফল ফুলুরি তো নেই বললেই চলে। কাজেই গরীব গুর্বোদের কথা তো ছেড়েই দিন। রহিস লোকেদের খাবার

প্লেটে কেবল মাংস। সেই খাবার-দাবার স্বাদু করতে, রসনালোভন করতে, আজকের মাংস কালকের জন্য জারিয়ে রাখতে গোলমরিচ চাই। মশলা বিনা রান্না অচল। তখন তো আর 'রেফ্রিজারেটর' হয়নি, কাজেই মাংস বাসি হলেও তাকে জারিয়ে তুলে রাখতে হবে। তার জন্যও মশলা চাই। সেই গোলমরিচ।

বলতে হয়ত প্রত্যয় হবে না। সে যুগে আরও এক ব্যাপারে মশলা ছিল অপরিহার্য। তখন আধুনিক চিকিৎসার আলো পড়েনি য়ুরোপে। এই বহু নিন্দিত প্রাচ্য জটিবুড়ির গুণে এই প্রাচ্য মশলায় সেকালের য়ুরোপের ভেষজ চিকিৎসা হ'ত। যারা আমাদের গাছগাছালির টোটকা মুষ্টিযোগের চিকিৎসার কথা ব'লে নাক সিঁটকান, তারা একটু খোঁজখবর করলে জানবেন সেকালে য়ুরোপেও এ'দেশরই মসলায় দিব্যি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা হ'ত। মশলার এত প্রয়োজনের বোধহয় এটাও একটা কারণ। গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাচ, আদা, দারুচিনি, জায়ফল, জয়ত্রী, তেঁতুল, চন্দনকাঠ, ভাঙ্, আফিঙ্—এ সবই সেকালে য়ুরোপের দাওয়াখানায় বিক্রি হ'ত হু হু ক'রে। এবং বলা নিষ্প্রয়োজন—সোনার দামে। গোলমরিচের একটা দানা তার সমওজনের রুপার বদলে বিকিয়ে যেত বাজারে। আদা দারুচিনি—কিনত সব ডাক্তাররা—সেও বলতে কি, সোনার দামে!

কিন্তু আসে কোত্থেকে এই মশলা? কোত্থেকে আবার? যেখান থেকে শিখল য়ুরোপ মশলার ব্যবহার। একথা আজকাল আর ঢাক পিটিয়ে বলবার দরকার নেই রোমানদের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সংযোগ বহুকালের। রোমান রাজারাই বোধ করি প্রথম এ দেশের মশলা নিয়ে গিয়ে মাংস রেঁধে খেত। মশলা দেওয়া সে মাংসের তোফা স্বাদ। গন্ধেই রসনায় লালাক্ষরণ হ'ত। আর সেই রোমানরা যখন ইংলণ্ড অধিকার করে নিলে, তখন তারা তাদের দাস-ক্রীতদাসদের এই রান্নার এলেমটা কি দিয়ে আসেনি? সেভাবেই হোক বা যে ভাবেই হোক আস্তে আস্তে সারা য়ুরোপ ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল এই মশলার অপরিহার্যতা। তার সদগুণে ভুর ভুর করছিল সারা য়ুরোপের পাকশালা। আর সেই সঙ্গে ঐ খবরও ছড়িয়ে পড়েছিল নিশ্চয় যে, এইসব বিচিত্র মশলা আসে পুবদেশ থেকে। 'ইষ্ট ইণ্ডিজ' থেকে। ঠিক কোথায় সেই দেশ, সমুদ্রের কোন উপকূলে, কোন বেলাভূমির কোল ঘিরে সেই মোহময় মশলার বন, কোন পথ ধরে যেতে হয় সেই বনে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা বোধ করি কারও ছিল না সেদিন। তবু অজানাকে জানবার, কুমারী পৃথিবীর অবগুণ্ঠন উন্মোচনের নেশায় সারা ইংলণ্ড তখন পাগল—কাজেই প্রাচ্যের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য তরী বসাবার শপথ নিয়ে একশ পঁচিশজন অংশীদারের একটা বিরাট কোম্পানী ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেদিনই পত্তন হয়ে গেল—সেই 'ফাউণ্ডার্স'

হলে। পঁচিশজন ডিরেক্টর নিয়ে সেকালের পরিভাষায় 'কমিটি'। একজন চেয়ারম্যান। কোম্পানীর হর্তা কর্তা বিধাতা। যাবই আমরা যাবই, বাণিজ্যেতে যাবই।

তবে যাব বললেই তো আর যাওয়া হয় না। প্রাচ্যে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার—মনোপলি—দোব বললেই তো আর দেওয়া যায় না। তার অনেক রীতিকরণ আছে। ইংলণ্ডেশ্বরী তখন মহারাণী এলিজেবেথ। কড়াহাতে তখন রাজ্য শাসন করছেন। দোর্দণ্ড প্রতাপ। সব দিকে তাঁর সমানদৃষ্টি। তাঁর অনুমতি চাই। চাই—বাণিজ্যিক পরিভাষায—'কুইনস লেটারস পেটেণ্ট।' সেখানে আবার নানা ফ্যাচাং। ফর্দ ফিরিস্তি। কার নামে এই অনুমতি দেওয়া হবে? অবশ্যই গভর্ণরের নামে। 'গভর্ণর এণ্ড দি কোম্পানী অফ মারচেণ্টস অফ লণ্ডন ট্রেডিং ইন টু দি ইষ্ট ইণ্ডিজ'। ষোলশ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিক। একত্রিশে ডিসেম্বর। সারা ইংলণ্ড তখন ক্রিসমাসের ছুটি উপভোগ করছে। আগামী দিন তার মহাসমারোহে 'নিউ-ইযারস ডে'র আনন্দ উৎসব। এই প্রসন্ন দিনে মহারাণীর হুকুম মিলে গেল নবগঠিত এই কোম্পানীর ভাগ্যে। এই সনদ অবশ্য পনের বছরের জন্যে। যদি কোম্পানী চায় এবং ইংলণ্ডেশ্বরী রাজী হন, আরও পনের বছর এটি বাড়ান যেতে পারে।

তবে এই ঘটনা হতে এই ধারণা করে নেওয়া ঠিক নয় যে ভারতবর্ষের উদ্দেশে এঁরাই—এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই ইংরেজদের মধ্যে প্রথম পা বাড়ালেন বা পা বাডাবার প্রযাস পেলেন। আসলে ভারতবর্ষ, দ্বীপময় ভারতবর্ষের জন্যে ইংলণ্ডের আকর্ষণ আরও, আরও অনেক আগের। রাজা সপ্তম হেনরীর আমল থেকেই মুখ্যতঃ এই দূর দেশের তীরে নৌকা ভেড়াবার জন্য, তার অজস্র রত্নরাজি আহরণ ক'রে আনবার জন্য তাদের অভিযানের অন্ত নেই। এবং এই ব্যাপারে সোনার আখরে যে ইংরেজ তাঁর নিজের নাম লিখে গেছেন—তিনি ডেভনশায়ারের লোক। নাম সার্ ফ্রান্সিস ড্রেক। ড্রেক অবশ্য ভারতবর্ষে আসতে পারেননি। স্বয়ং মহারাণী এলিজেবেথের দাক্ষিণ্যপুষ্ট এই অভিযানে চিলি, পেরু, মেক্সিকো তখনও অখ্যাত, অজ্ঞাত উত্তর আমেরিকার তটভূমি স্পর্শ ক'রে মলাক্কা, সেলিবিস জাভা ঘুরে কেপ অফ গুড হোপের আশার বাণী সঙ্গে ক'রে, প্রভূত মণিমাণিক্য বাণিজ্য সামগ্রীতে তার তিনটি রণতরী বোঝাই ক'রে, ঠিক দুই বছর আর প্রায় দশমাস পরে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। মলাক্কা সাগরে নিশ্চিত ধ্বংসের একেবারে দোরগোড়া থেকে বেঁচে ফিরে তাঁর জাহাজ 'গোল্ডেন হিণ্ড' ভিড়ল প্লাইমাউথ বন্দরে। তখনও ইংলণ্ডের মাটিতে পা ছোঁয়াননি। সেপ্টেম্বর পনেরশ' আশি। ভাসমান জাহাজের বুক থেকেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে সমুদ্রের মাছধরা নাবিকদের ডেকে প্রশ্ন করলেন ড্রেক, 'কেমন আছেন মহারাণী এলিজেবেথ? ভালো ত?'

এই উৎকণ্ঠার কারণ বোধ করি এই যে মহারাণী এলিজেবেথ ছাড়া তাঁর এই দুর্দাম অভিযান কি অন্য কোন ভীরু রাজা ভালো চোখে দেখবেন? অবশ্য ড্রেকের ভয়ের কিছু ছিল না। মহারাণী এলিজেবেথ বহাল তবিয়তেই তখন রাজ্য করছিলেন।

ভালো, খুব ভালো ছিলেন তিনি। এবং ততদিনে তিনি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংলণ্ডকে বাঁচতে হলে এই অতলান্ত নীল সমুদ্রের কর্তৃত্ব তাঁকে কব্জা করতে হবে। এই প্রত্যয় নিয়েই স্পেনের উষ্মা উপেক্ষা ক'রে, মহারাণী এলিজেবেথ এক শুভ দিনে ফ্রান্সিস ড্রেককে তাঁর জাহাজে—'ডেপ্টফোর্ডে'-এ নিজে গিয়ে 'নাইটহুডে' ভূষিত করে এলেন। ইতিহাস বলে, এলিজেবেথ তাঁর রাজ্যকালে যে কয়েকটি অতি মূল্যবান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—যার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী তার মধ্যে এইটি অন্যতম। এ যেন তিনি নীরবে, প্রকারান্তরে ডাক দিয়ে গেলেন ইংলণ্ডের ঘরছাড়া দিকহারা হাজার হাজার দামাল ছেলেদের—সমুদ্রের বুকে ডিঙি ভাসিয়ে দেবার জন্যে। পনেরশ' আশি। ড্রেকের জাহাজ গোল্ডেন হিন্দকে জাতীয় কীর্তিস্তম্ভ হিসেবে সংরক্ষণ করারও হুকুম হ'ল। তবে নামটা সোনার হলেও জাহাজটা তো শাল কাঠের। বেশিদিন টেঁকেনি। অবশ্য এই জাহাজের কাঠ দিয়ে একটা চেয়ার তৈরী করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দেন রাজা দ্বিতীয় চার্লস। সে অবশ্য অনেক পরের কথা।

তবে রাণী এলিজেবেথের সে ডাক বিফলে যায়নি। যদিও, এর আগেই - ড্রেক জাভা মলাক্কা আসবার আগেই—টমাস স্টিভেন্স নামে এক ক্যাথলিক ইংরেজ লিসবন থেকে গোয়া আসেন এবং সেখানে জেসুইট কলেজের রেক্টারের চাকরি নিয়ে নেন। ঐশ্বর্য নিয়ে স্টিভেন্স কোনদিন ঘরে ফেরেননি তবে এদেশের ঐশ্বর্যের যে প্রাচুর্য সে সংবাদটা চিঠির মাধ্যমে দেশের মাটিতে তিনি পৌছে দিয়েছিলেন।

তবে স্টিভেন্সরা সংখ্যায় নগণ্য। ড্রেকের শিরোপা পাবার বছর তিনেকের মধ্যে—তিন তিনজন দুঃসাহসী বণিক ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। কিন্তু তাঁরা আসবার অনেক আগেই সুরাট হয়ে জেসুইট পাদ্রীরা আগ্রায় পৌছে গেছেন। বা আরও শুদ্ধ করে বলা যায় শাহানশা আকবর তাঁদের আমদানী করে ফেলেছেন।

পনেরশ' উনআশি সালের শেষের দিকে পর্তুগীজ গোয়ায় এক মুঘল দূত কুর্নিশ করে দাঁড়ালে। হাতে—স্বয়ং আকবরের মোহরাঙ্কিত চিঠি। দোভাষীকে ডাকা হ'ল। এবং গোয়ার পর্তুগীজ গভর্ণর ডম লুই দ্য অর্থাইড শুনলেন, সম্রাট তাঁর চিঠিতে দু'জন জেসুইট মিশনারী তাঁর দরবারে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। তাঁদের ধর্মশাস্ত্র সব নিয়ে তাঁরা যেন সত্বর আগ্রার উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়েন।

কিম্ আশ্চর্যং অতঃপরং। সম্রাট জালালুদ্দিন আকবর ডেকেছেন জেস্থইট পাদ্রীদের? স্রেফ, রাজারাজড়ার খেয়ালের ব্যাপার না অন্ত কোন মতলব? শেষকালে পাদ্রীদের বন্দী ক'রে তাদের আবার মুক্তিমূল্য চেয়ে বসবে না তো মুঘল সম্রাট? গভীর চিন্তায় পর্তুগীজ গভর্ণরের সাদা কপালে সারি সারি রেখা পড়ে গেল। কি করণীয়? কিন্তু সব ভাবনার সমাধান করে দিলে পর্তুগীজ ফাদাররা নিজেরাই। ধর্মান্তরণ করাই তাঁদের ধর্ম। সেই সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই না তাঁরা লিসবনের তীর থেকে এই দূর দেশে পাড়ি জমিয়েছেন? আর যখন এক বাদশা নিজে থেকে তাঁদের ধর্মকথা শুনতে চাইছেন, তারা ভয়ে পিছিয়ে যাবেন? তা' কি হয় নাকি? ফাদাররা গভর্ণর অর্থাইডকে সোজা বলে দিলেন—তাঁরা যাবেন। ঈশ্বর যখন সহজ একটা স্থবর্ণ স্থযোগ জুটিয়েই দিয়েছেন, তা' হাতছাড়া করার মত মূর্খ তাঁরা নন।

সতেরই নভেম্বর। গোয়া বন্দর থেকে স্থরাটের উদ্দেশে যে জাহাজটা পাড়ি জমাল তাতে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিল তিনজন পাদ্রী—আন্তনিও মনসেরেট, রুডলফ, অ্যাকযোভিভা এবং ফ্রানসিসকে এনরিকায়েস। তৃতীয় জন আসলে পারশি মুসলমান। পরে খ্রীষ্টান হয়ে যান। আর প্রথম জনের তো পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না কেননা তাঁর দেওয়া আকবরের বিবরণ তো আজ ইতিহাস।

পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাস। আগ্রার বুকে তখনও বেশ ঠাণ্ডা। পাদ্রী তিনজন গিয়ে পৌঁছলেন ফতেপুর শিক্রি। গায়ে সাদা ধবধবে লম্বা লম্বা জোব্বা। মাথায় টুপি। গলায় ঝুলছে লম্বা ক্রশ। শহরের রাস্তায় পদব্রজে যখন তাঁরা দরবারের দিকে চলেছিলেন দু'ধারে বেশ ভিড় জমে গেল। আবাল বৃদ্ধ বণিতা বিস্মিত চোখ তুলে দেখলে সেই আজব আগন্তুকদের। কে এরা, কারা? কোত্থেকে এসেছে? কেনই বা এসেছে? যাবেই বা কোথায়?

সে রহস্য সমাধান করতে ঐ দুর্ভাগা দেশের অনেক চোখের জল ফেলতে হয়েছিল; অনেক রক্ত। অনেক মানুষের দীর্ঘশ্বাস জমে জমে পাথরের মত দেশের বুকে চেপে বসেছিল। কিন্তু সেত অনেক পরের কথা। সম্রাট আকবর সেদিন সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন সেই জেস্থইট ফাদারদের। শুধু তাই নয়। বখ্শীকে ডেকে বলে দিলেন—আটশ' স্বর্ণমুদ্রা এঁদের হাতে দিয়ে দিতে।

ফাদাররা শুনলেন। ফাদার ফ্রান্সিসকো এনরিকায়েস ফার্সী জানতেন। তিনিই সম্রাটের আদেশ অন্যান্য ফাদারদের বুঝিয়ে দিলেন। ফাদাররা সব জোরে জোরে ঘাড় নাড়তে লাগলেন। তারপর ফ্রান্সিসকোই তাঁদের মুখপাত্র হয়ে বললেন, 'সম্রাটের অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। তাঁরা ঈশ্বরের সেবক মাত্র। তাঁদের কোন অর্থের প্রয়োজন নেই?'

শাহানশা বোঝা গেল খুবই প্রীত হলেন। বার বার তিনি তাঁদের ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তাঁদের আনা মেরী মাতার ছবি, তাঁদের ওল্ড টেস্টামেণ্ট প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ সবই অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে পুংখানুপুংখরূপে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন—নানা জিজ্ঞাসায় তাঁদের জর্জর করে তুলতে লাগলেন। অভিজ্ঞ ফাদাররা একসময়ে বুঝে নিলেন, সম্রাটের প্রাণে রয়েছে অপার ধর্ম-জিজ্ঞাসা। মতি রয়েছে ধর্মে। কাজেই মনে মনে বুঝি ঠিক করে থাকবেন, 'উপযুক্ত আধার। ছাড়লে হবে না। লেগে থাকতে হবে।'

একসময় তাঁরা আগ্রায় একটা গির্জা তৈরীর প্রার্থনা করে ফেললেন। এবং কল্পতরু সম্রাট আকবর মঞ্জুর করে দিলেন। জেসুইট পাদ্রীদের উৎসাহ বেড়ে গেল। তাঁরা ধীরে ধীরে শনৈঃ পন্থা করে অভিষ্ঠ পথে পর্বত লঙ্ঘনের জন্য এগোতে লাগলেন। মনে মনে গোপন বাসনা স্বয়ং সম্রাটকে জেসুইট স্বর্গের দ্বারদেশে পৌঁছে দেবেন। তাঁকেও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করবেন তাঁরা।

না। তা তাঁরা পারেননি। পারেননি তার কারণ হিসেবে যতদূর ধারণা করা যায় অনেকে বলেন, ফাদাররা নাকি সম্রাটকে একটি ছাড়া অন্যান্য বেগমকে পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত কারণ ছাড়াও সেকালের মুঘল রাজনীতির তদানীন্তন অবস্থায় সেটা ছিল সম্রাটের কাছে একেবারে অসম্ভব দাবী। যে ভাবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভারসাম্য তিনি রক্ষা করে চলেছিলেন, এই ব্যবস্থা নিলে তাঁর রাজনৈতিক আপেলের গাড়ীটা তাতে একেবারে উল্টে যেত। আকবর তো সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি দিল্লীশ্বরো, ভারতেশ্বরো বা।

তা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব সম্রাট পাদ্রীদের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়েছিলেন। ছেলেদের খ্রীষ্টধর্মের প্রার্থনা সভায় যোগ দেবার অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি। এতে অবশ্য তাঁকে তাঁর পরিবারের বিপুল বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আকবরের বুড়িপিসি তখনও জীবিত—গুলবদন নামার লেখিকা। গুলবদন বেগম তো একেবারে রেগে টং।

অবশ্য এই ক্ষোভ শুধু মুঘল হারেমেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ঐ জল অনেকদূর গড়িয়েছিল। পাদ্রীদের সঙ্গে এতটা মাখামাখির ফলে গোঁড়া মুসলমানরা এটাকে একেবারে ইসলাম বিপন্ন জিগিরে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল। তারা কাবুলের শাসনকর্তা আকবরের ভাই মুহম্মদ হাকিমকে শাহানশা' বলে ঘোষণা ক'রে বিদ্রোহের দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বাঙলা বিহারেও এই বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ উড়ে এসে পড়েছিল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। অবশ্য সম্রাট শুধু শাস্ত্রালোচনাই করেন না, শস্ত্র ধরতেও তিনি সমান দড়। কাজেই একসময়ে হাকিমকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত

করে ফেললেন। এবং হারিয়ে দিয়েও তাকে ভাই বলে ক্ষমা করলেন। তবে একবারে নয়। সরকারীভাবে কাবুলের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করলেন হাকিমেরই বোন বখ্‌তউন্নিসা বেগমকে। তার নামেই শাসনকার্য চালাতে হয় হাকিমকে। গোঁড়া মুসলমানরাও তাঁর জয়ধ্বনি করল। তবে ঝামেলা তো বড় কম হয়নি। কমদিন চলেনি এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম!

এইসব ঘটনায় যখন মুঘল দরবারে ডামাডোল—একদল সাহেব বেরিয়ে পড়ল বিলেত থেকে এই ভারতবর্ষ উদ্দেশে—পদব্রজে। এঁদের চার জনকে ইতিহাস দেবতা সনাক্ত করে রেখেছেন—এঁরা রালফ ফিচ, উইলিয়ম লীডস্, জেমস বা জন নিউবেরী এবং টমাস স্টোরী। সালটা পনেরশ' তিরাশী।

হাঁটছেন তো হাঁটছেন। এক সময়ে অর্মুজে পৌছালেন। সেখানে পর্তুগীজদের থানা। অন্য কোন দেশের লোক যাতে ভারতবর্ষের এই রত্নখনির সন্ধান না পায় তার জন্য এদের সতর্ক প্রহরা। এইসব শ্বেতাঙ্গ নন্দনদের দেখেই তারা ভাবলে—গুপ্তচর নয় তো? ব্রিটিশ জাত—তলে তলে কি মতলবে ঘুরছে কে জানে? সে-সব বোঝবার চেষ্টা না করে তাদের বন্দী করে ফেললে এবং কোনরকম অপেক্ষা না করেই সোজা পাঠিয়ে দিলে ভারতবর্ষের পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়ায়।

তবে ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং। গোয়ায় পক্ষকাল বন্দী জীবন-যাপনের পরই মুক্তি। সেখানে জেসুইট কলেজের সেই ইংরেজ ফাদার টমাস ষ্টিভেন্স রয়েছেন না? দেশের লোক বলে কথা। খবর পেয়েই তিনি ছুটে গেলেন—গভর্ণরের কাছে। বুঝিয়ে বললেন তাঁকে—এঁরা সব ভাগ্যান্বেষী। গুপ্তচর বৃত্তি এদের পেশা নয়। পর্তুগীজরা অবিলম্বে তাদের ছেড়ে দিলে। স্টোরী বললে, 'বাপু আর নয়। এখানেই সাধু সন্ন্যাসী হয়ে থাকব।' বলেই একটা 'মিশনে' ঢুকে পড়ল। অবশ্য বেশি দিনের জন্যে নয়। সারা দেশ জুড়ে কত ভোগের সামগ্রী—কত কামিনী কাঞ্চন। আর কিনা এই যৌবন বয়সে জামা জোব্বা প'রে সে-সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এইসব নীরস মিশনারী জীবন যাপন? আরে ছ্যাঃ স্টোরী কিছু কালের মধ্যেই ভজনালয় ছেড়ে একজন ইন্দো-পর্তুগীজ তরুণীর পাণিগ্রহণ করে ফেললেন। এবং সংসার যখন করলেন, সে সংসার চালাতে হবে—কাজেই, গোয়ার এক সদর রাস্তার বুকে একটা ছোট্ট দোকান খুলে ফেললেন! পুরো সংসারী মানুষ।

অন্য তিনজন—ফিচ্, লীডস আর নিউবেরী ছাড়া পেয়ে এদিক-ওদিক না গিয়ে সোজা মুঘল দরবারে গিয়ে উঠলেন। সম্রাট আকবর তখন শিক্রিতে। নিউবেরীর কাছে মহামান্য মুঘল সম্রাট—গ্রেট মুঘলের উদ্দেশে লেখা স্বয়ং মহারাণী এলিজেবেথের একটি পত্র ছিল। তার বয়ানটা অনেকটা এইরকম—"In respect of the hard

journey which they have under taken to places so far distant, it would please his magestie with some liberty and security of votage to gratifie it with such privileges as to him shall deem good'. যতদূর জানা যায়, এই পত্রের কোন ফল হয়নি। কেননা, রালফ ফিচ্ যিনি এই ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছিলেন, তার বিবরণে এলিজেবেথের এই চিঠিটির সম্বন্ধে সম্রাট আকবর যে কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু বলেননি। অন্যজন লীডস পাকা লোক। পেশায় জহুরী। মণিমুক্তা জহরতের প্রতি আসক্তি মুঘল সম্রাটদের তো প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে পড়ে। সম্রাট আকবর তো তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কাজেই লীডসকে যে তিনি একটা চাকরি দিয়ে দেবেন এ আর বেশী কথা কি? একটা বাড়ী দিলেন। পাঁচটা চাকর। একটা ঘোড়া। তনখা প্রত্যহ ছয় স্টার্লিং সিলিং। তোফা। তোফা আরামেই কাল কাটাতে লাগলেন লীডস্।

নিউবেরী দরবারে বসে রইলেন না। লাহোর যাত্রা করলেন। কথা ছিল বাঙলায় গিয়ে রালফ্ ফিচের সঙ্গে দেখা করে দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু তাঁর কথা আর শোনা যায়নি। তবে যতদূর জানা যায় লাহোর থেকে পারস্যের পথে খুন হয়ে যান। কেউ কেউ অবশ্য বলেন নিউবেরী নাকি গোয়ায় দোকান দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা বোধহয় ঠিক নয়।

তবে দেশে ফিরেছিলেন রালফ্ ফিচ্ বেশ কয়েক বছর এ দেশে কাটিয়ে। বাংলাদেশে এসেছিলেন। ব্যাণ্ডেল ঘুরে গেছেন। তাঁর বিচিত্র ভ্রমণকাহিনী মুঘল ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র কাহিনীতে ভরপুর। আগ্রা থেকে গিয়েছিলেন বাঙলার সপ্তগ্রামে। সপ্তগ্রাম তাঁর বিবরণে সুন্দর শহর—'এ ফেয়ার সিটিং' সব কিছু জিনিসেরই প্রাচুর্য। সেখানে 'প্লেন্টিফুল অব অল থিংস'। সোনার গাঁ বা তত্তার মেয়েদের সব টপলেস্ কটিদেশে একখণ্ড কাপড় ছাড়া সারা দেহে আর কোন আবরণ রাখতে তিনি নাকি দেখেননি। ফিচ্ বার্মা ঘুরে এসেছিলেন। পেগু শহরের পরিখায় রাশি রাশি কুমীরের অস্তিত্বের কথা তিনি ভুলতে পারেননি। তিনি সিংহল গিয়েছিলেন। দ্বীপময় ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন। এবং তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত যখন ইংলণ্ডের বুকে ছাপা হয়ে বেরোল—সারা ইংলণ্ডে এই সোনার প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। এবং সেই যে জন কোম্পানীর কথা বলা হল—তাদের প্রাচ্যদেশ অভিযানের উৎসাহ বাড়িয়ে দিলে—'গ্রেটলি এনকারেজড দি প্রোমোটারস অফ দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।' কিন্তু রালফের বিবরণ যেমন উৎসাহিত করেছিল ইংরেজ বণিকদের ইংরেজদের কিছু কিছু ব্যর্থতার খবরও এই সময়ে লণ্ডনে পৌঁছে গেছে। এই প্রসঙ্গে সে কথাও বলে

নেওয়া যেতে পারে। পনেরশ' একান্নব্বই খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন জেমস্ ল্যাঙ্কেস্টার বছর তিনেকের জন্য আফ্রিকা, কেপ কমোরিন, মশলার দ্বীপ মলাক্কা দেখে দেশে ফিরেছিলেন তিন বছরে। তবে নিজের জাহাজে নয় ফরাসী জাহাজে। এবং খুবই নাজেহাল হয়ে। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন কিছু জরুরী সংবাদ, সোনার বাঙলার রত্নরাজির খবর। সেই সুদূর অতীতে, কনকচূড় মুকুটখানি মাথে বাঙালী বণিক-নিচয় দ্বীপময় ভারতে তার সপ্তডিঙা মধুকর ভিড়িয়ে কি ভাবে বাণিজ্য ক'রে বেড়াত তারই বৃত্তান্ত। আর কিছু নয়।

এর পর রবার্ট ডাডলি তিনটে জাহাজ নিয়ে দেশের সমুদ্র বেলা ছেড়ে প্রাচ্যের উদ্দেশে তরী ভাসিয়েছিলেন। কিন্তু সেই যে ভাসালেন, তারপর আর তাঁর কোন খবরই পাওয়া যায়নি। অতলান্তনীল সমুদ্র তার অচিনপুরীর বুকে কোথায় যে তাকে লুকিয়ে ফেলল, কে জানে!

কিন্তু এই টানাপোড়েনের মধ্যে ওলন্দাজদের একটা খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল য়ুরোপে। ছড়িয়ে পড়ল ইংলণ্ডে। কর্ণেলিয়াস হাউটম্যান কেপ অফ গুড্ হোপ হয়ে সুমাত্রা, বাণ্টাম ঘুরে এসেছেন মূল্যবান মশলার সম্ভার নিয়ে। মোটা মুনাফা। বাণ্টামের রাজার সঙ্গে নাকি একটা চুক্তিও হয়ে গেছে ডাচদের। লাভ যে অবিশ্বাস্যরকম বেশি হয়েছে, সেটা সহজেই বোঝা গেল। কেননা বছর পাঁচেকের মধ্যে পনেরবার নৌযাত্রা করল ডাচেরা। পঁয়ষট্টিটা জাহাজ ছিল ওদের বহরে।

আবার জনকোম্পানীর কথায় ঘুরে আসা যাক।

এপ্রিল মাস। বাইশ তারিখ। ষোলশ' এক।

টরবে থেকে সার্ জেমস্ ল্যাঙ্কেস্টার সেই যে যিনি নিজেই একদা সমুদ্রাভিযান করেছিলেন—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হয়ে প্রাচ্যের উদ্দেশে প্রথম নৌ-অভিযান শুরু করলেন। সঙ্গে চারখানা জাহাজ তার সবচেয়ে বড় জাহাজখানা আসলে একটা যুদ্ধ জাহাজ। ছয় শ' টনী। আসলে এটা আর্ল অফ কাম্বারল্যাণ্ডের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কাম্বারল্যাণ্ড স্প্যানিশ নৌশক্তির মহড়া:নেবার জন্যে কয়েক বছর আগেই এটি তৈরী করেছিলেন।

সে যাই হোক। অপেক্ষমান আম জনতা, কোম্পানীর বড়কর্তা, ছোটকর্তা, কর্মচারী সবাইকার শুভেচ্ছা নিয়ে রুমাল নাড়া,কিছুবা হর্ষধ্বনির মধ্যে ল্যাঙ্কেস্টার তো তাঁর ঐতিহাসিক অভিযান আরম্ভ করলেন। 'জয় মা বলে ভাসা তরী'।—তরী তো ভাসল। কিন্তু কি ছিল সেসব তরীতে। সেকালের কাগজপত্রে জানা যায় —তরীগুলি বোঝাই ছিল ইংলণ্ডে তৈরী জিনিসপত্র যার মূল্য ছয়হাজার আটশ' ষাট

পাউণ্ডের মত। আর ছিল রুপোর মুদ্রা—আটাশ হাজার সাতশ' বিয়াল্লিশ পাউণ্ডের। এই রৌপ্যমুদ্রা দিয়েই কোম্পানী কিনবে প্রাচ্যের বন্দরে বন্দরে লবঙ্গ, মরিচ, দারুচিনি।

দীর্ঘ তের মাস ধরে ল্যাঙ্কেস্টারের 'রেড ড্রাগন' ভাসতে ভাসতে চলল দূর প্রাচীর রবিকরোজ্জ্বল দিগন্ত উদ্দেশে। তখন জলপথ ঠিকভাবে নির্দিষ্ট হয়নি। শুধু অজানা, অচেনা সমুদ্র। তার বিস্তৃত নীল জলরাশির বুকে সূর্য ওঠে। অস্ত যায়। সাগরের পাখিরা কখনও মাস্তুলে এসে বসে। কখনও দল বেঁধে দূরে দূরে উড়ে যায়। নীলকণ্ঠের গলায় আকন্দ ফুলের মালার মত। ল্যাঙ্কেস্টারের চোখে স্বপ্ন নামে। কখনও বা পূর্ব অভিযানের পথের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন ঠিক চলেছি তো। কখনও দ্বীপময় ভারতবর্ষের মশলা বনের গন্ধ যেন তাঁর নাকে আসে। আসে তার সোঁদা মাটির গন্ধ। মদিরা সাইডার প্রভৃতি মদ্যের সৌগন্ধে নাবিকরা তাদের পরিবার পরিজনের মুখগুলি ভোলবার চেষ্টা ক'রে থাকতে পারে। কবে যে ঘরে ফিরবে কে জানে? সেইসব ফেলে আসা মিষ্টি মুখগুলি এখন মনে ক'রে বেদনা বাড়িয়ে লাভ কি? কখনও বা সাগরের বুকে উত্তাল ঝড় আসে। জাহাজগুলো উথাল পাথাল। মা কি কেঁদেছিল? প্রেয়সী কি দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুছেছিল? কে জানে? ঝড়ের গর্জন মাঝে বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে।

সুমাত্রার অচিন বন্দর। অবশেষে তীর মিলল রেড ড্রাগনের। তীর মিলল। কিন্তু মিললনা বাঞ্ছিত সওদা। মাথায় বেতের টুপি পরে দেহাতী সওদাগরেরা বলে গেল—এবারে মরিচের চাষ হয়নি। ফসল নষ্ট। কাজেই এক আধটা নয় চারটে জাহাজের ক্ষুধা মেটাবে কে?

ব্যর্থমনোরথ ল্যাঙ্কেস্টার তো থামবার মানুষ নন। তিনি এগিয়ে গেলেন। এবং যে খোঁজে চিনি, তাকে যোগায় চিন্তামণি। সামনেই জাহাজ ভর্তি মরিচ নিয়ে পর্তুগীজ জাহাজ। এতো আর য়ুরোপের সুসভ্য আবহাওয়া নয়। এতো সাগরের নীল জল। এখানে জোর যার মুল্লুক তার। কালবিলম্ব না করে ল্যাঙ্কেস্টার সেগুলি লুণ্ঠন করে তাঁর জাহাজগুলি বোঝাই ক'রে ফেললেন। জাহাজ ভর্তি হতে বাকী যা ছিল, পাশেরই এক দ্বীপে নেমে সেগুলি সংগ্রহ ক'রে ফেললেন।

সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে এতদূর এসেছে। এখানকার ভাই বোনদের সঙ্গে একটু মোলাকাৎ ক'রে যাবে না। এতদূর অসামাজিক ল্যাঙ্কেস্টার নন। তিনি জাভার বাণ্টামে যে ইংরেজ কুঠি আছে তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ক'রে, আগামী অভিযানের জন্যে মালপত্র রেডি করে-রাখবার বরাত দিয়ে আবার দেশের উদ্দেশে নোঙর তুললেন।

দেশে ফিরলেন তখন সেপ্টেম্বর মাস। ষোলশ' তিন। এই সুখের সময়েই অবশ্য একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বলা যায়, ইন্দ্রপতন হয়ে গেল লণ্ডনে। মহারাণী এলিজেবেথ দেহ রাখলেন। সসমারোহে সিংহাসনে বসলেন প্রথম জেমস্। সেকথা থাক। মোদ্দা কথায় আসা যাক্, লাভ হয়েছিল কেমন? তা শত্তুরের মুখে ছাই দিযে, সব খরচাপাতি বাদ দিয়ে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ লাভ করেছিল কোম্পানী। এবং লাভটা যে কী বিপুল হয়েছিল, সেটা আর একটা ঘটনা থেকে জানা যাবে। স্বভাব-কৃপণ জনকোম্পানী টেমস্ নদীর তীরে, যারা মাল খালাস করেছিল সেইসব কুলিদের উপহার দিয়েছিল একপ্রস্থ নতুন স্যুট। অবশ্য সেইসব 'স্যুটে'র কোন পকেট ছিল না!

তবে এই শতকরা পঁচানব্বই ভাগ লাভের কথা শুনেই যাঁদের চোখ কপালে উঠেছে, তাঁদের অবগতির জন্য বলে রাখা দরকার উইলিয়ম কিলিং-এর নেতৃত্বে জনকোম্পানীর তৃতীয় অভিযানে লাভ হয়েছিল, শতকরা দু'শ' চৌত্রিশ ভাগ! লাভ আর কাকে বলে। ধুলো মুঠো ধরতে কড়ি মুঠো!

কিন্তু ব্যাপারটায় ঝামেলা ছিল কিছু। প্রথম অভিযানে কোম্পানী মোটা লাভ করেছিল সন্দেহ নেই কিন্তু মাল বিক্রি করতে তো সময় লাগে। কাজেই দ্বিতীয়বার নৌযাত্রার জন্য যখন কোম্পানীর টাকার দরকার হ'ল তখন আবার নতুন করে চাঁদা তুলতে হ'ল। ষোলশ' চার। মার্চ মাস। এবারে নায়ক হেনরি মিডলটন। সর্বসাকুল্যে, তাঁর বরাতে প্রথমবারের এক তৃতীয়াংশের বেশি মালপত্র, বিক্রয়ার্থ সামগ্রী জুটল না। যাইহোক, তাই সম্বল নিয়েই উদ্যোগী পুরুষ মিডলটন বেরিয়ে পড়লেন। এবং বাণ্টাম, আমবোনা ঘুরে জাহাজভর্তি সেই লবঙ্গ আর মরিচ সংগ্রহ ক'রে দেশে ফিরলেন। ব্যবসা মন্দ হ'ল না। ষোলশ' ছয়। তৃতীয় দফায় কথা তো বলাই হয়েছে! মুনাফার লেখাজোখা নেই। কিন্তু পরেরটাই ফক্কা! ঝড়ের পর দুর্বৎসর। দু'জাহাজ ভর্তি মাল পাঠান হয়েছিল প্রাচ্যের উদ্দেশে। কিন্তু না ফিরল জাহাজ, না মানুষ।

এই প্রসঙ্গে আর একটা ব্যাপার বলতেই হয়। কোম্পানীর প্রথম যুগের ব্যবসা চালাও হচ্ছিল বটে, কিন্তু এইসব অভিযান অংশীদাররা সব ব্যক্তিগতভাবে চাঁদা দিয়ে আরম্ভ করতেন এবং লভ্যাংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিতেন। হকিন্স, জন জুর্ডেন সবাই এই পর্যায়ের লোকজন। ষোলশ' বার থেকে কোম্পানী জয়েণ্ট স্টক কোম্পানী হিসেবে সরাসরি কাজ শুরু করে।

আরও একটা কথা। কোম্পানীর ব্যবসা ফাঁপছিল আর জুটছিল 'ইণ্টার লোপারের' দল—অর্থাৎ বিনা লাইসেন্সে ব্যবসা করা বোম্বেটে ব্যবসায়ীরা। এই প্রথম

যুগের এমনি এক বিখ্যাত ইণ্টারলোপার সার্ এডওয়ার্ড মিচেলবোর্ণ। না কোম্পানীর অংশীদার, না কিছু। কিন্তু তবুও ষোলশ' চার সালের গ্রীষ্মকালে তিনি প্রাচ্যের উদ্দেশ্যে জাহাজ ছাড়লেন। মিচেলবোর্ণ ব্যবসা বোঝেন না। তিনি বোঝেন দস্যুতা। 'পাইরেসি'। তুমি জাহাজভর্তি সোনাদানা মাল-মশলা নিয়ে যাচ্ছ। হারে-রে-রে ক'রে সেই জাহাজের ওপর গিয়ে পড়ল মিচেলবোর্ণ। দ্বীপে দ্বীপে আগুন জ্বালিয়ে নির্মমভাবে লুঠতরাজ করল। এবং এমনিভাবে তার জাহাজ ভর্তি করে বাড়ী ফিরল। ষোলশ' ছয় সালে। ফিরল লুঠতরাজ ক'রে শুধু ডাচদের ওপর নয়। চৈনিক জাহাজগুলিও তার শিকার হয়েছিল। করল মিচেলবোর্ণ। ইংরেজও। তাই বদনাম গিয়ে পড়ল জন কোম্পানীর ওপর। তারা সবাই জন কোম্পানীর ওপর খাপ্পা। রামের দেষে শ্যামের মাথাভাঙ্গার অবস্থা। জন কোম্পানীর সবচেয়ে দুঃখের কথা মিচেলবোর্ণ রাজা প্রথম জেমসের কাছে অনুমতি নিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও আইনতঃ সম্রাট প্রথম জেমসের এটা উচিত হয়নি। কেননা এলিজেবেথ এই একচেটিয়া অধিকার একমাত্র জন কোম্পানীকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা পরে দেখব রাজরাজড়াদের এই রোগ যায়নি। রাজা প্রথম চার্লস ও বনেল ও কিনাস্টন নামে দু'জন ব্যবসায়ীকে প্রাচ্যে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তার জন্যে কোম্পানীকে বিশেষ করে সুরাটের কুঠিয়াল মেথওল্ডকে বহু ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল! সে যাইহোক, কয়েক বছর পরেই, প্রথম জেমসই অবশ্য এলিজেবেথের দেওয়া পনের বছরের মেয়াদী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাচ্যে ব্যবসা করার অধিকার চিরকালের জন্য ক'রে দেবার কথা তোলেন এবং একসময়ে এই অধিকার দিয়েও দেন। ষোলশ' নয়।

এই বছরই আরও একটা ঘটনা ঘটে গেল যার ফলে ইংরেজদের মশলাদ্বীপপুঞ্জ থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হয়। এই যে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের এত বাড়বাড়ন্ত, জন কোম্পানীর এত ঐশ্চর্য, এটা ওলন্দাজরা স্বভাবতঃই ভালো চোখে দেখেনি। কিন্তু তারা করবে কি? স্পেনের সঙ্গে এতদিন তাদের ঝামেলা চলছিল। একসঙ্গে দুটো জাঁদরেল শত্রুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার মত কব্জির জোর তাদের ছিল না। এই বছরই স্পেনের সঙ্গে তাদের একটা সামরিক মিটমাট হয়ে গেল। এখন তারা একাগ্রচিত্তে ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে উঠেপড়ে লাগল। এ ব্যাপারে তাদের কয়েকটা সুবিধা ছিল। ইংরেজদের আগে দ্বীপময় ভারতবর্ষে তাদের পদার্পণ। কাজেই স্থানীয় রাজারাজড়াদের সঙ্গে আগবাড়িয়ে তারা সন্ধিসাবুদ করে ফেলেছিল। তারাও লড়াকু জাত। তারা এই দ্বীপপুঞ্জে অলিগলি সব জানত। কোন কোন জায়গা লড়ায়ের দিক দিয়ে দরকারী, সেইসব জায়গায় তারা ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল।

তাছাড়া ডাচেদের যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেটা তাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান—সরাসরি সরকারী আনুকূল্যের রক্ষাকবচ ছিল তাদের—কাজেই তাদের টাকা পয়সা অনেক, জাহাজ অনেক, কুঠি অনেক। অনেক বলে অনেক। যেখানে ইংরেজদের আনুকূল্যে একটা জাহাজ একটা কুঠি ; ডাচেদের সেখানে কমসেকম চারটে থেকে পাঁচটা।

দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে মালাক্কার মশলাই সবচেয়ে দামী। পাকে চক্রে, ইংরেজদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল ডাচেরা। রাজা প্রথম জেমসের সক্রিয় সমর্থন পেলে না ইংরেজরা। এদিকে লবঙ্গের দ্বীপ আমবোনায়, চারিদিকে ওলন্দাজেদের মধ্যে—হংস মধ্যে বক যথা—কয়েকজন ইংরেজ বণিক থাকত। ডাচ গভর্ণর স্থানীয় লোকেদের জোর জবরদস্তী করে তাদের দিয়ে একটা এজেহার দেওয়ালে যে, ইংরেজরা চক্রান্ত ক'রে ডাচেদের উৎখাত করতে চাইছে। সেই অভিযোগ পেয়েই ডাচ গভর্ণর আঠার জন ইংরেজকে বন্দী করার হুকুম জারি করলেন। তাদের ওপর চালাতে শুরু ক'রে দিলে অত্যাচারের রথচক্র। দশ জনকেও ফাঁসি দেওয়া হ'ল। এটাই ইতিহাসের 'আমবোনা হত্যাকাণ্ড'। ষোলশ' তেইশ। এই খবর লণ্ডনে পৌছলে এ নিয়ে খুবই হৈ চৈ হয়েছিল। কিন্তু তখনকার মত কিছুই বিহিত হয়নি।

ইন্দোনেশিয়া তাহলে বড় শক্ত ঠাঁই। এ বনে বাঘ আছে। এদিকে ভারতবর্ষে হাওয়া মোটামুটি ইংরেজদের দিকেই বইছিল। কাজেই ওখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ইংরেজরা খাস ভারতবর্ষের দিকেই মন দিলে। আর ভারতবর্ষ বলতে সুরাট। সুরাটের বালুবেলার ওপর দিয়েই ভারতবর্ষের মাটিতে ঢুকতে হয় জলপথে। ইংরেজরা তখন তাই ঢুকে পড়েছে। তাদের তখন চা চাই, চিনি চাই, কফি চাই, তামাক চাই। মশলা তো চাইই। ব্যবসার জন্য মসলিন চাই। বারুদের জন্যে সোরা চাই। ভালো তাফ্‌তা, শাল দোশালা চাই। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাপড়-চোপড় তো চাই। ভারতবর্ষের টাকায় আস্তে আস্তে ইংলণ্ডের কাউন্টিতে কাউন্টিতে বনেদী পরিবারের সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের কফি ছাড়া চলে না। যদিও একদল লোক কফি আমদানিকে বলেছে বিলাসমাত্র—**'most useless since it serves neither for nourishment nor debauchery**—এতে পুষ্টিও হয় না, বেলাল্লাপনাও হয় না—তবু কফি প্রভৃতি বিলাসদ্রব্য বলতে ইংলণ্ড তখন পাগল। পাগল জন কোম্পানীর শেয়ারের জন্যে। **'men and women still clamoured for the 'luxuries', and for shares in the much-abused Company'.**

কিন্তু এতো অনেক পরের কথা। আমরা আরও পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এসেছি। আগের কথা আগে। এবং ভারতবর্ষে ইংরেজদের আসার কথা বলতে গেলে সেই হতভাগ্য লোকটার কথা বলতেই হয়। বলতে হয় সেই রহস্যময় ইংরেজটির কথা—

যাকে কেউ বলেছেন প্রথম ইংরেজ 'অ্যামবাসাডর' কেউবা আমূল উ চয়ে সনাক্ত করেছেন জুয়াচোর 'ইম্পস্টার' বলে। লোকটার নাম জন মিল্ডেনহল। পনের শ' নিরানব্বই সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি দেশ ছেড়েছিলেন মিশরের উদ্দেশে। ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রারই ইচ্ছা। কনস্ট্যান্টিনোপলের ইংরেজ রাষ্ট্রদূত সার্ হেনরী অন্ততঃ তাই জানতেন। কিন্তু বাতাসের কানে কানে লণ্ডনে প্রাচ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নতুন কোম্পানী খোলার খবর শুনেই জন তাঁর মতিগতি পাল্টে ফেললেন। কনস্ট্যান্টিনোপলের সঙ্গী ইংরেজরা জানল - মিল্ডেনহল পদব্রজে আলেপ্পি যাচ্ছে। যতদূর জানা যায়, এক চমৎকার ফন্দি খেলেছিল জনের মাথায়। তিনি ভাবলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কাজ শুরু করার আগেই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার মুঘল ফরমানটা যদি সংগ্রহ করতে পারা যায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে নিঃসন্দেহে সেটা বেশ দামে বিকোবে। কাজেই, কালবিলম্ব না ক'রে মিল্ডেনহল ভারতবর্ষ নামক বিচিত্র দেশটির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

এবং বলা বাহুল্য জন কোম্পানীর ভারতে ব্যবসা ফাঁদার ব্যাপারে জন মিল্ডেন-হলের ব্যাপারটা না উল্লেখ করে উপায় নেই। কেননা, ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেমসের পরিচয় পত্র থাকুক আর না থাকুক, মিল্ডেনহল স্বয়ং সম্রাট আকবরের দরবারে হাজির হয়েছিলেন এবং সেখানে পর্তুগীজ 'লবিকে' পর্যুদস্ত করে ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে একটা 'ফরমান' আদায় ক'রে থাকবেন! যদিও ফরমানটার অস্তিত্ব প্রমাণ করার মত মালমশলা কিছুই পাওয়া যায়নি, তবু মুঘল দরবারে ইংরেজদের হয়ে কথা যে তিনি বলেছিলেন সেটা মিথ্যে নয়। এবং সম্রাট আকবরের আতিথেয়তা ও দাক্ষিণ্যও যে তিনি লাভ করেছিলেন, সে ঐতিহাসিক সত্যটা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তবে খোদ জন কোম্পানী তাকে কোনরকম পাত্তা দেয়নি। আকবরের কাছে পাওয়া বলে দাবী করা ফরমানটার স্বত্বটা কোম্পানীর বড় কর্তারা তাঁর কাছে কিনতে চাননি—মূলতঃ এই কারণে যে, হকিন্সকে তাঁরা তার আগেই ভারতবর্ষে পাঠিয়েছেন তিনখানা জাহাজভর্তি মালপত্র দিয়ে। সেই হকিন্সের খবরাখবর তখনও তাঁরা পাননি। তাছাড়া মিল্ডেনহলের দাম ছিল বেশ চড়া। পনের শ' পাউণ্ড। এবং যেমনি হকিন্সের কাছ থেকে 'ডেসপ্যাচ' পেতে লাগলেন জন কোম্পানী, অমনি একেবারে হাঁকিয়ে দিলে মিল্ডেনহলকে। শেষবেশ জন ভারতবর্ষে জন কোম্পানীরা মাত্র একটা কুঠিয়ালের চাকরি নিয়েই সন্তুষ্ট হতে চেয়েছিলেন—কিন্তু কোম্পানীর বড় কর্তারা এতই ক্ষেপে গিয়েছিলেন তাঁর ওপর—যে তাতেও রাজী হলেন না তাঁরা।

কিন্তু সোনার দেশ ভারতবর্ষ নিয়তির মত তাঁকে টানছিল। মাঝে কিছুদিন পারস্যের বাজারে ঘোরাঘুরি করে—নানা ঝামেলার মধ্য দিয়ে মিল্ডেনহল এক সময়ে আগ্রা পৌছান লাহোর হয়ে। সিংহাসনে তখন সম্রাট জাহাঙ্গীর। এবং তখন তিনি আজমীঢ়ে। কাজেই আজমীঢ়ের দিকে মুখ ফেরান। সঙ্গে এক ফরাসী—'অগাষ্টিন হিরিয়ট'। এই আজমীঢ়ের পথেই মিল্ডেনহল এক বিশ্রী রোগে ভুগতে আরম্ভ করেন। এবং আজমীঢ়ের বুকেই তাঁর ইহজীবনের পথ চলার শেষ হ'ল। ষোলশ' চোদ্দ এপ্রিল। আগ্রার রোমান ক্যাথলিক কবরখানায় জন মিল্ডেনহলের অন্তিম শয্যার ওপরে পর্তুগীজ পাদ্রীরাই ক্রশ আঁকা একটা শিলালিপিস্থাপন ক'রে তার গায়ে লিখে দিয়েছিলেন—জোঅন-দ্য মেনডেনহল—মৃত্যু ১৬:৪। ভারতবর্ষের বুকে এইটেই প্রথম ইংরেজ স্মৃতিসৌধ। মিল্ডেনহলের শেষকৃত্য করেন আগ্রাকুঠির ইংরেজ ফ্যাক্টর টমাস কেরিজ।

তবে জন মিল্ডেনহলকে ঠক, জুয়াচোর বলে যতই নিন্দা করা না হোক না, একথা তো অস্বীকার করা উপায় নেই যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ জাতির ব্যবসা-ফাঁদবার আয়োজন করার জন্যে কসুর করেননি তিনি। খাস আকবর বাদশার দরবারে পর্তুগীজ 'লবির' মোকাবিলা করতে চেষ্টা করেছিলেন—একা জন রক্ষা করে ইংরেজদের গড়। প্রত্যক্ষতঃ না হলেও পরোক্ষভাবে উইলিয়াম হকিন্সের পথ সুগম করেছিলেন।

এবং হকিন্সই প্রথম ইংরেজ যিনি ইংলণ্ডের বন্দর থেকে জাহাজ ভিড়িয়ে ভারতবর্ষের বুকে—সবটাই নৌপথে এসেছিলেন। এসেছিলেন সুরাট বন্দরে। তাপ্তী নদীর উত্তাল জলে ধোয়া আরবসাগরের বেলাভূমিতে। এই সেই সুরাট। তখন সপ্তদশ শতাব্দীর সূর্য উঠছে আর তার রক্তিম আলোকে সুরাটের বিস্তৃত বেলাভূমি অগ্নিবর্ণ।

তবে য়ুরোপের সঙ্গে সুরাটের আলাপ এই প্রথম নয়। একশ' পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক ভূগোল বিশেষজ্ঞ টলেমি যে পুলিপুলা বাণিজ্যকেন্দ্রের উল্লেখ করেছেন, অনেকে মনে করেন সেটা সুরাটেরই পবিত্র অংশ ফুলপদ। আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুবা গুজরাটের যে অপরূপ কারুকার্যময় রুপোর জিনিস—সেই রুপো আসত রোম থেকে। কিছুবা ইরাক থেকে। সুরাট তখন সুবা গুজরাটের মধ্যে। সুরাট তখন মস্ত একটা বাজার—তাপ্তী নদীর তীরে। সেখান থেকে সাতক্রোশ দূরে গিয়ে সমুদ্র। আবুল ফজল আরও বলেছেন, সুরাটের আশেপাশে আরও কয়েকটি ছোটখাট বন্দর ছিল রাণীর, বুল্ডেরি ও খুলসর। এখানকার আনারস ছিল ভারী সুন্দর। আনারস—নানা রস। যত খাবে তত রস। আইন-ই-আকবরীর মতে জুরথাস্ট্রর অনুগামী পার্শীরা পারস্য থেকে পালিয়ে এসে এখানে বসবাস করেন

এবং সম্রাট আকবর তাঁদের ধর্ম নিষ্ঠাসহকারে পালনের কোন বাধা সৃষ্টি করেননি।

অনেকে মনে করেন ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে কুতবুদ্দিন আহিল বাদের হিন্দুরাজা ভীমদেওকে হারিয়ে সুরাট ও রানদের অধিকার করেন। সুরাট জেলা তখন এক হিন্দু ফৌজদারের অধীনে। সে বেচারী কানরেজে পালিয়ে এসে মুসলমান সুলতান আধিপত্য স্বীকার করে নিয়ে মোটামুটি তার চাকরি বাঁচাল। মহম্মদবিন তুঘলকের আমলে গুজরাটে যে বিদ্রোহ হয়, তাতে সুরাটের লুণ্ঠনের খবর পাওয়া যায়। এই ঘটনার বছর ছাব্বিশ পরে ফিরোজ তুঘলক এখানে একটা দুর্গ নির্মাণ করান। তখন নাকি আশে পাশে, ভীলেদের ভারী দাপট্।

সারা পঞ্চদশ শতাব্দীটাই সুরাট যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর ঘুমভাঙলে দেখা গেল গোপীনামে এক ব্যবসায়ী—রাজা নয়—আমীর নয় সামান্য একজন বেনে সুরাট ঢেলে সাজাচ্ছে। এরই তৈরী গোপী তাকাও—নৌসরী ফটকের কাছে। হেন বিদেশী ভ্রমণকারী নেই যিনি এই বিখ্যাত দিঘির বুকে তাঁর ছায়া দেখে যাননি। সে দেল্লাভেলে থেকে সুরু করে যেণ্ডেলস্লো, ফ্রায়ার, হ্যামিলটন-কে নয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় এই নৌসারির কাছেই বাস করত পার্শী অগ্নি উপাসক জুরস্থেয়ীরা। এঁরা সব সূক্ষ্ম চিকনের কাজ করতেন। কাপড় বুনতেন।

এর পরেই অবশ্য শ্বেতাঙ্গ বণিকদের পায়ের ধুলো পড়তে শুরু হয়েছে। পনেরশ' চোদ্দ। এলেন পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা। তাঁর বৃত্তান্তে সুরাটের নামডাক খুব। ভারী বোলবোলা। মালাবার উপকূল বা অন্যান্য সব জায়গা থেকে অজস্র জাহাজ এসে ভিড়ত নিত্যব্যস্ত সুরাটে, যদিও এর বছর দুই আগে তাদেরই জাত-ভায়েরা সুরাটের বুকে অগ্ন্যুৎসব করে গেছে পৈশাচিক আনন্দে। এর পনের-ষোল-বছর পরে আবার এই নারকীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে পর্তুগীজ হার্মাদরা।

জানা যায়, পর্তুগীজদের এইসব অত্যাচারেই বাধ্য হয়ে আমেদাবাদের সুবেদার সুরাটের বুকে শক্তিশালী একটি দুর্গ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন এবং পনেরশ' ছেচল্লিশে সেই দুর্গ তৈরীর কাজ বিপন্ন হয়ে পড়ে। তবে সেই দুর্গ কতটা শক্তিশালী-ভাবে তৈরি করা হয়েছিল সেটা বিতর্কের বিষয়। কেননা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু দিল্লী-আগ্রায় তখন দ্রুত পটপরিবর্তন হচ্ছে। সম্রাট আকবর বসেছেন সিংহাসনে। ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে তাঁর শাসনের নাগপাশে ভারতবর্ষকে বাঁধছেন তিনি। এমন সময় গুজরাট করল বিদ্রোহ। মির্জারা দক্ষিণ গুজরাট অধিকার ক'রে নিলে। পনেরশ' বাহাত্তর। কিন্তু আকবর স্বয়ং বিদ্রোহ দমন করতে এগিয়ে আসছেন শুনে মির্জারা বন্দী সুবেদারকে ছেড়ে দিলে, দুর্গ অবরোধ তুলে নিলে, এবং সোজা দিলেন পিট্টান।

ষোলই নভেম্বর আহমেদাবাদের নামসর্বস্ব সুবেদার তৃতীয় মুজাফ্‌ফরশাহকে জোতানার এক শষ্যক্ষেত্র থেকে ধ'রে আনল সম্রাট আকবরের শিবিরে এবং পরদিন সুবেদারের বিরোধী ইতিমাদ খাঁর আর তার দলবল এসে আহমেদাবাদের চাবিকাঠি সম্রাটের হাতে সমর্পণ ক'রে বশ্যতা স্বীকার করল।

আকবর ইতিমাদ খাঁর এই আত্মসমর্পণের মূল্য দিলেন। 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্‌' — বিখ্যাত সেই চাণক্য-নীতি দেখা যাচ্ছে তিনিও মানতেন। মাহী নদীর উত্তরাংশ উত্তর গুজরাটের সুবেদার করে দিলেন খান্‌ আজমকে আর মীর্জারা গুজরাটের যে বাকী অংশ অধিকার করে বসেছিল—ইতিমাদ খাঁকে করে দিলেন তার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কেননা, ইতিমাদ খাঁ মির্জাদের বিরোধী!

বিশে নভেম্বর। শহর আমেদাবাদের চাবি খুলে স-সমারোহে শহরে প্রবেশ করলেন সম্রাট আকবর। আহমেদাবাদ তখন ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ নগরই শুধু নয়, তার ঐশ্বর্যের যেন শেষ নেই। আবুল ফজল তো বলেই ফেলেছেন এর তিন আশিটা মহল্লা প্রত্যেকেই যেন এক একটা শহর। এবং বলা বাহুল্য শুধু পারস্য নয়, য়ুরোপীয় বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্রস্থল।

আহমেদাবাদে একটু থিতু হয়ে বসতেই কুশাগ্রবুদ্ধি আকবর কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করলেন—ইতিমাদ খাঁকে দিয়ে মীর্জাদের দমন করা চলবে না। তাঁকেই অগ্রসর হবে। হতে হলেনও। এবং একসময় কাম্বে পৌঁছলেন। সামনেই সমুদ্র। আকবরের জীবনে প্রথম সমুদ্র দর্শন। মহম্মদ হুসেন মির্জা তখন সুরাটের অধীশ্বর। কাম্বে থেকে নিজে বরোদা অধিকারের জন্যে লেগে পড়ে আকবর সৈয়দ মুহম্মদ খাঁ বরহকে পাঠালেন সুরাট অধিকার করতে। অসীম সাহসিকতার সঙ্গে মির্জাদের হাত থেকে বরোদা উদ্ধার করে আকবর এলেন মুহম্মদ খাঁর সাহায্যে। এদিকে মুঘলবাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে সুরাটের রাণী তাঁর ছেলেকে নিয়ে পালালেন। সুরাটের দুর্গ রক্ষার জন্য রইলেন দুর্গেশ হামজাবান। এই হামজাবানের কিছু অতীত আছে। আকবরের পিতা হুমায়ুনের একদা কাজ করতেন তিনি। কিন্তু এক সময়ে মির্জাদের দলে ভিড়ে পড়েন।

আকবর সুরাট দুর্গ অবরোধ করেন এগারই জানুয়ারী। পনেরশ' তিয়াত্তর। হামজাবান ছয় সপ্তাহ এই অবরোধ কাটিয়ে অবশেষে আত্মসমর্পণ করেন ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী। আকবর তাঁকে ক্ষমা করেন তবে খুবসম্ভব আত্মসমর্পণের পর সম্রাটের সমীপে অভদ্র ভাষা ব্যবহার করার জন্য আকবর তাঁর জিব কেটে নেবার হুকুম দেন!

এই সময়ে আর একটা ঘটনার কথা না বললে অন্যায় হবে। হামজাবান আকবরের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পর্তুগীজদের সাহায্য ভিক্ষা করেছিল।

পর্তুগীজরা প্রথমে রাজী হয়েছিল। লোকলস্কর নিয়ে তরী ভাসিয়ে এক সময়ে সুরাটের উপকূলে হাজিরও হয়েছিল। কিন্তু তারা ধূর্ত জাতি। আকবরের বিরাট বাহিনী দেখে অবশ্যই তারা বুঝে নিলে এ বড় শক্ত ঠাঁই। সহজে সূঁচ গলবে না। কাজেই চুলোয় যাক হামজাবান—তারা সম্রাট আকবরের সামনে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো। একরাশি উপঢৌকন দিলে সম্রাটকে। বললে তারা পর্তুগীজ সরকারের দূত মাত্র। হুজুরের কৃপাপ্রার্থী।

আকবর তাদের দ্বিতীয়বার দেখলেন, একবার দেখেছিলেন কাম্বেতে। এবার দেখা হতেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তাদের দেশের কথা। কোথায় তাদের পর্তুগাল। শুধালেন, য়ুরোপে আর কোন্ কোন্ রাজ্য আছে—তাদের কথাও। আকবর তাদের যে এতটা মর্যাদা দিলেন—তার কারণ আর কিছুই নয়—সমুদ্রে তাদের প্রতাপের কথা তাঁরও কানে উঠেছিল। এবং জানতেন হজ যাত্রীদের জাহাজ লুণ্ঠনে পর্তুগীজরা খুবই দড়। কাজেই তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তিনি পর্তুগীজদের সাদরে গ্রহণ করলেন।

গোয়ার পর্তুগীজ ভাইসরয়—ডোম এ্যানটানিও নোরহোনার দরবারে একজন দূত পাঠালেন। সে যখন ফেরৎ এল—সঙ্গে এল এ্যানটানিও ক্যাবর্যাল। মুঘল দরবারে পর্তুগীজ সখ্যতার চারাগাছটি রোপন করা হ'ল এই সুরাটেরই উপকূলে।

সুরাটের বুকেই আর এক ঘটনার কথা বলে নেওয়া যায়। পার্শিয়ানদের ধর্মনেতা তুরাণীয়ান দার্শনিক দস্তর সাহ ইয়ারজী রাণার সঙ্গে এখানেই আকবরের আলাপ হয় এবং অগ্নিউপাসক পার্শিয়ানের ধর্মতত্ত্ব তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে শোনেন। এবং অনেকের এই ধারণা—পরে আকবর বাদশার দীনইলাহী ধর্ম প্রবর্তন করেন—তার জিজ্ঞাসা সুরু সুরাটের বুকেই।

যতদিন যায় সুরাটের সমৃদ্ধি বাড়ে বই কমে না। আকবর—জাহাঙ্গীর—শাহজাহান পর্যন্ত সুরাটের শান্তি বড় একটা ব্যাহত হয়নি এবং তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে শশিকলার মত। সম্রাট শাহজাহান তো তাঁর এই সুরাটের রাজস্ব উপহার দিয়েছিলেন কন্যা জাহানারা বেগমকে তাঁর পান খাবার খরচের জন্যে। এই রাজস্বের পরিমাণ ছিল বার্ষিক নাকি তিন লক্ষ টাকা। সম্রাট আলমগীরের আমলের একটা হিসেবে জানা যায় সে সময়ে আমদানী শুল্ক আদায় হত ত্রিশ লক্ষ টাকা। তার তুই পঞ্চমাংশ আসত এই এক সুরাট থেকেই।

অবশ্য সুরাটের বুকে সত্যিকারের কালবৈশাখীর ঝড় উঠতে সুরু করে মুখ্যতঃ আলমগীরের আমলে। সে ঝড় তোলে শিবাজীর মারাঠা বাহিনী। শিবাজী পর পর তুবার এই বন্দর লুঠপাঠ করেন। প্রথম পাঁচদিন ধরে। যোলশ' চৌষট্টি। জানুয়ারী

যোল থেকেবিশে। মুঘল গভর্ণর তো পালালেন। ইংরেজ, ডাচ ও ফরাসীরা মিলে কিন্তু নিজেদের কুঠি রক্ষা করে। সুরাটের দুই তৃতীয়াংশ মারাঠাদের হাতে ছাই হয়ে যায়। শিবাজী এককোটি টাকার সামগ্রী সংগ্রহ করেন। ছয় বছর পরে আবার সুরাটের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েন শিবাজী। এবারেও প্রচুর জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে যান। ফলে সুরাটের বাণিজ্য বুঝি চিরকালের জন্য উৎসন্নে চলে যায়। তবে তখন আস্তে আস্তে বোম্বাই-এর কদর বাড়ছিল। সেখানেই একসময়ে কোম্পানীর ভারতবর্ষের সদর দপ্তর তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য সে আরও কিছু পরের কথা। এবং তখনও নাটক কম নয়।

তবে সুরাটের কথা যতই পাঁচ কাহন ক'রে বলা হোক না কেন, ইংরেজদের যা সব বাড়বাড়ন্ত সে পোড়া বাংলাদেশ থেকেই—সুতানুটিতে যার সুরু। সরকারী এক হিসেবে জানা যায় প্রথম ষাট বছর জন কোম্পানীর ব্যবসা বছরে গড়ে আট লক্ষ-টাকার বেশী হয়নি। আর ষোলশ' একাশি সালে এক বাংলাদেশ থেকেই তার ব্যবসা হয়েছিল আঠার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার। শ্রীবৃদ্ধির বহরটা কি বিশাল।

এই তো গেল সুরাট। সুরাট বন্দর। আর সেই সুরাটের তীরেই জাহাজ ভেড়ালেন জনকোম্পানীর কাপ্তেন উইলিয়াম হকিন্স। চব্বিশে আগস্ট। ষোলশ' আট। বছর দেড়েক আগে দেশ ছেড়েছিলেন। সঙ্গে ছিল তিনখানা জাহাজ —সাতশ' টনী 'রেড ড্রাগন', পাঁচশ' টনী হেক্টর, আর দেড়শ টনী 'কনসেন্ট'। কোম্পানীর হিসেবে হকিন্স বেশ তাড়াতাড়িই পৌঁছেছিল। কেননা জাহাজে রুটি মজুত ছিল প্রায় একশ' মাসের মত, দু'রকম বিয়ার ছিল—একটা তিনমাসের মত—অপরটা একমাসের। আর আসল মদ ছিল—প্রত্যেকে প্রত্যহ এক পাঁট করে খাবে —এমনি আটমাসের রেশন। হকিন্সের নৌযাত্রা এমনি নির্বিঘ্ন হয়েছিল যে, নয় মাসে টেবল বে এবং আরও চারমাসে এডেন।

যাইহোক, সুরাটের কাছাকাছি হতেই হকিন্স বললেন, উলিয়ম কিটিং-কে রেড ড্রাগন আর কনসেন্ট নিয়ে বাণ্টাম চলে যেতে। বাণ্টামে মশলার বাজার। আর হকিন্স তাঁর হেক্টর জাহাজ নিয়ে ভিড়লেন সুরাট বন্দরে। মুকাররব খাঁ তখন সুরাটের কর্তা। খবর গেল তাঁর কাছে। সে হচ্ছে মুঘল আমলা। মুফতে দু' পয়সা আমদানির গন্ধ পেলেই সে পারে না এমন কাজ নেই। একদিন এসে জাহাজে ঘুরে ফিরে জিনিসপত্র দেখে বললে, সম্রাটের জন্যে উপঢৌকন যা যা এনেছেন আমাকে দিয়ে দিন—আমিই সম্রাটকে পৌঁছে দেব। তা' ছাড়াও নিজের জন্যে বেশ কিছু সওগাত 'পেএবল হোএন এবল':বলে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে চাপালে। তারপর হকিন্সকে বললে, আর সমুদ্রে কাটিয়ে কি করবেন এবার তীরে নামুন। দেশী

লোকজন সত্যিকারের অভ্যর্থনা জানালে হকিন্সকে। হকিন্স সুরাটের বুকে গিয়ে আস্তানা গাড়লেন।

তারপর একসময় হকিন্স মুকারব খাঁকে বললে, 'আমরা এখানে কুঠি করব।' অনেক জিজ্ঞাসা জবাবের পর মুকারব খাঁ বললে, 'সে তো আমার দেবার ক্ষমতা নেই। দেবে খুদ্ মুঘল সম্রাট। সুরাট সম্রাটের খাস জমিদারী। সরাসরি তাঁর শাসনে চলে। তাঁরই দরবারে গিয়ে আপনাকে আর্জি পেশ করতে হবে। নান্য পন্থা।'

মুকারবের কথা শুনেই হকিন্স বললেন, 'বেশ দিল্লীই যাব। তারই ব্যবস্থা করে দিন।' মুকারব মুখে তাকে স্তোক দেয়—দিচ্ছি দোব বলে। কিন্তু কাজে কিছু করে না। এমনি সময়ে বেঁধে গেল সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই। অবশ্য তিলোত্তমা এখানে ভারতবর্ষে ব্যবসার অধিকার। ইংরেজ পর্তুগীজে জোর মারপিট হয়ে গেল এক চোট! হকিন্স যখন সুরাটে ভালো ভালোয় নেবে পড়লেন এবং মুকারব খাঁ বাহ্যতঃ তাঁর সঙ্গে বেশ মোলায়েম ব্যবহার করতে লাগল, হকিন্স ভাবলেন হেক্টর জাহাজটা সুরাটে রেখে কি হবে। তাতে কিছু সুরাটে—কেনা মালপত্র বোঝাই ক'রে জাহাজের মাস্টার মানোকে সোজা বাণ্টমের উদ্দেশে রওনা হতে বললেন।

ক'দিন যেতে না যেতেই এল নিদারুণ দুঃসংবাদ। কয়েকজন নাবিক কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসে খবর দিলে,—'হেক্টর' বধ হয়ে গেছে। জাহাজের মাস্টার সমেত নৌকাভর্তি লোকজন মালপত্র সব পর্তুগীজরা লুটে নিয়ে গেছে।

হকিন্স প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তারপরেই ক্রুদ্ধ। তারপর কাগজকলম নিয়ে বসলেন। পর্তুগীজ ক্যাপ্টেনকে জোর পত্রাঘাত করলেন। তাঁরা সম্রাট প্রথম জেম্‌সের লোক। রাজকীয় পরোয়ানা প্রাপ্ত কোম্পানীর লোক। কাজেই লুণ্ঠিত মালপত্র যেন অবিলম্বে ফেরৎ দেওয়া হয়।

পর্তুগীজ কর্তারা তাচ্ছিল্যে নাসিকাকুঞ্চন করে বললে, 'ইংলণ্ড আবার দেশ। তার আবার রাজা। অখ্যাত তো একটা দ্বীপমাত্র। মালফেরৎ দেবে না কাঁচকলা। খট্‌, খট্‌, লবডঙ্কা।'

হকিন্স তো রেগে অগ্নিশর্মা। মাল ফেরৎ দেয়নি বলে যতনা গাত্রদাহ তার চেয়ে রাগটা আরও বেশি ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেমসের সম্বন্ধে অসম্মানকর উক্তিতে। হকিন্স পর্তুগীজ ক্যাপ্টেনকে যা লিখলেন—গোদা বাঙলায় সেটা হচ্ছে আমার রাজার সম্বন্ধে যে-সব অসম্মানজনক কথা লিখেছেন তার জবাব হচ্ছে অসিমুখে। যদি সাহস থাকে মাটিতে এসে মোকাবিলা করে যাবেন।

এদিকে মুকারব খাঁ—বদমাইসীর বীজতলা—আগ্রা যাবার কথা বললেই সেই আগ্রার বাণী শুনিয়ে যাচ্ছে—হচ্ছে, হবে। আসলে পর্তুগীজদের ভয়ে হোক, ভক্তিতে

হোক ইংরেজরা যাতে আগ্রা না পৌছাতে পারে, মুকারব খাঁ সেই চেষ্টাতেই ছিল। এদিকে পর্তুগীজদের সঙ্গে ইংরেজদের এইসব পত্রালাপের পরেই একদিন সত্যি-সত্যিই পর্তুগীজরা চল্লিশজন লোক নিয়ে হকিন্সের আস্তানা আক্রমণ করে বসল।

হকিন্সের তখন বিপদের ওপর বিপদ। কেননা, সঙ্গী বলতে তো দু' জন ইংরেজ চাকর আর এক বিখ্যাত ভ্রমণকারী উইলিয়ম ফিঞ্চ। ফিঞ্চ আবার তখন দারুণ অসুস্থ। উত্থানশক্তি রহিত। তবু হকিন্স দমবার লোক নয়। তিনজন লোক নিয়েই সে চল্লিশ জন লোকের মহড়া নিতে তৈরী।

এদিকে মুকারব খাঁর সঙ্গীন অবস্থা। তাঁর রাজ্যে এ ধরনের রক্তক্ষয়ী একটা সংঘর্ষ হয়ে যাক—সেটা তো ভালো কথা নয়। খবর পেয়েই তিনি হাঁ-হাঁ করকি-করকি বলে শান্তির দূত রূপে হাজির হলেন। এবং যুযুধান দুই পক্ষকে থামিয়ে দিলেন।

কিন্তু হাওয়া তখন ইংরেজদের পালে লেগেছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের কানে উঠেছিল সুরাটে এক ইংরেজ এসেছে। যেমনি খবর গেল সম্রাট ইংরেজ জাহাজের লোকজনকে তাঁর দরবারে দ্রুত পাঠাতে হুকুম পাঠিয়ে দিলেন। মুকারব খাঁ আর কি করেন হকিন্স এতদিন ইনিয়ে বিনিয়ে ব'লে যা করতে পারেননি, সম্রাটের আদেশ পেয়েই সেই কাজ করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। হকিন্সকে দিল্লী পাঠাবার আয়োজন করলেন।

পর্তুগীজরা প্রমাদ গুণল। ইংরেজরা যে কি বস্তু তা' তারা জানে। কিছুদিন আগেই মিল্ডেনহল এসে খাস সম্রাট আকবরের দরবারে বাঘা পর্তুগীজ লবিকে বেশ নাড়া দিয়ে গিয়েছে। কাজেই নতুন করে এই হতভাগা হকিন্স গিয়ে কি ফ্যাসাদ বাঁধাবে কে জানে। কাজেই ষোলশ' নয়, পয়লা ফেব্রুয়ারি পঞ্চাশ জন পাঠান দেহরক্ষী নিয়ে হকিন্স যাত্রা করতেই তারা সব নানা ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাততে লাগল যাতে মাঝপথেই ইংরেজদের নিকেশ করা যায়। ক্যোচম্যানকে তারা নাকি ঘুষ দিয়েছিল, পেছন থেকে সে যেন হকিন্সকে ছোরা মারে। দুভাষীকে টাকা খাইয়েছিল—খাবারে যেন বিষ মিশিয়ে দেয়। কিন্তু কথায় বলে, রাখে কেষ্ট মারে কে? হকিন্স বহাল তবিয়তে একদিন সুরাট ছেড়ে আগ্রা গিয়ে পৌছলেন।

এই তো গেল হকিন্সের সুরাট পর্ব। কিন্তু আগ্রায় হ'ল কি তার? সে গল্প হকিন্সের কাছে না শুনে সেকালের আর একজন পর্যটকের মুখে শোনা যাক। সেই সঙ্গে শোনা যাক—সুভালি বা সোয়ালি হোলের আবিষ্কারের কাহিনী।

সুরাটের কথা বলতে গেলে আগে 'সোয়ালি হোলের' কথা বলতে হয়। ইতিহাস বলে 'সোয়ালি হোল' আবিষ্কার ক'রে ইংরেজরা সুরাটের পথ পরিষ্কার করেছিল। স্যার্ টমাস রো তাঁর আগে টমাস বেস্ট সবাই নেমেছিল এই সোয়ালিতে। বলতে কি, সোয়ালিই হয়ে গিয়েছিল সুরাটের সদর দরজা। এবং 'সোয়ালি হোল' মানেই এক অখ্যাত ভারত পর্যটক জন জুর্ডেন।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো পর্যটক বলতে সহজেই যে ছবি আমাদের মনে আসে—যিনি শুধু দেশ দেখতে বা ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়েই দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান—জন জুর্ডেন তেমন লোক নন। ভারতভ্রমণ তাঁর উপরি পাওনা। আসল উদ্দেশ্য রোজগারের ধান্দা। সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে বহু ঝড়ঝাপটা উপেক্ষা ক'রে জন কোম্পানীর চাকরীটা নিয়ে জুর্ডেন পাড়ি জমিয়েছিলেন প্রাচ্যের উদ্দেশে তখন 'ইষ্ট ইণ্ডিজ' নামটাই প্রতীচ্যের উদ্যোগী পুরুষদের মনে একটা মায়াজাল বিস্তার করত। সে এক অজানা রহস্যময় দেশ। তার তাল তমাল নারিকেলবীথির মর্মরধ্বনি মায়াবিনীর কুহকমন্ত্রের মত তাদের ঘরছাড়া করত। সেখানে মরিচ, লবঙ্গ, দারুচিনি বনের মোহময় গন্ধ। সেখানে সোনার গাছে হীরের ফুল ফোটে। সেই হীরামতি গজমতি দেশের রাজকন্যা সোনার খাটে শুয়ে রুপার খাটে পা রাখে। দেশটা কেবল সোনায় মোড়া, রুপায় মোড়া, মণি-মাণিক্য জহরৎ এর জড়োয়ার চাকচিক্যে ঔজ্জ্বল্যে চোখে ধাঁধা লাগে। সেখানে বালুকা বেলায় যেন সোনা ছড়ানো। টাকাও হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। শুধু আহরণের অপেক্ষা। কাজেই দলে দলে লোক যে এই ভারতবর্ষের উদ্দেশে পাড়ি দেবে এ আর বেশী কথা কি?

জন জুর্ডেনও দিয়েছিলেন। তবু সেদিনের সেই গড্ডালিকাপ্রবাহে জন জুর্ডেন একটি বিশিষ্ট নাম। নয়তো তাঁকে নিয়ে আজ গল্প বলার অবকাশই থাকত না। তিনি শুধু অর্থ আহরণের আয়োজনই করেননি ভারতবর্ষ থেকে, তাঁর নিজস্ব চোখ দিয়ে সে সময়ের ভারতবর্ষকে দেখে তার প্রাণ আগ্রা, তার সিংহদ্বার সুরাট, তার বিচিত্র রাজপুরুষের দল, তার সম্রাট, তার নওরোজ উৎসব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত তবু সত্যনিষ্ঠ কিছু বিবরণ, তথ্যনিষ্ঠ ছবি রেখে গেছেন। হয়ত খবরের দিক দিয়ে সেগুলো এমন কিছু নতুন নয়, কিন্তু সমসাময়িক বিবরণগুলি মিলিয়ে যাচাই করে দেখবার জন্য জুর্ডেনের বিবরণের সাহায্য অস্বীকার করা যায় কি? সেই ঐতিহাসিক মর্যাদা তো তাকে দিতেই হবে।

আশ্চর্যের কথা, সে প্রাপ্য মানও তিনি পাননি। না পাবার কারণ, বোধ করি, ঠিক জুর্ডেনের সময়ে বেশ কয়টি মূল্যবান বিবরণ, রয়ে গেছে। রয়েছে হকিন্সের বিবরণ, স্যার হেনরি মিডলটনের জর্নাল, রাল্‌ফ ফিঞ্চ ও উইলিয়াম ফিঞ্চের দিনপঞ্জী এবং সর্বোপরি সার্ টমাস রোর মূল্যবান রোজনামচা। করিয়েট প্রভৃতি অন্যান্য ছোটখাট বিবরণের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল। কাজেই জন জুর্ডেনের বিবরণের আর আদর হবে কেন? ভোজবাড়ী ফেলে কে আর গেরস্থবাড়ীর শাকচচ্চড়িতে উদরপূর্তি করতে চায়? শকুন্তলাকে ফেলে কে আর শোনে হংসপদিকার বৃত্তান্ত?

সামান্য হোক, তবু তাই নিয়েই আজকের আলোচনা। কেননা তাঁর জর্নালের একটা চরিত্র আছে—'**His journal is his monument; and in its candid pages we may easily discern the sterling nature of the man.**' এই জর্নাল যখন শুরু হচ্ছে, বিলেতে তখন বসন্তের ঝরঝরে আকাশ। গাছে গাছে শীত অবসানের আনন্দ। দিনরাত সেই গলাগলা বৃষ্টি, কুয়াশা, অন্ধকার, গোমরামুখো প্রকৃতি আর নেই। গ্রামেঘরে পাখী ডাকছে। নাইটেংগেল বা স্কাইলার্ক। সেই রৌদ্রকরোজ্জল দিনে 'এ্যাসসেনসন' জাহাজের নোঙর উঠল। প্রাচ্যের উদ্দেশে তার শুভযাত্রা। তাতে রয়েছেন চিফ ফ্যাক্টর জন জুর্ডেন। খ্রীষ্টাব্দ ষোলশ' আট। দেশে ফিরেছিলেন দীর্ঘ নয় বছর পর। এর মধ্যে বছর তিনেক ছিলেন ভারতে। দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট জাহাঙ্গীর। কিছুদিন আগেই ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সের চিঠি নিয়ে এসেছে উইলিয়ম হকিন্স দিল্লীর দরবারে। নিজেকে সম্রাটের রাষ্ট্রদূত বলে পরিচয় দিয়ে দিব্য বহাল তবিয়তে রয়েছে এদেশে। সম্রাট তাকে শিরোপা দিয়েছেন। দিশি আরমেনিয়ান মেয়ের সঙ্গে শাদী দিয়েছেন। নতুন উপাধি দিয়েছেন ইংলিশ খান্। কিন্তু দেননি সেটা যার জন্য হকিন্সের দিল্লী যাত্রা। দেননি সুরাটে কুঠি বানবার সনদ বা সারা রাজ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার ফরমান। দুটোই সমান দুর্লভ। মরীচিকার মত ইংরেজ ব্যবসায়ীদের তৃষ্ণা শুধু বাড়িয়েই চলেছে—মেটাবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

এমনি যখন অবস্থা—হকিন্সের আসবার প্রায় বছর খানেক পরে—জন জুর্ডেন নামে প্রায় চল্লিশ বয়স এক ইংরেজ ফ্যাক্টর ভারতের মাটিতে পা দিলে। জুলাই, ষোলশ' নয়। ভারতবর্ষে এলে কি হবে জুর্ডেনকে আগ্রা পৌছতে প্রায় বছর দুই সময় ব্যয় করতে হয়েছিল এবং আগ্রা যখন পৌছলেন, হকিন্সের তখন খুবই দুর্যোগ চলেছে। অবশ্য মুঘল 'ব্যুরোক্রোসি' বড় বিচিত্র বস্তু। তার মর্জি বোঝা ভার। হকিন্স যে বোঝেননি সেটা কোন বড় খবর নয়। অমন যে দুঁদে ব্রিটিশ রাজপুরুষ সার্ টমাস রো—বলতে কি ইংলণ্ডের বেশ উঁচু মহলের খানদানী লোক—তিনিও

প্রকারান্তরে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরেছিলেন এখান থেকে, তা উইলিয়াম হকিন্স কোন্ ছার!

জন জুর্ডেন তাঁর রোজনামচায় লিখছেন, তিনি যখন আগ্রা পৌছলেন, হকিন্সের তখন খুবই বেসামাল অবস্থা। **'At my comeinge to Agra, I was presentlie imformed that Captaine Hawkins was in some disgrace with the kinge for three causes'**, এইটি তিনটি কারণও চিত্তাকর্ষক, কেননা এ থেকে বোঝা যায় মুঘল 'বুরোক্রেসির' কার্যকলাপ কি বিচিত্র খাতেই না বইত! সুরাটের কাসটম্‌স্ অফিসার ও কাম্বের শাসনকর্তা মুকারব খাঁ হকিন্সের জাহাজ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ কাপড়চোপড় কেনেন। অবশ্য পরে পশ্চাতে দাম দেবেন এই কড়ারে। এখন হকিন্স সেই টাকাটা বার বার তাগাদা দিয়ে যখন পেলেন না, সোজা একদিন সম্রাট জাহাঙ্গীরের কানে তুলে দিলেন। সম্রাট শুনেই তাঁর চিফ সেক্রেটারী খাজা আবুল হাসানকে ডেকে পাঠিয়ে টাকাটা যাতে হকিন্স অবিলম্বে পেয়ে যায় তার ব্যবস্থা করতে বললেন। মুকারব খাঁর চোখ কপালে ওঠবার দাখিল। কিম্ আশ্চর্য্যং অতঃপরং! তিনি সুরাট বন্দরের শুল্কের হর্তাকর্তা তিনি জাহাজ থেকে কিছু কাপড় নিয়েছেন—তার কিনা দাম চায় ফিরিঙ্গীর বাচ্চা? কিন্তু করবেনই বা কি? আবুল হাসানও পরামর্শ দিলেন, ভায়া হে, সম্রাটকে যখন বলেছে, একটা রফা করে ফেল, নয়তো অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াতে পারে। মুকারব খাঁ একগাল হেসে হকিন্সকে বললে, 'আরে রাগছ কেন? বলেছি, তোমায় টাকা দেব না? এই নিয়ে তুমি সম্রাটকে বলতে গেলে? ছুঁচোর বিষ্ঠা পর্বতে? দোব, দোব টাকাটা শীঘ্রই দিয়ে দেব। মিথ্যা ভাবনা!'

ঐ হচ্ছে বড়লোকের দেনা। শুধতে সময় লাগে। আজ-দিচ্ছি কাল-দিচ্ছি করতে করতে একদিন মুকারব খাঁ বলে বসলেন তাঁর দেয় টাকার প্রায় সিকি ভাগ তিনি দেবেন না কেননা, সেটা তাঁর ভাই কিনেছে; এবং সেই কাপড়ের জন্য এমন সব দাম চাওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত চড়া। হকিন্স একগুঁয়ে ইংরেজ তারওপর স্বয়ং সম্রাট তাঁর মুরুব্বি। বললেন, 'ওসব হবে না। আমার পাওনা পুরোটাই উসুল চাই।' মুকারব খাঁ সাফ্ হাঁকিয়ে দিলে, 'যা দিচ্ছি নেবে তো নাও, নয়তো পথ দেখ।'

হকিন্স নাছোড় বান্দা। আবার সম্রাটের কানে এ ব্যাপার তুললে। সম্রাট তো রেগে আগুন, তেলে বেগুন! আবুল হাসানকে বললেন ক্রুদ্ধকণ্ঠে, এক্ষুনি যেন হকিন্সের টাকাটা মিটিয়ে দেওয়া হয়। হাসান হকিন্সকে ডেকে পাঠালেন তাঁর বাড়ীতে। যে টাকাটা মুকারব খাঁ দিতে চেয়েছিলেন সেটা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, যা দিচ্ছি সুড় সুড় করে নিয়ে যাও। যদি বেগড়বাই করো, ফল ভাল হবে

না ! দেখা গেল, এতকালের অনুনয় বিনয়ে যে কাজ হয়নি, আজকের রক্তচক্ষু সেই কাজ অবলীলায় করে দিলে ! হকিন্স সুড় সুড় করে টাকাটা নিয়ে বিদায় হ'ল। একই সঙ্গে তার পাওনা টাকার চৌথ চলে গেল আর গেল আবুল হাসান আর মুকারব খাঁর শুভেচ্ছা ! দুগ্র্‌হ আর কাকে বলে !

এদিকে হকিন্সকে যেদিন সম্রাট ইংলিশ খাঁ খেতাব দিয়েছিলেন, সেদিনই আবুল হাসানকে বলে দিয়েছিলেন, হকিন্সকে একটা ছোটখাট জায়গীর দিতে। এখন ঐ ঘটনার পর জায়গীরের কথা আবুল হাসান আর কর্ণপাতই করেন না। **'Nowe Captaine Hawkins looks for his land which the King had promised him, and cannot be without the ayde of Abdelasan ; which when Captaine Hawkins came to speake to him about it, he would hardlie affoard to speake with him, butt att length hee told him that there was nothinge for him ; beinge a marchannt, he might plye his marchandizinge and not looke for anything att the King's hands ··'** অর্থাৎ হকিন্সের জায়গীরের আবেদন শেষ বেশ আবুল হাসান স্রেফ হাঁকিয়ে দিলেন। বলেই ফেললেন, 'তুমি বাপু বেনে, ব্যবসা করে খাও, তুমি তো আর সত্যি রাজপুরুষ নও যে রাজার হাত থেকে জায়গীর পাবে।'

আবুল হাসান আরও বলেছিল, বাপু হে, তুমি যে বেনে সে খবর স্বয়ং সম্রাটের কাছে পৌছেছে। এবং সে খবর পৌছে দিয়েছেন সম্রাটের মাতাঠাকুরাণী। বিয়ানায় নীল কিনতে গিয়েছিল রাণীমার জাহাজ। সেখানে শোনে সেখানকার সব নীল তোমারই ফ্যাক্টর ফিঞ্চ (বিখ্যাত **William Finch**) কিনে ফেলেছে। রাণীমা অনেক সাধ্যসাধনা করে মাত্র এক বাক্স কিনতে পেরেছেন।

কিন্তু মুঘল 'ব্যুরোক্রেসির' কোপ এত সহজেই প্রশমিত হয়নি। আরও নাস্তানাবুদ করেছিল হকিন্সকে ! সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজে মগুপ হলেও তাঁর সভাসদরা কেউ উগ্র মদ্যপান করে দরবারে আসুক, এটা তিনি পছন্দ করতেন না। কাজেই তিনি একটা ফরমান জারী করে দিলেন সেইমত। কিন্তু হকিন্স তো ফার্সী ফরমানের মানে বোঝেন না। আর মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। যথা নিয়মে একদিন তিনি প্রভূত মদ্যপান করে দরবারে গেছেন, আর আবুল হাসান তাকে একবারে খোদ সম্রাটের কাছে নিয়ে হাজির করলে। তার মুখ দিয়ে তখন কড়া মদের গন্ধ ভুর ভুর করছে। সম্রাটের ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হল না। বিদেশী লোক ! সম্রাট তাকে বাড়ী যেতে বললেন। আর ভবিষ্যতে মদ্যপান করে সভায়

আসতে নিষেধ করে দিলেন। বারণ করে দিলেন :সম্রাটের কাছে দাঁড়াতে। মুখ-চোখ লাল করে অপমানিত হকিন্স সভা ত্যাগ করলেন। আবুল হাসানের ক্রুর চোখে বিচিত্র একটা হাসি খেলা করে গেল।

এইসব ঘটনার পাশে পাশে জুর্ডেন সিংহের মুখ থেকে জাহাঙ্গীরের প্রাণরক্ষার কাহিনীটাও বলে নিয়েছেন। বলেছেন তাঁর আমদরবারের কথা, প্রতিদিন চারঘণ্টা। জুর্ডেন লিখেছেন : **After the Kinges cominge to the cittee, havinge rested himselfe two or three daies, he beganne to sitt abroad, as he was accustomed, four howers every daie to heare all mens cawses, two howers in the forenoone and two howers in the afternoone. The rest of the daie he employeth in seeing elephannts to fight, and other sports** এই খেলার কথা বলতে গিয়েই জন জুর্ডেন জাহাঙ্গীরের সিংহেয় সঙ্গে মানুষের লড়াই-এর গল্প বলেছেন। বেগম সাহেবরাও নাকি চিকের অন্তরাল থেকে এই কদর্য খেলা দেখতেন। জুর্ডেন একটা গল্প বলেছেন। একবার একজন দুর্ধর্ষ পাঠান জাহাঙ্গীরকে এসে বললে, 'সম্রাট আমাকে এক হাজারী মনসবদার করে দিন।' এক প্রচণ্ড কৌতুক খেলা করে গেল সম্রাটের চোখে, বললেন, 'কেন? এমন কি বীরত্ব আছে তোমার যাতে তোমাকে মনসবদার করে দেব? সাধারণ মানুষের সঙ্গে তোমার তফাৎ কি? তুমি কি খালি হাতে সিংহের সঙ্গে লড়তে পার?'

পাঠান বুক ফুলিয়ে বললে, 'আলবাৎ। জান কবুল।'

সম্রাট এক ক্ষুধিত সিংহকে ছেড়ে দিতে বললেন।

মানুষ-সিংহের সেই কদর্য লড়াইয়ের মানুষই জিতল সেদিন, কিন্তু নিতান্ত অল্পকালের জন্যে! বিজয়গৌরবে উদ্দীপ্ত সেই পাঠান, ক্ষতবিক্ষত-দেহ সেই পাঠান, কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর উঠল না! এই গল্প জন জুর্ডেন একাই বলেননি। হকিন্সও তাঁর বিবরণে এই কাহিনী জুড়ে দিয়েছেন। এবং মানুষ-সিংহের লড়াই প্রসঙ্গেই এসে পড়েছে সিংহের মুখ থেকে জাহাঙ্গীরের আত্মরক্ষার ঘটনা।

শিকারের নেশা জারকের মতই তীব্র ছিল জাহাঙ্গীরের কাছে। একবার এক মৃগয়ায় ঘুমন্ত এক সিংহকে দেখে বন্দুক ছোড়েন। আহত সিংহ জেগে উঠে সম্রাটকে আক্রমণ করে এবং সেই আক্রমণের সামনে দাঁড়ায় এক রাজপুত অনুপ রায়। অনুপ অবশ্য মারাত্মকভাবে আহত হয় কিন্তু বেঁচে যায়। তার দেহে আঘাতের সংখ্যা ছিল বত্রিশটি। সম্রাট তাঁকে পাঁচ হাজারী মনসবদার করে দেন। খেতাব দেন অনিরায়

'সিংহদলন' আর দেন একটি তরবারি। তুঝুক-ই—জাহাঙ্গীরীতেও এই কাহিনী আছে। আছে ফিঞ্চের বর্ণনায়। আছে স্যার্ টমাস রোর জার্ণালে। ফিঞ্চের হিসেবে তারিখটা হচ্ছে—ছয়ই জানুয়ারী, যোলশ' এগার।

জন জুর্ডেনের বিবরণে অন্ততঃ একবারের জন্যও বাংলাদেশ এসেছে। তিনি বলেছেন, বছরে দশহাজার টনের মত লবণ আসত আগ্রা থেকে বাঙলা। যমুনা হয়ে। জলপথে। এক একটা মালনৌকায় চার থেকে পাঁচশ' টন লবণ ধরত। নৌকাগুলো বেশ লম্বা। চওড়া ও মজবুত।

আগ্রা তখন প্রাসাদনগরী। প্রত্যেক আমীরের বাড়ির চারিদিকে তার অধীনস্থ লোকেরা থাকত। সম্রাটের মহলে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর প্রহরী পরিবর্তন হ'ত। পাহারা দেবার কালে হাতীদেরও ব্যবহার করা হ'ত। তারা এত শিক্ষিত যে সম্রাট এলেই শুঁড় তুলে শাহেনশাকে সেলাম জানাত। যা না ছিল আগ্রায়, তা না ছিল ভারতে। এমনি তখন আগ্রার সমৃদ্ধি। সারা শহরে সব সময়েই যেন মেলা বসেছে। অতিথি অভ্যাগতদের জন্য প্রচুর ভালো ভালো সরাই ছিল আগ্রায়। সন্ধ্যার যবনিকায় দিকচক্রবাল ঢাকা পড়তেই সরায়ের দরজা যাতায়াতের জন্য বন্ধ হয়ে যেত। তখন কেবল প্রহরীর ইচ্ছেই 'সুপ্রিম অথরিটি'! সেকালে জন জুর্ডেনের আগ্রায় পাঁচ ক্যারেটের বেশি ওজনের কোন হীরের বিক্রি ছিল নিষিদ্ধ। সম্রাট জানতে পারলে গর্দান যাবে। কাজেই ওর বেশি ওজনের হীরে সাদা বাজারে বিক্রি হ'ত না! সম্রাটের জন্তু-জানোয়ারদের জন্য মাংসই নাকি লাগত প্রত্যহ সত্তর হাজার টাকার! আর মুঘল হারেমের কাহিনী বলতে গিয়ে বলেছেন : **His wives, there salves, and his concubines doe spend him an infinite deale of money, incredible to be believed, and therefore I omitt it.** ভালোই করেছেন!

জন জুর্ডেনের কি কখনও সম্রাট সন্দর্শন ঘটেছিল? হ্যাঁ। জন জুর্ডেন পাকড়েছিলেন খাজা জাহানকে মুরুব্বি। খাজা জাহানের দৌত্যে একদিন স্বয়ং সম্রাটের সঙ্গে তাঁর ভেট হয়ে গেল। রাজসকাশে তিনি আগ্রা থেকে পায়ে হেঁটে সুরাট ফেরৎ যাবার ফরমান চাইলেন, বললেন, তাঁদের দুঃখের বারমাস্যা, জাহাজ নষ্ট হয়ে গেছে—এই শহরেই তো কাটল পাঁচমাস এখন যা মালপত্র জোগাড় হয়েছে তার জন্য যেন আবার শুল্ক না চেয়ে বসে মুঘল কাষ্টম্‌স?

জাহাঙ্গীর নাকি অভয় দিয়ে বলেছিলেন—তাঁর দেশে এরকম ফরমান দরকার হয় না, তবু যখন তারা বলেছে, তিনি ফরমান দিয়ে দেবেন। সম্রাট রাজী হয়েছে শুনেই ইংরেজ ফ্যাক্টরেরা দুই হাঁটু গেড়ে মাটিতে মাথা ছুঁয়ে মাটির ধুলো তিনবার মাথায় ছুঁইয়ে তসলিম করল। খাজা জাহান এই মুঘল আদব কায়দায় তাদের

তালিম দিয়ে রেখেছিলেন। এরপর আহান খাঁ সাহেব ইংরেজদের ইঙ্গিত করতেই তারা সম্রাটের আরও কাছে এগিয়ে এসে ইংলণ্ডের রাজার মুখাঙ্কিত একটি স্বর্ণমুদ্রা সম্রাটের হাতে দিলেন। সকৌতুকে সম্রাট এই মুদ্রাটি নিরীক্ষণ করলেন এবং একসময়ে সেটি পকেটস্থ করলেন অম্লানবদনে। জাহাঙ্গীরের 'কিউরিও' প্রীতি এমনি আজব ব্যাপার ছিল।

এ-প্রসঙ্গে আরও একটা গল্প বলা হয়েছে। একবার এক রাজকর্মচারী সুদূর চীন থেকে আনা নক্সাকাটা একজোড়া ডিশের একটি অসাবধানতাবশতঃ হাত থেকে ফেলে ভেঙে ফেলে। খবরটা সম্রাটের কানে উঠতেই সম্রাট তো একেবারে দারুণ রেগে গেলেন। সেই রাজকর্মচারীকে ডেকে এনে সকলের সামনেই চাবকাতে সুরু করলেন। তারপর তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, সে যেন অনতিবিলম্বে চীনদেশের উদ্দেশে যাত্রা ক'রে যতদূর সম্ভব শীঘ্র নতুন একখানা ডিশ কিনে নিয়ে এসে জোড়া মিলিয়ে দেয়, নযতো তার আস্ত থাকবে না। জাহাঙ্গীরের 'কিউরিও' প্রীতির বহু গল্প সার্ টমাস রোর জার্ণালে আছে—কাজেই এই কাহিনীগুলি আমাদের পরিচিত জাহাঙ্গীর বাদশার ছবিটি আজও উজ্জ্বল ক'রে তোলে মাত্র।

এই ঘটনার পরই জুর্ডেনের আগ্রাপর্বের পরিসমাপ্তি। পায়ে হেঁটে সুরাট। আসবার সময় তিনি এসেছিলেন কুমবারিয়া, কারোঙ্গ, ভিয়ারা, মোটা, নারায়ণপুর, অধৈতা, ভাদোয়ার, নীমগান, সিন্ধখেরা, থালনের চোপরা, আরাচাঁদ, যওয়ান, রজের, বাহাদুরপুর, বুরহানপুর, আসীর, ফারগাঁও, খরগাঁও, বলথর, আকবরপুর, মাণ্ডু, লুনেরা, দীপলপুর, উজ্জয়িনী, কানাসিয়া, সুনেরা সারঙপুর, শিরঞ্জ, কাঁকনের সরাই, শাহদুরা, কালবাগ, কৈলারস, শিগ্রী, নরওয়ার, ভীতরওয়ার, আন্ত্রি, গোয়ালিয়র, ঢোলপুর, শিকান্দ্রা হয়ে আগ্রা। পথে তিনি অতিক্রম করেছেন থালনায়ের কাছে তাপ্তির খরস্রোত, বলথর আর আকবরপুরের মাঝে নর্মদা, লুনেরা আর দীপলপুরের মাঝে এবং উজ্জয়িনী এবং সুনেরার মাঝে চম্বলের দুই শাখানদী—একটি তো বিখ্যাত কালিদাসের শিপ্রা—সারঙপুরের কাছে কালীসিন্ধু নদী, আর গোয়ালিয়র ও ঢোলপুরের মাঝে মূল চম্বলকে। ফেরার পথ কিরাওলি, ফতেপুর শিক্রি, বিয়ানা এখানে সেকালে উৎকৃষ্ট নীল তৈরী হত—হিন্দৌন, লালসই, জামপাদা, চাকসু, লাদানা, মোজাবাদ, কুচিল, আজমীর, গরাও, মেঁরতা, যোধপুর, ছন্দারা, খাওপ, ভারওয়ানি, জানর, মোদর, ভীনমল, শামি, সংকলপুর, হাজিপুর, সরখেজ, আহমেদবাদ, কামবে, সরোদ, বরোচ হয়ে সুরাট। সেকালের খান্দেশ, রাজস্থানের মালব মারবার, গুজরাট ও উদয়পুর এই কয়েকটি প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল জন জুর্ডেনের ভারতভ্রমণ। সুরাট থেকে বুরহানপুর এবং সেখান থেকে উজ্জয়িনী

মোটামুটি এই পথেই বছর কয়েক পরে সার্ টমাস রো-ও গিয়েছিলেন। তারপরেই এঁদের পথ আলাদা, কেননা, জাহাঙ্গীর তখন আজমীঢ়ে শুনে রো রনথম্বভোর হয়ে সোজা আজমীঢ চলে যান।

কিন্তু জুর্ডেনের ভারতভ্রমণ বৃত্তান্ত স্থগিত রেখে আসুন আমরা জনের ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নিয়ে নিই। তাঁর জন্মদিন সঠিক না জানা গেলেও পণ্ডিতরা মনে করেন তাঁর জন্ম পনেরশ' বাহাত্তরের শেষাশেষি কিংবা পরের বছর। বাবার নামও জন জুর্ডেন। ইংলণ্ডের ডরসেটসায়ারের ছবির মত বন্দর শহর লাইম রেগিসের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ষষ্ঠ সন্তান ও চতুর্থ পুত্র জন। ছোটবেলা সম্বন্ধে তাঁর কিছুই জানা যায় না কেবল কল্পনা করা যায় বাচ্ছা বাচ্ছা একদঙ্গল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জনও হয়ত ব্ল্যাকবেরী তুলতে গেছে, কিংবা পাখীর বাসার সন্ধানে গাছে গাছে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিংবা হয়ত একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নোঙ্গর তুলে ভারী জাহাজগুলোর দিকে—কোন দূর বন্দরের উদ্দেশে পাড়ি জমাচ্ছে তারা; কিংবা দেখছে 'য়ুনিয়ন জ্যাক' পতাকা সগর্বে উড়িয়ে অজস্র মালপত্র নিয়ে লাইমের জলে নোঙ্গর ফেলছে কোন জাহাজ। কখনও শান্ত সমুদ্রে আঁকা ছবির মত জাহাজগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, কখনও ক্ষুব্ধ সমুদ্র স্রোতে মোচার খোলার মত সেগুলি কেবল দুলছে আর দুলছে। আর কিশোর জনকে যেন বার বার সুদূরের হাতছানি দিচ্ছে। ড্রেক, হাওয়ার্ডের হাতে পর্যুদস্ত স্প্যানীশ আরমাডার ছবিও তাঁর মনে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার ক'রে থাকতে পারে।

পনেরশ' অষ্টআশি সালের হেমন্তকালে জনের বাবা—তখন তিনি শহরের মেয়র, যখন মারা যান তখন জনের ভাগ্যে জুটল একটি লিজ নেওয়া বাড়ী, কাছেই একটা আপেলের বাগান, এবং বাকী সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ। যে বাড়ীতে তিনি মানুষ সেটি পান তাঁর সবচেয়ে ছোট ভাই চারলস্ এবং তাঁর মা পান সেই বাড়ীতে বিনাভাড়ায় থাকবার অধিকার। ষোলশ' পনের সালের ডিসেম্বরে বাড়ীটি মরগেজ থেকে হস্তান্তরিত হবার যখন উপক্রম হয় তখন জন জুর্ডেনই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে দেড়শ' পাউণ্ড ধার নিয়ে সেটিকে বাঁচান। ছোটভাই চার্লস্ শেষে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

যতদূর জানা যায়, জন জুর্ডেন নিজেই ছোটখাট জাহাজ নিয়ে পর্তুগীজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে সুরু করেন তখন তাঁর বয়েস বিশ-বাইশ। প্রায় এই সময়েই সুসান বলে স্থানীয় একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। একটি ছেলে। তার নামও জন। কিন্তু অচিরে এই স্বাধীন ব্যবসা ছেড়ে জন কোম্পানীর দাসখত লিখে দেন। বোধকরি কোম্পানীর চাকরিতে ব্যক্তিগত ব্যবসা অবাধে চলত এই সংবাদ জন জানতেন।

কাজেই চাকরি করতেই বা দোষ কি? না, নিজের ব্যবসা ভালো চলছিল না জনের? কিংবা আর কিছু একান্ত ব্যক্তিগত? স্ত্রী সুসানের সঙ্গে সম্বন্ধ ভালো ছিল না জনের, অন্ততঃ তাঁদের সম্বন্ধ যে তিক্ত হয়েছিল, তার প্রমাণ—জন তাঁর উইলে কিছুই রেখে যাননি তাঁর স্ত্রীর জন্যে। পারিবারিক অশান্তি কি জনের সমুদ্র যাত্রার কারণ? কে জানে?

কারণ যাই হোক না কেন, ষোলশ' সাতের শেষাশেষি জনকে দেখা গেল জন কোম্পানীর ফিলপট লেনের বাড়িটার করিডরে ঘোরাঘুরি করতে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন লোক নিচ্ছে। ঐ বছরের চব্বিশে নভেম্বরের এক সভার বিবরণে দেখা যাচ্ছে জাহাজের জেনারেল আর প্রধান কুঠিয়ালের পদের জন্য যাদের যাদের মনোনীত করা হয়েছে তার মধ্যে জন জুর্ডেনের নামও রয়েছে। সাতই ডিসেম্বর জনের চাকরি হয়ে গেল। মাইনে মাসিক তিন পাউণ্ড। জামাকাপড়ের জন্য অ্যালাউএন্স আরও দশ পাউণ্ড। জন যে সমুদ্রযাত্রার জন্য চাকরি পেলেন সেটি চতুর্থ। দুটি জাহাজ যাবে। একটি দু'বার সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ জাহাজ 'এ্যাসসেনশন' অপরটি আনকোরা নতুন—'ইউনিউন'। জেনারেল হলেন আলেকজাণ্ডার শার্পিলেগ। ষোলশ' আট চৌদ্দই মার্চ জনের জাহাজ উনউইচ বন্দর ত্যাগ করল।

কিন্তু হা হতোস্মি মন্দভাগ্য! দু'বার সমুদ্রযাত্রায় ঘুরে আসা জাহাজ 'এ্যাসসেনশন' এবারে আর দেশে ফিরে গেল না। মাত্র এডেন ঘুরে ভারতবর্ষের তীরভূমি থেকে ...নের 'লীগ' দূরে জাহাজটার সলিল সমাধি ঘটে গেল। তার আগে অবশ্য এডেনে কিছু ব্যবসা করেছেন আলেকজাণ্ডার শার্পিলেগ। জন জুর্ডেন যথেষ্ট সাহস দেখিয়ে ...া' নায পাশার সঙ্গে মুলাকাৎ ক'রে সে যাত্রায় তাঁদের মালপত্রের ওপর থেকে শুল্ক ...ব রেহাই করিয়ে এনেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁদের জাহাজ আর পৌঁছল না! ...বস্ত জাহাজ থেকে নৌকা ভাসিয়ে শার্পিলেগ প্রভৃতিরা তীরে গিয়ে উঠলেন এবং ...কদা তাদের সাক্ষাৎ হয়ে গেল উইলিয়ম ফিঞ্চের সঙ্গে। ইনি এর আগের সমুদ্রযাত্রায় ...সেছিলেন সুরাটে। এবং তাঁর হাতে মালপত্র জমা দিয়ে 'হেক্টর' জাহাজের ...জেনারেল হকিন্স স্বয়ং চলে গেছেন আগ্রায়—সম্রাট সন্দর্শনে। এবং সেখানে বেশ ...নিকটা জাঁকিয়ে বসেছিলেন। হকিন্স 'তুর্কী' ভাষা জানতেন। এবং সেটাই ...র তুরুপের তাস হ'য়ে তাঁকে ভারী সাহায্য করেছিল। কিন্তু হকিন্সের দৌত্য যে ...শেষ সফল হয়নি—সেত আগেই বলা হয়েছে। তাঁর ব্যবহার মুঘল 'ব্যুরোক্রেসি'কে ...ভাবে শত্রু করে তুলেছিল, সে গল্পত করাই হয়েছে। এ-দিকে সম্রাট ভেবেছিলেন ...রেজদের যে নতুন জাহাজ আসছে তাতে নিশ্চয়ই নতুন কিছু বিচিত্র জিনিসপত্র ...সবে তাঁর নজরানার জন্যে। কিন্তু জাহাজ যখন এল না, তার পরিবর্তে এল

কতকগুলি বিধ্বস্ত চেহারার ইংরেজ নাবিক—জাহাঙ্গীর ইংরেজদের সম্বন্ধে বীতরাগ হয়ে পড়লেন। তাছাড়া ইংরেজদের জাতশত্রু পর্তুগীজরা, জেসুইট ফাদারদের, সেই আকবরের আমল থেকেই মুঘল দরবারে একটা জোর 'লবি' ছিল; তারাও প্রচ্ছন্নভাবে ইংরেজদের প্রতিকূলতা করছিল। এমনি সময়ে হকিন্স সুরাটের কুঠিয়াল উইলিয়ম ফিঞ্চকে আগ্রায় ডেকে পাঠালেন। ফিঞ্চ জুর্ডেনকে পেয়ে তাঁকে সব মালপত্র বুঝিয়ে দিয়ে আগ্রায় ছুটলেন। মালপত্র তখন সুরাটের কুঠিতে সামান্যই। সেগুলি বিক্রি ক'রে এক সময় জন জুর্ডেনও আগ্রা গেলেন।

সেখানের সাড়ে পাঁচ মাসের গল্পত আগেই সারা। নাটকটা কিন্তু জমলো ফিরে এসে। তাঁরা যখন আহমেদাবাদ হয়ে ক্যাম্বেতে, গভর্ণর মুকারব খাঁ এত্তেলা পাঠালেন তাঁদের কাছে। কিছু ভালো খবর আছে। কি? না, সার্ হেনরি মিডলটন সুরাট উপকূল পৌঁছেছেন। আরও তাজ্জব কি বাত, মুকারব খাঁ ইংরেজদের জন্যে সুরাট যাবার পাল্কীর আয়োজন করে দিলেন! আরামে দুলতে দুলতে, ঘুমুতে ঘুমুতে তাঁরা একদিন সুরাট পৌঁছে গেলেন! সুরাটেত পৌঁছলেন কিন্তু ইংরেজ জাহাজে পৌঁছান কি অত সহজ?

এদিকে মিডলটনের কী হ'ল বলি। সুরাটের উপকূলে তিনি পৌঁছেছেন ঠিকই; কিন্তু সুরাট বন্দর দূরঅস্ত। পর্তুগীজরাও খবর পেয়েছিল। তারা সুরাটের উপকূল বরাবর থানা বসিয়ে দিল। সামনে পর্তুগীজ যুদ্ধজাহাজ। সারা তীরে তীরে সশস্ত্র পর্তুগীজ পাহারা। কোন ইংরেজ নৌকা এলেই তো তোপ দেগে উড়িয়ে দেবে। তাহলে? দিনের পর দিন জাহাজে জল, খাবার কমে আসছে। টাটকা খাবারের অভাবে নাবিকেরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। অথচ মিডলটন আখির দেখতে চান। অত্যন্ত জেদী মানুষ তিনি। সুরাটের বন্দরে যে মাল নামাবার কথা, তা' তিনি অন্য কোথাও নামাবেন না। পর্তুগীজ কাপ্তেনকে চিঠি লেখেন তিনি। তার সাফ জবাব, 'জোর যার মুলুক তার। এখানে আমাদেরই মৌরসী পাট্টা; সুরাটে ইংরেজদের নামতে দেব না।' স্থানীয় অধিবাসীরা পর্তুগীজ-ভয়ে তটস্থ। কোন ঝামেলার মধ্যেই যেতে চায় না। মিডলটন এসেছেন এখানে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর, ষোলশ' এগার। দিন যায়। পক্ষ ঘুরে আসে। সুরাটের বেলাভূমি তেমনিই দূরে রয়ে যায়।

আশ্বিনের সকাল। সমুদ্রতীরে কাঁচাসোনা গলে পড়েছে। পর্তুগীজদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া একটা ছোট্ট 'ফ্রিজেটে' দাঁড়িয়ে মিডলটন সুরাটের তীরভূমির দিকে অতৃপ্তনয়নে তাকিয়েছিলেন। এমন সময়ে দেখলেন দূরে বালি পাহাড়ে পাগড়ীর কাপড় উড়িয়ে কে যেন কী সঙ্কেত জানাচ্ছে। মিডলটন তৎক্ষণাৎ একটা নৌকা পাঠালেন। নৌকাটা তীরের কাছে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে মাঝিরা

সবিস্ময়ে দেখলে গুজরাটী পোষাকপরা এক সাহেব। সাহেব আর কেউ নয় এই গল্পের নায়ক—জন জুর্ডেন। নৌকা তীরে যাবার তর সইল না জুর্ডেনের। হাঁটু পর্যন্ত ভিজিয়ে জলে নেমে তিনি সাত তাড়াতাড়ি নৌকায় এসে উঠলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিডলটনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে গেল। পর্তুগীজ প্রহরীদের চোখে ধুলো দেবার জন্যেই তাঁর এই ছদ্মবেশ। 'পেপার কর্ণ' জাহাজের কেবিনে বসে জুর্ডেন মিডলটন সাহেবকে একটা অত্যন্ত জরুরী খবর দিলেন। বললেন, সুরাটের অদূরে ছোটখাট একটা বন্দরের মত জায়গা আছে যেখানে ছোট ছোট জাহাজ বা নৌকা অক্লেশে ঢুকতে পারে। জুর্ডেন আরও বললেন, এ-খবর তাঁকে দিয়েছেন সুরাটের শাসনকর্তা খাজা নিজাম এবং তার বিশ্বাস খবরটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। মিডলটন কিন্তু জুর্ডেনের খবরটা না গ্রহণ, না বর্জন করলেন। অন্য সব পন্থা বাজিয়ে দেখতে লাগলেন। এর মধ্যে বার ছয়েক সুরাটের শাসনকর্তার সঙ্গে দেখাও করে এলেন। দেখলেন, তিনিও পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সমান অসহায়। তিনি ইংরেজদের বললেন, সুরাট ছেড়ে কোথাও গিয়ে জাহাজ ভেড়াতে। সেখানে অবাধে ব্যবসা করতে পারবেন। মিডলটন ভাবলেন—তাই করি। করলেনও। কিন্তু ফল হ'ল না। কেন না, আসলে তিনি ভেবেছিলেন তিনি চলে গেলে পর্তুগীজরাও পাহারা তুলে নেবে। কিন্তু নিল না। মিডলটন আবার পুরনো জায়গায় ফিরে এলেন। এদিকে এ্যাসসেনশন জাহাজের পথহারা নাবিকেরা যায় জেনারেল শার্পিলেগ পর্যন্ত একে একে পেপারকর্ণ জাহাজে এসে উঠলেন। কিছু একটা করতেই হয়। কতদিন আর এমনি ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় থাকা যায়?

এই সময়েই মনে পড়ল জুর্ডেনের কথাটা। এবং কিছু খোঁজাখুঁজি করতেই বেরিয়ে পড়ল জায়গাটা। বিখ্যাত 'সোয়ালি হোল' (Swally hole): ছয়ই নভেম্বর ষোলশ' এগার সেখানে গিয়ে ভিড়ল ছোট ইংরেজ জাহাজ 'ট্রেডস্ ইনক্রিজ' এবং পর্তুগীজদের সব চাল বানচাল হয়ে গেল। কাছেই সুন্দর পানীয় জল। কাছেপিঠে গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ এসে তাদের কাছে ভেড়া-ছাগল প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করতে লাগল। পেপার কর্ণের লোকলস্কর যেন নবজীবন পেল। পর্তুগীজরা পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাতে লাগল; কিন্তু তখন ইংরেজদের মনে নবীন উৎসাহ, তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন অন্য কেউ? একটা ছোট-খাট লড়ায়ে পর্তুগীজদের একেবারে তুলোধুনে দিলেন মিডলটন। পর্তুগীজরা আবার গিয়ে দিল্লীর দরবারের দ্বারস্থ হ'ল।

কিন্তু পৃথিবীতে শক্তের ভক্ত কে নয়। যখন দেখা গেল ইংরেজরা বেশ লড়াকু জাত, মুঘল মনসবদাররা সমীহ করে চলতে লাগল। মুকারব খাঁ। কাছে থেকে

ভায়ের কাছে এসে একদিন মিডলটনের সঙ্গে দেখা করে গেলেন শুধু নয়, সারা রাতটা কাটিয়ে গেলেন ইংরেজ জাহাজ। ট্রেডস ইনক্রিজের পাটাতনে। বেশ কতকগুলো মজাদার খেলনা সংগ্রহ করে নিয়ে গেলেন। একটা 'বীভার হ্যাট', গন্ধবহ 'জারকিন' আর এক 'স্পেনিএল' কুকুরের বরাত দিয়ে গেলেন মিডলটনের কাছে। তিনি গেলেন তো খাজা নাজির এলেন। অনেক কথাবর্তা হ'ল। কেবল হ'ল না শুধু সেই বহু উপেক্ষিত আলোচনা—সুরাটে ইংরেজ কুঠী স্থাপনের কথাটা। এদিকে দিল্লীর হুকুমে মুকারব খাঁকে কাম্বের শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারিত করা হ'ল,যদিও সুরাটের কাস্টমস্ অফিসারের চাকরিটা তাঁর রইল। মুকারব খাজা নাজিমকে ঠেকিয়ে দিয়ে গেলেন এবং কথামত ইংরেজ জাহাজে আনা সীসা ওজনের সময়েই বেঁধে গেল ধুন্দুমার।

এদেশের ওজন ইংরেজ ওজনের চেয়ে বেশি। ইংরেজরা বলে না তারা বেশি দেবে না। খাজা নিজাম রেগে গিয়ে বললে, মাল ওঠাও। ব্যবসা হবে না। কুঠিয়াল হিসেবে জন জুর্ডেন মাপজোপ দেখিয়েছিলেন। সার্ হেনরি মিডলটনও বসেছিলেন। তিনি তো রেগে গিয়ে বললেন, ভেবেছে কি মুঘলরা। সঙ্গে সঙ্গে খাজা নাজিমকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে একেবারে ইংরেজ জাহাজে! ক্ষিপ্ত সিংহের মতো সারারাত পায়চারি করতে লাগল খাজা নাজিম। কিন্তু সকালে দেখা গেল নাজিমের মেজাজ বেশ ঠাণ্ডা। ট্রেড ইনক্রিজ জাহাজে গিয়ে নাজিম ব্যাপারটা শেষবেশ মিটিয়ে নিলেন! দেখা গেল, কাতর মিনতি অপেক্ষা তম্বিহম্বি অনেক বেশী কার্যকর দাওয়াই। সেই মুঘল যুগেও।

কিন্তু এত করেও আসল কাজ হ'ল না। মুকারব খাঁ একদিন জন জুর্ডেনকে ডেকে বললেন, দেখুন মানে মানে এখন তল্পি গোটান। সুরাটের কুঠী বসানোর ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতেই যেন আকাশ থেকে পড়লেন! ভাবখানা এই—এমন অবাক কথা সেই মুঘল আমীর আগে যেন কদাপি শোনেননি! সার্ হেনরি মিডলটনও তখন তিতিবিরক্ত। মুঘল রাজকুলের ব্যবহার আলাপ আলোচনার ধরণধারণে তিনি অতিষ্ঠ। ক্ষুব্ধচিত্তে তিনি সবাইকে সুরাটস্থ তাঁর ভাইবেরাদর ইংরেজ বাসিন্দাদের সব জাহাজে উঠে আসতে বললেন। উঠে এলেন জন জুর্ডেনও। তাঁকেও তল্পি গুটোতে হ'ল ভারতবর্ষ থেকে। তাঁর ভারত-ভ্রমণ শেষ হয়ে গেল। জাহাজ পেপার-কর্ণ নোঙর তুলল সুরাট থেকে। ছয়ই ফেব্রুয়ারি। ষোলশ' বার।

অবশ্য দ্বিতীয়বার ইংরেজ বহরের কর্তা হয়ে আসেন জন জুর্ডেন। তবে ভারতবর্ষে নয়। মালয় দ্বীপপুঞ্জের মালাক্কায় বিশেষ করে যাবার হুকুম ছিল তাঁর। হুকুম ছিল মশলার রাজ্যে মালয়, জাভা, বালি ও বোর্ণিওতে ওলন্দাজরা যে ব্যবসা

ফেঁদেছে—সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, তাতে ভাগ বসাতে। সেবার নানা প্রাণসংশয় উপেক্ষা ক'রে, কিভাবে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছিলেন জন জুর্ডেন, সে কম রোমাঞ্চকর অধ্যায় নয়। কিন্তু সুরাটের কাহিনী বলতে গিয়ে সে কাহিনী অপ্রাসঙ্গিক। তবু সোয়ালি হোলের আবিষ্কর্তা—জুর্ডেনের বিয়োগান্ত পরিণতির দু-একটা কথায় শেষ করে নেওয়া যাক। মালয় উপদ্বীপের বিখ্যাত বন্দর পাইনীর সমুদ্র উপকূলে দুর্ধর্ষ ওলন্দাজদের সঙ্গে এক অসম লড়াইয়ের পর জুর্ডেন যখন সাদা পতাকা উড়িয়ে শান্তি আলোচনা করছিলেন সেই সময় এক চোরাগোপ্তা গুলি এসে জন জুর্ডেনের প্রাণটা অকস্মাৎ নিয়ে নিলে। জুলাই. ষোলশ' উনিশ। তাঁর দুই ভাগ্নে ছিল সঙ্গে। পাইনীর বুকে তারাই তাঁকে সমাহিত করে। সুদূর ইংলণ্ড থেকে অনেক অনেক দূরে!

জন জুর্ডেনের ভারত ভ্রমণকে কেউ বড় একটা আমল দেয়নি। এর উল্লেখও বড় একটা কেউ করেনি। সারাজীবন যেমন সংসারের ভালবাসা পাননি তিনি, তেমনি, মৃত্যুর পরও পৃথিবীর কাছে তার সমান অনাদর জুটেছে। হয়তো অনেকেই বলবেন, জনের বিবরণে নতুন কিছু নেই। না থাক, তবু সমসাময়িক বিবরণ মিলিয়ে নেবার জন্ত coroborative evidence হিসেবে তাঁর সাহায্য অস্বীকার করা যায় কি করে? তা' ছাড়া জুর্ডেনের আরেকটা বড় কাজ 'সোয়ালী' আবিষ্কার। সেটা যে সেযাত্রায় মিডলটনকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল তাই নয়; বহুদিন ধরে শুধু ইংরেজদের কেন, ঐ উপকূলে বহু নাবিকেরই যথেষ্ট উপকার করেছিল। তবে বিস্ময়ের কথা, মিডলটন এই ব্যাপারে জুর্ডেনকে স্বীকার করেননি। স্বীকার করেননি হকিন্সও। অবশ্য হকিন্স নাহয় জুর্ডেনকে দেখতে পারতেন না, কিন্তু মিডলটন তো জুর্ডেনের বন্ধু ছিলেন। তবে?

অবশ্য এরা কেউ না করুন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড়কর্তারা জুর্ডেনকে ঝেড়ে ফেলে দেননি। ছয়ই নভেম্বর, ষোলশ' সতেরর কোম্পানীর এক বিবরণ লেখা আছে :…'as well for his service for the Sixth Voyage as the hazard he ranne into to give him (Middleton) intelligence of the Portugall, with the danger of his life passinge amongst the Portugalls in Mogolls habitt, swymminge over a river, to advise him (Middleton) of the porte of Swally, and for many other services sett downe in perticuler…' ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জুর্ডেনের এই কৃতিত্ব শুধু নথীভুক্ত করেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করেননি। সর্বসাকুল্যে এইসব কাজের জন্য দুইশত পাউণ্ড ইনাম দেন তাঁকে।

আগেই বলা হয়েছে, পারিবারিক শান্তি কোন দিনই পাননি জুর্ডেন। তুঁবের

আগুনের মত ঐ বেদনা ধিক্ ধিক্ করে সারাজীবন তাঁকে দহন করেছে। একমাত্র সন্তান তাঁর মৃত্যুর আগেই অকালে মারা যায়। তাঁর মৃত্যুর পর বোন সুসান ভিনে তাঁর উইলের প্রোবেট নেন এবং কোম্পানীর কাছে তাঁর যা পাওনা তা দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য দাবী করে। কিন্তু কোম্পানী ঢিমে-তেতালায় চলতেই থাকে এবং একসময় বোন সুসান ভিনেরও এন্তেকাল হয়ে যায়। ভাগ্নে জোনাস এসে সম্পত্তি দাবী করে। কোম্পানীর কাছে জন জুর্ডেনের নাকি আটশত পাউণ্ড গচ্ছিত ছিল—সেটা স্থদে আসলে দাঁড়িয়েছে বারশ' পাউণ্ড। জোনাস তখন বয়সের হিসেবে সাবালক হননি। কাজেই কোম্পানী তাঁকে হাঁকিয়ে দিলে। কিন্তু জোনাস অনেক ধুরন্ধর ছেলে। অনেক বলে কয়ে কোম্পানীকে রাজী করালে তাকে চারশ' পাউণ্ড দিতে। বাকিটা সাবালক হলে সে নেবে।

কিন্তু অনেকটা যেন আকাশ ফুঁড়ে আর একটা দাবীদার হাত বাড়িয়ে দাঁড়ালো। সে আর কেউ নয়—জন জুর্ডেনের বিধবা—স্থসান জুর্ডেন। কোম্পানী তো মোকা পেয়ে গেল। বললে, আদালতে গিয়ে তোমরা আগে মীমাংসা করে এস—টাকাটা পাবে কে? আদালত যাকে বলবে আমরা তাকেই দিয়ে দেব পাওনা টাকা। স্থসানের তরফ থেকে কোম্পানীর কাছে একটা আবেদন এসে পৌছল—তাঁকে সাহায্য করার। তাঁর জীবিকা নির্বাহ করার জন্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বড় শক্ত ঠাই। তারা বললে, ওসব হবে না। তবে তাদের 'দরিদ্র ভাণ্ডার' থেকে দশ পাউণ্ড সাহায্যের ব্যবস্থা হ'ল। কিছুকাল পরে দিলে আরও দশ পাউণ্ড। এদিকে স্থসানের মামলা চালাবার জন্তে বললে কোম্পানীর সলিসিটরকে। যাইহোক, অনেক আদালত ঘুরে শেষে সাব্যস্ত হ'ল স্থসানই পাবেন টাকাটা। কোম্পানী তাঁকে পুরো টাকাটা মিটিয়ে দিলে। এইবার স্থসান জোনাসের বিরুদ্ধে কেস করলেন। অন্যায়ভাবে তাঁর প্রাপ্য টাকা সে নিয়েছে! এই মামলার ফল কি হ'ল তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না; কিন্তু এটা বোঝা যায়, সারা জীবন যেমন স্থসান শান্তি দেননি জন জুর্ডেনকে, তেমনি স্বামীর মৃত্যুর পর জুর্ডেনের আত্মীয়-স্বজনকেও রেহাই দেননি তিনি! বোধ করি, নিজে জলতে জলতে কেবল জ্বালা ছড়িয়ে বেড়িয়েছেন সর্বত্র! এবং মরেও জুর্ডেন যেন তাঁর হাত থেকে রেহাই পেলেন না!

কিন্তু জন জুর্ডেনের কথা আর থাক। স্থরাটে ইংরেজ কুঠী প্রতিষ্ঠা জুর্ডেন তো দেখেনইনি, সার্ জন মিডলটনও দেখেননি। তবে মিডলটনের তলোয়ার টমাস বেস্টের কাজটা অনেকটা এগিয়ে দিলে। বেস্ট স্থরাটে পৌছলেন মিডলটনের কীর্তি-কলাপের মাস কয়েক পরেই। এবং দেখলেন স্থরাটের শাসনকর্তারা তাঁকে বেশ সমীহ করেই কথাবার্তা বলছে।

বেশ বড় বড় চোখ। ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি। বড় পাখামেলা প্রজাপতির মত গোঁফ। বেশ জবরদস্ত চেহারা। কপালের সামনেটা একটু টাক ব্যক্তিত্ব বাড়িয়েছে বই কমায়নি। বোঝাই যায়, খানদানী ঘরের ছেলে। ইনিই হলেন সার্ টমাস রো। জনকোম্পানীর পাঠান রাজা প্রথম জেমসের 'লেটার অফ ক্রেডেনশিয়াল' পাওয়া ভারতে প্রথম ইংরাজ রাষ্ট্রদূত। এবং হকিন্সের মত ইনিও আসেন সুরাটে। এবং সেখান থেকে যান জাহাঙ্গীরের দরবারে। সেই যে 'জাল' রাষ্ট্রদূত জন মিল্ডেন হলের কথা বলা হয়েছে, আগ্রার বুকে তাঁর মৃত্যুর সতের মাস পরে প্রথম ব্রিটিশ 'অ্যামবাসাডরকে' নিয়ে 'লায়ন' জাহাজ এসে ভিড়ল সুরাট বন্দরে। এল কিন্তু সেই একই উদ্দেশ্যে। সুরাটের বুকে পাকাপাকিভাবে কুঠী স্থাপন করে জনকোম্পানী অবাধ ব্যবসা করবার দাবী নিয়ে। এর জন্যে চাই—মুকারব খাঁ যা বলেছিল হকিন্সকে —আর কারও নয় স্বয়ং মুঘল সম্রাটের দেওয়া ফরমান।

কিন্তু কেন চাই? চাই এই কারণে যে, এই ফরমান না পেলে জন কোম্পানীর ব্যবসা লাটে উঠবে। ব্যাপারটা একটু বিশদ করে, খোলসা করে বলা যাক। মনে করা যাক্, কোন ইংরেজ জাহাজ এসে ভিড়ল ভারতীয় বন্দরে। স্থানীয় ব্যবসাদারদের সঙ্গে দেখা করল জাহাজের কাপ্তেন কিছু ব্রিটিশ মালপত্র আছে বিক্রির। চলবে নাকি? মাথায় পাগড়ী। কপালে ফোঁটা। পরনে পিরান। গলায় জড়ান চাদর। দেশীয় আড়তদার। তার চোখে ধূর্তামির হাসি খেলে গেল। বললে, না সায়েব। ঐ সব মাল চলবে না। অন্য কোথাও দেখুন। বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াবে জাহাজ? দর যাচাই করবে। বাজার যাচাই করবে। করুন। তাতে ইতর বিশেষ হবে না। সব শেয়ালের এক রা। সবাই জোট বেঁধে এক জবাব।

জাহাজের কাপ্তেন ক'দিন ঘুরবে? শেষে ক্লান্ত হয়ে জিনিসপত্র ন'কড়ায় ছ'কড়ায় বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া তার উপায় থাকবে কি? তারপর, বিক্রি না হয় হ'ল। খালি জাহাজ তো দেশে ফিরবে না? তার তো মালপত্র চাই। পাবে কোত্থেকে? কিনবে কি করে? সব অগ্নিমূল্য! কাপ্তেনের জাহাজ ছাড়তে যত দেরী হবে তাতে অসুবিধা। তাকে জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি কিনতেই হবে। দেশী ব্যবসায়ীরা এই স্বর্ণসুযোগ ছাড়বে কেন? এইসব সমস্যার একমাত্র সমাধান কুঠী বানাবেন। সেখানে লোকজন রাখা। জাহাজ এল—তার মালপত্র কুঠীতে নামিয়ে রেখে বুঝে সুঝে দরদস্তুর ক'রে বিক্রি করা হ'ল। আবার সেই জাহাজের জন্য মালপত্র সুযোগ-

সুবিধা বুঝে দর যখন কম থাকে কিনে রেখে দেওয়া হ'ল। জাহাজ এল তো তাতে বোঝাই করে দেওয়া হ'ল। কোন অসুবিধা নেই। কোন সময় নষ্ট নেই। ব্যবসার কত সুবিধা।

ব্যবসার অসুবিধা হয়ত রইল না, কিন্তু অন্য অসুবিধা তো গজিয়ে উঠল। কুঠীতে যে লোকজন থাকবে তাদের নিরাপত্তা কোথা? দেশের সর্বত্র ঘুরে যে মালপত্র কিনবে রাস্তায় ডাকাতি হয়ে যাবে না—তার গ্যারাণ্টি কি? কুঠীতে অত্যাচার হবে না শুল্ক অফিসারদের—তাই বা বরাভয় দেবে কে? এইসব নিরাপত্তার রক্ষাকবচ চাইছিল ইংরেজরা মুঘল সম্রাটদের কাছ থেকে। তারা একটা নির্দিষ্ট হারে শুল্ক দিতে রাজী। কিন্তু উটকো সব হেফাজত থেকে অব্যাহতি চাইছিল। চাইছিল এমন একটি চুক্তি পত্র যাতে অহেতুক ইনাম 'পেশকাশ' উপহার দাবী করবে না, সম্রাটদের জন্যে 'ফরমাইশ' দাবী করবে না, 'রাহাদাবী', 'পথকর' দাবী করবে না ঘাটে ঘাটে, হাটেবাজারে, কেরানীরা চাইবে না তাদের 'ফি'।

মুঘল দরবারে-বাদশা আকবরের কাছে এই ব্যাপারে ইংরেজদের হয়ে প্রথম দাবী জানান ইতিহাস-ধিক্কৃত সেই বণিকটি জন মিল্ডেনহল। কুঠী চাই। এবং এই দাবীই জোরদার করেছিলেন উইলিয়ম হকিন্স। কিন্তু তাঁরা কেউই সফলমনোরথ হননি।

হকিন্স সুরাট দিয়েই ফিরলেন। দেখা হ'ল মিডলটনের সঙ্গে। মিডলটন হকিন্সকে বোঝালেন অন্যকথা। বললেন কি দরকার সব তাড়াতাড়ি দিল্লী যাবার। স্থানীয় নবাবদের বা সুবেদারদের ইংরেজদের ব্যবসা করতে না দেবার কোন কারণ নেই। কেননা, ব্যবসা যত হবে, শুল্ক তো তত বাড়বে। তাতে তাঁদেরই লাভ। তবু তারা কেন তারা রাজী হচ্ছে না? আসলে তারা পর্তুগীজদের ভয়ে ভীত। পর্তুগীজরা তো গোয়ায় তাদের বিরাট ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। অতীতে বেশ কয়েকবার তারা সুরাটের বুকে লুণ্ঠনের পালঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। কেউই কিছু করতে পারেনি। আর মিডলটনের কথা যে ঠিক অচিরেই তা প্রমাণিত হয়ে গেল।

মুকারব খাঁ ইংরেজদের জন্যে একটা ভোজসভার আয়োজন করেছিল। হয়তো দুটো বাইজীও নাচিয়েছিল, সেই উপলক্ষে। মাইকেল বলে কথা। আর সেই অপরাধে চৌলের ফৌজদার তার এককিস্তি সব মূল্যবান মালপত্র আটকে দিলে। বলা বাহুল্য, পর্তুগীজদের চাপ ছিল এর পিছনে। মুকারব খাঁ আর কি করে, ইংরেজদের বললে, পথ দেখ বাছা। তোমাদের জন্যে কি জান খোয়াব?

মিডলটন তখন সুরাটের উপকূলে। দাঁতে দাঁত চিপে বলে থাকবেন, আচ্ছা।

এবং অনতিকাল পরেই সুরাট থেকে সরে গিয়ে লোহিত সাগরের বুকে গোটা সাতেক গুজরাটি জাহাজ ধরে ধরে তাদের কাছে অনেক টাকা খেসারত আদায় করে

নিলেন আর মুঘল রাজশক্তিকে বুঝিয়ে দিলেন জলপথে শুধু পর্তুগীজরা নয়, ইংরেজরাও আছে।

আছে যে সেটা অবশ্য আখিরে বুঝিয়ে দিলেন টমাস বেস্ট। বেস্টের দুটো জাহাজ 'রেড ড্রাগন' ও 'হোসিয়েণ্ডার'। সুরাটের বুকে কুঠী স্থাপনের প্রত্যক্ষ কৃতিত্ব অবশ্যই এই ভদ্রলোকের। যদিও সার্ হেনরী মিডলটনই এর উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। করে যে গিয়েছিলেন, বেস্ট সেটা খাস সুরাটে নেমে মুঘল সরকারের সঙ্গে দেখা করেই বুঝেছিলেন। এতকাল সেখানে ইংরেজদের যে হেনস্থা ছিল, সেসব এবার বেস্টকে কিছুই তার পেতে হ'ল না। সেপ্টেম্বর, ষোলশ' বার। সুরাটের নবাব তাঁকে সাদর সংবর্ধনা জানালেন। অনেকটা জামাই আদর। এবং এতদিন ধরে ইংরেজরা শত চেষ্টা করেও যা' পাননি, এককথায় বেস্ট সেটা পেয়ে গেলেন। সুরাটের কুঠী! প্রথম কুঠিয়াল টমাস অল্ডওয়ার্থ!

কিন্তু তার আগেই বেস্টের সঙ্গে পর্তুগীজদেরও একচোট হয়ে গেছে! বেস্ট যে সোয়ালীতে এসেছে সে সংবাদ পর্তুগীজদের কানেও গিয়েছিল। তারা আর চুপ করে বসে থাকা সমীচীন মনে করলে না। খাস সুরাটে আসবার আগেই ইংরেজদের শিক্ষা দেবে ঠিক করলে। একই সঙ্গে গুজরাটের মুঘল সুবেদারকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যে গোয়া থেকে এক 'স্কোয়াড্রন' নৌবাহিনী পাঠাল ইংরেজদের পর্যুদস্ত করতে। চারটে যুদ্ধজাহাজ, ছাব্বিশটে সৈন্য-ভর্তি নৌকা। স্থান সেই সোয়ালী হোল। কিন্তু হায়, ভাগ্যের পাশায় তখন ইংরেজদের দান পড়তে শুরু হয়েছে। সে জয়তরঙ্গ রোধিবে কে? যুদ্ধটা চলল প্রায় মাস খানেক ধরে। প্রথম দিন দুই বেস্ট তাঁর উঁচুমানের কামান দিয়ে পর্তুগীজদের তুড়ুং ঠুকে দিলেন। অনেকটা ড্রেকের যুদ্ধবিদ্যার অনুসরণ করে। তৃতীয় দিনে উভয় পক্ষই তাদের জাহাজের মেরামতিতে কাটিয়ে দিলে। চতুর্থ দিনে বেস্ট মাঝদরিয়ায় সরে এলেন এই আশায় যে, পর্তুগীজরা তাঁদের আক্রমণ করবে। পর্তুগীজরা কিন্তু এগোল না। তারা ভাবলে ইংরেজরা পালিয়েছে। তিন সপ্তাহ পরে আচম্বিতে পর্তুগীজদের আক্রমণ করলেন বেস্ট। দুদিন ধরে জোর লড়াই। পর্তুগীজরা হেরে ভূত! বিজয়ীর পতাকা উড়িয়ে ইংরেজরা এখন সোয়ালী নয়, দুটো জাহাজ নিয়ে সোজা খাস সুরাট বন্দরে ঢুকল। অপেক্ষমান জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। আহত সিংহের মত ক্ষতস্থান লেহন করতে করতে পর্তুগীজরা তাদের গুহায়—গোয়ায় ফেরৎ গেল। মুঘল রাজশক্তি সবিস্ময়ে দেখলে আরব সাগরের দিকচক্রবাল ভেদ করে আর এক নৌ-শক্তি নতুন সূর্যের মত স্বমহিমায় দীপ্যমান। সসম্ভ্রমে মাথা নোয়ান ছাড়া আর উপায় কি? দুনিয়ায় শক্তের ভক্ত কে নয়?

সুরাটের বেলাভূমিতে এখন আর তাড়াবাড়ি নয়—নিজের কুঠীর ভুলে—বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে কলোনীর মত জায়গা নিযে ভারতবর্ষে প্রথম ইংরেজ কুঠী প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। পর বছর সেটার পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে গেল। ষোলশ' তেরর ছাব্বিশে জানুয়ারী আগ্রা থেকে এল এই মর্মে সম্রাটের দেওয়া ফরমান। তাতে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে বলা হ'ল—ইংরেজদের সুরাটে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হ'ল—"**on paying a custom on all goods of 3½ percent up on the value and price they were worth when put into the custom house.**" শুল্ক ভবনে আনা মালের মূল্যের শতকরা সাড়ে তিন ভাগ শুল্ক হিসেবে উসুল দেওয়ার কড়ারে। শুধু সুরাট নয়। আরও তিনটে জায়গায তাদের কুঠী করতে দেওয়া হ'ল—আগ্রা, আহমেদাবাদ ও বরোচে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, সুরাটে কুঠিতো হয়েই গেল, তবে আবার 'অ্যামবাসাডর' পাঠানর হেফাজত কেন? কি দরকার ছিল তার? দরকার না থাকলে কি আর স্বভাবকৃপণ কোম্পানী এত টাকাকড়ি খরচ ক'রে সার্ টমাস রোকে পাঠান ভারতবর্ষে?

টমাস বেস্টের সঙ্গে একটা রফা হয়েছিল সুরাটের শাসনকর্তার। কথা ছিল, ইংরেজদের সদাচারের জামিন হিসেবে তাঁরা এক স্থায়ী প্রতিনিধি রাখবেন আগ্রার মুঘল দরবারে। আবার সেই প্রতারক বলে কথিত অবহেলিত ইংরেজ পর্যটক জন মিল্ডেনহলের কথা এসে পড়ে। এই প্রস্তাবটা সেইই প্রথম দিয়েছিল সম্রাট আকবরকে।

পর্তুগীজ পাদ্রী—ফাদার জেরোম জেভিয়ার, ফাদার মনসেরেট—আকবরের দরবারে পর্তুগীজদের পক্ষে জবরদস্ত 'লবি'। ইংরেজদের হয়ে এক মিল্ডেনহল। কাজেই উভয়পক্ষে জোর লড়াই। একপক্ষ চাপান দেয় তো অপর পক্ষ উতোর। এমনি করে চলতে চলতে এক রবিবার সম্রাট আকবর উভয় পক্ষকে ডেকে পাঠালেন। পর্তুগীজরা বললে, শাহান শা'—এরা এই ইংরেজরা '**all theeves**'—সব চোর। বলবে নাই বা কেন? ফিলিপের প্রজা তারা—ড্রেকের কাণ্ডকারখানা তো তাদের কাছে গুণ্ডামি, চৌর্যবৃত্তি ছাড়া কি? আরও গালিগালাজ, তারা কম করল না। এইসবের জবাবে মিল্ডেনহল নাকি তার তুরুপের তাসটি মেরে বাজী জিতে বেরিয়ে আসেন। জন কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার, মিল্ডেনহলের এককালের মনিব—রিচার্ড স্টেপ-নারের কাছে এক চিঠিতে এই সাক্ষাৎকারের চমৎকার বিবরণ দিয়ে জন লিখেছেন—"সম্রাটকে সেদিন আমি বলেছিলাম, শাহান শা' জেসুইটরা বলছে আমরা পরস্বাপ-হারী, তস্কর। লুটপাট করে খাই। সম্রাট, পারস্যে বা তুরস্কে আমাদের সাম্রাজ্ঞী যা করেছেন, এখানেও তিনি তাই করবেন। মুঘল ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকদের সদা-

চারের জামিন হিসেবে রাজদরবারে পাকাপোক্তভাবে একজন 'অ্যামবাসাডর'—রাষ্ট্রদূত রাখবেন তিনি। আমাদের জাতির সব কাজের জন্য দায়ী হবেন তিনি। এরপরও জেসুইটদের এই মিথ্যা অভিযোগ আপনি মানবেন 'মিলর্ড'?" মিল্ডেন-হলের মতে এই সময়ে ভাবী সম্রাট সেলিমও হাজির ছিলেন সেখানে।

হাজির যে ছিলেন, তার প্রমাণ হকিন্স যেদিন পৌঁছালেন জাহাঙ্গীরের দরবারে—তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আপনি এখানে থাকবেন তো। ইচ্ছে না থাকলেও হকিন্সকে বলতে হয়েছিল হাঁ্যা। এবং ছিলেনও তো বেশ কিছুকাল। এখন সুরাটে কুঠী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশ্নটাই আবার দেখা দিল। 'অ্যামবাসাডর' কই? বেস্ট তখন 'অ্যামবাসাডর' পায় কোথা? পল ক্যানিং বলে ওর মধ্যেই একজন দেখনশোভন কুঠিয়ালকে আগ্রা পাঠান হ'ল মুঘল দরবারে। অবশ্য শুধু হাতে নয়। হাতে কিছু উপহার। এবং জেমসের লেখা—তাড়াতাড়ি আনিয়ে নেওয়া—একটা পরিচয়পত্র। ক্যানিং-এর বরাতে আগ্রা সহ্য হ'ল না। হতভাগ্য ফ্যাক্টর আগ্রা পৌঁছবার ক'দিন পরেই দেহ রাখলেন। সুরাট থেকে ঐ বছরই জুন মাসে আর একজনকে পাঠান হ'ল আগ্রার দরবারে। ইনি টমাস কেরিজ। প্রায় মাস কুড়ি বাদে আরও একজনকে পাঠান হ'ল কেরিজের জায়গায়—উইলিয়াম এডওয়ার্ড।

কিন্তু এরা কেউই যে রাষ্ট্রদূত নয়। সবাই বণিকনন্দন, এটা বুঝতে পারবে না, এমন বোকা নয় মুঘল দরবার। আসল-নকল তারা ঠিকই বিচার করতে জানে। আর তারা যে সেটা জানে, টমাস বেস্ট:সেটা বুঝে গিয়েছিলেন। সেইমত দীর্ঘ রিপোর্টও দিয়েছিলেন জন কোম্পানীর সদরদপ্তরে।

কোম্পানীও বসেছিল না। প্রাচ্য ব্যবসা চালাতে হ'লে চাই কুঠী। কুঠীর জন্য মুঘল দরবারে আনুকূল্য চাই। চাই রাষ্ট্রদূত। তারা কেতাদুরস্ত জাত। তলোয়ার তারা ধরে। তবে তারও একটা কেতা আছে। স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের কাছে আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে আইন-কানুনের মধ্যে দিয়ে কাজ হাঁসিল করাই তাদের কাম্য। তাই ব্যয়কুণ্ঠ কোম্পানী রাষ্ট্রদূতের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারলে না। তাই, সাধারণতঃ রাজা প্রথম জেমসের সামান্যতম হস্তক্ষেপেও যে কোম্পানী ক্ষেপে যেত, সেই কোম্পানীই ঐ ব্যাপারে রাজকীয় সাহায্য প্রার্থনা করল।

ষোলশ' চোদ্দ। সাতই সেপ্টেম্বর।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফিলপট লেনের আপিসবাড়ির বিরাট হলঘরটায় জোর মিটিং বসেছিল সেদিন। গভর্নর স্যার্ টমাস স্মাইথ বিষয়টি খোলাখুলিভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন সভ্যদের। ইস্ট ইণ্ডিজে যদি ব্যবসা করতে হয় সে মুলুকের সম্রাটের

দরবারে একজন রাজকীয় প্রতিনিধি পাঠাতেই হবে। এই প্রসঙ্গে জুন মাসে দেশে ফিরে বেস্ট যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তার কপিও পেশ করে থাকবেন গভর্নর। বেস্ট তো জোর দিয়ে বলেছিলেন এ-ব্যাপারে। তা' বলুন, কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সভ্যরা সেদিন রাজী হলেন না। কেননা প্রশ্নটা টাকার। আর টাকাতো কম নয়। এত সব ঝামেলা না করে আগ্রার দরবারে একজন খুৎসই ফ্যাক্টরকে পাঠাও না বাপু। সেদিন আলোচনার তুফান বইল। তামাকের গন্ধে হলঘর অন্ধকার হয়ে গেল। প্রশ্নোত্তরে গমগম করতে লাগল সভাগৃহ। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তেই আসা গেল না। বৈঠক মুলতুবী রইল।

প্রায় মাসখানেক পরে চৌঠা অক্টোবরের সভায়তেও পাকাপাকি কিছু হ'ল না। আবার আলোচনার ঝড় বয়ে গেল, কিন্তু কি যে করা হবে 'কমিটি'রা তা নিয়ে এক-মত হতে পারলেন না। তিনদিন পরে আবার মিটিং বসল। এই মিটিং-এ কিন্তু—ভিতরে ভিতরে সদস্যদের মধ্যে কি যে কথা হয়েছিল কে জানে—মুঘল ভারতবর্ষে প্রথম ইংরেজ রাজদূতের নাম একরকম ঘোষণাই করে দেওয়া হ'ল। কবে যে প্রার্থীপদে আবেদন করতে বলা হয়েছিল, প্রার্থীদের নাম কিভাবে এসেছিল কমিটির বিবেচনার জন্যে—কিছুই জানা যায় না। তবে এই সভায় বলা হল, প্রার্থীদের মধ্যে সার্ টমাস রোর মত যোগ্য ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাঁকে পাওয়া গেলে ভালই হয়... **'none were esteemed so fittinge for that service as Sir Thomas Roe. If he may be had ;'**

বোর্ড অব ডিরেক্টর গভর্নর টমাস স্মাইথকে রোর সঙ্গে এ-ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে বললে। স্মাইথ বলবেন আর কি? মনে হয় ভেতরে ভেতরে স্মাইথই তো রোর আসল মুরুব্বী! বয়স চৌত্রিশ। সার্ টমাস রোর ঠাকুর্দার নামও সার্ টমাস রো। লণ্ডনের লর্ড মেয়র। বাপ রিচার্ড রো অল্প বয়সে মারা যান।

রোর এই মনোনয়ন দস্তুরমত চিত্তাকর্ষক। কেননা এই চাকরিটা—সেকালের বাজারেও বেশ লোভনীয়। এবং এই পদের প্রার্থী ছিল কুল্যে তিনজন—সার্ টমাস রো, সার্ জন ক্রুক আর মিস্টার বেলই। কিন্তু টমাস রোকে মনোনীত করার সময়ে যে যুক্তিটা দেওয়া হয় সেটাই বিস্ময়কর। বলা হয়েছিল অপর প্রার্থীরা এমন কিছু অনুপযুক্ত নন তবে কিনা সার্ জন ক্রুকের শরীরটা বেশ জুতসই নয়। ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধাক্কা সামলাবার মত মজবুত কাঠামো নয় তাঁর। একই অবস্থা বেলির। **—"but the estate of his bodie much doubted, beeinge of a weake constitution ; as also one Mr Bailie."**

যাইহোক বছরে ছয়শ' পাউণ্ডের চাকরিটা সার্ টমাস রোর বরাতে জুটে গেল।

জন কোম্পানীই শুধু তাঁকে পছন্দ করলে না, রাজা প্রথম জেম্‌সও তাঁকে সানন্দে মনোনীত করলেন। ব্যাপারটা বিনা বাধায় খুবই দ্রুত নিষ্পন্ন হয়ে গেল। কেন না সার্ টমাস রো বংশানুক্রমিকভাবে রাজ পরিবারের পরিচিত ব্যক্তি! আসলে খুব তরুণ বয়সেই সার্ টমাস মহারাণী এলিজেবেথের দরবারে আসন পেয়েছিলেন। এবং মহারাণীর মৃত্যুর বছর দুয়েক পরেই প্রথম জেম্‌স তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজকুমার হেনরী ও রাজকন্যা:এলিজেবেথ—উভয়েরই কৃপাধন্য ছিলেন সার্ টমাস রো। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনা বলতে হবে—হেনরী হঠাৎ মারা গেলেন আর এলিজেবেথের বিবাহ হয়ে গেল। কাজেই রাজকন্যার 'অনেস্ট টম'—এই নামেই রাজকন্যা তাঁকে ডাকতেন—চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু চাকরি সেকালেও বড় সহজ ছিল না। দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন রো। জুতোর গোড়ালি ক্ষয় হতে লাগল, কিন্তু কোন চাকরি জুটল না।

অবশেষে এই চাকরি। সার্ টমাস স্মাইথের দাক্ষিণ্যে। ঠিক হ'ল মাইনে ছয়শ' পাউণ্ডের মধ্যে তিনশ' পাউণ্ড নেবেন ভারতবর্ষে আর তিনশ' পাউণ্ড কোম্পানীর কারবারে লগ্নী খাটবে। বহু চাকরির উমেদার সার টমাস রোর স্বাভাবিকভাবেই কিছু দেনা ছিল। সেগুলি মিটিয়ে ফেলবার জন্য তাঁকে চারশ' পাউণ্ড অগ্রিম দেওয়া হ'ল। আরও চারশ' পাউণ্ড পেলেন রো। এটা অগ্রিম নয়। বিদেশে বিভুই-এ যাওয়া। অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লাগবে। 'অ্যামবাসাডর' বলে কথা। তার খাবার প্লেট ইত্যাদি কেনবার জন্যে ধার দেওয়া হ'ল একশ' পাউণ্ড। আরও প্রাপ্তিযোগ ছিল রোর। চাকরের জন্য দেওয়া হবে বছরে একশ' পাউণ্ড। আর পোষাকের জন্য ত্রিশ। সেকালের আদর্শেও 'পার্কস' বড় কম নয়। সঙ্গে যাবে একজন ডাক্তার, একজন যাজক। খাবার খরচ কোম্পানীর। অবশ্য মুঘল সম্রাট স্বয়ং যদি তার ব্যবস্থা করেন তাহলে অন্যকথা।

সব কিছু সার্ টমাস রোকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল। দেওয়া হ'ল রাজা প্রথম জেম্‌সের চিঠি। আর কোম্পানীর কিছু নির্দেশনামা। তাতে সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল একটি নির্দেশ। আমরা যখন সুরাট হয়ে সুতানুটি গিয়ে পৌছাব, দেখব ভারতবর্ষে ইংরেজদের ব্যবসায়ে অন্যতম বড় ঝামেলা ছিল কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা। সুরু থেকেই কোম্পানী সেই ব্যাপারে খুবই সজাগ ছিল। এবং টমাস রোকে সাবধান ক'রে দিয়েছিল যে, প্রাচ্যে কোনক্রমেই কোন ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে যেন লিপ্ত না হন তিনি। সেসব চিন্তা যেন কদাচ তার মনে উদয় না হয়। কদাপি না।

খাস লণ্ডন থেকেই ঠাটবাট খুব উঁচু পর্দায় বেঁধেছিলেন রো। তিনি যে একজন

রাজদূত পোষাকে-আশাকে চলনে-বলনে তা জানান দেবার সব আয়োজনই করেছিলেন তিনি। রাজদরবারে যাবার জন্যে যে 'স্যুট'টা তৈরী করিয়েছিলেন সেকালের লণ্ডনের প্রথম শ্রেণীর খলিফার কাছ থেকে—তার দাম পড়েছিল তেয়াত্তর পাউণ্ড সাত শিলিং ছয় পেন্স। আরও একটা প্রস্থ স্যুট বানিয়েছিলেন তার দাম পড়েছিল সাতচল্লিশ পাউণ্ড। সবই খানদানী ব্যবস্থা।

লণ্ডনের জন কোম্পানীর সদর দপ্তরের টেবিল ততদিন মুঘল রাজদরবারের নকল রাজদূতদের বিলাপব্যথায়-কাতর চিঠিতে ভর্তি। মুঘল দরবার তাদের কাউকেই বড় একটা গ্রাহ্য করছে না। যতই ময়ূরের পেখম পড়ুক না কেন, দাঁড়কাকই কি কখনও তার পরিচয় ঢাকতে পারে? নীলরঙ মেখে শেয়াল যতই রাজা সাজুক না কেন, তার রা যাবে কোথা? আগ্রা থেকে উইলিয়াম এডওয়ার্ড সার্ টমাস স্মাইথকে লিখেছেন—"**the necessity of residence with the king···is such as cannot bee avoyded ; and hee to bee a man sent immediately from our king , for that the title of a merchant is of them despised···** অর্থাৎ এদেশের রাজার কাছে একজন প্রতিনিধির অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এবং সেই ব্যক্তিকে এখুনি আমাদের রাজার কাছ থেকে পাঠাতে হবে—কেননা বনিকের খেতাব এদের কাছে ঘৃণার্হ। এটা ডিসেম্বর ষোলশ' চোদ্দর চিঠি! এমনি চিঠির পর চিঠি। পাঠান, পাঠান, রাষ্ট্রদূত পাঠান। জরুরী পাঠান। অবিলম্বে পাঠান।

পাঠান হ'ল। পনেরো জন সহচর নিয়ে ষোলশ' পনেরোর দোসরা ফেব্রুয়ারি সার্ টমাস রো 'টিলবারি হোপ' থেকে 'লায়ন' জাহাজে গিয়ে চাপলেন। বন্দরে কোম্পানীর কর্মকর্তারা হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকবেন। শীতের লণ্ডন ম্লানালোকের ঘেরাটোপে করুণচোখে এই বিদায় সমারোহ দেখে থাকবে!

সার্ টমাস রোর 'লায়ন' জাহাজের সঙ্গে আরও তিনটে জাহাজ ছিল। কোম্পানীর প্রথম ও তৃতীয় অভিযানের নায়ক উইলিয়াম কিলিং-এর যুদ্ধজাহাজ 'ড্রাগন'; 'একসপিডিসন' জাহাজের নেতৃত্ব করছিলেন ওয়াল্টার পেটন আর 'পেপারকর্ণ' জাহাজের মাস্টার ছিলেন ক্রিস্টোফার হ্যারিস। 'লায়ন' জাহাজের মাস্টার ছিল ক্রিস্টোফার নিউপোর্ট। সব মাল ভর্তি জাহাজ।

এবং জন জুর্ডেনের আবিষ্কৃত সেই সোয়ালী হোলেই সার্ টমাস রো ও তার জাহাজ তিনটে এসে নোঙর ফেলল। এখান থেকে তার দৌত্য শুরু হয়ে গেল। ষোলশ' পনের। আঠারই সেপ্টেম্বর।

বেড়াল মারতে হয় বিয়ের রাতে—এই ফার্সী তত্ত্বটি কি জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রথম ইংরেজ রাষ্ট্রদূত সার্ টমাস রো অবগত ছিলেন? খুব সম্ভব না। ফার্সীতে তাঁর ইলেমের কথা তো সচরাচর শোনা যায় না। তবু দেখা গেল কার্যতঃ নয়া ব্রিটিশ এ্যামবাসাডর এই প্রবচনের একটা প্র্যাকটিক্যাল ডেমন্সট্রেশন দিতে চাইলেন সুরাটের সূর্যস্নাত বালুবেলায়। দেখা গেল, খুঁটিনাটি সব কিছু ব্যাপারেই তাঁর মেজাজ একেবারে খুবই উঁচু পর্দায় বাঁধা। সুরাটের বিস্মিত মুঘল শক্তি দেখল ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর, ষোলশ' পনের সুরাটের অদূরে মাটিতে সেই পা ঠেকালেন রো, ক্যাপ্টেন হ্যারিস একশ'বার গুলির আওয়াজ করল। আটচল্লিশবার তোপধ্বনি, বিপুল বাদ্যসমারোহ—আর চারকুড়ি লস্করের গার্ড-অফ-অনার তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। লাল কার্পেট বিছান হ'ল তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে—আরও দেখা গেল সামান্য একটু পান থেকে চুন খসলেই সার্ টমাস রো বিশ্রীভাবে ক্ষেপে ওঠেন। আরে তাইতো উঠলেন!

সুরাটের ইংরেজরা সাধ্যমত এলাহী আয়োজনই করেছিল তাদের প্রথম রাষ্ট্রদূতের সংবর্ধনার জন্যে। একটা খোলা তাঁবুর মধ্যে সুরাটের ইংরেজ কুঠীর প্রায় ত্রিশ জন ফ্যাক্টর এসে অপেক্ষা করছিলেন তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্যে। কোন দিক দিয়ে জ্ঞানতঃ কোন ত্রুটি ছিল না। তবু সেই অভ্যর্থনাস্থলের কাছাকাছি এসে সার্ টমাস রো থেমে গেলেন।

কি ব্যাপার?—থামলেন কেন 'হিজ এক্সেলেন্সী'?

পরিবৃত ইংরেজ লোকজনদের কাছে নিজেই কারণটা ব্যক্ত করলেন রো। পাশেরই একজনকে ডেকে বললেন, তিনি 'হিজ ম্যাজেষ্টির এ্যামবাসাডর'। তাঁকে সম্মান দেখানর জন্যে কেউই উঠে দাঁড়াচ্ছে না জমায়েতে। তাই তিনি আর এগোবেন না।

সেই খবর পাঠান হ'ল তাঁবুতে। অপেক্ষমান ফাক্টররা সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন। রো আস্তে আস্তে আবার এগোতে লাগলেন। তিনি যে সামান্য ব্যক্তি নন। মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সের প্রতিনিধি—তাঁর স্বয়ং ব্যক্তিত্বে রো প্রথম থেকেই সেই কথাটা বারবার ঘোষণা করতে চাইছিলেন।

বলা বাহুল্য, এহ বাহ্য। পোক্ত পোলিটিশিয়ান সার্ টমাস রো পনের জন সহচর নিয়ে যেদিন টিলবারি হোপ থেকে 'লায়ন' জাহাজে চেপে বসলেন, ভারতবর্ষের উদ্দেশে, সেদিন থেকেই তিনি মনে মনে তাঁর কার্যক্রম বোধকরি ভেঁজে নিচ্ছিলেন। শক্তের ভক্ত যে সবাই এবং এমনি সম্মান যে কেউ দেয় না, ওটা নিতান্তই আদায় করে নিতে হয়—সমুদ্রযাত্রার দীর্ঘ আটমাস কালে ভারতবর্ষ থেকে যেসব 'ইন্‌টেলিজেন্স' তিনি পাচ্ছিলেন—তাতেই তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকবে। তাঁর পূর্বসূরীদের হেনস্থা অসম্মান পর্ব তাঁর এই ধারণা দৃঢ়তর করে থাকবে।

সুরাটের কাছাকাছি এসেই সার্ টমাস রোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নিকলস ডাউটনের 'মার্চেণ্টস হোপ' জাহাজের। গেল বছর তারা এসেছিল ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে। এখন তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে উড়িয়ে ধ্বজা ঘরে চলেছে। 'মার্চেণ্টস হোপ' থেকে সার্ টমাস রো ইংরেজ নৌশক্তির এক কৃতিত্বের খবর পেলেন আরব সাগরের লোনা জলে। ঘটনাটা হচ্ছে এই :

পর্তুগীজরা যখন ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে তাড়াতে কোনক্রমেই রাজী করতে পারলে না মুঘল সম্রাটকে, তখন তারা অন্যপথ দেখলে। অনুনয় নিবেদন নয়, এবারে তারা তলোয়ারের পথ বেছে নিলে। 'রাত্রিদিন বহি যায় হার্মাদের ডরে'। আর এই ব্যাপারে গোড়াতেই তারা একটা মস্ত ভুল করে ফেললে। জাহাজটা ফিরছিল লোহিত সমুদ্র হয়ে। পারশ্যে ব্যবসা করে প্রভূত বহুমূল্য সামগ্রী নিয়ে। মালিক মুঘল ব্যবসায়ী। গন্তব্যস্থল সুরাট।

আরব সমুদ্রের জলে তখন একটুও চাঞ্চল্য ছিল না। কেবল মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর দীপ্তি ছোট ছোট ঢেউ-এর ওপর পড়ে সেগুলিকে এক আশ্চর্য সুন্দর মহিমা দিচ্ছিল। আর সেগুলির দিকে তাকিয়ে সেই মুঘল বাণিজ্য-তরীর ক্লান্ত প্রবাসী-নায়কের মনে তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার বাসনাটা বুঝি ঝিকমিকিয়ে উঠেছিল। সুরাট আর কতদূর। দাঁড়ীদের টানা পাল্লার ঝপ্‌ঝপ্ শব্দে এই কথাটিরই বুঝি প্রতিধ্বনি শুনছিলেন তিনি। কিন্তু বেশিক্ষণ তাঁকে ভাববার অবকাশ দিল না ঘটনাচক্র। একজন মাঝি এসে খবর দিলে, অদূরে দিকচক্রবালের কোল ঘেঁষে একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। জাহাজটা হার্মাদের।

—তাতে কি? মুঘল ব্যবসায়ী দাড়িচুমড়ে নিশ্চিন্তভাবে হাসলেন—তাতে কি? খাস পর্তুগীজদের লেখা অনুমতিপত্র আছে তাঁর কাছে। ভয় কি? কিন্তু না। কিছুতেই কিছু হ'ল না। পর্তুগীজরা তাদের নিজেদের দেওয়া অনুমতিপত্র নিজেরাই মানলে না। সেই প্রখর নিদাঘে আরব সাগরের জল মুঘল ব্যবসায়ী

আর মাঝিমাল্লার রক্তে লাল হয়ে গেল। নিষ্ঠুরভাবে সেই জাহাজ লুণ্ঠন করলে পর্তুগীজরা।

এক সময়ে সে খবর পৌছাল দিল্লী। পৌছাল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে। এবং এই সংবাদও কারও অজানা রইল না, সেই লুণ্ঠিত-জাহাজে স্বয়ং সম্রাট-জননীর বহু মূল্যবান মালপত্র ছিল! ক্ষুব্ধ সম্রাট সুরাটের শাসনকর্তা করে পাঠালেন মুকারব খাঁকে। দ্রুত এর একটা বিহিত করবার জন্য। পর্তুগীজ হার্মাদদের শায়েস্তা করবার জন্যে।

সম্রাট তো বলেই খালাস। কিন্তু জলে পর্তুগীজদের দমন করাতো বড চাট্টিখানি কথা নয়। অথচ একটা কিছু না করলে মুকারব খাঁর ইজ্জত যায়। খাঁ সাহেব চাণক্য নীতি অনুসরণ করলেন। কাঁটা দিযে কাঁটা তোলার সেই প্রাচীন পথ ধরে তিনি ইংরেজদের কাছে দূত পাঠালেন। ডাউটন সাহেব তখন তাঁর দুখানা জাহাজ নিযে সুরাটের সমুদ্রে হাজির। মুঘল দূত তাঁরই কাছে কুর্ণিশ করে দাঁড়াল। হাতে মুকারব খাঁর চিঠি।

দোভাষী এল। চিঠিখানা পড়া হ'ল। বহুৎ বহুৎ সেলাম জানিযে খাঁ সাহেব মুঘল এবং ইংরেজ উভয়ের শত্রু পর্তুগীজ বেয়াদবদের দমন করার জন্যে ইংরেজ নৌ-নায়ককে পর্তুগীজ ঘাঁটি দমন অধিকারে অগ্রণী হ'তে বলেছেন। খাঁ সাহেব এটুকুও বুঝিয়ে দিতে ভোলেননি, যে মুঘলদের সঙ্গে পর্তুগীজদের কলহ আসলে তো ইংরেজদের বাণিজ্যতরীর উপস্থিতি নিযেই। কাজেই এই মহৎকাজে তাঁদের সহাযা করা তো ইংরেজদের নৈতিক দায়িত্ব।

কিন্তু ন্যায়-নীতিবোধের চেয়ে ইংরেজদের বাস্তববুদ্ধি অনেক বেশি। ডাউটন সাহেব লড়াই বুঝতেন, কাজেই অনেক বিচার-বিবেচনা করলেন। পর্তুগীজ ঘাঁটিতে তাদের আক্রমণ করা যে নিছক বোকামি সেটা তাঁর বুঝতে কষ্ট হ'ল না; মুঘল দূতকে সরাসরি ফিরিয়ে দিলেন। অনেকে অবশ্য মনে করেন, ডাউটনের শরীরটা তখন ভালো যাচ্ছিল না আর সেই কারণেই এইসব ঝুটঝামেলার মধ্যে যেতে তিনি রাজী হননি।

এদিকে মুকারব খাঁ তো ক্ষেপে গেলেন জবাব পেয়ে। ইংরেজদের ব্যবসা যাতে একেবারে অচল হয়ে যায় তার জন্যে তিনি সবকিছু আয়োজন সম্পন্ন করলেন। আর নিরুপায় হয়ে, মসুলিপত্তমে ওলন্দাজদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার তোড়জোড় করতে লাগলেন।

কিন্তু বিধি বাম। এ-ব্যাপারে একটা কিছু করবার আগেই খবর এল পর্তুগীজরাই মারমুখী হয়ে সুরাট আক্রমণ করার ফন্দি আঁটছে। খাঁ সাহেব এবার পস্তালেন।

এবং কি করেন কি করেন ভাবতে ভাবতে দেখা গেল সুরাটের ইংরেজ কুঠীর বড়কর্তা অল্ডওঅর্থকে ডেকে পাঠালেন। মাথা কাটলে চুন খুঁজতেই হয়। লজ্জা ঘেন্নার মাথা খেয়ে ইংরেজদের সঙ্গে বেশ একটা বোঝাপড়া করে ফেললেন। শিরে সংক্রান্তি। কোনরকম কালক্ষেপ না করে সোজা ডাউটন সাহেবের কাছে ধর্ণা দিয়ে পড়লেন। এবার ডাউটন আর খাঁ সাহেবকে ফেরালেন না। আক্রান্ত হ'লে পর্তুগীজদের প্রতিহত করার সব রকম প্রতিশ্রুতি দিযে বিদেয় দিলেন সুরাটের মুঘল শাসনকর্তাকে।

ষোলশ' পনের জানুয়ারি মাস। অর্থাৎ টমাস রো সুরাটে পৌছবার মাস খানেক আগের কথা। শীতের কুয়াশা ভেদ করে ছোট ছোট পর্তুগীজ রণতরী সত্যিই সুরাটের দিগন্তে ভেসে উঠল। সঙ্গে পর্তুগীজ গভর্নর স্বয়ং।

পর্তুগীজ গভর্নর ভেবেছিলেন মুঘলদেরতিনি সুরাটের বন্দরে এমন আড়ংধোলাই দেবেন যে,তারা আর কোনদিনই ইংরেজদের সঙ্গে দোস্তী করতে সাহস করবে না। কিন্তু ডাউটনের রণকৌশল পর্তুগীজদের সে আশায় ছাই দিযে দিল। এই লড়াই চলেছিল তিন সপ্তাহ ধরে। ডাউটনের জাহাজ ছিল চারটে। পর্তুগীজদের এগারটা। সঙ্গে ষাটটা আঠার-দাঁড়ী নৌকা। ইংরেজদের নাবিক সংখ্যা চারশ'। পর্তুগীজদের ছাব্বিশশ'। সঙ্গে দু'হাজার দেহাতী লস্কর। এই বিপুল পর্তুগীজ বহরকে নিঃসংশযে পরাজিত করলেন নিকলস ডাউটন। সোয়ালীর জলপথে পর্তুগীজদের তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। লেজগুটিয়ে তারা স্বরাট অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। আর ফলশ্রুতি হিসেবে, বলা বাহুল্য, মনে মনে যাই থাক মুকারব খাঁর ইংরেজদের হেনস্থা করার বিন্দুমাত্র সাহসও আর রইল না। এবং নিজেই উদ্যোগ নিয়ে ইংরেজদের বাণিজ্য অধিকারের সুযোগ-সুবিধার সুপারিশ করে আগ্রার দরবারে চিঠি পাঠিযে দিলেন।

এহেন ঘটনায় রো সাহেব যদি মুঘল রাজশক্তি সম্বন্ধে ধারণা করে নিযে থাকেন যে, তারা শক্তের ভক্ত তাহ'লে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় কি? কিন্তু মুঘল রাজন্যরা যে শুধু শক্তের ভক্তই নয়, নরমের যম, সে খবরও রো জাহাজে বসেই পেলেন। উইলিঅম এডওআর্ড রো-এর হয়ে মুঘল দরবারে সম্প্রতি যিনি একটিনি করছিলেন —রো তাঁর কথাও শুনলেন নানাসূত্রে। শুনলেন, জাহাজ থেকে নেমেই মুঘল শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা যৎপরোনাস্তি অসম্মান করেছে এডওয়ার্ডের! সুরাট বন্দরের কুলি এমনকি পিয়নরা পর্যন্ত তাঁর গায়ে হাত দিয়ে তাকে সার্চ করেছে। তাকে নাকি গলাধাক্কাও দিয়েছে কেউ কেউ—অথচ এডওয়ার্ড কোনরকম প্রতিবাদ করেন-

নি। দাঁতে দাঁত চেপে চোখমুখ লাল করে প্রথম জেম্‌সের নবনিযুক্ত ইংরেজ রাষ্ট্রদূত খবরটি শুনলেন আর মনে মনে বুঝি এই অপমানের শোধ নেবার জন্যে তৈরী করে নিলেন নিজেকে। আর লিখিতভাবে সেই শপথের পুর্বাভাষ নিয়ে রওনা হয়ে গেল উইলিঅম বিদল্‌ফ সেপ্টেম্বরের তেইশে। চিঠিতে সই করলেন জেনারেল কিলিং। বলা বাহুল্য রো-এরই নির্দেশে। এর আগেই অবশ্য রোর আগমন সংবাদ জানান হয়েছিল সুরাটে মুঘল দরবারকে। তার জবাবে মুঘল সুবেদার তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তা রখিদমদ্‌গারের জন্যে মুঘল রাজশক্তি কি কি করতে চায় তার ফিরিস্তি দিয়ে লিখেছিল যে, হুকুম হলেই ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের তত্ত্বাবধানের জন্য তিরিশটি ঘোড়া পাঠান হবে আর যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে মহামান্য রাজদূতের অবস্থানের জন্যে মুঘল সুবেদার একটা বাড়িরও ব্যবস্থা করতে পারে!

কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। অন্ততঃ অসার ছেঁদো কথায় ভোলবার বান্দা রো সাহেব নন। মুঘল সুবেদারকে তাঁর প্রতিশ্রুতির জন্য অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে সার্ টমাস রো আসল কথা পাড়লেন। বললেন, বাছা তোমার বদান্যতার তো অন্ত নেই। কিন্তু বাপু, আমি তো শুনেছি তোমাদের বন্দরে যেই জাহাজ ভেড়ে, মানুষ নামে তীরে তোমরা তাদের সবাইকে তন্ন তন্ন করে এমনকি পকেট পর্যন্ত হাতড়ে তল্লাসী চালাও! এই নাকি তোমাদের রীতি। কিন্তু বাপু, আমি একজন রাষ্ট্রদূত। আমার বা আমার ব্যক্তিগত লোকজনদের তো এসব করা চলবে না। আমরা এসবের উর্দ্ধে। আমার 'ডিপ্লোমেটিক প্রিভিলেজ আছে'। তবে অবশ্য কথা দিচ্ছি, আমার সঙ্গে ব্যবসা করার মত কোন বাণিজ্যদ্রব্য থাকবে না। সবই থাকবে আমার বা আমাদের ব্যবহারের। রো এসব লিখে সোজাসুজি শাসিয়ে দিলেন মুঘল সুবেদারকে যে এসবের অন্যথা হ'লে, তাঁর 'প্রিভিলেজে' হাত দিলে। তিনি আর আগ্রা যাবেন না। সোজা জাহাজে উঠে আসবেন। দয়া করে সুবেদার যেন এটা স্মরণ রাখেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা দরকার। টমাস রো জাহাজে বসেই শুনেছিলেন মুকারব খাঁ বদলি হয়ে গেছে; তার জায়গায় জাহাঙ্গীর গুজরাটের সুবেদার করেছেন শাহজাদা খুরমকে—ভাবী সম্রাট শাজাহানকে। আর সুরাটের নতুন শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন জুলফিকার খাঁকে। মুকারব খাঁর সঙ্গে অবশ্য আবার ইংরেজদের দেখা হয়েছিল তখন তিনি বিহারের সুবেদার। মুকারব খাঁর কথা বারবার উল্লেখ করেছেন জাহাঙ্গীর তাঁর 'তুরুকে'। লোকটা নাকি পাকা একজন সার্জেন। আসল নাম শেখ্ হাসান। মুকারব বিহার থেকে চলে আসেন আগ্রায়। শাজাহান তাঁর 'পেন্সনের' ব্যবস্থা করেন।

চব্বিশে সেপ্টেম্বর সকাল হতেই নতুন মুঘল শাসনকর্তা জুলফিকার খাঁর দূত এসে হাজির। সঙ্গে এক দীর্ঘপত্র। দোভাষী এসে চিঠি পড়ে জানালে যে, তাতে সুবেদার সাহেব মহামান্য রাষ্ট্রদূতের স্বাস্থ্য কামনা করে এই নিবেদন করেছে যে, বন্দরে মানুষ জন যেই নামুক তাদের সকল জিনিসপত্র তল্লাসী করাই তাঁদের রেওয়াজ। তবে রো সাহেবের সম্মানার্থে তিনি পাড়ঘাটে একজন অফিসার পাঠাবেন যিনি রাষ্ট্রদূতের বা তাঁর সহচরদের সম্পত্তি সেইখানে শীলমোহর করে সোজা পাঠিয়ে দেবেন তাঁরা যেখানে উঠবেন সেই বাড়িতে। সেখানে তাঁদের আনীত জিনিসপত্রগুলো খুলে একবার দেখে নেবেন কি সব জিনিস তাঁরা এনেছেন। চিঠির শেষে অবশ্য স্তোক-দিয়ে জুলফিকার খাঁ লিখেছিলেন মহামান্য রাষ্ট্রদূত যেন মনে না করেন শুল্ক বিভাগের লোকেরা তাঁর জিনিসপত্র কিছু তল্লাসী করবে সেখানে। তওবা, তওবা। তাই কি? কখনও হয়, শুধু একবার দেখে নেবে চর্মচক্ষে,—এই মাত্র! দেখে একবার খুশী হয়ে নেবে—'নাথিং টু ডিক্লেয়ার।'

রো সাহেব তো রেগে আগুন। মুঘল সুবেদারের মিছরির ছুরি কি তিনি বুঝতে পারেন না? খুব পারেন। মুঘল সুবেদারের লোককে খুব ধমকালেন। বললেন, তোমার মনিবকে বলো, আমি জাহাজেই থাকব, যতদিন না আগ্রার দরবারে এর একটা বিহিত হচ্ছে।

দূত তো নিমিত্ত মাত্র। বললে, হুজুরের যেমন মর্জি। তবে খাঁসাহেব জানিয়ে দিয়েছেন, এর বেশি করবার ক্ষমতা তাঁর নেই। কাস্টমস্ চেকিং-এর এই রেওয়াজ বহুকালের। স্বয়ং বাদশাও বোধ করি তা রদ করতে পারবেন না।

রো সাহেব আবার তড়পালেন। বললেন, স্বয়ং বাদশার মতামত শুনেই তিনি তাঁর ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করবেন। বললেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন যে, যাকে দিয়ে তিনি তাঁর অভিযোগ স্বয়ং সম্রাট সমীপে নিবেদন করবেন সেই উইলিয়াম এডওয়ার্ডের কি হাড়ির হালই না করেছিল এই মুঘল কাস্টমস! দূত বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল। রো তাকে একটু দাঁড়িয়ে যেতে বললেনএবং নানা ভেবেচিন্তে জুলফিকার খাঁর প্রস্তাবে শেষবেশ রাজীই হয়ে গেলেন। বলে দিলেন—পরের দিন তাঁর জিনিসপত্র নামবে, আর পরশু, অর্থাৎ ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর তিনি অবতরণ করবেন সুরাটের বালুবেলায়।

অবতরণ করলেনও যথাসময়ে, যথাসমারোহে। কিন্তু তারপরই সেই নাটক সুরু হয়ে গেল। মুঘল কাস্টমসের জমাট নাটক। দোভাষী মারফৎ উভয় পক্ষেরই শিষ্টাচার বিনিময় পর্ব একসময়ে শেষ হয়ে গেল। এবং এই সময়েই নিছক বেসুরো-ভাবে মুঘলপক্ষ বলে উঠল, মহামান্য রাষ্ট্রদূত যেন তাঁর সহচর পনের জনকে খানা-তল্লাসী করায় কোনরূপ আপত্তি না করেন।

—তার মানে ? সার্ টমাস রো ক্ষুব্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন। আমাকে স্পষ্টতই কথা দেওয়া হয়েছিল যে, আমার নিজস্ব কোন লোকজনকে কোনরকম কাস্টমস্ চেকিং করা হবে না। আবার এ-সব কথা কেন ?

কেন, তা কিছু বুঝিয়ে বললেন না মুঘল দোগোনায়ের কর্তারা। শুধু দোহারের মত গেয়ে উঠল এটাই রীতি, এটাই রেওয়াজ। এই তাদের একমাত্র বক্তব্য।

—সার্ টমাস রো বললেন, তোমাদের রীতি তোমাদের কাছে থাক। আমার সম্রাটের রাষ্ট্রদূতের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোন কিছুই আমি করতে দেব না। কাজেই আমি আমার লোকজন নিয়ে জাহাজে ফেরৎ চল্লাম। এবং শুধু বলা নয়, কার্যতঃ তাই করলেন টমাস রো। লোকজন নিয়ে জাহাজে উঠতে চললেন।

আবার দূত এল মুঘল পক্ষের। দোভাষী মারফৎ বলা হ'ল—সে কি কথা ? এই সব সামান্য ব্যাপারে এত মাথা গরমের কি আছে ? তারা একটা পাল্টা প্রস্তাব নিয়ে এল। রো সাহেবের সম্মানার্থে রো সাহেবের পাঁচজন সঙ্গীকে ছেড়ে দেওয়া হবে। বাকী দশজনকে করা হবে নিয়মমাফিক 'সার্চ'।

রো সাহেব তাতেও নারাজ। তাঁর পূর্বসূরীদের তৈরী করা ব্রিটিশ অ্যামবাসা-ডরের 'ইমেজ' সংশোধন করার জন্যে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। কাজেই মেজাজ তিনি বেশ উঁচু পর্দায় বেঁধে রেখেছিলেন। তিনি বারবার বললেন, থাক মান যাক প্রাণ।

ঘাড় চুলকে মুঘল কাস্টমসের অফিসার বললেন, দেখুন আপনারও কথা থাক। আমাদেরও রেওয়াজ বজায় থাক। আমাদের আলিঙ্গনে তো আপনাদের আপত্তি নেই। আপনার দশ জন কর্মচারীকে আমার লোকেরা আলিঙ্গন করবে। রো ভাবলেন, বেশি টান দিলে এবার বুঝি দড়ি ছিঁড়ে যাবে। তিনি বললেন, তথাস্তু। তাই হবে।

মোটামুটি এইসব শর্ত সাপেক্ষে সার্ টমাস রো চাপলেন ঘোড়ায়। সুরাট শহরের উদ্দেশে। জেনারেল কিলিং-এর কাছে বিদায় নিলেন। অন্যান্য ইংরাজ কাপ্তেনদের কাছে বিদায় নিলেন আর একসময় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের ঘোড়া টগবগিয়ে সুরাটের বালির ওপরে তাদের ক্ষুরের দাগ ফেলতে ফেলতে তীরবেগে এগিয়ে গেল শহরের দিকে। সঙ্গে তার সবশুদ্ধ তেইশজন লোক। আর মুঘলদের পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী আর দু'শ জন পদাতিক।

কিন্তু এইখানেই যদি সার্ টমাস রোর কাস্টমস্ পর্ব শেষ হতো তাহলে আর ভাবনা কি ? রো যখন মাঝপথে গিয়ে পৌছেছেন তখন হঠাৎ মুঘলমহল থেকে একটা প্রস্তাব নিয়ে আসা হ'ল। রো-এর পাশেই থাকবে জন পাঁচেক মুঘল

অশ্বারোহী। তারপরে তাঁর ইংরেজ সেনারা। মানে, মুঘলরা যে মহামান্য অতিথিকে সসম্মানে তাঁদের শহরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসছে এমনি একটা ধারণা সৃষ্টি করার জন্যেই এই অনুরোধ। টমাস রো অতশত ভাবেননি। রাজি হয়ে গেলেন। এবং তারপরই শুরু হয়ে গেল আসল নাটক।

এক সময়ে দেখা গেল সার্ টমাস রো থেকে মুঘল অশ্বারোহীর দূরত্ব বেশ বেড়ে গেছে আর সেইরকম বেড়ে গেছে ইংরেজদের সঙ্গে মুঘলদের দূরত্ব। এবং এমনি এক সময়ে সার্ টমাসের অজান্তে মুঘল সৈন্যরা প্রস্তাব করলে ঘোড়া থামিয়ে একটু জলপান করে নেবার। যাই বলা, তাই কাজ। ইংরেজরা যেই নামল ঘোড়া থেকে, সেই আড়াই শ' মুঘল শান্ত্রীরা তাদের ঘিরে ফেলে খানাতল্লাসী করতে সুরু করে দিলে।

সার্ টমাস রো বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। মুঘল ভারতবর্ষে তাঁর নতুন চাকরির মুখপাত যা হ'ল তাতে তিনি বোধ করি বেশ চিন্তিত হয়েই পড়েছিলেন। অজানা ভবিষ্যতের পথেপথে কি গুপ্তসর্প যে তার জন্যে অভ্যর্থনা করছে, সে কথা ভেবেই বুঝি তার গৌর ললাটের বলীরেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সুরাটের শীতের সূর্য তার সমুদ্রস্নান শেষ করে আকাশে অনেকক্ষণ ভেসে উঠলেও এখনও তার জড়তা যায়নি। কেমন যেন ম্লান তার দৃষ্টি—করুণ তার দ্যুতি। সার্ টমাস রোর মন্দ লাগছিল না। তাই ভাবনার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই জোর কদমে তিনি এগিয়ে চলেছিলেন।

—অকস্মাৎ ডাক শুনলেন, তার এক ভৃত্য উচ্চকণ্ঠে ডেকে চলেছে—'স্টপ মিলর্ড কাইণ্ডলি স্টপ'। সার্ টমাস ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন। ওয়ালিশ তাঁকে মুঘল কাস্টমসের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী শোনাল। মহামান্য রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে মুঘলরা তাদের খানাতল্লাসী সুরু করেছে। রাগে একেবারে তুবড়ির মত ফেটে পড়লেন রো। তাঁর কোষবদ্ধ কৃপাণ তিনি উন্মুক্ত না করে পারলেন না। খোলা তলোয়ার নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি মুঘলদের মধ্যে ফিরে গেলেন। ইংরেজরা সবাই মুঘল ব্যূহ ভেদ করে এসে তাঁকে ঘিরে দাড়ালে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে সার্ টমাস রো বললেন, কেন তোমরা এমন বিশ্বাসঘাতকতা করলে? মুঘলকর্তারা অম্লান বদনে বললে, তারা কিছু অন্যায় করেনি। নির্ধারিত শর্ত সারেই সার্ টমাস রোর লোকদের আলিঙ্গন করছিল মাত্র। কাস্টমস্ অফিসে সাধারণের সামনে এইসব তল্লাসী যাতে না করতে হয়, সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই এই নির্জন পথে তার দায়িত্ব সেরে নিচ্ছিল।

আচ্ছা নির্লজ্জ বেহায়া তো! সার্ টমাস খোলাখুলিভাবে বললেন, দেখ,

তোমাদের অনেক বেয়াদপি সহ্য করেছি। আর নয়। এই বলে কয়েকটা পিস্তলের একটা কেস ঝুলিয়ে নিলেন তাঁর ঘোড়ার রেকাবে। বললেন, দেখ বাপু, এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলিই এখন আমার মিত্র। তোমরা নও।

মুঘল লস্করেরা তাকে কিছু মনে না করে সুরাট অভিমুখে যেতে বলল। সার্ টমাস একবার ভাবলেন জাহাজে ফেরৎ যান। আবার ভাবলেন, হয়ত এরা ভাববে, তাঁরা ভয় পেয়ে পালালেন। শেষবেশ তিনি সুরাট যাওয়াই স্থির করলেন। মুঘল সেনানীদের বললেন এগোতে। এবং তাদের পিছু পিছু একটু তফাৎ রেখে এগোতে লাগলেন।

পথে মুঘলেরা থেমে বিশ্রাম করতে লাগল গাছের ছায়ায়। সেখানে তারা কিছু কলা নিয়ে এল খাবার জন্যে। ইংরেজদের দিতে চাইলে সার্ টমাস কিন্তু তাদের আতিথ্য অস্বীকার করে এগোতে লাগলেন। পথে নদী। পেরিয়ে সুরাট শহর; মুঘলরা না এলে কেউ ইংরেজদের পার করতে চাইলে না। একটু পরেই মুঘলরা পৌঁছে গেল। তারা এবার আলিঙ্গন করে সার্চ করার শর্তটি সম্পন্ন করতে চাইলে। তিতিবিরক্ত রো রাজী হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর যাজক মিস্টার বাউটন ও তিনজন চাকরকে নিয়ে নৌকায় উঠলেন। এবং তাঁর সামনেই মুঘল কাস্টমস্ অফিসার ইংরেজদের আলিঙ্গন করতে গেল। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। আলিঙ্গন করতে গিয়েই পকেটে হাত! সার্ টমাস রো নৌকায় বসে লক্ষ্য করছিলেন! তিনি চিৎকার করে আপত্তি জানাতেই মুঘলরা আর ঝামেলা না করে তাদের আলিঙ্গনপর্ব মিটিয়ে নিলে।

কিন্তু এর পরও কি টমাস রো এই কাস্টমসের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন? রো তাঁর জার্ণালে সখেদে জানাচ্ছেন—হায়রে, তাই যদি হ'ত। মুঘল কাস্টমসের হাত থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি পেয়ে রো তার জন্য নির্দিষ্ট বাড়িতে গিয়ে দেখেন, তাঁর জিনিসপত্র তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছায়নি। রো লিখছেন— "ছাট্ মাই নেসেসিটিজ সেণ্ট বিফোর ওএর কেপ্ট এ্যাট দি কাস্টমস হাউস এ্যাণ্ড কুড নট বি ডেলিভারড উইদাউট সার্চ।" তাঁর নিত্যপ্রয়োজনে সামগ্রীগুলিও কাস্টমস হাউসে পড়ে আছে। তল্লাসী না করে সেগুলি ছাড়া হবে না। কি আর করেন রো, জুলফিকার খাঁর দরবারে লোক পাঠালেন। অন্ততঃ তাঁর বিছানাপত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যেন এখুনি ছেড়ে দেওয়া হয়— এই বলে একটি অনুরোধও ক'রে পাঠালেন খাঁ সাহেবের কাছে। ভাগ্য ভাল, রোর এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন মুঘল সুবেদার!

কিন্তু মুঘল শুল্কবিভাগের এই অত্যাচার এই সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়নি। অন্যান

আটাশ মাস ভারতবর্ষে থাকবার সময় বহুবারই এর উৎপাত সার্ টমাস রোকে ভোগ করতে হয়েছে। তার অর্থ এ-নয় মুঘল কাস্টমসের সকল আয়োজনই নিছক অন্যায় কিংবা বিদ্বেষপ্রসূত। দেখা যায় রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা নিয়ে মুখে যতই হৈচৈ করুন না কেন সার্ টমাস রো, একেবারে নিছক ধোয়াতুলসী বড় একটা তিনি ছিলেন না। বিনা শুল্কে বহুমূল্য মণিমাণিক্য পাচার করতে তিনিও যে কম দক্ষ ছিলেন না, রিচার্ড সিটলই তার সাক্ষ্য। এঁকে দিয়েই, তাঁর জামাকাপড়ের মধ্যে সেলাই ক'রে অনেক কয়টি অতি বৃহৎ মণিখণ্ড ভারতবর্ষে পাচার করেছিলেন তিনি। মাণ্ডু থেকে লেখা রোর সুরাটের ফ্যাক্টরদের উদ্দেশে ষোল শ' সতের সালের আটই অক্টোবর-এর একটি চিঠিতে দেখা যায় যে, তিনি এই চোরাই চালান বিনা দ্বিধায় সমর্থন করে বলছেন—এইসব মণিমুক্তা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী 'ইফ ওয়ান অফ দি সোর্ডস সেণ্ট মি বাই দি কোম্পানী মে কাম আপ অর এনি আদার থিং অফ দি কোম্পানীজ বাই ষ্টিলথ, আই শ্যাল বি ওয়াণ্ডারফুল গ্ল্যাড।' সত্যিই রো খুবই খুশী হয়েছিলেন যখন রিচার্ড সিটল এই চোরাই মণিমুক্তা তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

এবং নানাকারণে এই কাস্টমস্ ফাঁকি দেওয়া ঐতিহাসিক মণিমুক্তাগুলিকে। ঐতিহাসিক এই কারণে যে, এই মণিমুক্তা কিছুটা সস্তায় জাহাঙ্গীরের মহামাত্য এবং শ্যালক আসফ খাঁকে বিক্রি করে টমাস রো একটা মস্ত দাঁও মারবার ফিকিরে ছিলেন। সেই দাওটা আর কিছুই নয় ইংরেজদের বাঙলাদেশে ব্যবসার মুঘল ফরমান। সম্রাট শাজাহান—তখনকারযুবরাজ খুররম্ গুজরাটের তথা সুরাটের সুবেদার। তাঁর ভয় ছিল ইংরেজরা বাঙলাদেশে ব্যবসা করতে পেলে সুরাটে তারা আর দামী মালপত্র আনবেনা। সুরাটের শুল্ক আয় পড়ে যাবে। টমাস রো'র ভাষায়, "বেঙ্গালা হ্যাথ নো পোর্ট বাট সাচ এ্যাজ দি পর্তুগীজ পোজেসেস ফর স্মল সিপিং। দি পিপিল্ আর আনউইলিং ইন রেসপেক্ট অব দি ওআর (এ্যাজ দে সাপোজ) লাইক টু এনম্যু ইন দেযার সীজ, এ্যাণ্ড দি প্রিন্স হ্যাথ ক্রশড্ ইট থিঙ্কিং উই ডিজায়ারড্ টু রিমুভ দিদার হোললি .." অনেকটা সেই কারণে রোর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তবে এই চোরাই মণিমুক্তা দিয়ে আসফ খাঁ মারফৎ রোর সেই সুবিধাটি লাভ করার চেষ্টাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না? ইংরেজদের সুরাট থেকে সুতানুটি—যাত্রার ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে সার্ টমাস রোর শুল্ক-ফাঁকি দেওয়া এই চোরাই মণিমুক্তার ভূমিকা তাই অস্বীকার করা যায় কি করে?

সুরাটের এই শুল্ক আদায়ের কড়াকড়ি বহুদিন চলেছিল। সার্ টমাস রোর যে দুর্গতি হয়েছিল মুঘল কাস্টমস অফিসারদের হাতে, টেভরনিঅর বলেছেন, এই ধরনের কড়াকড়ির তিনি নিজেও একজন সাক্ষী। এবং এই নিয়ে সে একেবারে খুনোখুনি কাণ্ড।

সে ষোলশ' তেপান্নর কথা। সুরাটের কাস্টমস অফিসাররা এক রাজপুতকে ধরে আনল। কি ব্যাপার—না, তার ঘোড়ার পিঠে কয়েক প্রস্থ কাপড় রয়েছে। সে তার শুল্ক দিতে রাজী নয়। শাসনকর্তা দাড়ি চুমড়ে বললে, কি হে শুল্ক দাওনি কেন?

রাজপুত। টক টক করছে রঙ। ইয়া লম্বা-চওড়া চেহারা। মাথায় পাগড়ী। কানে বালা। বাবরি চুল। কোমরে তলোয়ার। দৃপ্ত চেহারা। তেমনি তেজী চড়া গলায় বললে,বলছেন কি জনাব? সারা জীবন কেটেছে সম্রাটের নোকরি করে। আজ ছেলেবৌয়ের পরবার জন্যে কয়েক প্রস্থ সাধারণ কাপড় নিয়ে যাচ্ছি তার জন্যে আবার শুল্ক? সারা জীবন সরকারের গোলামী করে তার কি এই প্রতিফল? কাপড়ের দামইতো চার পাঁচ টাকার বেশি নয়—তার আবার শুল্ক কি হবে?

মুঘল শাসনকর্তার মনে হ'ল আচ্ছা বেয়াদব তো ছোকরা। বিশ্রি এক গালাগাল দিয়ে বললে, তুই দিবি না তোর বাপ দেবে। জানিস যদি স্বয়ং যুবরাজও এই কাপড় নিয়ে যেত তাকেও এই শুল্কের কড়ি গুণে দিয়ে যেত হত।

ক্রোধে ক্ষোভে রাজপুতের ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠল। এ-ধরনের গালাগাল শুনতে সে অভ্যস্ত নয়। তার থলি থেকে টাকা বার করবার ভান করে সে মুঘল রাজকর্ম-চারীর দিকে এগিয়ে গেল আর তার কাছে গিয়েই ক্ষিপ্রগতিতে তার তলোয়ার কোষমুক্ত করে ফেলল চকিতে এবং কারও কিছু বাধা দেবার আগেই সেই কৃপাণ আমূল বসিয়ে দিল সেই রাজকর্মচারীর বুকে একবার আধবার নয়। সাত-আটবার। শাসনকর্তা আর্তনাদ করে মুহূর্তে ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। আর সেই রাজসভার লোকজন অচিরে রাজপুতকে ধরে ফেলে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললে। চার পাঁচ টাকা দামের সামান্য দুই তিন প্রস্থ কাপড়ের শুল্ক দিয়ে গেল দুই তিনটে জীবন। এই কাহিনী লিখেছেন টেভরনিঅর।

তবে সুরাটের কাস্টমস অফিসারদের আচার আচরণের যে বিবরণ দেওয়া হ'ল তা' থেকে এমন একটা ধারণা হওয়া আশ্চর্য নয় যে, মুঘল আমলারা শুধু অশালীন আচরণে পোক্ত। আর ইংরেজরা নিরীহ মেষশাবক। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে

জানে না। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। সেকালেই বহু অসভ্য, ইতর ইংরেজ ভারতবর্ষে ভিড় করতে সুরু করেছিল। খোদ ইংরেজরাই তার বিবরণ রেখে গেছেন।

সেদিনের কথা—যেদিন সার্ টমাস রো ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলেন। আগেই বলা হয়েছে, টমাস রোর সঙ্গে একজন ইংরেজ রাঁধুনী এসেছিল। রোর সঙ্গে সেও নেমেছিল। নেমেই বেরিয়ে পড়ল মদের খোঁজে। মদ কোথা পাওয়া যায়? 'সুরা বৈঠ বিকায়'। খোঁজ মদের দোকান। একজন আর্মানী খ্রীষ্টানকে পাওয়া গেল। সেখানে সে সোৎসাহে কয়েকপাত্র আর্মানী মদ্য টেনে একেবারে মসগুল হয়ে কোন ইংরেজী কক্‌নি গানের সুর টেনে ফিরছিল বার ক্যাম্পে।

রাস্তায় তখন যাচ্ছিলেন জুলফিকার খাঁর ভাই। খানদানী মুসলমান। তাকে দেখেই ইংরেজ বীর পুঙ্গবের রক্ত টগ-বগ করে ফুটতে লাগল। খাঁ সাহেবকে দেখে চিৎকার করে উঠল, 'নাউ দাউ হিদেন ডগ্,' এইবার তুই দিশি কুত্তা।

ভাগ্যি খাঁ সাহেব ইংরেজি বোঝেন না। বিদেশী লোক। অত্যন্ত সম্ভ্রম সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন—কা কহ্‌তা হ্যায়?

ইংরেজ রাঁধুনীর মেজাজ গরম। খাঁ সাহেবের কথার কোন জবাব না দিয়ে একেবারে তলোয়ার বার করে আঘাত করলে তাঁকে। অবশ্য বিশেষ লাগেনি খাঁ সাহেবের। তাঁর সঙ্গীরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেলে তার অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে বন্দী করে নিয়ে গেল।

সার্ টমাস রোর কাছে খবর গেল। তিনি অচিরেই চিঠি লিখেদিলেন জুলফিকার খাঁকে। এই মদোমাতালদের হয়ে কথা বলতে তিনি আসেননি। এই সব ইংরেজকে মুঘল শাসনকর্তা ছিল যা খুশি শাস্তি দিতে পারেন, তাতে রোর কিছুই বলবার নেই।

মুঘল অমাত্য এখানেও যথেষ্ট সৌজন্য দেখিয়েছিল বিদেশীকে। তাকে তার দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে বললে সার্ টমাস রোকে। এবং বলা বাহুল্য রো স্বীকার না করলেও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের অসভ্যতা, মাতলামি, আচার-আচরণ ভারতবর্ষের বন্দরে বন্দরে ইংরেজদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করতে সুরু করেছিল—সন্দেহ নেই।

এ কাহিনী এডওয়ার্ড টেরীর। এই ভদ্রলোক যাজক। সার্ টমাস রো যতদিন ছিলেন ভারতবর্ষে—ততদিন তাঁর যাজক হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের এক বিবরণও রেখে গেছেন সেই সূত্রে!

কিন্তু আমাদের তো সুরাটের এই বেলাভূমিতে আটকে থাকলে হবে না। অনেকদূর যেতে হবে আমাদের। যেতেই হবে এই কারণে যে, গুজরাটে ষোলশ' ত্রিশ

একত্রিশে এমন দারুণ দুর্ভীক্ষ লাগল যে, অনেকের মতে এমন ভয়াবহ ব্যাপার আর কখনও এ-দেশে হয়েছিল কিনা বলা শক্ত। তাতে গুজরাটের আর্মানী তাঁতি-কুলের নির্বংশ হবার অবস্থা। এখানকার আর এক রপ্তানি দ্রব্য ছিল নীল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নীল অনেক সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই টাকা-আনা-পাই-এর হিসেবে অন্য বাজার দেখ। সেই সুদূর সুতানুটি। সে এখনও অনেক পথ। সপ্তদশ শতকের এই তো সুরু। এই শতকের সূর্য যখন ক্লান্ত হয়ে ঢলে পড়বে দিকচক্রবালে, আলোকাকীর্ণ হয়ে উঠবে পশ্চিম আকাশ—আমরা পৌছাব হোগলা বন আর মশার ঐক্যতান-সমৃদ্ধ ভাগিরথীর তীরে বাঙলাদেশের সেই গ্রামের হাটে। তার আগে একবার মসুলিপত্তন হয়ে বালেশ্বর, হরিহরপুর ঘুরে যাই আসুন!

তবে যাবার আগে একটু থেমে সুরাটের ইংরেজ কুঠির প্রেসিডেণ্ট মেথওল্ডের কাহিনীটা একটু বলে নেওয়া যেতে পারে। সুরাটের রাস্তা দিয়ে ভদ্রলোককে হাতে হাতকড়া দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সুরাটের মুঘল শাসনকর্তা হাকিম মসিউজ্জমান। অথচ বলতে কি, এ-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দায়িত্ব ছিল না মেথওল্ডের। বিন্দুমাত্র জানতেন না তিনি ব্যাপারটা। রামের দোষে শ্যামের মাথায় লাঠি পড়ার কাহিনী আর কি।

ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলা যাক। সুরাটের চীফ ফ্যাক্টর, প্রধান কুঠীয়াল উইলিয়ম মেথওল্ড সেদিন গোয়া থেকে সুরাটে ফিরলেন। সেখানে গিয়েছিলেন তিনি একটা সম্মেলনে। ভারতবর্ষের বাণিজ্য দরিয়ায় তখন তিন জাতের যুরোপীয় ব্যবসায়ীরা। ইংরেজ, ডাচ আর পর্তুগীজরা। এদের নিজেদের মধ্যে একটা যদি মীমাংসায় আসা যায় তাহলে মোটামুটি শান্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়। এই নিয়েই আলোচনা। পর্তুগীজরা কোনসময়েই ইংরেজদের ভালো চোখে দেখেনি। তারা বারবার ডাচ বা ইংরেজদের ভারতবর্ষের দরিয়া থেকে উৎখাত করতে চেয়েছে। পারিনি যে, সে খবর আমরা আগেই পেয়েছি। মেথওল্ডের সময়েও একবার তারা করেছিল। তারা সেই সুরু থেকেই বুঝেছিল সেইমত নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে মরীয়া হয়ে চেষ্টা হল তলোয়ারের জোরেই করতে হবে। ভালো কথার মানুষ নয় কেউ।

তারা যোলশ' তিরিশ সাল নাগাদ একটা কাণ্ড করে বসল। দুম্ একটা মুঘল জাহাজ আটকে ফেলে সুরাটের সুবেদারকে বললে—ইংরেজ আর ডাচেদের ব্যবসার বনেদ তুলে দিতে। কিন্তু তারা বোঝেনি ইংরেজরা রয়েছে। ইংরেজরা মুঘলদের সহায়তায় এগিয়ে এল। শাজাহান খবর পেয়েই বিজাপুরকে বললে গোয়া অবরোধ করতে। আর যায় কোথা, নতজানু পর্তুগীজ মানে মানে জাহাজ ফিরিয়ে দিলে।

মেথওল্ড ঠাণ্ডামাথার লোক। পর্তুগীজ বড়কর্তাকে বোঝালে, এ-সব করে কি হবে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা হোক। নিজেদের মধ্যে একটা মীমাংসা করে আসুন আমরা শান্তিতে ব্যবসা করি। এই ভেবেই গোয়ার 'কনভেনসন'। এতে দিশী ব্যবসায়ীদেরও শান্তি হবে। সুরাট ব্যবসায়ী সঙ্ঘের সভাপতি মীর্জা মাহমুদের সঙ্গে মেথওল্ডের খুবই দোস্তী। সাধারণ ব্যাবসায়ীদের সঙ্গেও তার সদ্ভাবের অন্ত নেই! সবদিক বাঁচিয়ে গোয়া কনভেনসনে সকলের মোটামুটি ভালো এমন সব ব্যবস্থাপত্র একটা রচনা করে আসলেন। মেথওল্ডের এই প্রয়াস সত্যিই খুব বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সকল ঐতিহাসিকই এর সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন।

আরব সাগরে 'য়ুনিয়ন জ্যাক' পতাকা উড়িয়ে মেথওল্ড যখন গোয়া থেকে সুরাট ফিরছিলেন তখন মনে মনে বোধহয় ভাবছিলেন, এক সানন্দ অভ্যর্থনা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। এই ভালো খবরটা কি আর চাপা আছে। সবাই জেনে গেছে এতক্ষণে। আরও জেনে গেছে মেথওল্ডের এই কৃতিত্বের কথা। কাজেই তাঁকে স্বাগত জানাতে জাহাজঘাটা ভর্তি লোকজন অপেক্ষা করছে!

কিন্তু কোথায় সাদর অভ্যর্থনা? সুরাটে নামতেই মেথওল্ড বুঝতে পারলেন, কোথাও বেশ কিছু গোলমাল হয়েছে। সবাযের মুখ ভারী। কোথায় দুটো ভালো কথা বলবে না আর্মানী বা মুঘল ব্যবসাদাররা, তা নয় মুখগুলো তোল হাড়ি ক'রে কখনও বা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল! কি হ'লরে বাবা?

হ'ল যে, মেথওল্ড পরদিনই জানতে পারলেন। সুরাটের নতুন নবাব এককালের সম্রাট শাহাজানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হাকিম মসিউজ্জমান। তাঁর দরবার থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে দূত এসে এত্তেলা দিলে, নবাব ডেকে পাঠিয়েছেন। বলে রাখা দরকার --মসিউজ্জমান ব্যক্তিগতভাবেও ইংরেজদের ওপর চটা ছিলেন। ছিলেন এই কারণে যে, একদা তিনি যখন হজ সেরে মক্কাশরিফ থেকে ফিরছিলেন, তাঁর জাহাজ পড়েছিল ইংরেজ জলদস্যুদের হাতে। এ-সময়ে সাধারণতঃ, সমস্ত জাহাজ লুণ্ঠন করে, মেয়েগুলোকে নিজেদের জাহাজে তুলে তারপর সেটাকে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ত। মসিউজ্জমানের কপাল ভালো। লুঠ করেই ক্ষান্ত হয়েছিল ইংরেজ জলদস্যুরা। কাজেই মসিউজ্জমান তীর্থ করে ফিরলেন। তবে দুঃস্বপ্নের মত সেই স্মৃতি নিয়ে। সুরাটের গভর্ণর হয়েও সেই দুঃস্বপ্নের কথা তিনি ভোলেননি। সেত এমন কিছু বেশী দিনের কথা নয়। বছর বার আগে।

যাইহোক, সেদিন মুঘল দরবারে গম্ভীর মুখে সুরাটের মার্চেণ্টস চেম্বার্সের চেয়ারম্যান মীর্জা মাহমুদ একটি পত্র পড়ে শোনালেন। আরব উপকূল থেকে লিখেছেন সর্দার নুরুদ্দীন। 'তৌফিকি' জাহাজের মালিক। লোহিত সাগরের

বুকে এক ইংরেজ জাহাজ তাঁর জাহাজ লুঠ করেছে। লুঠ করেছে আরও একটা জাহাজ। 'মাহমুদি'। এটার মালিক নাখোদা আহমদ—সাকিম আহমদাবাদ।

মেথওল্ড বোঝাতে লাগলেন, তা' কি করে হয় হুজুর। আমরা ব্যবসায়ী। জলদস্যু নই।

মসিউজ্জমান তো ধমক দিয়ে খেঁকিয়ে উঠে থাকবেন—কি করে হয়? জলদস্যু নই। তোমাদের আর জানতে বাকি নেই বাছা। তোমাদের সঙ্গে তো কথাই আছে নীলদরিয়ায তোমাদের জাতির জলদস্যুতার ক্ষতিপূরণ তোমাদেরই দিতে হবে। কোন কথা শুনব না।

মেথওল্ড আর কী বলবেন। শুধু বললেন, আগে ওরা পৌছান নবাব নাজিম। তারপর যা হয় হবে। মসিউজ্জমান তো মুঘল নবাব। সুযোগ পেলে ছাড়বার বান্দা নয়। বললে, মেথওল্ডকে নজর বন্দী করে রাখতে। পিয়ারসন বলে অন্য কুঠিয়ালের হল কয়েদ! তখন 'ডিসকভরি' বলে একটা জন কোম্পানীর জাহাজে মালভর্তি হচ্ছিল। তার মালপত্র, কোম্পানীর গুদামের মজুত মালপত্র আর রান্দেরের জাহাজঘাটায় কিছু সোরা, কিছু কাপড় জমা ছিল। মুঘল নবাবের কাছ থেকে হুকুম চলে গেল—সব আটক, সব আটক। দেশ জুড়ে জন কোম্পানীর সব মাল আটক। তৌফিকির ক্ষতিপূরণ।

'হুমব্রহো' 'হুমব্রহো' শব্দ করে দিশী তেলিঙ্গী বেহারায় বহা পাল্কীটা ইংরেজ কুঠি ছেড়ে চলল দরবারের উদ্দেশে। নজরবন্দী মেথওল্ডের আবার ডাক পড়েছে মুঘল দরবারে। সবিনয়ে প্রার্থনা করলে মেথওল্ড একটা রফা করলে হয় না। আমাদের জাহাজটা ছেড়েদিন। মাল আটকের আদেশ তুলে নিন। লক্ষ টাকা দেব। মসিউজ্জমানের চোখের তারায় লোভের আগুন নেচে উঠল। দাড়ি চুমড়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, নেহি, নেহি। তিন লাখ। মেথওল্ডের মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা। বলেন কি হুজুর? অত টাকা পাব কোত্থেকে? সত্যিই তড়িঘড়ি অত টাকা হুণ্ডী কেটে জোগাড় করার মত অবস্থা তখন ইংরেজ কুঠির বোধহয় ছিল না। তাছাড়া, আরও একটা ভাবনা খুব সম্ভব ইংরেজ গভর্নরের মাথায় এসে থাকবে। এটা হচ্ছে মুঘল তোষাখানা। এখানে টাকার ঢোকার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু টাকা ফেরৎ পাওয়া মানে বিশ বাঁও জল! মেথওল্ড আবার বললেন, 'ইমপসিবল।'

মুঘল শাসনকর্তা দাঁতে দাঁত চিপে ভেবে থাকবেন। সম্ভব কিনা দেখছি! সাদা চামড়ার কাফেরদের শিক্ষা দেওয়া দরকার। সোজা আঙুলে আর কবে ঘি বেরিয়েছে। তারপর কোতোয়ালকে বলে থাকবেন গারদে নিয়ে যেতে—মেথওল্ডকে। পিয়ারসনকে। টাকা বেরোয় কিনা দেখছি!

ইংরেজ কুঠির কাজকর্ম অচল।

সুরাটে তখন বসন্ত কাল শেষ। রুক্ষ সূর্যের ক্রুদ্ধ আলোকে সুরাটের বালুবেলা তপ্ত কটাহের মত। তারই ওপর পা ফেলে ফেলে ততোধিক উষ্ণ মেজাজ নিয়ে সর্দার নুরুদ্দীন তাঁর 'তৌফিকি' জাহাজ ছেড়ে নিজ ঘরের উদ্দেশ্যে না গিয়ে চললেন সোজা মীর্জা মাহমুদের কুঠিতে। চিঠিতে যে-সব কথা বলা ছিল, আবার তারই পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। তারা দুজনে একটা পাল্কীতে চেপে চললেন মুঘল সেরেস্তায়। সেখানে তাঁদের কি কথা হ'ল কে জানে, পরদিন সকালে দেখা গেল আপামর জনতার বিস্মিতদৃষ্টির সামনে গভর্নর মেথওল্ড আর ফ্যাক্টর পিয়ারসনকে শেকলে বেঁধে নবাবের দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ইংরেজদের যে ভকিল ছিল, সে বেচারী অনেক চেষ্টা করলে। প্রথমে চেষ্টা করলে সমস্ত দোষটা ফরাসী বোম্বেটেদের ওপর চাপাবার। কিন্তু হ'ল না। যারা 'তৌফিকি' লুট করেছিল,তারা একটা 'পাশ' দিয়েছিল। যাতে আর না জাহাজ লুঠ হয়। সেটা ইংরিজিতে লেখা। জাহাজের নামও ছিল 'রোব্যাক'। কাজেই মেথওল্ডকে মাথা নীচু করে ক্ষতিপূরণ দেবার কথা মেনে নিতে হ'ল। দাবী দাঁড়াল এক লাখ সাত হাজার সিক্কা টাকা। মেথওল্ড আর কথা বাড়ালেন না। টাকাটা দিয়ে দিলেন। কোম্পানীর ক্যাশে আর গুদামের মালপত্র বিক্রি করে উঠল পঁচাত্তর হাজার টাকা। 'ডিসকভরি'-তে যেসব বিলিতি মাল এসেছে, সে-সব বিক্রিবাট্টা করে, ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দিলেন মেথওল্ড সাহেব। রান্দেরের যে-সব মাল কেনা ছিল তার ওপর আর হাত পড়ল না। আর মুখ্যতঃ সেইসব মালপত্র দিযে। 'ডিসকভরি' জাহাজ ভর্তি করে তাকে বিলেত পাঠিযে দেওয়া হ'ল। ইংরেজ কুঠির কাজকর্ম আবার পুরোদমে চলতে লাগল।

কিন্তু ঝামেলার কি শেষ আছে নাকি! আর একটা জাহাজ লুঠ হয়েছিল না আরব সাগরে? আহমেদাবাদের 'মাহমদি জাহাজ'? তার ক্ষতিপূরণের কি হবে? মসিউজ্জমানের অনেকদিনের রাগ। বললে, ঠিক আছে। কয়েদেই থাকুন। তবে কড়া প্রহরায় প্রত্যহ একবার করে, ইংরেজ কুঠিতে যেতে পারবেন। মেথওল্ড লোক পাঠালেন খাস সম্রাটের দরবারে। সেখানেও পাত্তা পেলে না জন কোম্পানী।

এইবার মেথওল্ডের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি স্বমূর্তি ধরলেন। বললেন, তাঁর সঙ্গে মুঘল সম্রাট যদি এরকম ব্যবহার ক'রে, মাঝদরিয়ায় দিশী জাহাজকে কোম্পানীর তরফ থেকে আর কোন রকম নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। একেবারে জোঁকের মুখে নুন! এই নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির দৌলতেই না আজ 'তৌফিকির' ক্ষতিপূরণ পেলে সর্দার নূরউদ্দীন। মুঘলদের জলে ভয়। বছর বছর তাদের হজ্জে

জাহাজ পাঠাতেই হবে। মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবসার জন্যে জাহাজ না পাঠালে ব্যবসায়ীরা ক'রে খাবে কি? কাজেই মেথওল্ডের এই হুমকিতে কাজ হ'ল। এবং একটা সমঝোতাও হয়ে গেল। তাছাড়া ইতোমধ্যে আরও একটা ফ্যাকড়া তুলেছিল মেথওল্ড। 'মাহমুদির' যে পাশটা ছিল পর্তুগীজদের। দিউ থেকে দেওয়া। কাজেই তাদের কাছেই ক্ষতিপূরণ দাবী কর বাপু, বললেন মেথওল্ড।

এই প্রসঙ্গে আর একটা গল্পের কথা এসে পড়ে। সেটা অবশ্য অনেক পরের কথা। অষ্টাদশ শতকের সূর্যোদয়ের কাল। সতেরশ' এক। আবদুল গফুর সুরাটের এক খানদানী জাহাজী ব্যবসাদার। খান বিশেক জাহাজ তাঁর। মাঝদরিয়ায় বারবার বোম্বেটেদের হাতে পড়ে একদা তিনি সুরাটের শাসনকর্তা দিয়ানত খাঁকে গিয়ে ধরলেন, হুজুর এর বিহিত করুন। দিয়ানত খুবই মেজাজী মানুষ। ইংরেজদের একলক্ষ চুরাশি হাজার টাকা আর ডাচেদের চার লক্ষ ছাপান্ন হাজার টাকার বাজেয়াপ্ত করলেন তিনি খেসারৎ হিসেবে। অনেকটা মেথওল্ডের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু সুরাট তো খাস দিল্লীব অধীনে। সেখানে সম্রাট ঔরঙ্গজেব। তিনি ভয়ে পেছিয়ে গেলেন। জলে তখন ইংরেজদের অপ্রতিহত প্রতাপ। কাল পাল্টেছে। কাজেই দিয়ানত খাঁর দেওয়া হুকুমৎ রদ করে দিল দিল্লী, সে কথা থাক। মেথওল্ডের গল্পটা শেষ হ'ল। তার রহস্যটা কিন্তু রয়েই গেল। কার এই 'রোব্যাক' জাহাজ? কেই বা এই ইংরেজ বোম্বেটে যার জন্যে মেথওল্ডের এই নিগ্রহ?

একসময়ে সেই রহস্যও ফাঁস হয়ে গেল। এবং সেগল্পও কম বিচিত্র নয়। ঝামেলা খানিকটা মিটতে ষোলশ' ছত্রিশের ডিসেম্বরে মেথওল্ড এই ব্যাপারে একটা চিঠি লিখলে জন কোম্পানীর নতুন সদরদপ্তর বিশপস্ গেট স্ট্রীটের 'ক্রসবি হাউসে'। বললেন, ব্যাপারটার খোঁজখবর করতে। বিহিত করতে। এবং কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ। দেখা গেল, এ-ব্যাপারে আর কেউ নয়, স্বয়ং রাজা প্রথম চার্লস জড়িত। রাজার তখন টাকার দরকার। সার্ উইলিয়াম কোর্টেনের ধনকুবের বন্ধু স্যামুএল বনেল আর তার বন্ধু টমাস কিনস্টন—এই দু'জনে মিলে একটা কোম্পানী গঠন নয় করলে দক্ষিণ আমেরিকা বাণিজ্যে যাবার জন্যে। উইলিয়ম কবলের অধীনে জাহাজ 'সামারিটান' আর উইলিঅম আয়ারের জাহাজ 'রোব্যাক'। আসলে তারা যাবে ভারতবর্ষ। জাভা। সুমাত্রা। সবই জানতেন প্রথম চার্লস। জানতেন ভারতবর্ষে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার জন কোম্পানীর। তাঁরই ঠাকুমার দেওয়া। তাঁর বাবা সেটা আরও দীর্ঘ মেয়াদী করে দেন। তবু নতুন কোম্পানীর নামেই 'রয়াল চার্টার' বার করে দিলেন।

কবল আর আয়ার নীলদরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। আর তার ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়ল তুফান। উত্তাল সমুদ্রের উন্মত্ত জলরাশির মাঝে একসময় 'সামারিটান' ডুবে গেল। বরাত জোরে কব গেল বেঁচে। হৃতসর্বস্ব 'রোব্যাকও' বাঁচল। বাঁচল আয়ারও কিন্তু বেঁচে কি হবে? বাণিজ্যতরী বোঝাই করে যে ঘরে ফিরবে তারা, কোথায় সেই স্বর্ণসাম্রাজ্য?

আর খুঁজে খুঁজে কি হবে? সামনেই একটা দেশী জাহাজ না? 'তৌফিকি'? আয়ার বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে কামান দেগে দিলেন। খুলে ফেললেন বণিকের আঙরাখাটা। সর্দার নুরুদ্দীন তো কম যাবার বান্দা নন। তিনি পাল্টা জবাব দিলেন। কিন্তু কতক্ষণ? ইংরেজ বোম্বেটের কাছে অচিরেই 'তৌফিকি' হেরে গেল। তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করল 'রোব্যাক' জাহাজের কাপ্তেন আয়ার, সে খবর আমরা আগেই শুনেছি। কয়েকদিন পরেই আবার তাদেরই খপ্পরে পড়ল 'মাহমুদি'। এ-গল্পও তো আগেই বলা হয়েছে।

রয়াল চার্টারে ছিল এঁরা, আমেরিকার উদ্দেশে যাচ্ছে। কাজেই কোম্পানী কিছু বলতে পারেনি। এখন মেথওল্ডের চিঠিতে সব জানতে পেরে তারা চেপে ধরল। সোজা প্রিভি কাউন্সিলে মামলা শুরু করে দিলে। আর মুঘল সম্রাটকে চিঠি লিখে জানালে সব বৃত্তান্ত। জানালে জন কোম্পানীর নির্দোষিতার কথা।

বনেল কিনিস্টনের কোম্পানী পড়ে গেল ফ্যাসাদে! বনেল পালাল ফ্রান্সে। সেখানেই তার মৃত্যু হ'ল। কিনিস্টনকে হাতের কাছে পেয়েই তাকেই জেলে পাঠালে কোর্ট। কিন্তু টাকা? লক্ষাধিক টাকা যে গচ্ছা গেল কোম্পানীর—তার কি হ'ল! খোদ রাজা প্রথম চার্লস এ-ব্যাপারে জড়িত রয়েছেন না? কাজেই কিল খেয়ে কিল হজম করা ছাড়া আর কি করতে পারত জন কোম্পানী?

এই ঘটনার ওপর যবনিকা এখানে পড়লেও, এই ধরনের ঘটনার কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আমরা যতই এগোতে থাকব—সুরাট থেকে বালেশ্বর, গঞ্জাম, হরিহরপুর বোম্বাই, মাদ্রাজ, হুগলি—এ ধরনের ঘটনা বারবার ব্যতিব্যস্ত করেছে কোম্পানীকে। মাঝদরিয়ায় সে এক নৈরাজ্যের কাল। সেখানে আইন শুধু তলোয়ারের দাসত্ব করে। এবং কোম্পানীর কাপ্তেনরাও কিছু ধোয়া-তুলসী নয়। নীলসমুদ্রে মালভর্তি জাহাজ নিয়ে বাড়ি ফিরছে কোম্পানীর কাপ্তেনরা। পথে পেয়ে গেল অন্য কয়েকটা মালভর্তি জাহাজ। সেগুলো লুণ্ঠন করে, মালপত্র নিজেদের জাহাজে বোঝাই করে—লোকজন সমেত লুণ্ঠিত জাহাজটা মাঝসমুদ্রে সোজা ডুবিয়ে দাওনা বাপু। কে আর তার খোঁজ করবে? দেশের বন্দরে ফিরে কোম্পানীর 'বিল অব লেডিং' অনুযায়ী মালপত্র বুঝিয়ে দিলেই তো হিসেব শেষ। বাকীটা তো একদম ফাউ। এ-কাহিনী বহুবার ঘটেছে। ধর্মের কল কখনও সখনও হয়ত বা বাতাসে নড়ে। কিন্তু সে

ব্যতিক্রমমাত্র। যেমন, 'রোয়্যাকে'র ঘটনা। নয়ত নীলদরিয়ায় জলদস্যুর অবাধ রাজত্ব। আর তার ঝড়ঝাপটা অবশ্যই সুরাটের বুকে এসে লাগে। আকছারই লাগে।

কিন্তু আমাদের তো হরিহরপুর যাবার কথা না? পথে করমণ্ডল উপকূলে মসুলিপত্তন ঘুরে যাই আসুন। গোলকুণ্ডারাজ্যের প্রধান বন্দর মসুলিপত্তনে ইংরেজ-দের খুবই পুরনো কুঠি। ষোলশ' এগারয় স্থাপিত। এখানে সংগৃহীত স্থানীয় চিকন সুতোর কাপড় পারস্য ও বাস্টামে বিক্রি করে ইংরেজরা। সার্ টমাস রো যখন আগ্রায় —এই যে মেথওল্ডের গল্প বললাম—তিনি তখন মসুলিপত্তনে। রো যখন কোম্পানীকে লিখলেন যে, বাঙলার ফরমান পাওয়া শক্ত। এই উইলিয়াম মেথওল্ড তখন মসুলিপত্তন থেকে লিখেছিলেন, চেষ্টা করে যান। আশা ছাড়বেন না। ব্যবসা বাড়াতে হ'লে বাঙলা চাই।

সেই মসুলিপত্তনে এক নতুন দৃশ্যের যবনিকা উঠল।

লোকটা সেদিন ফিরে এল। সারা গায়ে একরাশ ধুলো। মুখখানা তেতে পুড়ে আমসি হয়ে গেছে। গায়ের কালো রঙ পুড়ে পুড়ে তামাটে। বেশ বোঝা যায় সারাদিনের সৌরস্নেহ তার দ্রাবিড় দেহে অকাতরে বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু তাতেও তাকে বিচলিত করতে পারেনি। লোকটা ব্যর্থমনোরথ বলেই এতটা বিষণ্ণ। স্থানের নাম মসুলিপত্তন। দূরে ভারতে মহাসাগরের নীল উর্মিমালায় উষ্ণ বাতাসের দাপাদাপি। ইংজের কুঠির ঘেরাটোপের মধ্যে বসে লোকটা হাত মুখ নেড়ে বললে, না, হ'ল না। আরও কয়েকজন লোক ফিরল একে একে। এরা সবাই ইংরেজদের দিশি টাউট। মাল সংগ্রহ করে। সেদিন সকলের মুখে একই দুঃসংবাদ। মসুলিপত্তনে কাপড় নেই। টাফেটন, পারকেল, মখমল—কিছুই না। মার্চ মাস। ষোলশ' তে ত্রিশ। কোম্পানীর ওএর হাউসকীপার জানালো খোদ এজেন্টকে। জন মরিসকে। বেসাতির জন্য কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না। মরিস শুনলেন। এবং শুনে বসে রইলেন না। সেদিনের আরক্ত সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বেলে করমণ্ডল উপকূলের ইংরেজ কুঠিতে একটা জোর সভা বসে গেল। অতঃকিম্? কর্তব্য কি? কাপড় নেই মানেই তো ব্যবসা বন্ধ। কুঠি কি উঠে যাবে নাকি?

কুঠি তুলে দেবার জন্যে তো আর জন কোম্পানী সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে ভারতবর্ষে পাড়ি জমায়নি। ইংরেজরা উদ্যোগী পুরুষ সিংহ। ব্রিটিশ লায়ন-এর তাই লক্ষ্মী করতলগত। সেদিনের মোমবাতির আবছা আলোকে উত্তেজিত এক ইংরেজ বণিক বললে 'লেট আস সেল ফর বেঙ্গালা!' বাঙলা চল। সুতানুটিতে কাপড়ের অভাব নেই।

মসুলিপত্তনের এজেন্ট সাহেব সব শুনলে। শুনলে কুঠির অন্যান্য মাতব্বররা। মোমবাতির আলোকে টেবিলের চারিদিকে বসা ছায়াগুলো নড়তে লাগল। দুলতে লাগল। এ-ছাড়া উপায়ইবা কি? কাপড় ছাড়াতো ইষ্টার্ণ ট্রেডইতো বন্ধ। রুজি রোজগার বন্ধ। খট খট লবডঙ্কা। কাজেই—

কাজেই ইংরেজ চিন্তার চেয়ে কাজ বেশী করে। কমিটি বললে, 'ইট ইজ এগ্রিড।' সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হ'ল আটজন ইংরেজ যাবে বেঙ্গালা। বাঙলাদেশ। সুবে বাঙলা। যার মানে তখন বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা। বাঙলাদেশের দিকে ইংরেজদের লুব্ধ দৃষ্টি অনেককালের। সেই সার্ টমাস রো নামে যে ভদ্রলোক বত্রিশটা তোপ দেগে

নেমেছিলেন সুরাটের বালুবেলায়—তিনিও খাস দিল্লীর দরবারে বসে চেষ্টা করেছিলেন সম্রাটপুত্র খুরমকে পাকড়াও ক'রে এই সোনার দেশ বাঙলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুবিধা আদায় করতে! তিনি বলা বাহুল্য পারেননি। কিন্তু মরিশ 'প্রোটোকল' বোঝে না। কাজ :বোঝে। আর বোঝে কাজ কি করে আদায় করতে হয়। বাইশে মার্চের সভায় আটজনের নাম ঠিক হয়ে গেল দু'জন মার্চেণ্ট আসল ব্যবসায়ী। অন্য দু'জন তাদের পেটেলদার। নায়কের নাম রালফ কার্টরাইট. পদাধিকারে তাঁর পরের ব্যক্তিটি হলেন টমাস কলি। অন্যান্য ছয় জনের নাম উইলিয়ম ব্রুটন, জন ডবসন, এডওয়ার্ড পেটেকোড, জন বসভি, জন ওয়াড এবং উইলিয়ম উইহন। এঁদের মধ্যে ব্রুটনই ইতিহাসের বড় খাতিরের লোক। কেন না, ইনি তাঁদের বঙ্গযাত্রার একটা ফিরিস্তি ইতরজনের জন্য রেখে গেছেন। এবং ভদ্রলোক একদা কলকাতা ঘুরে গেছেন। শুধু তাই কি? এক পড়ন্ত আষাঢ়ের বিকেলে কলকাতায় রথের মেলা দেখে গেছেন!

সেকথা থাক। যতই তাড়াহুড়ো করুক না কেন, সব যোগাড়যন্তর করতে ইংরেজদের পক্ষকাল কেটে গেল। ছয়ই এপ্রিল। বাঙলাদেশের উদ্দেশে তরী ভাসালো ইংরেজ বণিক জন কার্টরাইট। তরী মানে নৌকাই। জাহাজ নয়। যেমন তেমন করে বানাল একটা মাল বোঝাই নৌকা। কেবিন দেখলে হাসি আসে! মাথায় খড়ের ছাউনী। বেশী ঝড় উঠলে বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যাবে। যাবে? যাক না!

ইংরেজরা 'থোড়াই কেয়ার' করে। দেশী নবাবের জন্যে তাদের কাছে প্রচুর উপঢৌকন। কাজ তারা আদায় করবেই।

অবশ্য মনে মনে ইংরেজেরা বোধ করি ভেবেছিল—সুন্দর বহিবে পবন ভেসে যাব রঙ্গে। কিন্তু হ'ল কই? বেঙ্গালার স্বর্গ পৌঁছবার আগেই সুরাট মসুলিপত্তম।

ষোলশ' তেত্রিশ। একুশে এপ্রিল। ভগবান যীশুর কৃপাধন্য খ্রীষ্টানদের সেদিন উৎসব-ইষ্টার ডে। আর খ্রীষ্টের সেই উৎসবের দিনে খ্রীষ্টানদের রক্তে আলপনা আঁকল খ্রীষ্টানরা। গৈরিক কিছুবা স্বর্ণাভঃ সূর্যস্নাত আসমুদ্র বিস্তৃত ধূ-ধূ বালুবেলায় রক্তে দাগ পড়ল। আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ চাপা আক্রোশের আস্ফালন ও আহত মানুষের আর্ত চিৎকারে বেলাভূমি প্রতিধ্বনিত হ'ল! ওপরে বিরাট পাখা মেলে সমুদ্র পাখীর দল বুঝিবা ভয় পেয়ে চক্রাকারে আকাশে ঘুরতে লাগল। স্থানের নাম হরিশপুর।

কিন্তু ঘটনার একটু বিশদ বিবরণ প্রয়োজন। দরকার ব্যাপারটা। একটু আগে থেকে খুলে বলার। পাটুলি নদীর মোহনায় ইংরেজদের নৌকাটা যেমন পৌঁছাল,

রালফ্‌ কার্টউইট বললেন, তাঁরা সুবে বাঙলার উড়িষ্যায় পৌঁছে গেছেন। কাজেই ডিঙি ভাসিয়ে শহর হরিশপুরে তাঁরা পায়ের ধূলো দেবেন। এবং ইংরেজরা সেকালে ঢাক কিভাবে পেটাতে হয় তা' ভালোই জানতেন। হরিশপুরের নবাবের কাছে এত্তেলা পাঠাতে বললেন, যে ইংরেজ বণিকরা উড়িষ্যায় এসেছেন এবং নবাবের সখ্যতা কামনা করেছেন।

বললেন বটে, কিন্তু কিছুই করার বিশেষ সময় পেলেন না। দেখলেন মূর্তিমান কৃতান্ত সমঈগল চোখে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার মত উড়ে আসছে একটা পর্তুগীজ জাহাজ। উদ্দেশ্য যে মধুর প্রেমালাপ নয় সেকথা বুঝতে কোন কষ্টই হ'ল না। সব কিছু কাজকর্ম ফেলে আটজন ইংরেজ বণিক তাদের মাঝিমাল্লা নিয়ে পর্তুগীজদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার জন্যে কোমর বেঁধে তৈরী হতে লাগল। পর্তুগীজরা ভেবেছিল, ভালোই শিকার পেয়েছে। লুঠ আজ নিন্দের হবে না। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল ইংরেজরাই 'রণং দেহি' রূপ দিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। পর্তুগীজরা পিছিয়ে গেল।

কার্টউইট তখন পর্তুগীজ জাহাজের কাপ্তেনকে ডেকে পাঠালেন। এবং গোটা ব্যাপারটা যেন কিছুই হয়নি এমনই একটা ভাব দেখিয়ে পর্তুগীজ কাপ্তেন সোজা এসে উঠল ইংরেজ জাহাজে। এ-কথা সে-কথা নানা কথা। কিন্তু আসল কথাটা কিছুই ফাঁস করলে না। পর্তুগীজ কাপ্তেন কার্টউইটকে বার বার বোঝাতে চাইলে, যে সে একজন বন্ধুভাবাপন্ন ব্যবসায়ী মাত্র। তার থেকে কোন বিপদেরই আশঙ্কা নেই। শক্তের ভক্ত কেলর? ব্যাপারটা এখানেই মিটে গেল। এবং দৃশ্যপটও পাল্টে গেল।

আশঙ্কা আছে কি নেই, সেটা ইংরেজরা হাড়ে হাড়ে বুঝলে তেরাত্তির না পেরোতে পেরোতে। চব্বিশে এপ্রিল। হরিশপুর নবাবের সঙ্গে দেখা করে কার্টউইট-আর কোলি সাহেব সবে কুঠিতে ফেরৎ এসেছেন। এমন সময় হৈ-হৈ করে কয়েক দল লোক একেবারে ইংরেজকুঠির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে। আক্রমণকারীদের মধ্য অনেকেই দেহাতী লোক। তবে তাদের নেতৃত্বে সেই পর্তুগীজ জাহাজের ধোয়া-তুলসী কাপ্তেন!

কিন্তু এবারও ভাগ্য ইংরেজদের বাঁচিয়ে দিলে। যদি না বাঁচাত, বলা যায় না, ইংরেজদের বাঙলাদেশে বাণিজ্যের বাসনা চিরকাল মনে মনেই রয়ে যেত! স্থানীয় এক স্বাধীন রাজা লক্ষ্মী সিং তাঁর শ'দুই লোকজন নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই পথ ধরে। ইংরেজদের কোণঠাসা অবস্থা দেখে তিনি পর্তুগীজদের তাড়া করে গেলেন। এবং সে যাত্রা ইংরেজরা নেহাৎ ভাগ্যক্রমেই বলতে গেলে বেঁচে গেল।

তবে বেঁচে গেল মানে এ নয়, ইংরেজরা একেবারে অক্ষত রইল। কলি সাহেবের

হাতে জোর আঘাত লাগে, অপর একজনের মাথা এবং পায়ে লাগে মারাত্মকভাবে। আর পর্তুগীজদের সঙ্গে যেসব দিশি লোকজন ছিল তাদের সর্দার খেল বেশ কয়েকটা ছোরার আঘাত। এবং এদের পিছনে ফেলেই একদিন জন কার্টউইট তাঁর আরও দু'জন সঙ্গী লেখক উইলিয়ম ব্রুটন আর জন ডবসনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কটকের পথে, উড়িষ্যার বিখ্যাত রাজা মুকুন্দদেও বা 'মালিঘান্দির দরবারের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট নৌকায় নিয়ে চলল সোনা, রূপা, কাপড় আর মশলা। পাটুয়া বা পাটলী নদীর উজান বয়ে বেশ খানিকটা পথ পার হয়ে মালগুলো গরুর গাড়ীতে বোঝাই করে তারা একসময় পৌঁছলে বালিকুদা। সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে ততক্ষণে।

অন্ধকারের এক গাঢ় কৃষ্ণ আস্তরণ পরে শহরটা হরুন-অল-রশিদের মত এই বুঝি তার নৈশ পরিক্রমায় বের হবে। গরুর গাড়ীর একটানা ক্যাঁচ-কাঁচ শব্দ, একসময়ে সরাইখানার দোরগোড়ায় এসে থামল। মশালধারী প্রহরীরা এগিয়ে গিয়ে সরাইখানার কোতোয়ালের সঙ্গে কথা বলল। আর তারপরেই তারা সদলবলে সেই পান্থশালার সিংদরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল!

তখনও সরাইখানার সবাই ওঠেনি। আটাশে এপ্রিলের সকাল। দেখা গেল ঐ কাক ডাকা-সকালেই 'হুমব্রহো', 'হুমব্রহো' করে একটা আটবেহারার নকসাকাটা ঝালর দেওয়া পাল্কী এসে থামল। কার্টউইটের কাছে খবর গেল, বালিকুদার নগরপাল স্বয়ং এসেছেন দেখা করতে। শুধু দেখা করতে আসেননি, ইংরেজ বণিকদের যথাসম্ভব সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রতিশ্রুতি দিতে এসেছেন। কার্টউইট জানালেন, যে তাঁরা দেরী করতে রাজী নন। সেইদিনই নয়, এক্ষুণি তাঁরা যাত্রা করবেন। বালিকুদার নগরপাল তাদের ব্যবহারের জন্যে একটি করে ঘোড়া এবং মাল বইবার জন্যে বেশ কয়েকজন উড়িয়া কুলী জোগাড় করে দিলেন। শুধু তাই নয়। রাজঅতিথি হিসাবে রামসিঙা জাতীয় যন্ত্র বাজিয়ে একদল মানুষ তাদের এগিয়ে দিলে। নগরপাল স্বয়ংও রইলেন কিছুটা পথ। একসময় তিনি বিদায় নিলেন। কিন্তু তাঁর চেলাচামুণ্ডারা ইংরেজদের সঙ্গে রইল। যাতে হরিহরপুর পৌঁছে ইংরেজদের হাওলাৎ দেওয়া ঘোড়াগুলো তারা ফেরৎ নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু হরিহরপুরে যে আতিথ্য পেল ইংরেজরা তার তুলনায় এসব কিছুই নয়। সম্রাটের বিশ্বস্ত অনুচর মির্জা মোসিন এসে তাদের অভ্যর্থনা করলেন। অবশ্য পথে গ্রীষ্মের দাবদাহের যে যন্ত্রণা ইংরেজরা পায় তারও নাকি তুলনা নেই। উত্তপ্ত বেলাভূমির তাপে তাদের নাকি গায়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। এবং দুপুরের ঘণ্টাতিনেক তাঁরা বৃক্ষের তলায় বিস্তৃত ছায়ায় বসে বসে তাদের জ্বালা জুড়িয়েছিল।

অবশ্য মির্জা মোসিন ইংরেজদের খোলসা করে সব কথাই বলেছিল। উড়িষ্যার

মুঘল শাসনকর্তা তাকে চিঠি লিখেছেন, তাঁদের খাতির করতে। এবং তাই তাঁদের সরাই-এ পৌঁছে দেবার আগে বিরাট এক খাবার আয়োজন করলেন মির্জা মোসিন। মির্জা সাহেব নিজে রইলেন স্থানীয় এক মসজিদের প্রাঙ্গণে তাঁবু ফেলে। কিন্তু এহ বাহ্য। মির্জা আসল অনুগ্রহ দেখালেন কার্টউইট-এর দলকে পরদিন প্রত্যুষে। অবশ্য সে কারণেই কার্টউইটকে কয়েক দিনের জন্যে হরিহরপুরে থেকেই যেতে হ'ল!

সে এক বিষম কাণ্ড। সেই যে সেই পর্তুগীজ জাহাজের দিশি লোকজনের সদাবটার কথা মনে আছে? ক্রটন লিখছেন, একদিন দেখা গেল সেই লোকটা এসে মির্জা মোসিনের লোকজনের সঙ্গে কথা কইছে। লোকটা ইংরেজদের হাতে দু' জায়গায় ছোরা খেয়েছিল—এর মধ্যেই বেশ সেরেস্থরে উঠে দিব্যি কাজকর্ম সুরু করে দিয়েছিল। ইংরেজরা তো ঝানু মাল। তারা তখন সদার লক্ষ্মী সিং-এর মালশূন্য জাহাজটা আটক করে রাখে। এখন তাকে এখানে ধাওয়া করতে দেখে, ইংরেজদের বুঝতে কষ্ট হ'ল না লোকটা এসেছে সেই জাহাজটা ছাড়িয়ে নেবার বন্দোবস্ত করতে।

তখন সোজা গিয়ে বললে ক্রটনকে। উনি বলল কার্টউইটকে। আর কার্টউইট কালবিলম্ব না করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল মির্জা মোসিনের তাঁবুতে। এবং আনুপূর্বিক সব কিছুই বিবৃত করল—বলল, জাহাজটা যদি ছেড়ে দেন মির্জাসাহেব, তাহলে অন্যায় হবে। ওরা আমাদের উপর ডাকাতি করতে এসেছিল।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর। মির্জা মোসিনের তখন নাস্তার সময়। ইংরেজদের যুক্তি আছে। কিন্তু পর্তুগীজদের পক্ষে কথা বলতে এসেছে সেই সর্দারটাই নয়। সঙ্গে একরাশ টাকা, ঘুষ। কিন্তু মির্জা একজন পোড-খাওয়া মুঘল সিভিলিয়ান! ইংরেজদের জন্যে খাস মুঘল সরকার থেকে যে চিঠি এসেছে তাতে তাদের পাল্লাটাই বেশ একটু ভারী বলে মনে হল। তাছাডা তখন শাজাহানের আমল। তিনি শ্বেতাঙ্গদের শত্রু। কিন্তু পর্তুগীজদের তিনি সবচেয়ে বড দুষমন একেবারে সাক্ষাৎ যম। কাজেই মির্জা সাহেব পর্তুগীজদের মুখপাত্র সর্দারকে বললেন, কিছুবা আফশোষের সঙ্গে, 'না বাপু ওসব এখানে কিছু করার নেই। তোমরা কটকে গিয়ে নবাব সাহেবের সঙ্গে ব্যাপারটা ফয়সালা করে নাও।'

শুধু তাই করেই ক্ষান্ত হলেন না মির্জা মোসিন। ইংরেজ বণিকদলের সঙ্গে সঙ্গে চললেন কটকে, এবং একসময়ে—সেদিন পয়লা মে—ভোর চারটে বাজে। আঁধারের ঘোরাটোপ থেকে সদ্য বেরিয়ে-আসা আকাশে শুকতারা তখনও দিব দিব করে জ্বলছে। দূরে মালকান্দির রাজপ্রাসাদের প্রহরী পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা

বাজল আর বুঝি বৈতালিকদের জাগিয়ে দিয়ে গেল। ইংরেজরা দলবল নিয়ে উঠল মোসিনের মির্জা অতিথিশালায়। সেখানে সবিস্ময়ে কার্টরাইট দেখল—অতিথি সৎকারের জন্য অত প্রত্যুষেও মুঘলাই খানার এলাহী আয়োজন। নানারকম মাংস। ফল। আর মদ? আরে সে ছাড়া কি খানা জমে নাকি?

মালকান্দির সিংহাসনে তখন মুঘল নবাব আগা মুহম্মদ জামান। খানদানী ঘরের ছেলে। তেহরানের লোক। লম্বা, দোহারা চেহারা। টকটকে ফরসা রঙ। দেখলেই তাঁর আভিজাত্যের আভাস পাওয়া যায়। পয়লা মের বেলা তখন পড়ে এসেছে। আকাশটা সারাদিন পুড়ে পুড়ে একটু তামাটে রঙ ধরেছে। রাস্তায় পা পাততে আর তেমন কষ্ট হয় না। ইংরেজ দলবল নিযে মির্জা মোসিন বেরোলেন দরবারের উদ্দেশে।

এপথ সেপথ একটু ঘুরে একসময়ে দরবারে পৌছলেন কাটউইট। আর দেখলেন সেই প্রশস্ত হলঘরে—একরাশ লোকের কি পরম কৌতূহল আর বিস্ময়ের বস্তুই না হয়ে পড়েছেন তাঁরা। এ দেখে সে দেখে। ফিসফাস করে। বিচিত্র চেহারা। বিচিত্র সাজপোষাক। কোন্ দেশের মানুষ এরা? কি উদ্দেশ্য এদের?

মালকান্দির দরবারের সময় বয়ে যায়। অমন গ্রীষ্মের দীর্ঘবেলা, তাও পুইয়ে যায়। অমন উজ্জ্বল দিবালোক তাও মিইয়ে আসে। ইংরেজরা প্রতীক্ষা করে—আগা মুহম্মদ জামান কখন আসবেন? প্রতীক্ষা অনেকেই করে। হঠাৎ কে যেন ফিস ফিস করে বলে ওঠে, 'নবাব আসছেন—নবাব আসছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে পাল্‌টে গেল দরবারের চেহারা। পাতা হ'ল দামী গাল্‌চে। তার চার কোণে চারটে সোনার থাম বসান হ'ল। যাতে গাল্‌চেটা ঠিক বসান থাকে, সরে না যায়। আর সেই বিরাট-বিস্তৃত কারপেটের মাঝখানে পাতা হ'ল একটা লাল মখমলের তাকিয়া। নবাব সাহেব তাতে ঠেসান দিয়ে বসবেন। আয়োজনের কোন খুঁত নেই। দৃশ্য তৈরী। নায়কের আবির্ভাব হলে হয়।

হল। সামনে মুহম্মদ জামানের ভাই। হাতে তাঁর উন্মুক্ত তরবারি। পিছুপিছু নবাবের জন পঞ্চাশেক সভাসদ। চার পাশের আমজনতা উচ্চৈস্বরে নবাবের জয়ধ্বনি করে উঠল। হাঁটু গেড়ে তারা প্রণিপাত করল জামানকে। দুই পাশে দুই বান্দার কাঁধে হাত রেখে, আগা মুহম্মদ জামান মালিকান্দির সভা আলো করে এলেন।

অবশ্য এ-কথা এখন শপথ করে বলা শক্ত—কে এই নবাব? এই কাহিনীর প্রত্যক্ষদর্শী উইলিয়ম ব্রুটন একে মালিকান্দির নবাব বলেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, লোকটা নতুন। শ্বেতাঙ্গ। এবং খুব সম্ভব পারসী। সতেরশো চার সালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্রে অবশ্য এঁকে আগা মুহম্মদ জামান

বলেই সনাক্ত করা হয়েছে। নানা সূত্র বিচার করে উইলসন সাহেব অবশ্য জামানকেই উড়িষ্যার নবাবী গদী দান করেছেন। কিন্তু বাদশানামায বলা হচ্ছে ঐ সময় উড়িষ্যায় নবাব মুতাকিদ খাঁ। তবে খাঁ সাহেব শ্বেতাঙ্গ ছিলেন না। না ছিলেন পারসী।

কিন্তু ব্রুটন সাহেব নবাবের নামটা সঠিক না বলে যান, আর একটি ছোট্ট ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেছেন, যেটা অনেক তাবড তাবড ইংরেজদের বলতে বেধে-ছিল। হকিন্স কি সম্রাট আকবরের পদচুম্বন করেছিলেন? সর্ টমাস রো তো গর্জন করে বলেছেন, তাঁকে সম্রাটের পাযে মাথা ঠেকাবার জন্যে বহুবার বলা হযেছিল, কিন্তু তিনি তা অস্বীকাব করেছিলেন। রো ঠিক বলেছিলেন কিনা, আজ আর তাব যাচাই করার উপায় নেই। কেননা মুঘল দরবারে প্রথম ইংরেজ রাষ্ট্রদূত তাঁর নিজের কথা যতই ধানাই-পানাই করে বলুক না কেন, সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মচবিত বা ডাযারি—তুঝকে ভুলেও একবার এই ফিরিঙ্গীর কথা তোলেননি।

সম্রাটের পদচুম্বন নিযে এরা যতই আপত্তি করুন না কেন, ব্রুটন বলেছেন কার্টরাইটকে যখন পরিচয করিযে দিলে মিজা মোসিন আগা মুহম্মদ জামানের সঙ্গে, নবাব ঘাড নেডে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। এবং আবও এক বিচিত্র কাজ করে ফেললেন। অকস্মাৎ তাঁব কিংখাবী জুতোর খোলস ফেলে পাটা কার্টরাইটের দিকে এগিযে দিলেন। কার্টরাইট চমকে উঠলেন। বলে কি নবাব? তাঁর পদচুম্বন করতে হবে? মির্জা মোসিন থেকে শুরু করে সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠল। আরে, কর কি কর কি? এইতো নবাবী রেওযাজ। বার দুই ঘাড় নেডেছিলেন কার্টরাইট। কিন্তু তৃতীয দফায জন কার্টরাইট উবু হযে বসে নবাব আগা মুহম্মদ জামানের পদচুম্বন করেছিলেন। এই সাক্ষ্য তো একজন ইংরেজেরই।

অবশ্য মুঘল নবাবের পাযের ধুলো মিছিমিছি নেয়নি ইংরেজরা। যে গরু দুধ দেয, তার চাঁট অবশ্যই সহ্য করতে হবে। নবাবের পদচুম্বনের বিনিময়ে ইংরেজরা সেই মালকান্দির দরবার থেকেই লাভ করল বিনা শুল্কে উড়িষ্যার যে কোন বন্দরে বাণিজ্য করা রপ্তানি করা এবং জায়গা কেনা, ফ্যাক্টরি বানান, জাহাজ তৈরি করা ও সারানর অবাধ অধিকার। পেটে খেলে পিঠে সয। বুদ্ধিমান ইংরেজ সুবা বাংলায় যেদিন প্রথম পা ফেলেছিল, সেদিন থেকেই এই শিক্ষা সেকাজে লাগিয়েছিল।

*

কিন্তু কার্টরাইট বেশ করিৎকর্মা লোক। হরিহরপুরে তিনি একটা যেমন তেমন কুঠি খুললেন। জায়গাটা হরিশপুর থেকে কটকের প্রায় মাঝপথে। পরের মাসেই বালেশ্বরে একটা বেশ বড়সড় কুঠি স্থাপন করলেন।

বেশী দিন গেল না, বছর খানেকের মধ্যেই একটা কথা রটি গেল ক্রমে, দিল্লীর সম্রাট শাজাহানের কাছ থেকে ইংরেজরা একটা ফরমান পেয়েছে সারা সুবা বাঙলায় ব্যবসা করার। অবশ্য তার সীমানা বলা আছে সুবর্ণরেখার মুখে বন্দর পিপলির বেশী তারা যেতে পারবে না। ঐতিহাসিকরা অবশ্য এই ফরমানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তবে এই ফরমানটা রটনাই হোক আর ঘটনাই হোক এতে ইংরেজদের খুবই সুবিধা হয়েছিল। তারা পুরী এবং পিপলিতে ছোট ছোট আস্তানা বানিয়ে ফেলল অচিরে।

তবে এদিকে খুবই সুবিধে হলেও কাজের কাজ খুব একটা হ'ল না কেননা তাদের আনা চওড়া কাপড় বা সীসার কোন খরিদ্দার পাওয়া গেল না। বছর খানেক গুদামজাত হয়ে পড়ে থাকার পর সেগুলোকে পাটনা কুঠিতে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। এদিকে উড়িষ্যার অফুরন্ত মিষ্টি সরস ফল-ফুলুরি এবং তার উগ্র আরক কুঠিয়ালদের কাছে দুর্নিবার আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। তা'ছাড়া উড়িষ্যার ভুবনত্রাস ম্যালেরিয়া। পাঁচ ছয়জন কুঠিয়াল দেহ রাখলেন—কে যে মদের ঘোরে, কে যে ম্যালেরিয়ায় তা শপথ করে বলা শক্ত। এদিকে খবর পেয়ে ইংরেজদের চিরশত্রু পর্তুগীজ আর ডাচেরা আবার তাদের পিছনে লেগে পড়ল।

এদিকে কার্টরাইটের আরেক ঝামেলা। সাতসমুদ্দুর পাড়ে সংসার ফেলে এসে তার বিরহীমন নারীসঙ্গে ব্যাকুল। সবাই তো আর কালিদাসের যক্ষ নয় যে মেঘদূত পাঠিয়েই প্রিয়বিরহ ভুলবে। সে বেচারী কুঠির পাশেই এক মুসলমান বেগম সাহেবার কৃপা কটাক্ষের জন্যে পাগল। তবে কেন জানিনা পঞ্চশরের দেবতারা বড় বেরসিক। এইসব ব্যাপারটা রাখাঢাকা থাকে না। পঞ্চপুষ্পের মতই গন্ধ ছড়ায়। নবাবের কানে গিয়ে উঠল ব্যাপারটা। আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে কার্টরাইট কয়েদ। কুঠি ভেঙে দেবার হুকুম।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কুঠি বাঁচল। কার্টরাইটও বাঁচল, কিন্তু বাঁচল না কোম্পানীর ব্যবসা। ষোলশ' ছত্রিশের জানুআরীতে জন ইয়ার্ড এলেন কার্টরাইটের জায়গায়। কিন্তু ব্যবসার কোন সুলক্ষণ দেখা গেল না। শেষবেশ কোম্পানী ঠিকই করে ফেললে গনেশ উল্টে দেবে এখানে। এবং সেইমত ষোলশ' একচল্লিশ নাগাদ 'ডায়মণ্ড'বলেএক জাহাজকে পাঠালেএখানকার দেনাপাওনা মিটিয়ে ফেলে, বালেশ্বরের কুঠিই তুলে দিতে। দিতও, কিন্তু সার্ ফ্রান্সিস ডে মাদ্রাজের প্রতিষ্ঠাতা এলেন বালেশ্বর। তিনি বললেন, মূল কুঠি না হোক মালপত্র চালানের জন্যে, মাল ওঠানামার একটা ঘাঁটি হিসেবে এটাকে বজায় রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এবং খাস বাংলায় যাতে একটা কুঠি বানান যায় তার চেষ্টা যেন করে কোম্পানী।

তাই হল। অন্ততঃ বছর চল্লিশ বালেশ্বর এই ভাবেই বেঁচেছিল। এবং বাংলায় যে কুঠি তৈরী হ'ল, তার উদ্দেশে জাহাজ এই বালেশ্বর থেকেই ছেড়েছিল। ষোলশ' পঞ্চাশ সালে কাপ্তেন ব্রুকহ্যাভেন 'লায়নেস'নামে এক জাহাজ করে আসে বালেশ্বর। তিনি পরের বছর—চারজন কুঠিয়াল—ব্রিজম্যান, সিটকেন্স, টেলর আর চেম্বক, এইখান থেকেই একটা দেশী বড়সড় নৌকা ছেড়ে হুগলীনদীর উজানে চুঁচুড়া আর ব্যাণ্ডেলের মাঝখানে ঘোলঘাট বলে একটা জায়গায় গিয়ে নোঙর ফেলল। সেইটেই হুগলী।

তবে বালেশ্বর এখানেই শেষ হয়নি। আমরা মাদ্রাজ কুঠির কথা বলতে গিয়ে দেখব সেখানে কিভাবে বাণিজ্য সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল ইংরেজ। ধূলো মুঠো ধরতে কুড়িমুঠো উপায় করেছিল সেখানে।

ইংরেজ ব্যবসা তখন শুক্লপক্ষের চাঁদ। ক্রমবর্ধমান কোন জায়গাতেই তারা খুশি নয়। হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোন খানে। কাজেই উড়িষ্যার কুঠির প্রায় এক সময়ে তারা মাদ্রাজ বোম্বাই—এও গিয়েছিল। সেসব কাহিনী এবার বলা হচ্ছে।

দক্ষিণ রেলপথে বাঙ্গালোর সিটি থেকে মহীশূর পর্যন্ত একটি প্রায় একশ' চল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ মিটার গেজ লাইন আছে। তারই ধারে ছোট্ট হল্ট স্টেশন-চন্দ্রগিরি কোপ্পাল। মহীশূর থেকে মাত্র তেইশ কিলোমিটার দূরে। কোন মেল এক্সপ্রেস ট্রেন দাঁড়ায় না। তিনটে আপ তিনটে ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন নিয়ে তার আজকের সংসার। কিন্তু চিরকালই এত সামান্য ছিল না সে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর আগে সেই স্টেশনটারই অদূরেই সেই বিখ্যাত চন্দ্রগিরি পার্বত্যরাজ্যের রাজ-সভায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। এখানেই তখন ক্ষয়িষ্ণু বিজয়নগর রাজ্যের শেষ স্বাধীন নৃপতি শ্রীরঙ্গের রাজপাট। তাঁরই সভায় এক আশ্চর্য প্রস্তাব নিয়ে হাজির হ'ল এদেশের রোদে পোড়খাওয়া তামাটে রঙ এক-দল বিদেশী। জাতিতে ইংরেজ। এখানে বেশ কয়েক বছর ঘুরে দেশী কায়দা অনেকটা রপ্ত করেছে তারা। সভাসীন নরপতিকে তারা একেবারে আভূমি কুর্নিশ করে দাঁড়ালে।

চওড়ায় মাইল খানেক। লম্বায় ছয় মাইল। সমুদ্রের ধারে এমনি একফালি জমি। কয়েকটা বা গ্রাম। সামনে বঙ্গোপসাগরের অশান্ত জলরাশি। নীল জলের বুকে ঢেউয়ের পর ঢেউ। অনন্তশয্যা বাসুদেবকে কোলে করে যেন সহস্র-ফণা বাসুকী দুলছে, আর দুলছে। আর তাতে ছোট ছোট মোচার খোলার মত ডিঙি ভাসিয়ে কালো কালো জীর্ণ-শীর্ণ মানুষগুলো কালে-অকালে মাছ ধরছে। জাল ভরছে। তারা সব শ্রীরঙ্গ রাজার প্রজা। তারা রাজাকে মাছ ভেট দেয়। ঝিনুক কড়ি দিয়ে আসে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। শাঁখ, সামুদ্রিক হরেকরকম দ্রব্য নজরাণা দিয়ে আসে। রাজা থাকেন সেই পর্বতবেষ্টিত, প্রকৃতি সুরক্ষিত চন্দ্রগিরিতে। থাকেন ধ্বংসোন্মুখ স্বাধীন বিজয়নগরের শেষ পতাকা উড়িয়ে। ঢিলে ঢালা জামা, উড়ুনী কাঁধে, পরণে সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়। রাজার ঠাটবাটের অভাব নেই। লোক-লস্কর, কাছারি পেয়াদা, সৈন্য-সামন্ত কম হোক—সবই আছে রাজার।

তাঁরই সামনে,তাঁরই দরবারে নানা বিচিত্র সব উপঢৌকন নিয়ে—ব্রডক্লথ,চমৎকার কাচা, বিলেতী পশমী কাপড়, হয়তবা কয়েকখানা ঝকঝকে ইস্পাতের তলোয়ার নিয়ে ইংরেজ কুঠিয়ালরা সব সেলাম করে দাঁড়াল। মনে তাদের তখন ভারী দুঃখ। তাদের নিজস্ব কোন জমি নেই এই ভারতবর্ষে। এ-রাজ্যে তারা ডাচেদের পিছু পিছু ঘুরেছে। ষোলশ' এগার সালে—অর্থাৎ সুরাটে কুঠি স্থাপনের বছর দুই আগে তারা

মসুলিপত্তনের ডাচ কুঠির কাছে একটা আস্তানা বানায়। এখান থেকে তারা দেশী কাটা কাপড় কেনে, আর তাই নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে পারস্য আর ব্যান্টমে। মসুলিপত্তম তখন স্বাধীন গোলকুণ্ডা রাজ্যের প্রধান বন্দর। কিন্তু সেখানে ডাচেরা বাদ সাধল। তাদের মুখের গ্রাসে তুমি ভাগ বসাবে, তারা ছাড়বে কেন? তাছাড়া বন্দরের আমলারা রয়েছে না? তারা নিত্যি নিত্যি নানা দাবী নিয়ে হাজির। আজ এটা দাও, কাল ওটা দাও। ইংরেজরা তো উদব্যস্ত। এইখানে বছর চোদ্দ কাটানর পর তারা ডাচেদের আর এক বিখ্যাত কুঠি পুলিকটের উত্তরে আরমাগাঁও-এ আর একটা নতুন কুঠি বসাল। কিন্তু এযেন টকের জ্বালায় ঘর ছেড়ে তেঁতুলতলায় বাস। সেই অত্যাচার—সেই পুরনো ঝামেলা তাদের পিছনে তাড়া ক'রে ফিরল। তারা আবার আরমাগাওঁর বাস ছেড়ে মসুলিপত্তমে ফিরে গেল। এবং সেখানে গিয়েই থামল না, গোলকুণ্ডার সুলতানের দরবারে গিয়ে হাজির। সেখানে যাতায়াত করতে করতে ষোলশ' বত্রিশ সাল নাগাদ সুলতানের কাছ থেকে একটা 'সোনার' ফরমান আদায় করে নিলে। তখন দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন বিশাল গোলকুণ্ডা রাজ্য। তার দাপট দেখে কে? কাজেই এই ফরমানে ইংরেজদের মস্ত সুবিধে হ'ল। কেননা, এর সাহায্যে তারা সারা সুবিস্তৃত গোলকুণ্ডা রাজ্যে অবাধে বাণিজ্য করার অধিকার পেল। বছরে তার জন্যে তাদের দিতে হবে মাত্র পাঁচশ' স্বর্ণমুদ্রা প্যাগোড়া। এই ফরমান দু'বছর পরে আবার নতুন করে তারা লাভ করে—ঐ একই শর্তে। কিন্তু সব থেকেও তাদের কিছুই নেই. নেই ডাচেদের মত কোন নিজস্ব জমি। তাই তারা তখনও-স্বাধীন চন্দ্রগিরির রাজার কাছে হাজির হ'ল সমুদ্রের ধারে ঐ একফালি জমি যদি বিজয়নগর বংশাবতংস মহারাজ শ্রীরঙ্গ তাদের বিক্রি করেন।

রাজা শ্রীরঙ্গ অবাক হয়েই থাকবেন। বলে কি, এই সাদা সাদা লালমুখো মানুষগুলো। কি আছে এই ফালি জায়গায়? প্রাপ্তিযোগত কিছুই নেই। সেখানে ক'ঘর প্রজা আছে; কিন্তু তারা খাজনা দেবে কি—তাদেরই তো দিতে পারলে ভাল হয়। এমনি অবস্থা। তবে রাজা তো এত বোকা নন যে বুঝতে কষ্ট হবে বেশ কিছু জরুরী ব্যাপার না থাকলে এরা এমনি এমনি এত চড়াই-ওতরাই পেরিয়ে বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তাঁর দরবারে এসে প্রণিপাত করবে? তাছাড়া হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না। আর ঠেকায় যখন পড়েছে, যতটা পার দুয়ে নাও। অন্যদিকে ইংরেজ। তারাও বেনের জাত—তাদের হিসেব আর এক। তারা দেখছে সামনে সমুদ্র। সেখানে তারা অপ্রতিহত প্রতাপ। কাছেপিঠে জাতশত্রু ডাচেরা নেই। পর্তুগীজ নেই। রাজা স্বাধীন। থাকে দূরে। আমলাদের ঝামেলা নেই। অপূর্ব জায়গা। অবাধে আসবে তাদের বাণিজ্যতরী। কেউ বাধা দিতে পারবে না। এখানে তারাই

রাজা। তারাই সম্রাট। গোলকুণ্ডার তুলনায় দরটা একটু চড়াই লেগে গেল। তা' হোক। তাদের অনেক দিনের স্বপ্ন তখন সফল হতে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের বুকে তাদের নিজস্ব জমি। তারা কি দামের পরোয়া করে? বছরে খাজনা লাগবে নয় হাজার টাকা। আর রাজাকে সম্মান দেখানর জন্য উপকূলের নামকরণ হ'ল শ্রীরঙ্গপত্তম্।

প্রশ্ন হতে পারে, এখানে অত সহজে ইংরেজরা বসবাসের ঠাঁই পেল কি করে? তখনও তো কই দিল্লী দুর্বল হয়ে পড়েনি। তখনও তো ভারতের সিংহাসনে প্রবল-পরাক্রম সম্রাট শাজাহান। তখনও তো কই তিনি নখদন্তবিহীন বৃদ্ধ শার্দুলে পরিণত হননি? তখন তিনি বিক্রমে অমিত। বিধর্মীদের রাহু। কাজেই এত সহজে ইংরেজরা কি করে ভারতবর্ষের এই ভূখণ্ড পেয়ে গেল কুঠি তৈরি করবার জন্যে? সে কারণ বলতে গেলে ভারতবর্ষের দক্ষিণের—বিন্ধ্য-পর্বতের দক্ষিণের অংশ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এর বুক দিয়ে কৃষ্ণা-কাবেরী-গোদাবরী-তুঙ্গভদ্রা বয়ে গেছে। মাথায় দাঁড়িয়ে বিন্ধ্য, ডাইনে বামে দুপাশে পূর্ব ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। পায়ের নীচে কণ্যাকুমারীর মুখচুম্বন করে সমুদ্রের নীলাম্বুরাশি। কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা বিধৌত অংশ দাক্ষিণাত্য; নীচের অংশকে দক্ষিণ ভারত বলতে হয়। খাস ইংরেজ আমলের আগে—যে যাই বলুক—ভারতের এই অংশ কখনও পুরোপুরিভাবে বা দীর্ঘকালের জন্যে দিল্লীর দাসত্ব করেনি। কেউই তাকে শৃঙ্খলের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে পারেনি। মুসলমান আমলের আগে, দক্ষিণের এই তামিল অধ্যুষিত ভূখণ্ড মোটা-মুটিভাবে চারটি দক্ষিণী রাজবংশের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। চালুক্য। পল্লব এবং চালুক্য বংশের ধ্বংসস্তূপের ওপরে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকূট ও পল্লব বংশের পতনকালে উত্থিত প্রবল চোল মণ্ডলম বা চোলরাজ্য। উত্তরাপথের কোন রাজাই এর বুকে তাঁর জয়পতাকা ওড়াতে পারেননি।

সেই কাজ প্রথম করেন আলাউদ্দিন খিলজী। তিনি গুজরাট অধিকার করে রাণী কমলাদেবীকে গ্রহণ করেন। হাতবাড়ান চিতোরের রাণী পদ্মিনীর দিকে। কিন্তু আয়নার বুকে তার ছায়া দেখেই তাঁর জীবন কাটল। চিতোর পেলেন, চিতোরের রাণীকে নয়। অধিকার করলেন মালব। অপর দিকে তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুরকে পাঠালেন দক্ষিণের হিন্দুরাজ্য জয় করতে। এইসব বিজয়ের কাহিনী নিয়েই না বঙ্গ নাট্যশালায় সেই বিখ্যাত নাটক—দেবলাদেবী। কাফুর দেবগিরির যাদব রাজ, তেলেঙ্গনার কাকতীয় রাজ প্রতাপরুদ্র, দোরসমুদ্রের হোয়সলরাজ তৃতীয় বীরবল্লাল আর মাদুরার পাণ্ডুরাজকে তার তলোয়ারের ঘায়ে চৌপাট করে দিলেন।

কিন্তু আগেই বলেছি, উত্তরের কোন রাজশক্তি দক্ষিণে থিতু হয়ে বসতে পারেনি।

কাফুর সরে আসার পর কৃষ্ণা আর তুঙ্গভদ্রার মাঝে অভ্যুদয় হল হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের। আবার তারই উত্তরে জেগে উঠল মুসলমান বাহমনী রাজ্য। বিজয়নগর-বাহমনীর লড়াই দীর্ঘ। লেগেই থাকত। পাঁচভাই মিলে যেমন বিজয়নগর রাজ্যের পত্তন করেছিল, বাহমনীরাজ্য একদা ভেঙে পাঁচটুকরো হয়ে গেল—আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বিদর ও বেরার। পৃথক হলেও লড়ায়ের ব্যাপারে এরা কিন্তু একাট্টা। এরাই একযোগে তালিকোটার লড়ায়ে বিজয়নগরকে একেবারে মরণ-কামড় দিলে। তবে বিজয়নগর সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়নি। পূর্বঘাট পর্বতমালার কোলে দুর্গমরাজ্য চন্দ্রগিরিতে গিয়ে আশ্রয় নিলে এঁদেরই এক বংশাবতংস রাজা শ্রীরঙ্গ। এখান থেকেই তিনি তাঁর অবশিষ্ট রাজ্য পালন করতে লাগলেন।

এদিকে মুঘলরা কখনই ভারতবর্ষের এই দাক্ষিণাংশ জয় করতে পারেননি। সম্রাট আকবরও না। ঔরঙ্গজেব তাই দাক্ষিণাত্যে এসে শিবির ফেলেছিলেন। বিজাপুরের পতন হয় মুঘল সম্রাটের হাতে ষোলশ' ছিয়াশি সালে। পর বছর যায় গোলকুণ্ডা। কাজেই ইংরেজরা যখন মসুলিপত্তনের 'সোনার ফরমান' পায়, তখন গোলকুণ্ডা দাক্ষিণাত্যের স্বাধীনরাজ্য। বিজয়নগর তখন হৃতসর্বস্ব। তবু তার রাজা তো স্বাধীন। কাজেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে যে সুযোগ পেতে ইংরেজদের বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল সেই প্রার্থিত বস্তু অনেক সহজেই পেয়ে গেল এই স্বাধীন দক্ষিণী নৃপতিদের কাছ থেকে।

কাজেই দিল্লীর শিথিল শাসনের সুযোগে নয়, স্থানীয় সামন্তদের সৌজন্যেই দক্ষিণে ইংরেজদের বরাতে এই বহুকাঙ্ক্ষিত জায়গাটুকু জুটে গেল। আর সার্ ফ্রান্সিস তো কোনরকম ইণ্ডিয়া হাউসের পরামর্শের অপেক্ষা না করেই বছর খানেকের মধ্যে এখানে একটা দুর্গ বানিয়েফেললেন—সেণ্ট জর্জ দুর্গ। ভারতের মাটিতে ইংরেজদের প্রথম দুর্গ! ষোলশ' চল্লিশ! এবং এই যে দুর্গ তৈরী হ'ল, তার জন্যে ইংরেজদের নতুন প্রজাদের কাছে কোনরকম কর নেওয়া হয়নি। কলকাতায় যখন ফোর্ট উইলিয়ম তৈরি হয় তখন বার বার কলকাতা কাউন্সিলকে এই বলে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল যে, মাদ্রাজে যখন কর নেওয়া হয়নি তখন কলকাতাতেও যেন কর নেওয়া না হয়।

মাদ্রাজ ইংরেজদের বলতে গেলে প্রথম সন্তান তো ভারতের মাটিতে। প্রথম উপনিবেশ। কাজেই তার আদর আলাদা। মাদ্রাজের শহরটার পরিকল্পনাও তাই করা হয়েছিল চমৎকার। ঘরদোর শুধু সুন্দর নয়, প্রতিটি বাড়ীর চারদিকে নীচু নীচু দেওয়াল, তার বালিভরা রাস্তার দু'পাশে ইট বাঁধাই ফুটপাথ। মাঝে মাঝে গাছ-গাছালি। তাদের ছায়ায়-ছায়ায় পথিকের হাঁটতে আরাম হবে। সেখানে টাউন হল

গভর্নরের বাড়ী,সেণ্টমেরীর চার্চ, রাইটারদের জন্যে কলেজ, নিউ হাউস,হাসপাতাল। গভর্নর থাকতেন দুর্গের বেশ ভেতরে:। এখানকার আবহাওয়াও চমৎকার। গ্রীষ্মের দিনকটায় যাহোক একটু কষ্ট হত, নয়ত সাহেবদের কাছে মাদ্রাজ ছিল স্বর্গ। আর যখন হু হু করে বইত সমুদ্রের বাতাস, মাদ্রাজ কুঠির তখন যেন নতুন রূপ। আঙুর আর লেবু অপর্যাপ্ত। মিষ্টি ফলের অভাব নেই। সেকালের ইংরেজদের তিনটে বড কুঠি —কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের মধ্যে নিঃসন্দেহে মাদ্রাজই সেরা। মাদ্রাজের কাউন্সিলরা অবিবাহিত হলে—জনা তিন—তাঁরা গভর্নরের কুঠিতেই থাকবেন। নয়ত অন্যান্য আড়তদারদের মত দুর্গের ভেতরেবাড়ীতে থাকতেন। একেবারে গোড়ার দিকে ইহুদী, আর্মানিয়ান এমনকি সন্ন্যাসী ধর্মযাজকরাও দুর্গের ভেতরে বাড়ীতে থাকতেন। কিন্তু জনসংখ্যা বাডতে থাকলে নবাগতদের বাইরেই ঠাঁই হ'ল। কুঠিয়ালরা থাকত একটা বড়বাড়ীতে। তার যোলটা ছোট ছোট ঘর। দুটো লম্বা বারান্দা। সেকালের এক ব্যবসাদার পরিব্রাজক লকইয়ার যখন মাদ্রাজে যান—অষ্টাদশ শতকের সার্ গোডার দিকে—সারা বাড়ীতে কুল্যে তখন সাত আট জন লোক থাকত। দুর্গের দরজা বন্ধ হয়ে; গেলে কারও বাইরে বেরোন ছিল নিষেধ। কিন্তু দরজা বন্ধ হলে কি? জানালাতো খোলা। সেখানে মই খাটিয়ে নেমে যেত তরুণ রাইটারের দল। ব্যাপারটা এমনি প্রকট দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছিল একদা এক গভর্নরকে বলতে হয়েছিল: এই ধরনের বদ অভ্যাস অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, নতুবা অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে; সোজা ফিরতি জাহাজে বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে! মাদ্রাজের তখন তিনটে পাড়া—সাহেব পাড়া মানে দুর্গ টা, দখিনে মাঝি-মাল্লাদের টাউন আর দেশী শহর—যেখানে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাস করত।

মাদ্রাজের সৈন্যসংখ্যা ছিল কত? আড়াইশ' য়ুরোপীয়, দু'শ তোপাজ বা দোআঁশলা পর্তুগীজ এবং দুইশ' সশস্ত্র পিয়ন। তাদের জন্যে দিব্যি একটা বাড়ী ছিল। সেখানে অবশ্য মাঝে মাঝে মাতলামির কাণ্ড যে ঘটত না তা নয়। শুধু শহরের নয়, মাদ্রাজের হাসপাতালেরও ছিল সুনাম। শৃঙ্খলাও ছিল শহরে। অষ্টাদশ শতক পড়বার আগেই সেখানে শহরের জন্যে একজন মেয়র নির্বাচিত হ'ন। দশবার জন অল্ডারম্যান। শহর-শাসনে তাঁরাই হর্তাকর্তা।

এইবার সেকালের মাদ্রাজের গভর্নরদের কথায় আসা যাক। মাদ্রাজের গভর্নরদের মধ্যে একজনের কথা আজও লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তিনি এলি হু ইয়েল। বিখ্যাত মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়—ইয়েল যাঁর নামানুসারে। এর লাইব্রেরীর জন্য শুধু অসংখ্য বইই দেননি তিনি, তাঁর দেওয়া মালপত্র বিক্রি বছরে পাঁচশ' বাষট্টি পাউণ্ড বার শিলিং দিয়ে স্কুলটি কলেজে পরিণতকরা হয়। এটা সতেরশ

আঠার সালের ব্যাপার। মাদ্রাজের দুঁদে গভর্নর হিসেবে যিনি নামকরা তিনি হচ্ছেন টমাস পিট। একদা ইনি ছিলেন 'ইন্টার লোপার'। বিনা লাইসেন্সে ইনি দিব্যি ব্যবসাপাতি করতেন। অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত ভ্রমণকারী কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন যেমন করতেন। তাঁকে জন কোম্পানী যথেষ্ট কায়দা করতে চেষ্টা করেছিলেন, বলা বাহুল্য, পারেননি। অবশেষে তাঁকে মাদ্রাজের গদীটাই দিয়ে দিলেন। এবং পিট যে তাঁর গদীর ইজ্জত রেখেছিলেন, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এবং সাক্ষ্য দিচ্ছে প্রাচোর আহৃত ধনে কিভাবে, জন কোম্পানীর কল্যাণে ইংলণ্ডে তিনি উত্তর কালে একজন নবাব হয়ে বসেছিলেন। এই টমাস পিটই ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী প্রথম উইলিয়ম পিট—আর্ল অফ্ চ্যাথামের ঠাকুর্দা। পিট এই ভারতবর্ষের পয়সা দিয়েই শুধু দেশে তাঁর বিপুল ভূ-সম্পত্তি কেনেননি। ওল্ড সারাম (**Old Sarum**)-এর পার্লিযামেণ্টারী সিটটাও কিনে নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটা গল্প অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জন কোম্পানীর জবরদস্ত প্রেসিডেণ্ট সার্ যশিয়া চাইল্ড। তাঁর কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার বজায় রাখবার জন্যে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদের মায় মন্ত্রীদের পর্যন্ত তুষ্ট করতে দিয়েছিলেন প্রায় এক লক্ষ পাউণ্ড! বলা বাহুল্য সে পয়সা এই ভারতবর্ষের সোনার খনি থেকেই আহরিত এবং জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া।

মাদ্রাজের গভর্নরদের কথা বলতে বলতে আরও একজনের কথা মনে আসে—তিনি কাপ্তেন ম্যাক্রে। সতেরশ' পঁচিশ থেকে সতেরশ' তিরিশ—এই পাঁচ বছর মাদ্রাজের গভর্নরের চাকরি করে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করেন তখন সম্পত্তির মূল্য দাঁড়িয়েছিল আটলক্ষ পাউণ্ড! তাঁর বার্ষিক মাহিনা ছিল কিন্তু মাত্র পাঁচশ' পাউণ্ড! অবাক লাগলেও সেকালের হিসেবে এটা এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়। এমনি ঘটনা আকছার হ'ত তখন।

আর এইটুকু বলেই ম্যাক্রের কাহিনী সবটুকু বলা হ'ল না। এবং সেকথা ঘটা করে বলতে গেলে সেকালের মাঝ সমুদ্রের আর একটা রক্তাক্ত ছবি এই প্রসঙ্গে ভেসে ওঠে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। বোঝাই জিনিসপত্র সোনাদানা হীরামাণিক ও বহু নরনারী নিয়ে জাহাজ চলেছে সমুদ্রে। হঠাৎ কোথা থেকে ঈশানের মেঘের মত, কিংবা হিংস্র দৃষ্টি তীক্ষ্ণ নখর : বাজপাখীর মত হাজির হ'ল এক দ্রুতগতি যুদ্ধ জাহাজ। কালো আর লালের ওপরে মড়ার খুলি আঁকা পতাকা উড়িয়ে তীরের মত দ্রুত ভেসে এল। লড়াই করারও উপায় নেই। আর আত্মসমর্পণ করলেও রক্ষা নেই। সমস্ত সামগ্রী লুণ্ঠন করবে হিংস্র নেকড়ের মত সেইসব অমানুষ জলদস্যুর দল। তারপর পুরুষমানুষগুলোকে কচুকাটা করে ভাসিয়ে দেবে সাগরের জলে।

হাঙ্গর আর তিমিতে সেই টুকরো টুকরো মানুষের দেহে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে। রক্তে লাল হয়ে যাবে নীল জল। আর সেই নারীগুলিকে নিয়ে নারকীয় ভোজের আসর বসবে। পাশব অট্টহাস্যে ভরে উঠবে আকাশ। শিউরে উঠে চোখ বুজবে সূর্য। আঁধারের গ্লানিমায় ভরা সেই জাহাজগুলোর বুকে আলো জ্বলে উঠবে। মদের বন্যা বইবে। আর সেই জানোয়ারের দল খেলা করবে সেইসব নারী দেহ নিয়ে। কাতর আর্তনাদে ভরে যাবে পাটাতন। হা হা করে হাসতে থাকবে শয়তান।

এদের সঙ্গেই একদা মোকাবেলা করতে গিয়েছিলেন 'ক্যাসেণ্ড্রা' জাহাজের কাপ্তেন ম্যাক্রে। তার সঙ্গে ছিল 'গ্রীনিচ' জাহাজের কাপ্তেন কিরবি। সতেরশ' কুড়ি সালের কথা। পঁচিশে জুলাই। জোহানা দ্বীপে গিয়ে দেখলেন আড়াইশ'-টনী 'ইণ্ডিয়ান কুইন' জাহাজে চৌদ্দ জন জলদস্যু। তাদের নব্বই জন চ্যালাচামুণ্ডা। আটাশটা বন্দুক। তাদের কাপ্তেন লা বাউচে। জাহাজটা তারা মেরামত করছে। সারিয়ে উঠলেই তারা অভিযানে বেরোবে। ম্যাক্রে ভাবলেন—এই মওকা। কিরবিকে বললেন। সেও রাজী। তারা সব তৎপর হচ্ছেন এমন সময় দেখলেন যেন জল ফুঁড়ে আরও দুটো বোম্বেটে জাহাজ হাজির। এদিকে 'গ্রীনিচ' হাওয়া। ম্যাক্রে দেখলেন – তার পক্ষে একা এতজনের মহড়া নেওয়া অসম্ভব। কিন্তু পালানরও উপায় নেই। লড়ে গেলেন। এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন। প্রথম চোটে জিতেও গেলেন। কিন্তু তাদের লোক লস্কর অনেক। আবার ম্যাক্রের লোকজন সব আহত শেষকালে একটা ডিঙি করে ম্যাক্রে পালিয়ে একটা দেশী রাজারকাছে আশ্রয় নিল। বোম্বেটেরা গিয়ে অনেক তড়পাল। কিন্তু রাজার কাছে নতি স্বীকার করতে হ'ল। কিন্তু রাজার কাছেই বা কতদিন থাকবেন? অবশেষে বোম্বেটে তাকে মারবে না এই রকম একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হ'ল। ম্যাক্রে তাদের কাছে ফিরে গেলেন। দেখা গেল, বোম্বেটের কথার ঠিক নেই। জল্লাদের খড়্গের ম্যাক্রের নীচেমাথাটা দিতেই হবে যখন স্থিরনিশ্চিত সেই ম্যাক্রের সময়ে বোম্বেটে জাহাজে একজন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল—মারবে কে ম্যাক্রেকে? আমি আছি ম্যাক্রের পক্ষে! এ-যাত্রায়ও ম্যাক্রে বেঁচে গেলেন! তারা তাকে একটা ভাঙা জাহাজ আর একশ' উনত্রিশ গাঁট কাপড় দিয়ে ছেড়ে দিল। অনেক কষ্টে ম্যাক্রে বম্বে এসে পৌঁছালেন। জন কোম্পানী তাঁর এই শৌর্যের সম্মান দিয়েছিলেন। প্রথমে বেনকোলেনে চাকরি। পরে একেবারে সেকালের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত চাকরি মাদ্রাজের চিফ।

এখন একটু সেকালের মাদ্রাজের জীবনচর্যার কথা হোক। সেকালের মাদ্রাজের জীবনে রবিবার একটা সত্যিকারের 'সাবাথ' ডে। আটটা থেকে ন'টার মধ্যে ঘণ্টা বাজত চার্চে। প্রায় শ' দুই সৈন্য লাইন দিয়ে দাঁড়াত দুর্গ থেকে চার্চের দুয়ার গোড়া

পর্যন্ত। সপরিবারে গভর্নর যেতেন উপাসনায়। গভর্নর পৌছতে পৌছতে গির্জায় অর্গানে সুর বেজে উঠত, এবং গভর্নর তাঁর আসন নিলে তবেই সেই বাজনা থামত।

রবিবার ছাড়াও মাদ্রাজের নিস্তরঙ্গ জীবনে মাঝে মাঝে আনন্দের ঝোড়ো হাওয়া বইত। কোন ধর্মীয় বিশেষ দিনে। বা বিলেত থেকে জাহাজ এলে। শহরের সমুদ্র তোরণটা লোকজনে ভরে যেত। প্রথম দিন জাহাজ থেকে নামত মাঝিমাল্লা, লোকজন। দ্বিতীয় দিনে মালপত্র। সপ্তাহ পরে সেগুলো নিলেমে বিক্রি করা হ'ত।

ষোলশ' সাতাত্তর আটাত্তর সালে মাদ্রাজে কোম্পানীর কর্মচারী ছিল চুয়াত্তর জন। ছয়জন এঁদের মধ্যে বিবাহিত। পাঁচজনের স্ত্রী তাঁদের সঙ্গে থাকত। এই স্ত্রীদের একজন মাত্র ইংরেজ, একজন ডাচ, দু'জন ফিরিঙ্গী দু'জন পর্তুগীজ। এ-ছাড়াও ঐ সময়ে মাদ্রাজের সাহেবপাড়ায় ছিলেন তিন জন ইংরেজ বিধবা, দু'জন অবিবাহিতা, ষোলজন য়ুরোপীয—কালাধলা দুই পাড়াই মিলে।

এবং এই মাদ্রাজেই একদা জন কোম্পানীর চাকরি নিয়ে এসেছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসকে তিনি তাঁর রাজনীতিতে পাল্টে দিয়েছিলেন প্রায় শ' তিনেক বছরের জন্য। সবাই জানেন, এসেছিলেন তিনি কলম হাতে করে। কনিষ্ঠতম করনিক হয়ে। আর ভাগ্যচক্রের কি বিচিত্র গতি, বন্দুক হাতে একদিন তিনি ইংরেজদের মর্যাদা বাঁচালেন, দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের দানাপাণি বজায় রাখলেন। গভর্নরের লাইব্রেরীর তদারক করতে করতে এক সময় তিনি ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড যুদ্ধে বন্দুক ধরলেন। এবং সে কাহিনী বলার আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনার কথা বলে নেওয়া যাক।

সতেরশ' সাত। মার্চের তিন তারিখ। শনিবার। স্থান—দাক্ষিণাত্য। আহমদ-নগরের মুঘল শিবির। ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেব সকালে উঠে তাঁর শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। যথানিয়মে তাঁর প্রার্থনা শেষ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে অবসন্ন শরীরে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। গত কয়েক মাস ধরেই ভুগছিলেন। এইত গত সপ্তাহে বেশ কয়েকদিন ভারী জ্বরে ভুগলেন। ভুগলেন তীব্র অবসন্নতায়। এবারে রোগের আক্রমণ যেন আরও তীব্র। তাকে শুইয়ে দিলে সবাই মিলে। বেলা আটটা বাজে। সব শেষ। শয্যাপাশে কন্যা জিনাত-উন্নিসা কি ককিয়ে কেঁদে উঠে থাকবেন? তাঁর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন? কে জানে? কিন্তু ভারতলক্ষ্মী যে সেদিন কেঁদে উঠেছিলেন সন্দেহ নেই। কেননা ভারতবর্ষের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল নানা বিদেশী শক্তি সেটুকু তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এযে ইন্দ্রপতন! দেশজুড়ে এক অনিশ্চয়তা। কি হয় কি হয় ভাব। কে চালাবে এই সুবিশাল সাম্রাজ্য? কে মানবে তাকে?

মুঘল সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের কেন্দ্রশক্তিতে যে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল, এই সুবিশাল সাম্রাজ্যে একগ্রন্থিতে বেঁধে রাখবার শেষ হাতটাও যে অসাড় হয়ে গেল, এই সত্য আরও একজনের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। তাঁর নাম জোসেফ ফ্রাঁসোয়া ডুপ্লে। পণ্ডিচেরীর ফরাসী গভর্নর। মুঘল সম্রাটের মৃত্যুর পর এতকালের সুবেদাররা সহজেই স্বাধীনতা ঘোষণা করবে এ প্রায় স্থিরনিশ্চিত এবং তাই নিয়ে নানা যুদ্ধবিগ্রহ হতে বাধ্য। ডুপ্লে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন। আঠার বছর বয়স থেকে এই দেশে তিনি কাল কাটাচ্ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে ভালোভাবে সমর দক্ষতার তালিম দিতে পারলে এবং য়ুরোপীয়দের দ্বারা ভালোভাবে পরিচালিত হলে, এদেশী সৈন্যদের জুড়িনেই। এবং এইভাবে একটা সৈন্য দল সৃষ্টি করতে পারলে, দেশীয় রাজার বদলে তাঁরাই এই দেশে একটা নিয়ামকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন। কাজেইপণ্ডিচেরীর বুকেডুপ্লে তাঁর দেশী সৈন্যবাহিনী তৈরি করার পরিকল্পনা সুরু করে দিলেন।

তবে তখনও তিনি কোন দেশীয় রাজার উপর তাঁর পরিকল্পনা পরখ করতে পারেননি। এমন সময় য়ুরোপে ইঙ্গ-ফরাসী লড়ায়ের কথা তাঁর কানে এসে গেল। এদিকেও একটা কিছু করতে হয় এমনি যখন ভাবছেন, মরিশাস থেকে তিনহাজার সৈন্য নিয়ে অ্যাডমিরাল লা বুর্দনিস এসে হাজির হলেন পণ্ডিচেরীতে। সঙ্গে তিন হাজার সৈন্য—ডুপ্লে তো লাফিয়ে উঠলেন! সেকালে সৈন্য সংখ্যা শ'য়ে মাপা হত। কাজেই এত সৈন্য দিয়ে কাছে পিঠে যে ইংরেজ কুঠি আছে মাদ্রাজ, সেটাই দখল করে নাও। অনতিবিলম্বে নাও। বুর্দনেসকে সঙ্গে করে ডুপ্লে মাদ্রাজ দুর্গ আক্রমণ করলেন। তখনও উইলিয়াম পিটের উদয় হয়নি ইংলণ্ডে। তখনও জন কোম্পানীর হাতে বণিকের মানদণ্ডের জায়গায় রাজদণ্ড তুলে দেওয়া হয়নি। তারা তখন চুটিয়ে ব্যবসা করছে। কাজেই মাদ্রাজের সেণ্ট জর্জ দুর্গের আরক্ষা তখন নেই বললেই হয়। কিছু দিন অবরোধে কাটিয়ে ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করলে। সতেরশ' ছেচল্লিশ। একুশে সেপ্টেম্বর।

তারপরেই লেগে গেল গণ্ডগোল। ফরাসীদের মধ্যে মতদ্বৈধ। ডুপ্লে ভাবছেন তার বিরাট পরিকল্পনার কথা। দুর্বল দিল্লীর সুযোগ নিয়ে এই বিরাট দেশে তিনি ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন করবেন। তাঁর বিরাট দেশী সৈন্য তৈরী হয়ে গেছে। তাদের তিনি ভাড়া খাটাবেন। মাদ্রাজে দিয়ে এই পরিকল্পনার সুত্রপাত হ'ল। এ্যাডমিরাল লা বুর্দেনিস ওসব বুঝতে চাইলেন না। তিনি সেণ্ট জর্জ দুর্গ ইংরেজদের ফিরিয়ে দিতে চাইলেন কিছু টাকার বিনিময়ে। কথাবার্তা কয়েও ফেললেন ইংরেজদের সঙ্গে। ডুপ্লে শুনে তো খাপ্পা! দারুণ ঝগড়া দুজনে। কি যে হ'ত বলা যায় না এই কলহের

কলে, কিন্তু করোমণ্ডল উপকূলে তখন শীতের শীর্ণতা পেরিয়ে, বসন্তের দক্ষিণ বাতাসের কূজন-গুঞ্জনের পর্ব শেষ হয়ে এসেছে সেই বৈশাখী ঝড়ের দিন! আকাশ কালো করে অকালে তখন দিন ফুরিয়ে যায়। তাণ্ডবনৃত্য করে সমুদ্র তরঙ্গের ডম্বরু বাজাতে থাকে ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়। বুর্দেনিস তাঁর নৌবহর সরিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর আস্তানা মরিশাসে।

মাদ্রাজের এই ইংরেজ বন্দীদের মধ্যে ছিলেন সেকালের এক অখ্যাত রাইটার য়ুরোপে এক্সলাচাপেলের সন্ধির কল্যাণে ইংরেজ আবার মাদ্রাজ ফিরে পেল। তারপর আবার সেখানে মন্দাক্রান্তা তালে জীবন বইতে লাগল। অবশ্য ষোলশ সেখান একষট্টি সালে যে ভারতে ইংরেজ কুঠি শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজান হ'ল তাতে দুটো কুঠি স্বাধীন কাজ করবার অধিকার পেল নিজ নিজ প্রেসিডেণ্ট ও কাউন্সিলের অধীনে—একটা সুরাট অপরটা মাদ্রাজ। মাদ্রাজের অধীনে বাঙলাদেশের সব কুঠি। সেখান থেকেই হুগলী, পাটনা, কাসিমবাজার কুঠির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা হত। মাঝে অবশ্য বছর দুই—হেজেস ও গিফোর্ডের আমলে এবং পরে জব চার্নকের আমলে বছর আট—হুগলী, সুতানুটি স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়েছিল। এবং এটা তো ইতিহাস যে কলকাতা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এখন থেকেই রবার্ট ক্লাইভ আবার কূটের সঙ্গে গিয়েছিলেন হৃতরাজ্য উদ্ধার করতে। সে অবশ্য বেশী বছরের কথা নয়।

কিন্তু মাদ্রাজের গল্প বলতে গিয়ে একবার সেই বিচিত্র বইটার টমাস প্লাডগ্রাসের কাহিনীটা বলে নেওয়া যাক। সতেরশ' সাতাত্তর। মাদ্রাজের সমুদ্রতীরে সেদিন বেশী ভীড়। নতুন জাহাজ এসেছে 'হোম' থেকে। এবং সেই জাহাজে আগন্তুক রাইটারের মধ্যে আঠার উনিশ বছরের একটা ছেলে নামল। নাম টমাস প্লাডগ্রাস। বাড়ী চারলটনে। নেহাতই বাচ্ছা। পলাশীর যুদ্ধের সময়েও তার জন্ম হয়নি। মাদ্রাজে কোম্পানীর কর্তারা তখন নীল, তিসি আর লবণের ব্যবসা করত। ত্রিশটা জেলার ওপর ফোর্ট সেণ্ট জর্জের কর্তৃত্ব। বালেশ্বর-গঞ্জামে তখন লবণ আর নীলের বেশ বড় কারবার কোম্পানীর। গঞ্জামের 'নিমক মহল' তো গুপ্তধনের মত। সেখানে যেন আকাশে সোনা, বাতাসে সোনা, মাটিতে সোনা। কত লোকের যে কপাল ফিরে গেল তার লেখাজোখা নেই। কাজেই সবাই যে গঞ্জামে বদলি হতে চাইবে—এ আর নতুন কথা কি? 'শ্যাল কি গ্রেটফুল ইফ মাই সারভিসেস আর ট্রান্স-ফারড্, টু দি ফ্যাক্টরি অফ বালাসোর অর গঞ্জাম' এই বয়ানের আবেদনপত্র আকছার পাওয়া যেত গভর্নরের টেবিলে। এ দিকে গভর্নরের নিজেরই কারবার রয়েছে সেখানে। কাজেই নতুন করে প্রতিযোগী জুটিয়ে কে আর নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে চায়?

রবার্ট ক্লাইভ। আগামী দিনে ডুপ্লের আসল প্রতিদ্বন্দ্বী। ডুপ্লে তাঁদের ঠিক বন্দী করে রাখেননি। তাঁরা পালাবেন না এই প্রতিশ্রুতির বদলে তাঁদের স্বাধীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেওয়া হয়েছিল। ডুপ্লে যখন বুর্দেনিসের দেওয়া চুক্তি মানতে চাইলেন না, ইংরেজরাও ফিকির পেয়ে গেল। তাঁরাই বা মানবেন কেন তাঁদের দেওয়া 'ভদ্রলোকের শর্ত'। একদিন গভীর নিশীথে রবার্ট ক্লাইভ পণ্ডিচেরী থেকে আঠার মাইল দক্ষিণে সেণ্ট ডেভিড দুর্গে পালিয়ে গেলেন। সেণ্ট ডেভিড করোমণ্ডল উপকূলে তখনও ইংরেজদের একমাত্র নিজস্ব ঘাঁটি। ছোট্ট ঘাঁটি। তবু তখনও স্বাধীন।

ডুপ্লের কিছুই নজর এড়াল না। তৎক্ষণাৎ তিনি সেণ্ট ডেভিড আক্রমণ করলেন। অবরোধ করলেন। আর্কটের নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের তখন বেশ দোস্তি। তিনি বেশ সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। লড়াই চলতে লাগল ঢিমেতালে। রবার্ট ক্লাইভের ভূমিকার পরিবর্তন হ'ল। মসি ছেড়ে তিনি অসি ধরলেন। এবং নানা ঘটনার সমারোহে দেখা গেল একদিন ইংরেজরা জিতে গেছে। অবশ্য তত দিনে অ্যাডমিরাল বসকোয়েন তাঁর নৌবহর নিয়ে এসে গেছেন বম্বে থেকে। সতেরশ' সাতচল্লিশ। বসন্তকাল। ক্লাইভ তখন সদ্য সাবালক। বয়স একুশ।

এবং এই একুশ বছরেই এই সেণ্ট ডেভিডেই একটা নাটক হয়ে গেল যাতে বোধ করি বোঝা গেল বিধাতার কোন অদৃশ্য ইঙ্গিতে ক্লাইভের জন্যে অনেক বড় কাজ অপেক্ষা করছে। সেদিন তাস খেলতে খেলতে ক্লাইভ আর এক অফিসারের কাছে কিছু টাকা হেরে যান। কিন্তু ক্লাইভ সবিস্ময়ে উপলব্ধি করলেন তাঁর পার্টনার তাঁকে ঠকিয়েছে। ক্লাইভ বললেন, এ-টাকা তিনি দেবেন না। তাঁকে ঠকান হয়েছে। সেকালে এর একমাত্র মীমাংসা ছিল 'ডুয়েল লড়াই'। দু'জনেই ডুয়েলের জন্যে তৈরী। ক্লাইভই প্রথমে পিস্তল ছুঁড়লেন। কিন্তু না। তাঁর লক্ষ্য ঠিক হ'ল না। প্রতিপক্ষ তাঁর কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে বললে, 'জীবনভিক্ষা চাও, ঠকানর অভিযোগ ফিরিয়ে নাও।' নির্বিকার চিত্তে ক্লাইভ বললেন, 'জীবনভিক্ষা চাইতে পারি। কিন্তু তুমি যে আমায় ঠকিয়েছ এই অভিযোগ আমি কক্ষনো ফিরিয়ে নেব না। আমায় গুলি করে মার। তবু না। তুমি ঠক্। প্রতারক। তোমার ঠকামির টাকা আমি কক্ষনো দোব না।' বিস্মিত প্রতিপক্ষ তাঁর পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

য়ুরোপে একসলাচাপেলে সন্ধির কল্যাণে ইংরেজরা আবার মাদ্রাজ ফিরে পায়। এবং তারপর আবার সেখানে মন্দাক্রান্তা তালে জীবন বইতে লাগল। গভর্নর এল অবশ্য ষোলশ বাষট্টি থেকেই মাদ্রাজ বাংলাদেশের সকল কুঠির শীর্ষে। সেখান থেকেই হুগলী, পাটনা, কাসিমবাজার কুঠির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা হত। মাঝে অবশ্য বছর

দুই-হেজেস ও গিফোর্ডের আমলে এবং পরে জব চার্নকের আমলে বছর আট হুগলী সুতানুটি স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়েছিল। এবং এটাও ইতিহাস যে কলকাতা আক্রমণের পরিপেক্ষিতে এখান থেকেই রবার্ট ক্লাইভ আবার কুটের সঙ্গে গিয়েছিলেন হৃত রাজ্য উদ্ধার করতে। সে অবশ্য বেশী পরের কথা নয়!

কিন্তু মাদ্রাজের গল্প রাখতে গিয়ে একবার সেই বিচিত্র রাইটার টমাস স্নডগ্রাসের কাহিনীটা বলে নেওয়া যাক! সতেরশ' সাতাত্তর। মাদ্রাজে সমুদ্রতীরে সেদিন বেশ ভীড় নতুন জাহাজ এসেছে 'হোম' থেকে। এবং সেই জাহাজে আগন্তুক রাইটারের মধ্যে আঠা'র উনিশ বছরের একটা ছেলে নামল। নাম টমাস স্নডগ্রাস। বাড়ী চারলটনে। নেহাতই বাচ্চা। পলাশীর যুদ্ধের সময়েও তার জন্ম হয়নি। মাদ্রাজে কেম্পানীর কর্তারা তখন নীল তিসি আর লবণের ব্যবসা করত। ত্রিশটা জেলার ওপর ফোর্ট সেণ্ট জর্জের কর্তৃত্ব। বালেশ্বর গঞ্জামে তখন লবণ আর নীলের বেশ বড় কারবার কোম্পানীর। গঞ্জামের 'নিমকি মহল' তো গুপ্তধনের মত। সেখানে যেন আকাশে সোনা, বাতাসে সোনা, মাটিতে সোনা। কত লোকের কপাল ফিরে গেল তার লেখাজোখা নেই। কাজেই সবাই যে গঞ্জামে বদলি হতে চাইবে—এ আর নতুন কথা কি? 'শ্যাল বি গ্রেটফুল ইফ মাই সারভিসেস আর ট্রান্সফারড্ টু দি ফ্যাক্টরি অফ বালাসোর অর গঞ্জাম' এই বয়সের আবেদন পত্র আকৃছার ভিড় করত গভর্নরের টেবিলে। এদিকে গভর্নরের নিজেরই কারবার রয়েছে সেখানে। কাজেই নতুন করে প্রতিযোগী জুটিয়ে কে আর নিজের সর্বনাশ টেনে আনতে চায়?

এদিকে শোষণে অতিষ্ঠ গঞ্জামের বুকে নেমে এল মন্বন্তরের হাহাকার। কঙ্কালপ্রায় মানুষের দল এ গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রাম, সে গ্রাম ছেড়ে আর এক গ্রাম ঘুরে বেড়াতে লাগল ভাতের জন্যে। শাকপাতারি চিবোতে লাগল অনন্যোপায় হয়ে। কিন্তু ক্ষুন্নি-বৃত্তি হবার আগেই সকল ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটে যেতে লাগল চিরকালের জন্যে। মানুষ স্ত্রী পুত্রকন্যা বিক্রি করতে লাগল। হেলেবলদ লাঙ্গলজোত তো আগেই গেছে। শেষ বেলা নিজেকে বিক্রি করে শশ্মানে এসে হাজির হতে লাগল মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মত। কেবল তফাৎ এই—তাকে আর চণ্ডালের কাজ করতে হ'ল না, তাকেই কে পোড়ায় তার ঠিক নেই। হুড় হুড় করে লোক পালাতে লাগল। পালাতে পালাতে মরতে লাগল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসে তার খবর গেল। দু'দিন আগে বাঙলায় এমনি মন্বন্তর হয়ে গেছে। কোম্পানী কম্পিতকণ্ঠে বললে, 'রিলিফ পাঠাও, রিলিফ পাঠাও।'

মাদ্রাজের গভর্নর বাহাদুরের কপিল চোখের তারায় আর এক লাভের হিসেব বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে গেল। কোম্পানীর কাছারিতে চারলটনের সেই পাকা-

পোক্ত ছেলেটা টমাস স্মডগ্রাসের কাছে বড় সাহেবের এত্তেলা গেল। সাহেব ডাকছেন? রাধানগরের রুমালে মুখ মুছতে মুছতে স্মডগ্রাস গভর্নরের সামনে গিয়ে 'বাউ' করে হাজির হ'ল আমাকে ডেকেছিলেন, ইয়োর হাইনেস?'

—ইয়েস। তুমি গঞ্জামে যেতে চাও?

কি বলবে ভেবে পেলে না স্মডগ্রাস। কি বলতে চান গভর্নর? এর জন্য তদ্বির তদারক কম করেনি সে। বার বার এক কঠিন পাথরে ব্যর্থ আঘাত করে তার প্রচেষ্টা নিষ্ফলে ফেরৎ এসেছে। আর আজকে স্বয়ং গভর্নর তাকে ডেকে এই কথা বলেছেন। নিজেকে অনেক সংযত করে, তার মনের উচ্ছ্বাস মনে রেখে বিনীত বাধ্য ভৃত্যের মত স্মডগ্রাস বলে থাকবে ইফ য়্যু প্লিজ। গভর্নর 'প্লিজড্' হয়েই স্মডগ্রাসকে রেসিডেণ্ট করে দিলেন গঞ্জামের। কালেক্টরেরও ওপরে তার স্থান! গঞ্জামের 'রিলিফ ওয়ার্ক' তাকেই করতে হবে। গভর্নর হ্যাজ বিন প্লিজড্ টু এ্যাপয়েণ্ট হিম এ্যাজ দি রেসিডেণ্ট অফ গঞ্জাম ইত্যাদি, ইত্যাদি। এতবড কাজ কি আর যে সে লোককে দিয়ে হয়?

সতেরশ' একানব্বই। স্মডগ্রাস গিয়ে পৌছালেন উড়িষ্যায়। কোম্পানীর কর্মচারীরা সাদর অভ্যর্থনা জানাল তরুণরেসিডেণ্টকে। নেমেই সোজা চলে গেলেন তিনি কালেক্টরের কাছে। দুর্ভীক্ষ ত্রাণের বিপুল আয়োজন করার হুকুম আছে লীডেনহল স্ট্রীটের। কালেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলেন নতুন রেসিডেণ্ট, 'কাজের কথায় আসা যাক। রিলিফের চাল কোন গুদামে কত আছে বলুন।'

'— চাল? কালেক্টারের তো আকাশ থেকে পড়ার অবস্থা! চাল কোথা?'

'—মানে?' বছর চোদ্দ কোম্পানীর কাজ করা ঝানু রাইটার স্মডগ্রাসেরও ব্যাপারটা বুঝতে বেশ সময় লেগে থাকবে। কালেক্টর সোজা বললেন, 'হিসেবের খাতাপত্র দেখতে চান, পাবেন। সব ঠিক আছে বুক অফ এ্যাকাউণ্টস্। কিন্তু যদি চালের খোঁজ করেন তো নাচার।' স্মডগ্রাস সব বুঝলেন। এবং এ-সব নিয়ে আর উচ্চবাচ্য না করে নিজের আখির গোছাতে লাগলেন। রাস্তায় চিল্কার ধারে তাঁর জন্যে একটা বিরাট প্রাসাদ বানিয়ে নিলেন। রেসিডেণ্ট তো আর যে সে বাড়ীতে থাকতে পারে না। তার ইজ্জত আর কোম্পানীর সম্মান তো আর আলাদা নয়। এবং বলে না, যে খায় চিনি, তাকে যোগায় চিন্তামনি। সেই চিন্তামনি তাঁকে এক তুখড় মুন্সী জুটিয়ে দিলেন—নাম গোপালকৃষ্ণাম্মা। একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ! দু'হাতে টাকা লুঠতে লাগল এই জোড় মাণিক। টাকার আণ্ডিল বাঁধতে লাগল স্মডগ্রাস।

কিন্তু কথায় বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। একদিন পাপের ডিঙি ভরাডুবি

হয়ে গেল। তাঁর জোর জবরদস্তির জ্বালায় সারা দেশ উত্যক্ত। ছোটখাট থেকে বড়সড় ব্যবসাদার, তালুকদার সবাই অতিষ্ঠ। রেসিডেণ্ট সাহেবের জ্বালায় কারও নিস্তার নেই। কালেক্টর সাহেবেরও বোধকরি নীরব সম্মতি থেকে থাকবে। সুবিস্তৃত গঞ্জাম বালাসোরের তালুকদারের সবাই মিলে আবেদন পাঠালে সোজা গভর্নরের কাছে। মাদ্রাজের সেণ্ট জর্জে।

এই 'মাস পিটিসন' গণ দরখাস্তকে জন কোম্পানীর কর্তারা ভারী ভয় খেতেন। সুতানুটি সমাচারে আমরা দেখব—ফাঁসির হুকুম মকুব করে দিয়েছিল কোম্পানী এই গণ দরখাস্তের প্রতাপে। কাজেই মাদ্রাজ গভর্নর বরখাস্ত করে দিলেন স্নডগ্রাসকে। নতুন কালেক্টর হলেন ওয়াল্টার ব্যালফুর। স্নডগ্রাস তো তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতেই চাইলেন না। তাঁর লোকজনকে লাঠিয়াল দিয়ে ঠ্যাঙাবার ভয় দেখালেন। শেষকালে কাজিয়া হবে নাকি দু'জনে। মাদ্রাজে খবর গেল। সেখান থেকে কড়া ভাষায় নির্দেশ এল। গোপালকৃষ্ণাম্মাকে কয়েদ করা হ'ল। গতিক সুবিধের নয় দেখে স্নডগ্রাস কর্মভার ত্যাগ করলেন। সতেরশ' চুরানব্বই।

কিন্তু হাল ছাড়লেন না। বললেন, 'হুজুর আমি নির্দোষ। এসব অভিযোগ—বিদ্বেষ, অসূয়াপ্রণোদিত। এসবের বিন্দুবিসর্গ আমি জানি না।' এবং খোদ মাদ্রাজের গভর্নরকে জপাতে লাগলেন। এক সময় শিবের মাথায় ফুল পড়ল। তবে তখন বছর চারেক কেটে গেছে। নতুন মুন্সী জগন্নাথ রাওকে নিয়ে স্নডগ্রাস আবার হারানো গদীতে অধিষ্ঠিত হলেন। তবে একবার যে বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সে কি তা ভুলতে পারে? আবার অত্যাচার। আবার জবরদস্তি। আর অভিযোগ। গণ্ডগোল। কালেক্টর ব্রাউনকে চার্জ বুঝিয়ে দিতে বলা হ'ল এবার। এবারও সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি।

মাদ্রাজ কাউন্সিল এবার কিন্তু স্নডগ্রাসের আর কোন কথা শুনলে না। যদিও প্রায় বছর চারেক ধরে এর জন্য অনেক তদ্বির তদারক করলে স্নডগ্রাস। কিন্তু এবার আর ভবী ভুলল না। সাতাশ বছরের বাস উঠিয়ে এবার স্নডগ্রাসকে দেশে ফিরতে হ'ল। তবে মজার কথা এই, লণ্ডনে ফিরে সে লীডেনহল স্ট্রীটের জন কোম্পানীর সদর দপ্তরে তার আবেদনপত্র পেশ করলে। সে বাড়ীর করিডরে বেশ কয়েকদিন ঘোরাফেরা করতে লাগল। কিন্তু কোম্পানী সেসব মানলে না। সোজা নাকচ করে দিলে তার আবেদন। এর পরই নাটক।

লীডেন হল স্ট্রীটের বাড়িটার সামনে একটা ছোট্ট টুলে দাঁড়িয়ে ভাড়াকরা শতছিন্ন জামাকাপড় পরে সে জনগণের উদ্দেশ্যে তার করুণ কাহিনী বিবৃত করতে লাগল: 'ঐ যে প্রাসাদে ঐশ্বর্যের বিপুল সমারোহ দেখছেন, সে এই আমার মত হতভাগ্য

এক রাইটারের বিন্দু বিন্দু স্বেদে শোণিতে তৈরী। উনত্রিশ বছর সেই বনজঙ্গল ফকির আর সাপের দেশে গভীর বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে আজ আমি রিক্ত। সর্বস্বান্ত। আজ আমার খাবার সংস্থান নেই। আজ আমার শীতের বসন নেই। আজ আমি ব্রিটিশ জনগণের দরবারে আমার আর্জি পেশ করছি। এটা কি ঠিক? এটা কি ন্যায় বিচার? আপনারা রায় দিন।'

দিন যায়। দিন ঘুরে ঘুরে সপ্তাহ। অফিসপাড়ার লোকজন শোনে। মুখে মুখে কথায় কথায় ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়ে। একদিন 'টাইমসে'র এক করেসপণ্ডেন্ট সব ব্যাপারটার একটা রিপোর্ট ছাপিয়ে দিলে। জন কোম্পানী আর স্থির থাকতে পারলে না। একদিন স্নডগ্রাসকে ডেকে পাঠালে। এবং এইসব কেচ্ছা আব ছড়াবার আগেই তার দাবী সব মিটিয়ে দিলে। বছরে পাঁচ হাজার পাউণ্ড পেন্সন ব্যবস্থা করে দিলে। কেস জিতে স্নডগ্রাস একটা বিয়ে কবে ফেললে। মরবার সময় রেখে গেল দু'লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তি। ভারতবর্ষে সে যা হারিয়েছিল, বিলেতে তা' সুদসমেত উসুল করে নিলে। মাদ্রাজের এই অখ্যাত রাইটার দেখিয়ে দিলে কোম্পানীকে ধান্দাবাজি করে কতদূর কি করা যায়।

মাদ্রাজের কাহিনীতে এই খানে ডোরা বেঁধে চলুন আমরা একটু শহর বোম্বাই ঘুরে আসি। জিব্রাল্টরের অপর দিকে টাঞ্জিবার আর এই বোম্বাই যৌতুক পেয়েছিলেন ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগাল রাজকুমারী ক্যাথারিনকে বিয়ের যৌতুক হিসেবে।

চারিদিকে শুধু অশান্ত আবর সাগরের লোনা জল। দ্বীপবিশেষ এই ভূখণ্ডে কি আশ্রয় নিয়েছিলেন রাজা ভীম-দেওগিরির যাদব নরপতি—আলাউদ্দিন খিলজির দাক্ষিণাত্য অভিযানে পর্যুদস্ত হয়ে—পালিয়ে এসে? এ সম্বন্ধে খুব একটা জোর দিয়ে কিছু বলা না গেলেও এটা হয়ত ঠিক এই ত্রয়োদশ শতকের অন্তিমকালেই এই দ্বীপে প্রথম তৈরী হয় মহিকাবতী মহিম নগরী বোম্বাই। এবং এই হিন্দু নগরীর জীবনচর্যা প্রায় দেড়শ' বছর ধরে চলেছিল এমনি মন্দাক্রান্তা তালে—সাগরের উন্মত্ত তরঙ্গের কোন অব্যক্ত আকুল বাসনা আছাড়ি বিছাড়ি করে মরেছিল কখনও বা এরই বহুদূর—প্রসাবিত বেলাভূমিতে। কখনও বা শান্তসমুদ্রের গান শুনতে শুনতে এর অকুলীন মাল্লা-মাঝির দল তাদের ডিঙি ভাসাত। সমুদ্রের অকৃপণ ভাণ্ডার থেকে মাছ কখনও বা শাঁখ, ঝিনুক সংগ্রহ করতে। প্রসন্ন সূর্য তাদের আশীর্বাদ করত। আর এই ইতর জনের জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে কোনরকম ভ্রুক্ষেপ না করে চলত নগরীর বিলাস জীবন তার আনন্দ উল্লাসের ফেনিল সমারোহ।

কিন্তু এই দ্বৈপায়ন জীবনের স্রোতধারা হঠাৎ একদিন নির্বারিত হয়ে গেল অস্ত্রের ঝনঝনায়। চতুর্দশ শতকের মধ্যপাদ হিন্দু রাজাদের হাত থেকে এল মুসলিম সুলতানদের দখলে। সুবা গুজরাটের হাতে পড়ল বোম্বাই। তাদের হাত থেকে পর্তুগীজদের হাতে। পনেরশ' চৌত্রিশ। অর্থাৎ ভাস্কো-ডা-গামা কোচিনে দেহরক্ষা করার বছর দশেক পরে। বাংলায় চট্টগ্রামে তাদের ঘাঁটি স্থাপনের বছর চারেক আগে—পর্তুগীজদের হাতে এই রাজ্যটা চলে এল। পর্তুগীজদের তখন খুব বোলবোলা। বীজাপুরের কাছ থেকে গোয়া লড়াই করে অধিকার করে নেয় আলফনসো দ্য আলবুকার্ক পনেরশ' দশের নভেম্বরে। তার মুসলমান নবাবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান বিজয়নগরের হিন্দু রাজা আলবুকার্কের দিকে। এই গোয়াকেই কেন্দ্র করে আলবুকার্ক আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, লঙ্কা, ইন্দোনেশিয়ার চারিধারে তার বাণিজ্য বিস্তার করে ফেললেন। লিসবনে রাজা মানুএল প্রাণখুলে মদত দিতে লাগলেন। আর গোয়ার গভর্নর আলবুকার্ক যেন সারা পৃথিবীটাকে নিজের পায়ের তলায় পেয়ে গেলেন। পেয়ে গেলেন সুবিস্তৃত এক মশলা সাম্রাজ্য। মহাপ্রতাপান্বিত খাস পর্তুগাল সম্রাট মানুএলের প্রত্যক্ষ সাহায্য পেয়ে আলবুকার্ক তোয়াক্কা করবে কার এই দুনিয়াদারে? দুনিয়াখানা তো তাঁর নখদর্পণে।

ইংরেজরা এই বন্দরভূমির দিকে লুব্ধদৃষ্টি দিয়েছিল সেই সুরু থেকেই। এখানে এসেই। সুরাটে তাদের কুঠি বসাবার সময় থেকেই। ষোলশ' চোদ্দ-পনের থেকেই। ষোলশ' ছাব্বিশে একবার:তো লড়েই গিয়েছিল·এটা পাবার জন্যে। কিন্তু পায়নি। ইংলণ্ডে দেখতে দেখতে রাজবংশ গেল। কুঠারাঘাতে ছিটকে পড়ল প্রথম চার্লসের মুণ্ড। রাজরক্তে ভেসে গেল লণ্ডনের মৃত্তিকা। ক্রমওয়েল এলেন। ইংলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—যাকে জন কোম্পানী বলে সনাক্ত করাই ভাল—কেননা ভারত বা আরব বা লোহিত সাগরে তখন য়ুরোপের নানাজাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভিড—ডাচ-ফরাসী-ওলন্দাজ স্প্যানীশ—আসলে রাজার দলে হলেও ক্রমওয়েলের সঙ্গে তো ঝগড়া করতে পারে না, ব্যবসা করে খায়—ধরলে ক্রমওয়েলকে—বোম্বাইটা কিনে নিন আমাদের ব্যবসার সুবিধা হবে। ব্যবসা ক্রমওয়েলেরও চাই—কেননা তদ্দিনে সারা ইংলণ্ড বুঝে গিয়েছিল—তার বাঁচার জন্য, তার সমৃদ্ধির, ঐশ্বর্যের জন্য চাই প্রাচ্যে ব্যবসা। কেননা তার প্রাচীন ব্যবসাতো পশমের। সে ব্যবসায় দিনগুজরান হয়ত নয়। কিন্তু রাজা উজির হওয়া যায় না। তাছাড়া সে ব্যবসাও তাদের তখন পড়ন্ত। লোকে কাঁচা পশম বা ভেড়ার লোম কিনতে চায় ইংলণ্ডের। কিন্তু তার বোনা পশমের কাপড—নৈব, নৈবচ।

এবং ইংরেজের অত কামনার ধন এই বোম্বাই একদিন একেবারে বিনা কসরতে পেয়ে গেল কোম্পানী। পেয়েছিলেন রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগাল রাজকন্যা—ক্যাথারিন অফ ব্রাগাঞ্জাকে বিবাহের যৌতুক হিসেবে। রাজা সেটা সহজে দেননি কোম্পানীকে। বেশ কয়েক বছর পরে বাৎসরিক নামেমাত্র দশ পাউণ্ড খাজনায় দ্বীপটি কোম্পানীকে দিয়ে দেওয়া হ'ল। এটা ষোলশ' বাষট্টি সালের কথা। এই সময় এই কুঠি হল সুরাটের অধীনে। তার প্রধান তখন সার্ জর্জ অক্সেনডেন। এর পরই এই আসনে বসলেন জেরাল্ড আঙ্গিয়ার। ষোলশ' উনসত্তর সালে ইনিই হয়ে এলেন খাস বম্বের গভর্নর। বোম্বাই-এর যত বোলাবোলা মুখ্যতঃ সবই এঁর আমলে। তিনিই এই শহরকে সুরক্ষিত করার এবং নবসাজে সজ্জিত করার পরিকল্পনা নেন।

সুরক্ষিত করার ব্যবস্থাই আগে করতে হল অ্যাঙ্গিয়ারকে। পর্তুগীজরা তখন সালসেটিতে। রাজায় রাজায় চুক্তি হ'ল য়ুরোপে—আর সাতসমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে এসে যারা এখানে আস্তানা বেঁধেছিল তারা এই চুক্তির সর্ত কি সহজে মেনে নেয়? বোম্বাই এতকাল ছিল পর্তুগীজদের। তারা রোমান ক্যাথলিক। আর ইংরেজরা প্রোটেস্ট্যান্ট। কাজেই ধর্মবিশ্বাসের একটা প্রচণ্ড সংঘাত লাগল। সেটাই খানিকটা বিক্ষোভের আকারে দেখা দিল খাস বোম্বাই-এ। বাসিন্দারা বেশ বাধা

দিল। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের যৌতুকের জমির দখল পাওয়া গেল ষোলশ' পঁয়ষট্টিতে।

কোম্পানী হাতে পেয়ে এটা সুরক্ষিত করতে লেগে পড়লেন। বোম্বাইয়ের তখন জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ। স্থলপথে মারাঠারা। মুঘলরা। আর জলপথে পর্তুগীজরা, ডাচেরা। সালসেটি তখনও পর্তুগীজদের। তারা সেখানে একটা শুল্ক থানা বসিয়ে দিলে। অ্যাঙ্গিয়ার বেশ চালু লোক। কর্মকুশল। রাজ্যচালনায় বেশ দক্ষ। সব দিক ভেবে চিন্তে তিনি একটা উদার নীতি গ্রহণ করলেন। তোমার ধর্মকর্ম তোমার থাক। তোমার ধর্মীয় উৎসবে কোন বাধাবন্ধ নেই। নেই জীবনযাত্রার উন্মুক্ত রাজ পথে বাধানিষেধের খানাখন্দ। সকল ধর্ম, সকল জাত-বেজাত দিব্যি সুখে শান্তিতে থাক। কোম্পানী তা' নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তা' ছাড়া সেকালে—অর্থাৎ পর্তুগীজ আমলে একটা বিশ্রী ব্যবস্থা ছিল স্থানীয় লোকেদের ধরে ধরে তারা বেগার দেওয়াত। মগের মুল্লুক আর কাকে বলে? জোর যার মুল্লুক তো তারই। অ্যাঙ্গিয়ার কিন্তু এইসব প্রথা রদ করে দিলে। দেশী লোকেরা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগল।

এবং দেখতে দেখতে তার বাসিন্দা বাড়তে লাগল। আমরা পরে দেখব, ইংরেজরা কলকাতা পত্তন করার পরও এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। পর্তুগীজ আমলে লোকসংখ্যা ছিল মাত্র দশ হাজারের মত। দেশী বেনেরা একটা মহল্লা করে ফেললে তাদের। পারশী, আরমানীরা—যারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে চায়—কেইবা না চায় এই দুনিয়ায়—সব দলে দলে এইখানে এসে বাস করতে লাগল। বোম্বাই বাড়তে লাগল দ্রুত। মাত্র আট বছরের মধ্যে তার জনসংখ্যা হয়ে গেল ছয় গুণ—ষাট হাজারের মত।

তবে বম্বের রোগ তো বড় কম নয়। অনেকটা সেই কলকাতারই মত—তার জলাভূমি, তার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া আর তার রোগডেরী। অ্যাঙ্গিয়ার তার জলনিকাশের জন্যে পাকা পয়ঃ প্রণালী তৈরীর পরিকল্পনা আঁটলেন। কিন্তু এসব কাজে তো টাকা লাগে। লণ্ডনে যথাসময়ে বার্তা গেল। কোম্পানী তো স্বভাব কৃপণ। তাছাড়া, সেত আর তখনও এখানে সাম্রাজ্য স্থাপনের খোয়াব দেখেনি। এসেছে ব্যবসা করতে। কাজেই স্বভাবতঃই এইসব বাজে খরচে রাজী হবে কেন? অ্যাঙ্গিয়ার ক্ষুব্ধ হয়ে সেখানের আদালত কাছারীকে দুঃস্থ নিবাসে পরিণত করে ফেললে।

অ্যাঙ্গিয়ার তার আমলে বোম্বাই-এর সব উন্নয়নে হাত দিলেও, একথা বলা ঠিক হবে না, তিনি কিছু শান্তিতে কাটিয়েছিলেন। মুঘল নৌবাহিনীর সেনাপতি সিদ্দিরা তো বম্বে বন্দর তাদের নৌবহরে শীতকালীন আস্তানা হিসেবে দাবী করত এবং

ব্যবহারও করত। অনেক আবেদন নিবেদনও হয়েছে। তবে তার কোন ফল হয়নি। অবশ্য মারাঠাদের কাছ থেকে এই সুবিধা কখনও ভোগ করেনি সিদ্দিরা। সিদ্দিদের ঝামেলার সঙ্গে আর এক অশান্তি নিজেদের মধ্যে। বোম্বাই-এ একটা বিদ্রোহ হয়ে গেল। হবে নাই বা কেন? কোম্পানীর কৃপণতায় তার লোকজন তো বেশ চটিতং। তাদের দিয়ে লড়াই করান হবে—অথচ তাদের কোন 'রেস্ত'র ব্যবস্থা করা হবে না, এ কেমন কথা? তারা ক্ষেপবে না? অবশ্য ক্ষেপে সুবিধে হ'ল না, কেননা, তাদের পরাজিত নায়ককে অচিরে ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হ'ল। তখনও এই জেরাল্ড অ্যাঙ্গিয়ারেরই রাজত্ব। অবশ্য এর তিন বছর পরেই অ্যাঙ্গিয়ারের এন্তেকাল হয়ে গেল এবং তার জায়গায় এলেন রোল্ট। গেলেন। তবে সেই যে বিদ্রোহ সেটা গেল না। ধূমায়িত থেকে সেটা এবার বিপুল বহ্ন্যুৎসবে ফেটে পড়ল। এবারে আর সহজে রেহাই পেল না কোম্পানী। এবারের নায়ক রিচার্ড কেগউইন। ইনি একজন জাঁদরেল লোক। ডাচেদের হারিয়ে সেণ্ট হেলেনা এনে দিয়েছেন ইংলণ্ডের রাজার চরণতলে! ইনিই এবার বেঁকে বসলেন। বললেন, 'কোম্পানীর এই মুনাফা-বাজী চলবে না।' বোম্বাই উপনিবেশটা হঠাৎ দখল করে নিলেন। বললেন, 'তাজ্জব কথা।' বললেন, 'ভোট হোক'। আর ভোটে তিনি-ই নির্বাচিত হয়ে গেলেন গভর্নর। তবে ইংলণ্ডেশ্বরের নামেই তিনি উচ্চারণ করলেন এক ঘোষণাপত্র—'এই অত্যাচার, অবিচার আর চলবে না। কোম্পানীর এই শোষণ আজ থেকে বন্ধ হয়ে গেল।' তিনি অত্যন্ত উদারভাবে দেশ শাসন করতে লাগলেন। কর সব কমিয়ে দিলেন আর সেই যে একদল বণিক ছিল যারা বিনা ছাড়পত্রেই ব্যবসা করত, তাদের তিনি একটা কার্যকর স্বীকৃতি দিলেন। মারাঠাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে ফেললেন। দেশে বাণিজ্য বাড়তে লাগল। আমানত হতে লাগল হু হু করে। ভাল কাজ কারবারে দেশের লোক খুশী।

কিন্তু এই বিদ্রোহ যেমন হাউই-এর মত জ্বলে উঠে বম্বের সারা আকাশ উজ্জ্বল করে তুলেছিল, তেমনি নাটকীয়ভাবেই একদিন হঠাৎ তার সমাপ্তি ঘটল। ইংরেজ পতাকা উড়িয়ে একদিন এক জাহাজ এসে ভিড়ল বম্বের বন্দরে। এবং তা' থেকে নামল, মহামান্য রাজা দ্বিতীয় চার্লসের এক চিঠি। রাজা হুকুম দিয়েছেন দুর্গটা সার্ জন চাইল্ডের হাতে সমর্পণ করে দেবার জন্যে। রিচার্ড কেগউইন বিনাবাক্য-ব্যয়ে সেই আদেশ মেনে নিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় পরিণত হ'ল।

এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট হলেন সার্ যশুয়া চাইল্ড। এই ভদ্রলোক নতুন আদলের মানুষ। তিনি বললেন, ওসব ভালো কথার কাল নয়।

এবার একটু শক্ত হতে হবে। বলংবলং বাহুবলং। নিজের কব্জির জোরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বললেন, ধনিকের মানদণ্ডে হবে না। রাজদণ্ড চাই। 'সিকিইওর ইংলিশ ডমিনিয়ন ইন ইণ্ডিয়া ফর অল টাইম টু কাম' আগামী দিনের জন্যে ভারতবর্ষে সুদৃঢ় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চাই। আরও বললেন, সুরাটে হবে না। সুরাট শুকিয়ে যাচ্ছে। ত'ছাড়া এখানে সবসময়ে মুঘলদের চোখে চোখে থাকতে হয়। কাজেই গুটাও পাততাড়ি। চলো বোম্বাই। যেখানে মুঘলদের এক্তিয়ার নেই। তাদের সর্বগ্রাসী হাত পৌঁছবে না। এবং মুঘল রাজত্বে ইংরেজদের ওপর কোন অত্যাচার হলেই তার শোধ তুলে নাও সমুদ্রে।

প্রসঙ্গত, বলা দরকার, স্যর্ যশুয়ার আগেই বম্বের বিখ্যাত গভর্নর অ্যাঙ্গিয়াংও কোম্পানীর ডিরেক্টদের লিখেছিলেন 'হাতে তলোয়ার নিয়েই এখন ব্যবসা করতে হবে'—'ম্যানেজ ইয়োর জেনারেল কমার্স উইথ দ্য সোর্ড ইন ইওর হ্যাণ্ডস্।'

সুরাটে তখন আর এক চাইল্ড সাহেব। যশুয়া চাইল্ডের ভাই জন চাইল্ড। সারা ভারতবর্ষে সব ইংরেজ কুঠির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি নিজে কয়েকজন কর্তাব্যক্তি ফ্যাক্টরদের নিয়ে একদিন কাউকে কিছু না বলে সুরাট ছাড়লেন। পাঁচই মে। ষোলশ' সাতাশি। বর্ষা তখনও পুরোপুরি আসেনি। মৌসুমী বায়ুর বয়ে আনা কালো ঝুড়ি ঝুড়ি মেঘে সুরাটের ঈশান আকাশ তখনও ভর্তি হয়ে যায়নি। সাহেব সুরাট ছাড়লেন। কাউকে না বলে কয়ে। সকলের অজান্তে।

কিন্তু না, তখনও ভারতবর্ষের সিংহাসনে সম্রাট ঔরঙ্গজেব। তার চোখকে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়। সঙ্গে সঙ্গে সুরাটের মুঘল শাসনকর্তা সুরাটের ইংরেজ কুঠির চারদিকে পাহারা বসিয়ে দিলেন। আটকে দিলেন যেসব কুঠিয়ালদের তখনও বোম্বাই নিয়ে যেতে পারেননি চাইল্ড। দুই পক্ষই তখন পাঁয়তারা কষতে সুরু করল। কিন্তু কেউই কারুর সরাসরি মুখোমুখি হতে চাইল না। অথচ বিলেত থেকে চাইল্ডের এই নিক্রিয়তার জন্যে চাপ আসতে লাগল। এবং এক সময়ে আকাশে তখন লঘুপক্ষ মেঘ। গুজরাটের সমুদ্রে তখন শান্তির নীলিমা সূর্যালোকে ঝকঝক করছে। সেই শান্তির আবহাওয়া ছিন্ন করে সোয়ালির মুখে হাজির হ'ল ইংরেজ নৌবহর। কর্তা জন চাইল্ড নিজে। তাঁর দূত গেল মুঘল দরবারে। তাদের জিনিসপত্র, লোকলস্কর সব কয়েদ করে রাখা হয়েছে এতকাল। কাজেই খেসারৎ চাই।

মুঘল নবাব এমনিই একটার আশঙ্কা করছিলেন। ইংরেজদূতকে কোন পাত্তা না দিয়ে তখনই তিনি ইংরেজ কুঠিয়াল তাদের দেশী গোমস্তা সবাইকে বেঁধে নিয়ে গেলেন। কুঠির সব মাল করলেন বাজেয়াপ্ত। চাইল্ডও আর জবাবের অপেক্ষা না করে সামনে যেসব ভারতীয় জাহাজ পেলে তাদের সবাইকে সঙ্গে বেঁধে বোম্বাই রওনা হয়ে গেল।

যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। মুঘল সরকারও ইংরেজদের এই ঔদ্ধত্য আর মেনে নিতে রাজী হলেন না। জলে যেমনি ওদের প্রতাপ স্থলে তো তারা নিতান্তই শিশু। কাজেই এতদিন ইংরেজদের তারা যেমন নজরবন্দী করে রাখতেন এবার আর সেই সুবিধা দিলেন না। বন্দীদের হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে দিলেন। এবং এই নাটকের শেষ হতে দীর্ঘ ষোলমাস লেগেছিল। এবং এই ষোলটি মাস ষোলশ' অষ্টআশির ডিসেম্বর মাস থেকে ষোলশ' নব্বই-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত তাদের এই শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাটাতে হয়েছিল। তবে শুধু ইংরেজ কুঠিয়ালদের নিগ্রহ করেই শান্ত থাকলেন না মুঘল সরকার। মুঘল নৌবাহিনীর প্রধান হিসেবে জাাঙ্গযার সিদ্দিকে বললেন, বোম্বাই আক্রমণ করতে।

ঝম ঝম করে লড়াই বেঁধে গেল। মুঘল নৌসেনা হুড়মুড় করে নেমে পড়ল বোম্বাই বন্দরে। কোথায় ইংরেজরা তাদের বাধা দেবে? তারা সব দুর্গের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলে। মুঘলরা ইংরেজ দুর্গ অবরোধ করে থাকল।

কিন্তু ক'দিনই বা থাকবে? সব থাকার একটা সীমা আছে। তাছাড়া বোম্বাই তো দ্বীপ বিশেষ। বাইরে থেকে খাবার আসবে জল আসবে তার ব্যবস্থা কই? তাছাড়া বোম্বাই তো তখন দুঃস্বপ্নের নগরী। আবহাওয়া মোটেই ভালো নয়। কাজেই একসময় জন চাইল্ড আত্মসমর্পণ করলেন। দেহি পদপল্লব মুদারং।

এতদসত্বেও কিন্তু ইংরেজরা কিছুটা নাকে খত দিয়ে ছাড়া পেয়ে গেল। ঔরঙ্গজেব জানতেন ইংরেজদের বেশী ঘাঁটানো ঠিক নয়। কেননা জলে তারা সত্যিই অপ্রতিহতপ্রতাপ। ইংরেজ বোম্বেটেতে তখন লোহিত সাগর, আরব সাগর ছেয়ে গেছে। আর বছর বছর ব্যবসার জন্যে না হোক হজ করতে যাবেত ধর্মপ্রাণ নরনারী। এই রাস্তায় তাদের তো কচুকাটা করবে ইংরেজরা। জাহাজ লুট করে ভারী ভারী জাহাজ ডুবিয়ে দেবে সাগরের জলে। একজন মুসলমান হয়ে তাঁর প্রজাদের কি করে এ-ভাবে রাক্ষসের হাতে ছেড়ে দেন তিনি? এ-ছাড়াও বোধ করি কথা ছিল। তখন দাক্ষিণাত্য অভিযানের পাঁয়তারা করেছেন তিনি। মারাঠাদের বড় বাড় বাড়ছে। তাদেরও খর্ব করতে হবে। ওদিকে গঙ্গার উপকূলে সুদূর বাঙলায় জব চার্নকের সঙ্গে নবাবের জোর ঝামেলা চলছে। এদিকে ইংরেজরা ব্যবসা গুটিয়ে নিলে তাঁর রাজকোষে অর্থাগম কমে যাবে না? এইসব দিক ভেবেই বোধহয় সম্রাট এক ফরমানে ইংরেজদের সব দোষত্রুটি ক্ষমা করে দিলেন। জানুআরির চৌঠা। ষোলশ' নব্বই। তবে তার আগে তলোয়ারে আঘাতে তিনি নতজানু করে ছেড়েছেন ইংরেজদের। এবং স্যার জন চাইল্ড বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা চেয়েছেন! ইংরেজদের পুরানো সব কুঠি ফিরিয়ে দেবার হুকুম দিলেন সম্রাট।

ব্যবসা করার লাইসেন্স মঞ্জুর করলেন তিনি। ইংরেজরা খেসারত দিলে, দেড়লক্ষসিক্কা টাকা। আর যেসব ভারতীয় জাহাজ লুঠ করে নিয়েছিল—সব ফেরৎ দিয়ে দিলে। তবে বেচারী জন চাইল্ডের চাকরি গেল। তবে তার ভাগ্য ভালো ; এই দুঃসংবাদ তার কাছে পৌঁছবার আগেই তিনি দেহরক্ষা করলেন। তিনি মরে বাঁচলেন।

কিন্তু সেই যে বোম্বাই-এ ইংরেজরা সরে এল, সেখানেই রয়ে গেল। ইংরেজ কুঠিরে সেটাই হল মূল ঘাঁটি। তবে পাকাপাকিভাবে হতে সময় লেগে ছিল আরও কয়েকটা বছর। কারণ আর কিছুই নয় প্লেগ মহামারী। প্লেগে ইংরেজদের ভারী ভয়। খাস লণ্ডনে এই প্লেগের জন্যে তাদের অফিস বন্ধ হয়ে যাবার দাখিল হয়েছিল। তাছাড়া বোবাই-এর আবহাওয়া এমনিই তো খারাপ। এর ওপর প্লেগ। গোদের ওপর বিষফোঁড়া।

তবে বোম্বাইকে আবার একবার লড়াই দেখতে হয়েছিল। সেটার নাম বেসিনের লড়াই। সেটা হয়েছিল পর্তুগীজদের সঙ্গে। কোঙ্কনের বুকে পর্তুগীজ ঘাঁটি। সতেরশ' ছত্রিশ সাঁইত্রিশের কথা। বাজীরাও তাঁর 'ব্লিৎসক্রিগ' কাহিনী দিয়ে ঝড়ের মত গতিতে থানা অধিকার করে নিলেন। এবং বর্ষার সালসেটি কব্জা করে ফেললেন। বর্ষার আকাশ একটু পরিষ্কার হতেই মারাঠা বাহিনী বেসিন আক্রমণ করল। কিন্তু পর্তুগীজরা তো কম লড়াকু জাত নয়। তারা মরিয়া হয়ে লড়ে গেল। ন' হাজারের মারাঠা বাহিনী দুর্গের প্রাকারে উঠতেই পারলে না। ভেতরে ঢুকবে কি ?

এদিকে খাস গোয়ার পর্তুগীজ বড়কর্তাব টনক নড়ল। তিনি পেড্রো ডি মেলোকে দুই জাহাজ সৈন্য দিয়ে পাঠালেন। এদিকে মারাঠাদেরও লোকজন এসে পড়ল। বাজীরাও তাঁর ভাই চিমাজী আপ্পাকে পাঠিয়েছিলেন বেসিন অভিযানে। নিজে ব্যস্ত ছিলেন মালবে। সেখানে লড়াই ফতে করে এলেন বেসিনে। সঙ্গে এলেন মলহর রাও হোলকার, রণোজী সিন্ধিয়া, মানাজী আঙ্রে। ভাই চিমাজী আপ্পাত ছিলেনই পর্তুগীজ সেনাপতি ডি মেলো ভেবেছিলেন থানাটাই আসল। থানাটাকে যদি দখল করতে পারা যায়, সমস্ত মারাঠা সৈন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে তার মূল বাহিনী থেকে। তাকে পিষে মারা সহজ হবে। কিন্তু পেশোয়া বাজীরাও রাজ্যশাসনে। আক্রমণ রচনায় রণবিদ্যায় অত্যন্ত ধুরন্ধর। সারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার জুড়ি মেলা ভার। বোধকরি মারাঠা—সূর্য শিবাজীর পরেই। তিনি ডি মেলোর এই চালটা আর বুঝবেন না ? সন্নিবেশিত বিরাট মারাঠা বাহিনী মারাত্মকভাবে আক্রমণ করলে ডি মেলোকে—এবং অবরুদ্ধ বেসিনকে সাহায্য করতে এগোবার আগেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। তার নৌবাহিনী ছত্রাকার।

বেসিনের অবস্থা তখন করুণ। কে কাকে সাহায্য করবে? পাশেই বোম্বাই

ইংরেজ বোম্বাইদ্বীপে। তার কাছে কাতর প্রার্থনা করলে পর্তুগীজরা সাহায্যের জন্যে। কিন্তু আপনি বাঁচলে বাবার নাম। অবশ্য ইংরেজরা পর্তুগীজদের কখনই ভালচোখে দেখত না। কেননা তারা তো পর্তুগীজদের হাতে কম বেগ পায়নি! কিন্তু এখানে সাহায্য করতে এলে মারাঠারা কি ইরেজদের দফারফা করবে না? তুড়ুং ঠুকে দেবে না? তাদের উভয়সংকট।

কাজেই বোম্বাযের ইংরেজ গভর্নর পর্তুগীজদের কেবল যেটা নিঃখরচায় দেওযা যায় এই পৃথিবীতে তাই যথেষ্ট পরিমাণে দিতে থাকলেন—বাণী। উপদেশ। আর ভিতরে ভিতরে মারাঠাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সঙ্গে একটা রফা করতে চেষ্টা করলেন। ইংরেজদের একটা মস্ত গুণ তারা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি দেখে সহজেই আন্দাজ করতে পারে আখিরে এ যুদ্ধে কে জিতবে। এই দূরদৃষ্টি তাদের অনেক বাজে ঝামেলা থেকে বাঁচিযেছে। এখানে বোধকরি তারা বুঝে থাকবেন, পর্তুগীজদের কোন আশা নেই, তা' তারা যতই লড়ুক না কেন। মারাঠাদের দিকেই পাল্লা ভারী। তাই তারা অচিরে মারাঠাদের বারুদ, গুলি, টোটা সরবরাহ করে সাহায্য করতে শুরু করে দিলেন। এবং ব্যাপারটা ক্রমশঃ এমনি দাঁড়াল যে, ঐতিহাসিকরা এও বলেছেন, যে বেসিনের যুদ্ধে পর্তুগীজ সেনাপতি মারা যান, যার গুলিতে, তিনি একজন ইংরেজ!

এই সমযে পর্তুগীজেরা যেসব আবেদন নিবেদন করে চিঠি লিখেছিল বোম্বাইযের ইংরেজ গভর্নরের কাছে—সেগুলি বড়ই মর্মন্তুদ! 'সৈন্যরা সব ক্ষুধার তাড়নায় পীড়িত। ক্রমাগত লড়াযে ক্লান্ত। তাদের মাইনে দেবার পযসা নেই। চার্চের সব ফলকগুলো কবে গলিযে ফেলা হযেছে। মারাঠারা সব সমুদ্র উপকূলে 'মাইন' বসিযেছে। শহরের কাছেই তাদের কামান মুখ উঁচু করে দাঁড়িযে ইত্যাদি।' এবং এতে বরফ কিছুটা গলল। ইংরেজরা দুশ' ব্যারেল বারুদ আর চার হাজার রাউণ্ড কামানের গোলা পাঠালেন পর্তুগীজদের।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। যদিও লড়ল বটে পর্তুগীজরা। এক আধবার নয়, বারবার। এগার বার সম্মিলিত মারাঠা বাহিনীর আক্রমণ তারা ফিরিয়ে দিলে। রাত্রির লড়াযের পর যখন দিবালোকে জেগে উঠল বেসিন দুর্গ, মারাঠারা দেখল, রাত্রের ভাঙা দুর্গ, প্রভাতের আলোকে আবার পুনর্গঠিত। শেষবেশ মারাঠা সেনাপতি চিমাজী তাদের এক উদার প্রস্তাব দিলেন। বললেন, আপনারা যদি শহর ত্যাগ করে—গোয়া বা দমনে চলে যেতে চান, আপনাদের কেউ কেশাগ্র স্পর্শ করবে না। নতুবা সারা শহরটা আমরা মাইন বসিয়ে উড়িয়ে দেব। চিমাজী পর্তুগীজদের আরও বললেন, 'যারা শহরে থাকবে আত্মসমর্পণ করবে—তাদের ধর্মের ওপর কোন হস্তক্ষেপ করা হবে না।'

কি আর করবেন, পর্তুগীজ সেনাপতি সাদা পতাকা উড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন গোয়া। আর বেসিনের ঐতিহাসিক যুদ্ধের ওপর যবনিকা নেমে এল। এতে পর্তুগীজরা হারল বটে, কিন্তু লড়ে হারল। সম্মানের সঙ্গে হারল। বাইশ হাজার মারাঠা সৈন্যের পাঁচ হাজারের অন্তিম শয্যা রচিত হ'ল বেসিন দুর্গের পাদদেশে।

তবে এই যুদ্ধের আসল ফায়দা ওঠাল বোম্বাই-এর ইংরেজরা। তারা করিৎকর্মা লোক। তাদের কাউন্সিল দুটো কাজ করল। দেশী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলল ত্রিশ হাজার টাকার মত। অনেকটা মারাঠাদের হাত থেকে কলকাতা বাঁচাবার জন্যে 'মারাঠা ডিচ' কাটবার সময় যেমন করেছিল তেমনি। আর কোনরকম কালবিলম্ব না করে দু'জন দূত পাঠালে। বলা বাহুল্য উপঢৌকন সহ। এক কাপ্তেন ইঞ্চবার্ডকে। শিবাজীপুত্র শাহুজীর কাছে। আর একজন কাপ্তেন গর্ডনকে বেসিনে। চিমাজী আপ্পার দরবারে। তাঁর জয়ে অভিনন্দন জানিয়ে। তাদের তখন তুঙ্গে বৃহস্পতি। দুই দৌত্যই সফল। মারাঠাদের সঙ্গে তাদের এক সন্ধিপত্র রচনা হয়ে গেল। যার ফলে তাদের সেই বহু প্রার্থিত ব্যাপারটারই ফয়সালা হয়ে গেল। দাক্ষিণাত্যে বিনাশুল্কে ব্যবসার অধিকার তারা পেয়ে গেল। বারই জুলাই। সতেরশ' উনচল্লিশ।

তবে ততদিনে বোম্বাইয়ে পার্শীরাও বেশ জমিয়ে বসেছে। সুরাটের বিখ্যাত জাহাজ ব্যবসায়ী লৌজী নস্সরামজী ওয়াদিয়া এসেছেন বোম্বাইয়ে—বছর তিনেক হ'ল। শতাব্দীর শেষে আমরা দেখলাম লর্ড ভ্যালেন্টিয়া বলছেন, বম্বে প্রায় পার্শীদেরই দখলে। তবে বোম্বাই মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের পর এবং পুরোপুরি ইংরেজরা স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব করতে পারল লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে—কলকাতায় যখন লাটভবন, ব্যারাকপুরে যখন চিড়িয়াখানা, আর বাগানবাড়ী তৈরীর কাজ পুরোদমে চলছে। তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শশ্মানশয্যা ছেড়ে জলদর্চ্চিতনু উনবিংশ শতক সদ্য ভূমিষ্ট হয়েছে মাত্র!

আমরা এখনও সুতানুটি গিয়ে পৌছাইনি। সেখানে পৌছে দেখব, কলকাতার সঙ্গে বোম্বায়ের মিল অনেক। সেই জলাভূমি, সেই দুর্গন্ধ, দূষিত আবহাওয়া, সেই অগণিত মৃত্যুর খতিয়ান। 'দুইটি বর্ষায় একটি জীবন'—এই প্রবাদ বম্বেরই। তবে এই অসংখ্য মৃত্যুর ঘটার জন্যে দায়ী সবই যে বম্বের খারাপ আবহাওয়া; তা' নয়। প্রচুর গোমাংস ও শূকরমাংস খাওয়া। কড়া পর্তুগীজ মদ, আঁটোসাঁটো জামাকাপড়—ইংরেজদের অকালে মৃত্যুর কারণ। তালের রস তাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত করত মাত্র। এই তাল ও নারকেল গাছের গোড়ায় 'বাকশ' বলে একরকম পচা মাছ সার হিসেবে ব্যবহার করা হ'ত। আর তা থেকে উঠে আসা দুর্গন্ধ বম্বের বাতাস বিষিয়ে তুলত। হ্যামিল্টন সাহেব বলেছেন। একটা ঘন কুয়াশা এই 'টডি' গাছগুলোকে ঘিরে থাকত

আর ইংরেজদের মাথা আর ফুসফুস জাম করে রাখত—আর তা থেকেই হত ক্ষয়, জর আর পেট খারাপ।

তবে এই সমুদ্রের তীরভূমি বরাবর তাল, তমাল, নারিকেলবীথির পত্রমর্মরে যে কূজনগুঞ্জন—তমালতালী বনরাজী শোভা - বম্বের তীরভূমি আলোকিত করে থাকত —সেগুলি যখন এতই খারাপ, তার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের এতই ক্ষতিকারক, সেগুলি কোম্পানীর কর্তারা কেটে ফেলেনি কেন? কেন আর—ঐ যে নেপলিয়ন একদা গালাগাল দিয়ে বলেছিলেন—ইংরেজরা বেনের জাত—নেশন অফ শ্যপকীপারস্— কারণটা সেইখানেই। প্রতি হাজার নারিকেলে কোম্পানীর খাজনা আদায় হ'ত পঁচিশ টাকা। এতগুলো টাকা কি হাতছাড়া করা যায় নাকি? তার জন্যে মরুক না কেন কয়েকটা ইংরেজ। এই নিয়ে সেকালে কম চিঠি লেখালেখি হয়নি। এক-সময় কোম্পানী ঐ পচা মাছ সার হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করে দিলে এবং তাতে ফলও ভালো হ'ল। বিলেত থেকে কম কর্মচারী আমদানী করতে হ'ল। কিন্তু এদিকে নারকেলের ব্যবসা গেল পড়ে। বিশ হাজার গাছের গড়ে আঠারটার বেশি নারকেল হ'ল না। তবে কোম্পানী শুকনো মাছের গুঁড়ো সার হিসেবে ব্যবহার করতে বললে। কোম্পানীর খাতায় কলমে বলা হ'ল - এই 'প্ল্যান'—ফুল প্রুফ। সাংঘাতিক কাজ হয়েছে। জানি না, এই প্ল্যান যিনি করেছিলেন, তাঁকে শিরোপা দেওয়া হয়েছিল কিনা। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেল ডাক্তার গ্রোস বলছেন—'বোম্বে ইংরেজদের সমাধি ক্ষেত্র'—এটা সতেরশ' পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দের বাস্তব ছবি। ঐ সময়ে জর, পেটখারাপ ছাড়াও বম্বের ইংরেজদের রোগডেরীর দীর্ঘ তালিকায় রয়েছে কলেরা, স্কার্ভি, পঙ্গুত্ব, প্যারালিসিস, বসন্ত, বাত, পাথ্‌রী, কৃমি— কি নয়! তাতজরও খুব হ'ত—বিশেষ করে নবাগতদের। অতিরিক্ত মদ খাবার জন্য লিভারের রোগ তো আখছার। এর ফলশ্রুতি হিসেবে বম্বের জনসংখ্যা মাঝে মাঝে বাড়লেও সব সময়েই পড়তির দিকে। ব্যাপারটা এমনিই দাঁড়িয়েছিল যে, সতেরশ' আঠারয় গভর্নর বুনকে লিখতে দেখা যাচ্ছে দ্বীপের কাজকর্ম চালাতে দরকার ছয়শো লোকের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে একশ' কুড়ি জনকে!

তারপর ছিল সুরাটের সঙ্গে বম্বের আক্‌ছা আকচি। সুরাটের প্রেসিডেণ্ট সার্ জন গেয়ার বললেন, বম্বের গভর্নর সার্ নিকলস ওয়েটকে আমি মানি না। গেয়ারকে সুরাটে আটকে রাখা হ'ল। এদিকে কদিন পরে দেখা গেল ওয়েটেরও কয়েদ হয়েছে। ভদ্রলোককে কাউন্সিলের এক সভায় একটা গোজামিলের রহস্যভেদ করতে বলা হলে তিনি তো তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বললেন, থোড়াই কেয়ার করি মশায় আপনাদের। মাসের হিসেবপত্র পাশ করা ছাড়া, আপনাদের সঙ্গে কোনরকম কথা বলতে আমি রাজী নই। এই না বলে গভর্নর সভাকক্ষে তালাচাবি লাগিয়ে

সেই যে ঘরে চলে গেলেন, আর সভাই ডাকলেন না! পরে অবশ্য ভদ্রলোক একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, জানেন না মশায়, মিথ্যে বলাই এখানকার রীতি—এখানকার রীতি পরস্পরের গলাকাটা! আপনি বোধহয় ভাবছেন আমি আপনার শত্রু। বিশ্বাস করুন তা আমি নই, এবং যারা আপনাকে মিত্রভাবে কথা বলছে, জেনে রাখুন তারাও তা নয়—। উৎকোচ দেওয়া-নেওয়া, ষড়যন্ত্র, করাপসন, চুরি, জোচ্চুরি, নোঙরামি-এই নিয়েই নতুন তৈরী বোম্বের ইংরেজ উপনিবেশ। গভর্নর বুন বলেছেন, সর্ষের মধ্যেই ভূত ছিল। কোম্পানীর কর্মচারী যে যেদিকে পারত অসাধু উপায়ে টাকা লুঠত। কোম্পানীর দরকারী জিনিসপত্র আগাম কিনে রেখে মুনাফা করে কোম্পানীকেইবিক্রি করত। গভর্নররা নিজেরাই চোখের চামড়া না রেখে উপঢৌকন নিত, এবং বলা বাহুল্য দেশী দালালরা তাদের মদত জোগাত। এমনি একজন দালাল ছিল বনওয়ালদাস। সৈন্যদের মধ্যেও মদের মাইফেল চলত। নীচু জাতের মেয়েদের উপভোগ এবং তার জন্যে ফিরঙ্গ রোগ বম্বেতে বড় অজানা ছিল না।

তবে বম্বের সাধারণ যানবাহনে বৈচিত্র্য ছিল। সেখানে ঘোড়ার প্রচলন কম। কাজেই গরুতে টানা গাড়ী চলত খুব। কাউন্সিলের কর্তাদের অবশ্য একটা করে ঘোড়া থাকত, পাল্কীর বেয়ারা থাকত। আলাদা বাড়ীও থাকত। তবে বম্বেতে কালো ধলোর বিচার ছিল না পাড়ায়। কালাদের জন্যে আলাদা মহল্লা চালু ছিল না বড়। সাহেবরা সকালে উঠে একটু ঘুরে আসত। এসে ব্রেকফার্স্ট। নটা থেকে বারটা পর্যন্ত অফিস। একটা থেকে ডিনার। দুটো থেকে আবার পাঁচটা অফিস। তারপর চা। সান্ধ্যভ্রমণ। তারপর রাত্রির আহার। আহারে নিমন্ত্রণ হ'ত বন্ধু বান্ধবদের। পরে পশ্চাতে রাত্রির আহারটা সন্ধ্যায় হ'ত। দুপুর দুটোয় 'টিফিনের' প্রচলন হয়! ক্রিসমাসে গভর্নর দ্বীপের বিশিষ্ট অধিবাসীদের নৈশভোজে নিমন্ত্রণ জানাতেন। বোম্বায়ের ইংরেজ আমলের সুরুতে পর্তুগীজ মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে হ'ত। স্থানীয় মেয়েরাও ইংরেজদের ঘর করতে সুরু করে। তবে খাস ইংরেজ মেয়েদের সংখ্যা বম্বেতে কখনই পর্যাপ্ত হয়নি। শ্রীমতী গ্রাহাম বলেছেন—পুরুষ আর নারীর অনুপাত তিনের জায়গায় এক।

ঘোড়ায় চড়া, ভোজ, নাচ, তাস কখনও-বা শিকার, মুরগীর লড়াই, কুকুরের লড়াই এই নিয়েই কাটত বম্বের সাহেব জনের অবসরের কাল। বাইজীর নাচ, হুঁকো খাওয়া—তাও ছিল। আর এক মজা ছিল কুঠিয়াল সাহেবদের। তারা পায়রা চড়ুই মারবার ভান করে ঢুকে পড়ত দেশী পাড়ায়। বানিয়ারা

হাঁ-হাঁ করে বেরিয়ে আসত। আর কিছু টাকা সেলামী দিয়ে তাদের ঘরে পাঠাত। বলা যায় না তো, গোরা বলে কথা, কি জানি কি ঝামেলা বাঁধায়!

*

কিন্তু আর বোম্বাই-এর কথা যাক। আমাদের যেতে হবে অনেকদূর। সুতানুটি। হুগলীর বালুকাবেলায় নগণ্য একটা গ্রাম, একটা হাটে। কিন্তু সেখানে পৌঁছাবার আগে আমরা যাব পাটনা। যেখানে তখন কর্মরত সুতানুটির সমঝদার—জব চার্নক। কলকাতার তথাকথিত 'ফাউণ্ডার'—চার্নক তখন সেখানকার চতুর্থ কুঠিয়াল।

জন কোম্পানী হঠাৎ পাটনায় কুঠি করতে গেল কেন? করতে গেল মুখ্যতঃ একটাই কারণে। সোরা, সল্ট পিটার, পটাসিয়াম নাইট্রেট যা নাকি বারুদে লাগে, সেটা অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় সেখানে। তখন বিলেতে' যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই আছে। কাজেই সোরার চাহিদা খুব। এবং পাটনার সোরা সেই য়ুরোপ বাজারে খাঁই মেটাত অনেকটা। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, কেবল সোরাই পাটনার একমাত্র পণ্য। এখানে সুলভ সামগ্রীর মধ্যে ছিল কস্তুরী এবং ভূটান থেকে পাঠান নানারকম দ্রব্যগুণ সম্পন্ন ভেষজ, হলুদ, সোহাগা, বোরাক্স, গঁদ, আঠা, এবং তাফেতা, এলাচী, আমবার্লি বা অমরবতী প্রভৃতি সূক্ষ্ম কাপড়, সার্সি এবং মশলা বলতে এলাচী। জন কেন পাটনার কুঠিয়াল ছিলেন? তাঁর দেওয়া তালিকা থেকে এই জিনিসগুলোর নাম দেওয়া হ'ল। সোরা আমদানি জন কোম্পানীর কর্তারা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন—সেটা বোঝা যাবে 'বে অব বেঙ্গলে' ন্যস্ত টাকার লগ্নী কি রকম হবে তার নির্দেশনামা থেকে। লীডেন হল স্ট্রীট থেকে বলা হচ্ছে—মোট টাকার অর্ধেকটাই খাটাবে সোরার বাজারে। বাকিটা রেশম, চিনি আর কাপড়ে!

এখন এই সোরা চালান হত কি ভাবে? প্রথম প্রথম দেশী গাধাবোটে। মাল-বওয়া নৌকা ভাড়া করে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছিল ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠছিল। সোরা বোঝাই করে দেশী মাঝিমাল্লা হাঁকতে লাগল দ্বিগুণ ভাড়া। নয়ত তারা পাল নামিয়ে বসে রইল। যতই তোমার তাড়াতাড়ি থাক, তারা ঠায় বসে থাকবে। আর কখনও আবার গ্যাঁটের কড়ি গুণে দিয়েও রেহাই নেই—মাঝপথে তারা মালপত্র নিয়ে বেপাত্তা। কোন্ দিকে যাবে কোম্পানী? এর পেছনে মুঘল আমলাদের উস্কানি যে ছিল না তা বোধহয় নয়। মাঝে মাঝে দারোগাদের অহেতুক ধমকানি, জোর জুলুম—টাকা চাই—নয়তো নৌকা আটক। এওতো প্রায় ভাগীরথী-তাপ্তী-কৃষ্ণা সব নদীরই ঘাটে ঘাটে নিত্য দিনের ঝামেলা। তখনও সরকারিভাবে পাটনা কুঠি বসেনি। পাটনার ইংরেজ ব্যবসাদারেরা মসুলিপত্তম থেকে এক ধরনের হাল্কা জাহাজের মত নৌকা আনালে। তাতেও দেখা গেল চলাচলের অনেক অসুবিধা। সেটা বিক্রি করে নিজেরাই তারা সেই আদলে একটা নৌকা বানালে। এতে দু শ' টন সোরা বোঝাই করা যেত। লম্বায় পঞ্চাশ গজ, চওড়ায় পাঁচ আর গভীরে আড়াই। আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন তাঁর বিবরণে এই নৌকারই প্রশংসা করে গেছেন।

সোরা রপ্তানীর প্রথম যুগে কাঁচা সোরাই পাঠান হ'ত বিলেতে। এখানে তা শোধন করার মত তামা পাওয়া যেত না। তাছাড়া শোধন করার মত সুবিশাল পাত্রও ছিল দুর্লভ। পাটনা জানালে হুগলীকে। হুগলী খবর পাঠালে মাদ্রাজে। মাদ্রাজ খবরটা পাশ করে দিলে সুরাটে: 'আফ্রিকা থেকে এই সোরা সাফাই করার জন্যে বেশ পড পাত্র পাঠাও। সেখানে চিনি শোধনের জন্যে যেসব পাত্র ব্যবহার করা হয় সেগুলি দিয়ে কাজ হবে। সুবিশাল সেইসব পাত্র আফ্রিকা থেকে এল হুগলীতে। প্রথম প্রথম সেখানেই সোরার শোধনপর্ব সারা হ'ত। কিন্তু কালক্রমে পাত্রগুলো পাটনায় পাঠান হ'ল। সেখানেই সোরার শুদ্ধির কাজ একেবারে সেরে তাকে নৌকায় চাপান হ'ত। ডাচেরা এই কাজ করত ছাপরায়। দেখা যাচ্ছে, খুব বুদ্ধিমান ছাত্রের মত ইংরেজরা পড়াশুনা অনেক দেরীতে সুরু করলেও, বুদ্ধির জোরে, তারা বারবার ডাচেদের ডিঙিয়ে গেছে। তারা সিংঘী আর নৌনগরে তাদের শোধন কারখানা বসিয়ে ফেললে। তবে, আগেই বলেছি, সোরার চাহিদা উত্তরোত্তর খুব বাড়ছিল, এবং সেই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাবার জন্যে তারা সব সময় সংগৃহীত সোরা শোধন করার অপেক্ষা করতে পারত না। সাদা ও কটা দুই রঙেরই সোরা বোঝাই হত নৌকায়। রাস্তায় রাজমহল, কাশিমবাজারের চৌকি পেরিয়ে যেত হুগলী। সেখানে তো বিরাট গুদাম। নিকলস ম্যান্থসি সেই গুদামঘর দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন—এতবড়! সেই গুদাম থেকে আবার নৌকা বোঝাই করে যেত বালেশ্বর। সেখানে জাহাজে বোঝাই করে পত্রপাঠ বিলেত! তখনও আর জাহাজ আসত না হুগলী। প্রথম জাহাজ আসে হুগলীতে ক্যাপ্তেন স্ট্যাফোর্ডের 'ফাকন' জাহাজ। জব চার্নক কাশিমবাজার কুঠির প্রধান কুঠিয়াল হবার বছর খানেক আগে!

কাগজপত্রে কুঠির নাম পাটনা হলেও বলে রাখা ভাল জন কোম্পানীর কর্মচারীরা কেউ পাটনায় থাকত না। ডাচেরাও তাই। ম্যানুচি তার সাক্ষী। পাটনার প্রধান কুঠিয়াল থাকত হাজিপুরে। কারণ পাটনায় থাকা মানেই নবাবের কাছে থাকা। তার মানেই আবার নবাবের আমলা পরিষদের কাছে থাকা। তাঁদের চাহিদার অন্ত নেই। নিত্য 'দেহি' 'দেহি' রব। এটা দাও। ওটা দাও। না দিলেই নানান দিক দিয়ে ঝামেলা পাকাবে। কাজেই যতদূর সম্ভব দুর্জনসংসর্গ পরিহার করে হাজিপুরে অবস্থান। একেবারে গঙ্গার অপর কূলে। সেখানে একটা বাড়ী ভাড়া করে তিনি থাকতেন। ভাড়া মাসে সাড়ে তিন টাকা। নওনগরেও ইংরেজদের একটা কুঠি ছিল। সেখানে আর ভাড়াটে বাড়ী নয়, নিজস্ব বাড়ী। অবশ্য নওনগরকে এখন আর সনাক্ত করা যায় না। আর পাটনার বার মাইল উত্তরে ইংরেজদের ছিল

আরও একটা আড়ত। জায়গার নাম সিংঘী। আজকের সিংঘিয়া। হাণ্টার সাহেবের মতে গণ্ডক নদীর বামে। এর মধ্যে সিংঘিয়ারই আবহাওয়া ভালো। সেখানেই কোম্পানীর চাকরবাকর সব থাকত। এরই আশে পাশে গাঁয়ে ঘরে সব সোরা তৈরী হ'ত।

তবে সরকারীভাবে পাটনা কুঠির পত্তন হয় ষোলশ' আটান্নয়। আমরা পরে পরে দেখব ইংরেজরা ষোলশ' কুড়িতে সেখানে কুঠি বসিয়েছিল কিন্তু সেটা লাভজনক না হওয়ায়, উঠিয়ে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে বিহারে কিছু কিছু তাদের আড়ত রয়েছে। রয়েছে বোধকরি অন্য কারণে। সেটা—এই। বিহারে সোরার কারবার চালু করে ডাচেরা। অনেকে মনে করেন, ডাচেরা সমস্ত মালগস্ত করে ফরাসী থাকলে ফরাসী, ইংরেজ থাকলে ইংরেজ এদের মধ্যে হিস্সেমত ভাগ করে দিত। অনেক দিন ধরে এই ধরনের একটা 'কোঅপারেটিভ' ব্যবসাকে ডাচেরাও চালু করেছিল। য়ুরোপের সব ব্যবসায়ী জাতের মধ্যে তারাই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে দক্ষ। এবং এই দক্ষতার জন্যেই এই ধরনের ব্যবসা সার্থক হয়েছিল। এই সোরার ভাগ নেবার জন্যেই বোধহয় ইংরেজরা ছোট ছোট এইসব আড়ত চালু রেখেছিল।

পাটনার কুঠির পত্তনের তারিখ যেমন ঠিক করে বলা শক্ত তেমনি বলা শক্ত পাটনার কুঠির প্রথম কর্মচারা কারা। ষোলশ' সাতান্ন আটান্নর সাতাশে ফেব্রুআরি তারিখে একটা ঐতিহাসিক চিঠি পাওয়া যায়। লিখেছেন জন কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টর তাঁদের লীডেনহল স্ট্রীটের সদর দপ্তর থেকে। হুগলীর এজেণ্ট বাহাদুরকে লেখা চিঠিখানা বাঙলায় এই: আমাদের একত্রিশে ডিসেম্বরের চিঠি পাঠাবার পর আমরা এই ব্যাপারে অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছি এবং ভারতবর্ষের সকল অংশে আমাদের বিভিন্ন কুঠিগুলি সম্বন্ধে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে বেশ কিছুটা এগোন গেছে এবং সকল কুঠিকে—উত্তরে বা দক্ষিণে—পারস্য বা বঙ্গোপসাগরীয় সব কুঠিই এক প্রেসিডেন্সির অধীনে থাকবে। এই প্রেসিডেন্সি থাকবে সুরাটে। আমরা এইভাবেই আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের চারটে এজেন্সি থাকবে, একটা থাকবে সেণ্ট জর্জ দুর্গে, একটা ব্যাণ্টামে, তৃতীয়টি পারস্যে এবং আর একটি হুগলিতে—এই শেষেরটি আপনার আবাসস্থল। এবং সেই কারণেই আপনার জানা দরকার এই ব্যাপারে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেটি হচ্ছে এই:

হুগলীতে আমরা নিয়োগ করছি

মিঃ জর্জ গার্টন—আমাদের এখানে এজেণ্ট থাকবেন। এঁর মাহিনা আমরা ঠিক করেছি বছরে একশ' পাউণ্ড; দ্বিতীয় পদাধিকারী—মাহিনা বছরে চল্লিশ পাউণ্ড; তৃতীয়—ম্যাথিউস হলসটেড্ বার্ষিক মাহিনা ত্রিশ পাউণ্ড; উইলিঅম র‍্যাগডেল—

চতুর্থ—মাহিনা কুড়ি পাউণ্ড ; টমাস ডেভিসপঞ্চম—মাহিনা কুড়ি পাউণ্ড।

বালেশ্বরে—

টমাস হপকিন্স চিফ, চল্লিশ পাউণ্ড মাহিনায় ; ওয়ান্টার রজার্স দ্বিতীয়—তিরিশ পাউণ্ড, উইলিঅম ডেনিএল তৃতীয়—তিরিশ পাউণ্ড এবং যশুয়া রাইট চতুর্থ—কুড়ি পাউণ্ড মাহিনায়।

কাশিমবাজারে—

জন রেন চিফ চল্লিশ পাউণ্ড মাহিনায ; ডেনিএল শ্যেলডন দ্বিতীয়—তিরিশ পাউণ্ড ; জন প্রিডি তৃতীয়—তিরিশ পাউণ্ড এবং জব চানক চতুর্থ—কুড়ি পাউণ্ড মাহিনায়।

পাটনায়—

রিচার্ড ; চেম্বারলেন চিফ চল্লিশ পাউণ্ড মাহিনায, দ্বিতীয়—রোজার স্যেমুর তিরিশ পাউণ্ড মাহিনায, তৃতীয়—উইলিঅম ভ্যাসেল ঐ একইমাহিনায় এবং চতুর্থ-ফ্রান্সিস ফেরিরার কুড়ি পাউণ্ড মাহিনায়।

এই চারটি কুঠি আমরা ঠিক করেছি বঙ্গোপসাগরের উপকূলে স্থাপন করা হবে এবং এগুলি হুগলীর এজেন্সীর অধীনে কাজ করবে ; এবংসময়ে সময়ে আপনার কাছ থেকে যেসব নির্দেশ যাবে সেগুলি পালন করবে।

কোর্টবুকের এই চিঠিখানা ঐতিহাসিক কেননা এই পত্রেই প্রথম সরকারিভাবে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নকের নাম খুঁজে পাওয়া যায়। জব চার্নক তখন অবশ্য অকিঞ্চিৎকর এক ইংরেজ তরুণ। ভাতভিক্ষের আশায় সাতসমুদ্দুর তেরনদী পেরিয়ে এসেছেন এদেশে। কলকাতা,শহরকলকাতা তখনও ভাগিরথীর বালুকাবেলায় প্রতীক্ষা করছে রূপকথার সেই জলকুমারীর মত 'সাগর জলে সিনান করি' সজল এলোচুলে তার প্রেমিক পুরুষের। কোন পরম মুহূর্তে হবে তার আবিভাব! কিন্তু সুতানুটি কলকাতা থেকে এখনও আমরা অনেক দূরে। এখন আমরা পাটনায়। এবং তার জন্মকুণ্ডলী পরীক্ষা করে দেখছি। তার এই জন্মপত্রিকাটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করার সময়ে দেখা যাবে এই চিঠি যত না সমস্যার সমাধান করেছে,সৃষ্টি করেছে তার চেয়ে বেশি। কেননা ফোর্ট সেণ্ট জর্জের কনসালটেসনস্ বুকে (১৬৬৯-৮০) এক জায়গায় উল্লেখ রয়েছে জব চার্নক হুগলীতে দ্বিতীয় পদাধিকারী ; ভারতবর্ষে আসেন ১৬৫৬ ; কোম্পানীর চাকুরিতে বহাল হন সেপ্টেম্বর ৩০, ১৬৫৮; সিনিয়র মার্চেণ্ট হ'ন ১৬৬৬ ; বর্তমান মাহিনা ৪০ পাউণ্ড। মাস্টারস ডায়ারিস দ্বিতীয় খণ্ডেও এই সংবাদের পুনরুল্লেখ রয়েছে। চার্নকের এই 'বায়োডেটা' যদি মানতে হয়, বা সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে, চার্নক ভারতবর্ষে আসেন কোন 'হোম

এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট' না নিয়েই। চাকরি পাবার প্রায় বছর দুই আগে তিনি পা দেন ভারতের মাটিতে! মাঝের সময়টা কোথায় ছিলেন তিনি? কোন 'ইণ্টারলোপারের' সঙ্গে? একেবারে কোন একটা দিনযাপনের প্রাণধারণের রেস্ত না করেই কি তরুণ জব চার্নক দেশ ছেড়েছিলেন নেহাৎ কোন রোমাণ্টিক নেশায়? আবার তাঁর নাম কোম্পানীর চাকরির জন্য তদ্বির করলেন কোন্ ভদ্রলোক? নিশ্চয়ই কোন কেষ্টবিষ্টু। একটা কোন জবরদস্ত খুঁটি না থাকলে তো এরকমভাবে চাকরি হত না জন কোম্পানীতে। জব চার্নকের কে সেই মুরুব্বি? মাদ্রাজের গভর্নর একদা 'ইণ্টার-লোপার' টমাস পিট?

আরও সমস্যা জন কোম্পানীর সদর দপ্তরের নির্দেশনামায় ষোলশ' আটান্ন সালে কোম্পানীর পক্ষে সুবা বাঙলায় চারটে কুঠি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল কিনা তা নিযে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। সার্ হেনরি ইউলের দৃঢ় বিশ্বাস, ষোলশ' উনষাট সালের ফেব্রুআরির আগে কোম্পানী কখনই পাকাপোক্তভাবে ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে কাশিমবাজার কুঠি খুলতে পারেনি। পারেনি তার আর একটা প্রমাণ, ষোলশ' আটান্নর আগস্ট মাসে জব চার্নক আর কাশিমবাজার কুঠির নবনিযুক্ত বড়কর্তা জন রেন বালেশ্বরে। টমাস ষ্টেম্যান নামীত এক নাবিকের পিকারিংকে লেখা একটা চিঠিতে দেখা যাচ্ছে জব চার্নকের নাম। চিঠিটার প্রয়োজনীয় অংশটুকু হচ্ছে: "আপনার বন্ধু কেন (রেন হবে) এখনও সেরে ওঠেননি। তার প্রায় প্রতিদিনই সেই আগের মতই বিকার হচ্ছে (wonted fitts) এবং হতভাগ্য জব বিষণ্ণ মনে ঝিমোচ্ছে এবং জনকে তার অসুস্থতায় সমবেদনা জানাচ্ছে।" এই চিঠিটা হেজেসের ডায়েরিতে আছে। এই সময়ের একটু পরেই আরও একটা চিঠি পাওয়া যায়। সেও এই হেজেসের ডায়ারির কল্যাণে। এটি লিখেছেন হেনরি অল্ডওয়ার্থ টমাস ডেভিডকে। চিঠিটা রাজমহল থেকে লেখা। তারিখ ফেব্রুআরি, ষোলশ' আটান্ন উনষাট। এই চিঠিটা মোটামুটি তুলে দিচ্ছি। এতে জব চার্নকের সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য রয়েছে:

"গতকাল এই জায়গায় পৌছেছি। দেখলাম বাজার প্রায় পুরোপুরি অগ্নিদগ্ধ এবং অনেক লোকই অনাহারে কেননা খাবার নেই। এই দৃশ্য দেখে আমি ও মিস্টার চার্নক খুবই মর্মাহত হলাম। আপনার না থাকার জন্যে অবশ্য ততটা হইনি এবং ক্লারেট'ওপাঞ্চের পাত্র—অবশ্য এর চেয়ে ভালো কোন পানীয় এখানে পাওয়া যায় না—হাতে করে আমরা আপনাদের কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করছি। মিস্টার চেম্বারলেন এবং মিস্টার চার্নক আগামী কাল পাটনায় যাবেন। তাঁর যাত্রা দ্রুততর করার জন্য চার্নক আজ তাঁর চুলগুলি কেটে ফেলেছেন এবং মুসলমান 'মুরে'দের ধরণে কেশ-

বিন্যাস সুরু করেছেন। অতীতের স্মৃতিনিদর্শন হিসেবে আমি তাঁর এক গোছা চুল আপনার কাছে পাঠাতে পারতেম কিন্তু মিস্টার চেম্বারলেন শপথ করেছেন যে, সে কাজটা তিনিই করবেন।

পুনঃ মিস্টার চার্নক এই পত্রে আপনাকে তাঁর অভিবাদন জানিয়েছেন এবং আমরা উভয়েই অভিবাদন জানাচ্ছি উইলিয়াম পিটসকে।

সমসাময়িক এবং ইংরেজ ভ্রমণকারী সেকালের 'মুর' অর্থাৎ মুসলমানদের সঙ্গে 'জেণ্টু'বা হিন্দুদের কেশ চর্চার তুলনা দিয়ে বলেছেন,জেণ্টুরা ছোট ছোট দাড়ি রাখত এবং দাড়ি কামাত এবং মুরেরা রাখত বড় বড় দাড়ি এবং ছাঁটত। হিন্দুরা অনেকেই নেড়া হ'ত। আবার মুসলমানেরা চুল ছাঁটত! জব চার্নক কি তাহলে দাড়ি রাখতেন? সপ্তদশ শতকের ইংরেজদের এটা ফ্যাশন ছিল। এই জিজ্ঞাসা কৌতূহল নিবৃত্তি না হলেও এই ছোট্ট চিঠিটার মধ্যে ভবিষ্যতের জব চার্নকের ছবি আস্তে আস্তে ফুটে উঠতে শুরু করেছে। ভারতবর্ষকে—তার মানুষ-জন, আচার-আচরণকে তিনি ভালোবাসতে আরম্ভ করেছেন। যে লোকটি ভারতীয় মেয়েকে বিয়ে করে তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে, তার সমাধিতে মুরগী বলি দেবে—এই ছোট্ট ঘটনার মধ্যে কি সেই অতিদূর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না?

সেকথা এখন যাক। এখন পাটনা কুঠির কথা হচ্ছিল। এই যে রিচার্ড চেম্বার-লেনের কথা বলা হ'ল। ইনিই পাটনার কুঠির সদ্যনিযুক্ত পয়লা নম্বর কুঠিয়াল। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে জব চার্নক কাশিমবাজার কুঠির জন্য মনোনীত হয়েও চললেন পাটনায়—রাজমহল হয়ে। আর একটু লক্ষ্য করার আছে। পাটনায় আমরা দেখেছি দুটো পোষ্ট খালি ছিল। পাটনার দাবী কাশিমবাজারের চেয়ে জরুরী থাকায় বোধহয় পাটনার খালি পদটা আগেই ভর্তি করা হয়ে থাকবে। সেটাই সম্ভব। পাটনার সোরা তখন য়ুরোপের বাজারে পড়তে পায় না। ইংরেজদের নিজেদেরই এর সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। কাশিমবাজারের সিল্কের চাহিদা যথেষ্ট থাকলেও তুলনামূলকভাবে, ব্যবসায়ী দৃষ্টিতে—পাটনার দাবীই ছিল জোরদার। কাজেই হুগলীর এজেণ্ট সেখানকার পোষ্টেই আগে লোক দিলেন!

কিন্তু সমস্যা এখানেই শেষ নয়। পাটনা কুঠি স্থাপিত হল কবে? পাটনায় কুঠি বসানর চেষ্টা প্রায় সুরাটে একটু থিতু হয়ে বসবার পরেই। ঘটনার শুরু আগ্রায়। কেটিপ্লেস ছিলেন সেখানকার সর্বময় কর্তা। রবার্ট হিউজেস তাঁর অধীনে। কুঠিটা সদ্য বসেছে। এমন সময় আগ্রার বাজার থেকে একরকম সুন্দর অথচ দুধ সাদা কাপড় নিয়ে এল ইংরেজ কুঠিতে। ভারতীয় মসলিনের তখন য়ুরোপে গরম বাজার।

কেটিপ্লেস দেখে বললেন, বাঃ বেশ কাপড় তো। তল্লাস কর কোথাকার? খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল। কাপড়ের নাম আমবার্তি। আসে সুদূর বিহার থেকে। কেটিপ্লেস পাঠালেন বিলেতে এই কাপড়ের নমুনা। 'স্যাম্পেল'। ইংরেজী ষোলশ' আঠার। কোর্ট অব ডিরেক্টরসরা কাপড় দেখে খুব খুশি। বললেন, এ মাল সওদা কর। পাঠাও এক লট। কোর্ট আরও বললে, হাজিপুর-পাটনায় দু'জন গস্তদারকে পাঠাতে। বললে আমবার্তি কাপড তো দেখবেই,তাছাড়া সেখানে বাংলা সিল্ক পডতা দরে সংগ্রহ করা যায় কিনা তাও খোঁজখবর করবে। কোম্পানীর নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে ষোলশ' কুড়ি পাঁচই জুনের এক প্রসন্ন প্রভাতে রবার্ট হিউজেস বেরিয়ে পড়লেন পাটনার উদ্দেশ্যে। ঝাড়া হাত পা। কোনরকম মালপত্র তিনি সঙ্গে নিলেন না। নিলেন শুধু চার হাজার টাকার হুণ্ডি। সাহেব চললেন পাটনায়। মাল গস্ত করতে। কুঠি স্থাপনা করতে।

মুকারবর্খাকে মনে আছে আপনাদের? সেই যে সুরাটের ফৌজদার। ক্ষিপ্ত হয়ে উইলিঅম হকিন্স যাকে বলেছিলেন—'মুকারব দ্য ডগ,—কুত্তা'। জুলফিকার খাঁ আসবার আগে পর্যন্ত যিনি সুরাটে বহাল তবিয়তে রাজত্ব করেছেন। প্রচুর কামিয়েছেন ইংরেজদের সঙ্গে দোস্তী করে। ভদ্রলোক পর্তুগীজদের ভয় খেতেন তাই, কখনও সখনও ইংরেজদের সঙ্গে একটু কটু ব্যবহারও করে ফেলেছেন। কিন্তু শেষ দিকটায় ইংরেজদের প্রতি সদয়ই ছিলেন। এখন সেই মুকারব খাঁ তখন বিহারের সুবেদার। সিপাহি-ই-সালার। বিহারের মাটিতে পা দিয়ে হেজেস যেই শুনলেন, সেই মুকারবই বিহারের সিংহাসন আলো করে পাটনায় অধিষ্ঠান করছেন, মনে মনে খুবই প্রীত হয়ে থাকবেন। এবং পাটনায় পৌঁছে কোনরকম কালবিলম্ব না করে সোজা মুকারব খাঁর দরবারে গিয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন। মুকারবও পুরনো পরিচিত লোক দেখে খুশি। খুশি বোধহয় অন্য কারণেও। বিহারে তিনি রাজত্ব করছেন আর প্রাণখুলে হেকিমি করছেন। দাওয়াই দিচ্ছেন। ইংরেজরা ভালো শিশি বোতল সাপ্লাই করে। কাজেই ইংরেজদের পেয়ে তিনি আনন্দে ডগমগ। একেবারে আনন্দ বিহ্বল। বললেন, সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করবেন তিনি। সেকালে পাটনার আজকের মতই খুবই জটিল 'হাউসিং প্রবলেম' ছিল। বাড়ি পাওয়া একটা বিষম সমস্যা। সুবেদার নিজে এগিয়েএসে বললেন,কুছ পরোয়া নহি। সবএনতেজাম হয়ে যাবে। এবং গেলও। পাটনায় বড়বাজারে কোতোয়ালীর পাশেই একটা বাড়ী ঠিক হল রবার্ট হিউজেসের জন্যে। মাসিক ভাড়া অবশ্য সেকালের হিসেবে অনেক—ছয়টাকা বার আনা।

হিউজেস দেখলেন, এখানেও সেই পর্তুগীজ। তারা হুগলীর পিপলি থেকে

তাদের সশস্ত্র নৌকা করে এসে এখানকার বাজারের সব মাল কিনে নিয়ে যেত। হিউজেস প্রথম কয়েক মাস তাঁর গায়ের ব্যথা মারলেন। তারপর সেপ্টেম্বর মাস-নাগাদ তাঁর সহকারি জন পার্কার এসে পৌঁছতেই ব্যবসাপত্র শুরু করে দিলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন, আমবার্তি কাপড় তৈরী হয় লাক্‌খোয়ারে। পাটনা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। সেখানে গিয়ে তাঁতিদের দাদন দিয়ে এলেন। পাটনায় একটা আড়ত বসালেন। বাংলা থেকে কিছু কাঁচা সিল্ক যোগাড় করলেন, সাত গাঁয়ের লেপ তৈরী হ'ত খুব চমৎকার। পাটনা থেকে দশ মাইল দূরে বৈকুণ্ঠপুরে রেশম আর কার্পাস সুতোয় মেশানো একরকম কাপড় তৈরী হ'ত—রঙ ঠিক ছোট এলাচের মত —তাকে বলত এলাচী কাপড়। সেই সবরকম জিনিস সংগ্রহ করে তার ব্যবসা কি রকম কি চলতে পারে—সব কিছু ফিরিস্তি নিয়ে এক লট মাল হিউজেস রওনা করে দিলেন আগ্রা অভিমুখে।

সেবারের মত তো কাজ চুকল। কিন্তু মাল আগ্রা পৌঁছালে হিসেব করে দেখা গেল, লাভের মধু পিঁপড়েয় খেয়ে ফেলেছে। তখন গরুর গাড়ী করে মালপত্র যেত। তার ভাড়া মন প্রতি পাঁচসিকে থেকে দেড় টাকা। বর্ষায় পথ তো দুর্গম। গমনাগমন বন্ধ। পাটনা থেকে আগ্রা পৌঁছাতে তখন সময় লাগত পঁয়ত্রিশ দিন। তারপর তো রাস্তায় হয় ডাকাত নয় ফৌজের অত্যাচার। একবার তো আগ্রা যাবার পথে সব মালই লুঠ হয়ে গেল। লুঠেরা আর কেউ নয়, দাক্ষিণাত্যের নবাবী সৈন্য। কাজেই অনেক ভেবেচিন্তে হিউজেস কোম্পানীকে জানালে, সিল্কের জন্যে মুর্শিদাবাদ আর সৈদাবাদে চেষ্টা করাই বিধেয়। আর শুধু কাপড়ের জন্যে পাটনার কুঠি খুলে রাখা পড়তায় পোষাবে না।

এত গেল ব্যবসার ব্যাপারটা। অন্য কারণও ছিল। আগেই বলেছি, সেকালে পাটনায় বাড়ী পাওয়া ছিল দুষ্কর। খোদ সুবেদারের তদ্‌বিরে তবে সেই প্রথমবার তারা একটা বাড়ী পেয়েছিল। ষোলশ' একুশ সাল নাগাদ তাদের সেই পাথীর বাসা বিরাট এক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেল। সঙ্গে কোম্পানীর প্রচুর মালপত্র। ঈশ্বরের দয়ায় কুঠিয়াল কর্মচারীদের জানগুলো সেযাত্রায় বেঁচে গেল। তারপর সেই বাড়ির খোঁজ। খোঁজ-খোঁজ। কিন্তু কোথায় বাড়ী? অনেক তদ্বির তদারকের পর যদিও পাওয়া গেল, কিন্তু কপাল মন্দ, তাদের বরাতে সইল না। ব্যাপারটা হ'ল কি। মুকারব খাঁ বদলী হয়ে গেলেন আগ্রা আর তাঁর জায়গায় আগমন হ'ল বাদশাপুত্র শাহজাদা পারভেজের। বিহারের নতুন শাসনকর্তা। এত আর সাধারণ সুবেদার নয়, শাহজাদা বলে কথা—তার সঙ্গে প্রচুর লোকজন, পারিষদবর্গ ইত্যাদি। কাজেই তাঁর বাড়ী চাই অনেকগুলি। অমনি সব বাড়ী 'রিকুইজিসন' হয়ে গেল। অনেক

রহিস আদমিদেরই উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল তখন এবং সেই গড্ডালিকা প্রবাহে ছিলেন এই ইংরেজ বণিকরাও। অবশেষে দশদিন ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে, দামী দামী সব কাপড়পত্র মাটিতে ফেলে রেখে শেষবেশ প্রচুর টাকা সেলামী দিয়ে তাঁরা একটা বাড়ী জোগাড় করতে পেরেছিলেন—আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর আগে পাটনা বাজারে।

অবশ্য বাড়ী জোগাড়ই হ'ল ; ইংরেজরা আর রইল না পাটনায়। কোম্পানী দেখল, কিছু লাভ দিয়েআগ্রাবাজার থেকেই বিহারী ব্যবসাদারদের কাছ থেকে কাপড় কেনা অনেক সুবিধে। আর তখনও তো সোরা আমদানি সুরু হয়নি পাটনা থেকে। কাজেই ষোলশ' একুশ সালের জুন মাসে হুকুম এল, বাঁধো গাঁঠরি, গুটাও তল্পীতল্পা। পাটনা কুঠি তুলে দাও। অবশ্য বললেই তো আর ব্যবসা গুটানো যায় না। সময় লাগে। লেগেছিলও। মাস তিনেক। আগে রওনা হয়ে গেলেন হিউজেস। পার্কার অসুস্থ ছিলেন। তিনি এলেন কয়েক সপ্তাহ পরে। পাটনায় ইংরেজ কুঠি-স্থাপনের এই তো আদি অধ্যায়। '।মলিটারী হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায়' এইচ এইচ উইলসন এই কুঠি-স্থাপনের প্রচেষ্টার কথাই বলেছেন।

এরপর পাকাপাকিভাবে পাটনায় কুঠি স্থাপনের চিন্তা করে জন কোম্পানী এই ঐতিহাসিক নির্দেশনামা মোতাধিক ষোলশ' আটান্ন সালে। সে খবর তো আগেই দেওয়া হয়েছে। এবং এর কারণ—আগে যে কথা বলেছি, সোরা। ষোলশ' পঞ্চাশে কাপ্তেন জন ব্রুকহেভেন তাঁর সরকারি নথিতে লিখেছেন—পিটার বা সল্ট পিটার বা সোরা সংগ্রহের সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে পাটনা। এইসব খবর বিলাতে পৌছলে তবেই এই কুঠি বসানোর নতুন করে তাগিদ পড়ে বলে মনে হয়। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে—মাইকেল এডওয়ার্ডস তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'দি ব্যাটল অব প্লাসী এণ্ড কনকোয়েস্ট অব বেঙ্গলে' বলছেন, ষোলশ' ষাটের মধ্যে ইংরেজরা কাশিমবাজারে একটা কুঠি এবং সোরা, সিল্ক ও আফিঙের জন্যে অপর একটি কুঠি স্থাপন করে পাটনায়। সব দিক দিয়ে এটাই সবচেয়ে অবিতর্কিত উক্তি।

ষোলশ' ষাটের মধ্যে পাটনা কুঠি বেশ চালু হয়ে গেলেও জব চার্নকের কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না ষোলশ' তেষট্টির আগে। এই বছরেই জন কোম্পানীতে তাঁর পাঁচবছরের চাকরীজীবন পূর্ণ হয়। এবং এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে তিনি নিজের হক বুঝে নেবার মত শক্তিসংগ্রহ করেছেন। ঐ বছর তেইশে ফেব্রুআরিতে লেখা এক দাবীপত্রে বেশ দাপটের সঙ্গেই তিনি জন কোম্পানীকে জানাচ্ছেন যে, চতুর্থ কুঠিয়াল হয়ে কাল কাটাতে আর তিনি রাজী নন। পয়লা নম্বরের চেয়ারটা তাঁর

চাই। অনুযায় তিনি চললেন। চার্নক যে কাজের লোক, এটা এর মধ্যেই কোম্পানী বুঝতে পেরেছে। পর বছরই তাঁর দাবী কোম্পানী মেনে নিলেন। আরও বছর দুয়েকের মধ্যেই বহুজনকে টপকে তিনি হলেন সিনিঅর মার্চেন্ট। ম হিনা চল্লিশ পাউণ্ড! অবশ্য তাঁর কুঠীটা তখন খাস পাটনায় নয় সিংঘীতে।

মোটামুটি ব্যাপারটা এই হলেও উত্তর কালের মানুষের জানবার কৌতূহল যায়—ঠিক পাটনায় কবে থেকে কাজ শুরু করলেন তিনি, কনিষ্ঠতম কুঠিয়াল হিসেবে কি কি ঝুটঝঞ্ঝাটে পড়েছিলেন যে ছটফটে মানুষ তিনি—মাঝে অন্য কোথাও গিয়েছিলেন কিনা? কাশিমবাজার পর্বে তাঁর সঙ্গে এলিসকে নিয়ে হেজেসের সঙ্গে যে কলহ হয়েছিল, তেমন কোন নাটক রচনা হয়েছিল কিনা পাটলিপুত্রের মাটিতে? এসব জানবার কোন উপায় নেই। কেবল কল্পনা করা যেতে পারে—কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা এই বেয়াড়া মানুষটি তার নবজীবনের প্রাতে—বিহারের হাটে হাটে ঘুরে ঘুরে অক্লান্ত পরিশ্রমে নৌকা বা গরুর গাড়ি বোঝাই করিয়ে চলেছেন, সোরা, দোলো চিনি, কিছুবা কাপডচোপড। কখনও বা আফিং কিনে, তাঁকে বেশ ভালো করে নিরীক্ষণ করে না দেখলে বোঝা যায় না—মানুষটা বিদেশী। তাঁর গৌরতনু গ্রীষ্মের অশান্ত হাওয়ায় বয়ে-আনা ধুলোয় একেবারে ধূসর হয়ে গেছে। কিংবা প্রখর তপন-তাপে তার গোরা অঙ্গ কালি হয়ে, তামাটে হয়ে গেছে। লোকটা এদেশী জীবনচর্যায় চারুপাঠ নিয়ে নিয়েছে; দেশী ভাষায় কথা বলছে—দেশী হুঁকো খাচ্ছে গাছতলায় বসে—আর দেশী মহাজনরা জুলজুল করে তাকিয়ে সকৌতুকে ভাবছে, কে এই বিচিত্র ব্যক্তি?

পাটনা চার্নকের জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনার পটভূমি। কিভাবে কেমন করে এই ঘটনার কথা বাতাস মাথায় করে নিয়ে জনে জনে পৌঁছে দিয়েছে কে জানে, তবে শোনা যায়, ঘোড়ায় করে চার্নক চলেছিলেন কাজে। কোম্পানীর সওদা করতে। সঙ্গে তার সশস্ত্র পাইক পেয়াদা। হঠাৎ কোন মিঠে বামাকণ্ঠের কাতর আর্তনাদ তাঁর কানে পৌঁছে থাকবে। ঘোড়ার লাগাম টেনে থমকে দাঁড়িয়ে থাকবেন চার্নক। তাঁর তরুণ ফর্সা চওড়া কপালে ভ্রূকুটির আবছা রেখা পড়ে থাকবে। কিন্তু সেই বা কতক্ষণ? একটু দাঁড়িয়ে সেই চিৎকার লক্ষ্য করেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন চার্নক। ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে ওড়া ধুলোর কুণ্ডলী তাঁকে ও তাঁর লোকজনকে অনুসরণ করে গেল।

সেই শব্দের পিছু পিছু ধাওয়া করেই চার্নক পেলেন তাঁর প্রেয়সীকে। তাঁর দয়িতাকে। সেই প্রখর সূর্যালোকে আশ্চর্য সুন্দরী সেই পঞ্চদশীকে দেখে স্তব্ধ বিস্ময়ে কি দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন জব চার্নক? সামনে ধূ ধূ জ্বলছে অরণি।

আগুনের লেলিহান শিখায় সেই চিতার চারিদিকের অপেক্ষমান মানুষগুলোকে যেন হিংস্র শ্বাপদের মত মনে হচ্ছে। এদৃশ্য এ দেশে অনেক দেখছেন চার্নক। মেয়েটাকে ওরা আগুনে ফেলে দেবে। 'সতী' হবে সে, 'সতী'।

অশ্রুসজল সেই মুখখানি, অজস্র উদ্বেগ, উত্তেজনায় কাতর সেই মুখখানি, রেশমী বস্ত্রে, নানা অলংকারে নববধূর মতন সজ্জিতা সেই ববরণিনী, স্বেদ-চন্দনে চর্চিত সেই মুখখানি কি চার্নকের বিলেতী রক্তে শিভলরির দোলা দিয়ে থাকবে? হয়ত বা। হয়ত' বা। এটা যোলশ' আঠাত্তর-উনআশির ঘটনা। এর বছর শ' দুই বাদে এই নিয়ে কাব্যও হয়ে গেল—

"Cries Chernock, Scatter fagots!

Double that Brahmin in ; two That pale widow is mine, . "

"চীৎকার করে উঠলেন চার্নক" চিতার কাঠগুলো ছড়িয়ে দাও। বামুনটাকে দু'টুকরো করে ফেল; বিবর্ণ এই বিধবাটি আমার হ'ল।"

অবশ্য এসব গল্প কথা। সুদূরের জনশ্রুতি যেমন পল্লবিত হয়ে কল্পনার রঙে রঙিন হয়ে ওঠে; আমাদের রোমান্টিক মনের খোরাক জোগায়, এও তেমনি। প্রায় একই সময়ে এদেশে আরো এক ইংরেজ বড়কর্তা উইলিঅম হেজেস একটা বিরাট ডায়ারি রেখে গেছেন। তাঁর দেওয়া কাহিনীটা বেশ ভিন্ন। তিনি লিখেছেন: চার্নকের এই কাহিনী তাঁকে বলেছেন কাশিমবাজারের ফৌজদার বালচাঁদ। চার্নক এক জেণ্টু-হিন্দু ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। ভদ্রলোক বোধহয় তখনও জীবিত, কিংবা সদ্য মারা গেছেন। মেয়েটি এক গা বহু মূল্যবান অলঙ্কার নিযে পালিয়ে এসেছিল। অনেক টাকাকড়িও নিয়ে এসেছিল মেয়েটি। এই নিয়েই অভিযোগ উঠল নবাবের কানে। নবাবের কানে খবর যেতেই তিনি বারটা সিপাহী পাঠিয়ে দিলেন চার্নককে বেঁধে আনতে। কিন্তু চার্নককে বাঁধবে এতবড় শিকল নবাবেরও ছিল না। সিপাহীরা এসে দেখলে পাখী উড়ে গেছে। খাঁচা ফাঁকা। হেজেস বলেছেন, চার্নক খবর পাবার আগেই পালিয়েও থাকতে পারেন, কিংবা ঘুষ দিয়ে থাকতে পারেন নবাবের অনুচরদের।

চার্নককে না পেয়ে তারা তার উকিলকে ধরে নিয়ে গেল। চিল যখন নেমেছে, কুটো না নিয়ে উঠবে না। কাজেই চার্নকের ভকিলেরই হ'ল দু'মাসের কয়েদ। এই জ্বালা দেশী 'ভকিল'দের ইস্তক পোয়াতে হয়েছে। আমরা কাশিমবাজার পর্যায়ে দেখব ইংরেজদের জন্যে গোমস্তা বল গোমস্তা, বেনিয়ান বল বেনিয়ান, ভকিল বল ভকিল কাস্তমুদীকে বার বার কয়বারই না :কয়েদ খাটতে হয়েছে! নবাব অবশ্য উকিলকে নিয়ে গিয়েই খুশি হলেন না। তিনি পাটনার ইংরেজ কুঠিতে

পাহারা বসিয়ে দিলেন। দিনরাত চৌকি। তবে সুলুক সন্ধান চার্নক জানতেন। তিনি নবাবী দরবারে কথাবার্তা কইতে লাগলেন। এবং একসময় তিন হাজার টাকা নগদ,কিছু চওড়া কাপড় আর কিছু নতুন তলোয়ার উপঢৌকন দিয়ে ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেললেন। হেজেসের ডায়ারির কাল ষোলশ' বিরাশি।

এর একটু পরেই এলেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন। তিনি খুব সংক্ষেপে এই কাহিনী সেরেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, চার্নক তাঁর সাধারণ সশস্ত্র গার্ডদের নিয়ে একদা এক সতীদাহ দেখতে গিয়েছিলেন; কিন্তু সেই বিধবার সৌন্দর্যে তিনি এতই মুগ্ধ হয়ে যান যে, তাঁর লোকজনকে সেই মেয়েটিকে তার নিবাসে নিয়ে যেতে বলেন। অর্থাৎ সতীদাহের কাহিনীর আবিষ্কর্তা হ্যামিল্টন। ইনি কাপ্তেন লোক। ভারতবর্ষের ঘাটে ঘাটে তার পণ্য কুড়িয়েছেন দীর্ঘকাল ধরে। তার দুই খণ্ডের গ্রন্থ 'এ নিউ এ্যাকাউণ্ট অব দি ইষ্ট ইণ্ডিজ' ষোলশ' অষ্টআশি থেকে সতেরশ' তেইশ পর্যন্ত দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর তার এই নৌঅভিযানের বিবরণ। এরই দ্বিতীয় খণ্ডে কলকাতা এসেছে। এসেছে জব চার্নকের কথা।

'বেঙ্গল অবিটুআরি' (আঠারশ' একষট্টি) কাব্য ক'রে হ্যামিল্টনের কথাই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। "সম্ভবতঃ পনরটি বসন্তের নিষ্পাপ এক জীবন পৌত্তলিকতার যুপকাষ্ঠে যখন প্রায বলি হতে যাচ্ছিল। তখন আড়ম্বরময় অলঙ্কারে সজ্জিত, সূক্ষ্মতম বস্ত্রে আবরিত তনু সেই সুন্দরী হিন্দু তরুণীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে জব চার্নক তাঁর রক্ষীদের সেই আধা অনিচ্ছুক বলিটিকে মুক্ত করতে বলেন। তাঁর বিশ্বস্ত রক্ষীদল তাকে তার অকালমৃত্যু থেকে উদ্ধার করেন। এবং চার্নক তাকে সসম্ভ্রমে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান।"

এই জব চার্নকের এই কাহিনীটিকে অনেকে অনেকভাবে দেখেছেন। হ্যামিল্টনের সঙ্গে হেজেসের মিল নেই। আবার আধুনিক ঐতিহাসিকরা বলেন, চার্নকের উদ্ধার করা এই মেয়েটি ব্রাহ্মণ কন্যা নয়। নীচু জাতের হিন্দু মেযে। তাঁদের যুক্তি এই যে, হ্যামিল্টন যে পরে বলেছেন চার্নক তাঁর স্ত্রীকে সমাধি দিলেও সেখানে তার মৃত্যু দিনে একটি করে মুরগী বলি দিত—এর কারণ আর কিছুই নয়—তাঁর স্ত্রী এমন এক সমাজ থেকে এসেছিলেন,যাদের প্রথাই ছিল মৃতের উদ্দেশে মুরগীবলি। বিহারের পাঁচপীর বলে জাযগায় একদল নীচু জাতের মুসলমান ও হিন্দুরা এই প্রথা মানে। এবং সেই কারণে চার্নকের জামাই স্যর্ চার্লস আয়ার যখন শ্বশুরের সমাধির ওপর পাথর বসান, তাতে শাশুড়ীর কোন উল্লেখ করেন না। জব চার্নকের তিনটি কন্যার মেরী, এলিজেবেথ ও ক্যাথারিণের যখন খ্রীষ্টধর্মে অভিষেক হয় সেণ্ট মেরী চার্চে (উনিসে আগস্ট ষোলশ' উনব্বই) যাজক জন ইভান্স মেয়েদের মায়ের নাম দেননি।

কিন্তু এ থেকে মেয়েটি নীচু জাতের হিন্দু মেয়ে এটা প্রমাণ হয় কি করে? হেজেসের ডায়ারি থেকে দেখা যাচ্ছে জব চার্নকের এক সদ্য বিধবাকে ভাগিয়ে এনেছিলেন। মেয়েটির সঙ্গে প্রচুর অর্থ ও অলঙ্কার ছিল। এটা হ্যামিল্টনও বলছেন। নীচু জাতের মেয়ের হাতে এত টাকা, গায়ে এত আভরণ আসে কোত্থেকে? এবং একটা নীচু জাতের মেয়ের জন্য বিহারের নবাব হয়ত তখন শাহজাদা আজম নয় সইফ্ খাঁ—যে বার জন সৈন্য পাঠিয়ে দেবে এটা কি গ্রহণযোগ্য? তাছাড়া 'জেণ্টু' শব্দটা তো সেকালের উচ্চ কোটির হিন্দুদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হ'ত। বড় জামাই সার্ চার্লস আয়ারস্ যিনি বাঙলার প্রথম গভর্নর হয়েছিলেন-তিনি সেকালের য়ুরোপীয় সমাজের যথেষ্ট রক্ষণশীল আবহাওয়ায় এদেশের ভিন জাতের মেয়েকে শাশুড়ী বলে স্বীকার করতে চাইবে না—এ আর বেশী কথা কি? ফাদার জন ইভান্স 'ব্যাপটাইজেসান রেজিস্টারে' দেশী মেয়ের নামটা লিখতে চাইবেন না, তার কারণ বোধহয় পাটনা থেকে মাদ্রাজ অনেক দূর। মাদ্রাজে নতুন সাহেব সমাজ আছে। পাটনায়—দে গরুর গা ধুইয়ে—কে কার খোঁজ রাখে। তাছাড়া জব চার্নক নিজেই যখন সেখানে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা!

পাটনায় থাকতে থাকতেই আমরা দেখব চার্নক তাঁর মনিবদের কাছে কি বিপুল আস্থাই না অর্জন করেছেন! তাঁর বিরুদ্ধে যিনিই কোম্পানীর কাছে নালিশ করেছেন, তিনিই গাড্ডায় পড়েছেন। তাঁর হেনস্থার অন্ত নেই। এবং শেষ অবধি তাঁর চাকরি গেছে। অ্যালেন ক্যাচপোল বলে পাটনার এক কুঠিয়াল তাঁর সঙ্গে টক্কর দিতে এসেছিল। ট্রেঞ্চফিল্ড, লিটলটন এমন কি হেজেসের ডায়ারির বিখ্যাত উইলিঅম হেজেস—হুগলীর প্রথম এজেন্ট—যিনি প্রথম মাদ্রাজের তত্ত্বাবধান থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন ভাবে কাজকর্ম করার অধিকার পেয়েছিলেন—এরা কেউই চার্নকের সঙ্গে ঝগড়া করে পারেননি সবাই তাঁদের ভাতভিক্ষে হারিয়েছেন। কোম্পানী তাঁদের চিঠিতে সাফ্ বলেই দিয়েছেন, চার্নক তার চৌত্রিশ বছরের চাকরিতে আমাদের মনে এমনই এক আস্থা সৃষ্টি করেছেন যে, কারুর কোন অভিযোগেই আমাদের এই দীর্ঘদিনের মতটা পাল্টে যাবে না।

পাল্টে যে যাবে না, তার একটা মজার উদাহরণ স্টেন্শ্যাম মাস্টারের ঘটনাটা। পাটনায় চার্নকের তো অনেকদিন হ'ল। আলালের ঘরে দুলালের মত, এখানে বলতে কি, তিনি যা' চেয়েছেন, তাই পেয়েছেন। আটবছর চাকরি হবার আগেই তিনি 'সিনিঅর মার্চেণ্টের' পদে প্রমোশন পেয়েছেন। পাঁচ বছর সিনিঅর মার্চেণ্টের পদে থাকার আগেই পাটনার মুখ্য কুঠিয়ালের পদে তার চাকরি পাকা 'কনফার্ম' করে কোম্পানী। মাঝে তাঁকে 'গ্র্যাচুইটির' ইনামও দেওয়া হয়েছে বিশ পাউণ্ড। তা'

ছাড়া,বারবার তাঁর ওপর কর্তাদের বিশ্বাস,আস্থার কথা লিখে জানিয়েছে কোম্পানী। মাস্টারের ঘটনায় জানালে নতুন করে।

ব্যাপারটা হয়েছিল কি, পাটনায় অনেকদিন থাকার পর কোম্পানী আবার তার প্রমোশনের কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁর বিয়ের বছরেই তাঁকে ফোর্ট সেণ্ট জর্জের-সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড—দ্বিতীয় পদাধিকারীর পোষ্টটা দেওয়া হয়। কিন্তু চার্নক তখন চিফ। কারও তাঁবে থাকা তার কুষ্ঠিতে লেখেনি। তিনি সোজা সেই প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন। পরের বছর তাঁকে কাশিমবাজার কুঠির প্রধান করে বদলি করা হ'ল। স্টেনশ্যাম মাস্টার তখন বে অফ বেঙ্গলের এজেন্সীর বড়কর্তা। চার্নক পাটনা থেকে কাশিমবাজার যাবার কোন লক্ষণ দেখালেন না। তাছাড়া মাস্টার তাকে সোরা পাঠাতে বলেছিলেন তাড়াহুড়ো করে। নয়তো বালেশ্বর থেকে যে জাহাজ ছাড়বে তাতে সোরা ভর্তি হবে না। চার্নক তাঁকে গ্রাহ্যই করলেন না। তাঁর আদেশ কানেই নিলেন না। জাহাজ বালেশ্বর ছেড়ে গেল আট হাজার মন যে সোরা কাশিমবাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল শুধুমাত্র তাই নিয়ে। পাটনা থেকে একত্রিশখানা জাহাজ বোঝাই উনত্রিশ হাজার আটশ' নব্বই মন সোরা আর সে জাহাজ বিলেতে গেল না। মাস্টার তো খাপ্পা। তিনি কাশিমবাজারের বদলির অর্ডার বাতিল করে দিলেন। ডিসেম্বর, ষোলশ' উনআশি।

তখনই বেঁধে গেল রঙ্গ। পাটনা থেকে চার্নক কোম্পানীকে লিখে পাঠালেন তাঁর প্রতি মাস্টারের অশোভন এই ব্যবহারের কথা। লিখলেন, কেন তাঁর সোরার জাহাজ হুগলী পৌঁছায়নি। নতুন নবাব সইফ খাঁ নৌকা সব আটকে দিয়েছে। মালগুদাম সব 'সীল' করে দিয়েছে। মাঝিমাল্লারা পাঁচ হাজার টাকা 'ডেমারেজ' চাইছে। মাস্টার বললেন, চার্নক সহজেই হাজার দু'হাজার টাকা দিয়ে এই ঝামেলা মেটাতে পারত। কিন্তু মাস্টার তো জানেন না, কি বস্তুদের নিয়ে চার্নককে সংসার করতে হয় পাটনায়— আজকে হাজার দু'হাজারে রাজি হয়েগেলে কালকে এই টাকার অঙ্ক কোন আকাশ-ছোঁয়া পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে! চার্নক কিছু ঠাণ্ডায় কিছু গরমে নবাব দরবারে এই ঝামেলার মীমাংসা করলেন।—মুক্তিমূল্য সাতশ' টাকা মাত্র! (অবশ্য চার্নকের সব ব্যবস্থা ভেস্তে যায়। সইফ খাঁ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় পরোয়ানা আর তড়িঘড়ি সই হ'ল না নবাবের!)

সোরার নৌকার যাই হোক না কেন। মাস্টার সাহেবের মাস্টারী ঘুচে গেল। তার অর্ডার বাতিল করে কাশিমবাজারের বড় কুঠিয়ালপদে চার্নকের প্রমোশনের হুকুম বহাল রইল। ষোলশ' একাশি জানুআরি মাসের হাঁড় কাঁপান শীতে চার্নক সপরিবারে সেখানে গিয়ে নামলেন। ষ্ট্যানশ্যাম মাস্টারের কিন্তু চাকরি গেল!

কিন্তু চার্নকের এই বিপুল সাফল্যের রহস্যটা কি? কি সেই যাদু যা' দিয়ে চার্নক তাঁর মনিবদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন? এ যেন কামরূপ-কামাখ্যার ডাকিনী যোগিনী মন্ত্র যা দিয়ে জন কোম্পানীর চেয়ারম্যান থেকে কমিটি—সবাই ভেড়া বনে গিয়েছিলেন! কি সেই মন্ত্র, কি সেই রহস্য? অথচ চার্নক তো এমন কিছু ধোয়া-তুলসী ছিলেন না। কোম্পানীকে যেসব মাল বিক্রি করত মহাজনরা, তার শতকরা দু'ভাগ কমিশন আদায় করতেন জব চার্নক। তাঁতিদেরও কিছু ছাড়তে হ'ত। এবং এসব নিয়ে কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় ব্যাপার নেই। বোধহয় কোম্পানীও জানতেন। তবে? খুব কাজজানা করিৎকর্মা এবং পরিশ্রমী লোক? ঝানু মাল। হবেও বা। দেশী ভাষাটা তিনি ভালই রপ্ত করেছিলেন। দেশী আচার-আচরণ। একথা কোম্পানী বার বার স্বীকার করেছেন। এবং এর ফলে দেশী নবাব বাদশা-দের সঙ্গে কথাবার্তা, কাজকারবার চালাতে প্রচুর সুবিধা হ'ত তার। আরও একটা সুবিধে ছিল—তিনি পাটনায় থাকতেন—একেবারে নবাবের আশে পাশে। হুগলী কাশিমবাজার, বালেশ্বর—তারা কেউই খাস দিল্লীর খবর পেত না। তার মর্জি বুঝতে পারত না। সব খবরেই তাদের পাটনা হয়ে পেতে হ'ত। এইসব ঘটনা সম্বন্ধে বোধকরি কোম্পানীকে সব সময়েই ওয়াকিবহাল রাখত চার্নক! এবং চার্নক কাজের লোক। তাঁর আমলে সোরার কারবারের জোর ধরে খুব। কোম্পানী বলেছিল সব সময়েই বেশ কিছু পরিমাণ সোরা যেন মজুত থাকে হুগলীতে—যাতে জাহাজ আসামাত্র বোঝাই করে পাঠান যায়। এই ব্যবস্থা চার্নক বজায় রাখতে খুবই চেষ্টা করতেন, অবশ্য মাঝে মাঝে যে বাধা আসত না, মাস্টারের গল্প বলার সময়, সে কাহিনী তো বলাই হয়েছে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চার্নক নবাব-দেওয়ানের সঙ্গে রফা করে ফেলতেন। ষোলশ' সাতাত্তরে পাটনার দেওয়ানের টাকার খুব টানাটানি। হুকুম হ'ল সোরার শুল্ক শতকরা তিনভাগ হারে জমা না দিলে সব নৌকা বাজেয়াপ্ত। চার্নক বারশ' টাকা ঘুষ দিয়ে সে যাত্রা আটক মাল উদ্ধার করে পাঠান। তবে ঘুষ দিলেও চার্নক একটা কথা মুঘলদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন—শুল্ক তাঁরা হুগলীতে নৌকা পৌছালে তবে দেবেন। পাটনায় নয়? দেখা যাচ্ছে, চার্নকের ব্যবসাবুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ। এর সব ঘাঁতঘোঁত তিনি খুবই বুঝতেন। বুঝতেন দাপটের সঙ্গে রাজপাট চালাতে হয় কিভাবে। এর একটা গল্প বলি। কোম্পানীর কুঠিতে কুঠিতে সেকালে গোমস্তা দেশী মহাজন, গস্তদাররা টাকা লেনদেন করত। এনিয়ে খুবই ঝামেলা হ'ত। কেউ ধার নিত। কেউ শোধ দিত। কেউ দিত না। এই নিয়ে মাঝে মাঝে খুনোখুনি পর্যন্ত হ'ত। আর এই সুযোগে ফৌজদার বা নবাবের লোকেরা নাক গলাত। কোম্পানীর কাছে

টাকাকড়ি আদায় করে নিত। এরকম বহু ঘটনা ঘটেছে কাশিমবাজারে। হয়েছে হুগলীতেও বা। কিন্তু পাটনায় এমনি একটা ঘটনা কিভাবে সামলে নিয়েছিলেন চার্নক—দেখবার মত।

সিংঘীর ইংরেজ কুঠিতে তখন রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে। রাত্রি নয়টা হবে। মার্চ মাসের দারুণ গরম। হঠাৎ একটা হৈ-চৈ শব্দে রাত্রির নৈঃশব্দ্য ভেঙে খানখান হয়ে গেল। সাহেবরা যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কি ব্যাপার? কি ব্যাপার?

কুঠির এক পোদ্দার শিবরাম মালিক খুন হয়েছেন। তাঁর আর্ত চীৎকার—লোকজনের কান্না মুহূর্তে কুঠির মেজাজ পাল্টে দিল। পাল্টে দিল আরও এক কারণে। কুঠির চিফ্ স্বয়ং জব চার্নক নিজে সরজমিনে তদন্ত করতে এসেছেন ব্যাপারটা—সেই গভীর রাতে। জানা গেল খুনী পালাতে পারেনি। নাম বিশ্বম্ভর। এককালে সেও কোম্পানীর কাজ করত। তাই কোম্পানী তার কাছে কিছু টাকা পেত। কুঠিতে কি যেন কাজে এসেছিল সে। পোদ্দারমশাই দেখা পেয়েই সেই টাকার কথা তুলেছেন। আর যাবে কোথা? এক কথা দু'কথা হতেই বিশ্বম্ভর উত্তেজিত। অপমানিত। এবং তার অশ্রাব্য গালিগালাজ সুরু।

শিবরাম হাজার হোক পোদ্দার। একগণ্ডা কুঠির লোকদের সামনে এতবড় কথা। চোপদারকে ডেকে বিশ্বম্ভরের গলার উড়নীধরে টেনে আনতে বললে। উড়নী ধরতেই বিশ্বম্ভর সেটা চোপদারের হাত থেকে নিয়ে, কোমর থেকে ছোরা বার করে সোজা সেটা শিবরামের বুকে বসিয়ে দিলে। রক্তে জায়গাটা ভেসে গেল। বার কয়েক ধড়ফড় করে শিবরাম স্থির হয়ে গেল চিরকালের জন্যে! কুঠির লোকজন বিশ্বম্ভরকে ধরে ফেলল।

চার্নক সেই রাত্রেই সব কিছু জিজ্ঞাসাবাদ: করে ব্যাপারটা বিশদভাবে দেখে নিলেন। এবং গভীর রাত্রে যখন শুতে গেলেন, তখন এই পাকা হুকুম দিয়ে গেলেন। বিশ্বম্ভর সারারাত কুঠিতে আটক থাকবে। সকাল হতেই তাকে যেন নবাব দরবারে নিয়ে যায় কোতোয়ালীর লোক; তারও সব বন্দোবস্ত করে রাখলেন।

সুশৃঙ্খলাসহকারে সব কাজই হয়ে গেল। নবাব দু'মাস বিশ্বম্ভরকে কয়েদ করে রাখলেন। তারপর ছেড়ে দিলেন। ততদিনে বিশ্বম্ভর সপরিবারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাহলে চার্নকের সাফল্যের রহস্য কি তাঁর এই কর্মদক্ষতা? তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধি? তাঁর ভারতীয় আচার-আচরণ, ব্যবসা, ভাষা, রাজনীতি সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান? না তার কোন প্যাট্রন ছিল লীডেনহল স্ট্রীটের সদর দপ্তরে? কে তিনি? পিট? ব্যাঙ্কার—স্বর্ণকার যশুয়া চাইল্ড?

রহস্য যাই হোক—চার্নক পাটনা থেকে একটা শিক্ষা নিয়ে গিয়েছিলেন কাশিম-বাজারে। শুধু বণিকের মানদণ্ড নিয়ে আর ব্যবসা চলবে না। মানদণ্ডের পিছনে দণ্ডধারী ব্যক্তিদের চাই। চাই অস্ত্র। চাই শক্তির দাপট। সিধে আঙুলে আর ঘি উঠবার দিন নেই। শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা চালান আর অচল। বহুটাকা দিয়ে, বহু ফরমাস, হাসবল হুকুম এবং পরোয়ানা এনে দেখা গেছে। তাদের কালিরদাগ শুকোবার আগেই সেগুলোর দাম কানাকড়িতে পরিণত হয়। এক নবাবের দেওয়া পরোয়ানা নতুন নবাব মানে না। দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে। দিল্লীর ফরমান সুবায় সুবায় মূল্যহীন। সবাই স্বাধীন। সবাই প্রধান। কে কাকে মানে? কাজেই মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের। সেই দাপট চাই, শক্তি চাই। সেই শিক্ষাই তিনি প্রয়োগ করেছিলেন সেদিন, যেদিন তিনি নবাবের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ রক্তক্ষয়ী লড়াযে নেমেছিলেন। সেই হুগলী বুকে ভাগীরথীর গেরুয়া জলে।

কিন্তু সে এখন অনেক পরের কথা। আসুন, আমরা চার্নকের সঙ্গে একটু কাশিমবাজারে নেমে পড়ি। পরে রাজমহল তো আর কুঠি নয়, আড়তমাত্র। যদিও হ্যামিল্টন বলেছেন ওখানে একটা ট্যাকশাল 'মিন্ট' ছিল কোম্পানীর। সোরার টাকা ওখানে থাকত। কলকাতার কাউন্সিলের ভাবী গভর্নর—উইলিয়ম হেজেসের ভাইপো রবার্ট হেজেস এখানে কাজ করতেন। জনা তিনেক লোকের আড়ত ছিল এখানে।

সে যাই হোক এখন আমরা কাশিমবাজারে চলেছি। কাশিমবাজার বলতে কান্তমুদী। চলুন এখন তার কথাই শুনে আসি!

॥ কাশিম বাজার ও কান্ত মুদি ॥

কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠি সেদিন অত্যন্ত কর্মচঞ্চল। অনেকদিন কাজকর্ম ঢিমে-তেতালায চলার পর নবাবের সঙ্গে জগৎশেঠের সঙ্গে ব্যাপারটা মিটে গেছে। মাঝে কাজকর্ম তো বন্ধ হযে গিয়েছিল বললেই হয। এখন আবার টাকাকড়ি আমদানী হচ্ছে।

রেশম তাঁতিদের দাদন দেওযা সুরু হযেছে। বাংলার শারদোৎসব। মাল-পত্র জমা হতে সুরু হযেছে।

সতেরশ' তিরিশ। প্রধান কুঠিযাল জন স্টকহাউস সকাল সকাল উঠে 'ব্রেকফাস্ট' সেরে সোজা আড়তে গিযে হাজির হযেছেন। এসেই কাজে বসে গেছেন। বিভিন্ন গুদাম হতে জিনিসের সব ওজন খাতার সঙ্গে মিলিযে দেখতে সুরু করেছেন। অন্যান্য কুঠিযালরাও নিজের নিজের কাজে সমান ব্যস্ত।

এমন সময এক পিযন এসে খবর দিলে এক ভদ্রলোক তাঁব সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ভদ্রলোকের নাম বুড়া দত্ত। স্টকহাউস নাম শুনেই দ্রুত কুঠি থেকে বেরিযে এসে দত্তমশাযকে সংবর্ধনা জানালেন, 'কাম ইন, কাম ইন। সো হ্যাপি দ্যাট যু হ্যাভ কাম।' আপনি আসায আমরা যে কী খুশী।

কিন্তু বুড়া দত্তর তামাটে মুখে খুশির কোন প্রলেপ পড়ল না। আষাঢ়ে জলভরা মেঘের মতই মসীকৃষ্ণ হযে রইল। বুড়া দত্ত আস্তে আস্তে বললেন, আমি এসেছি আপনাদের জাগিযে দিতে, আমার পক্ষে আপনাদের এই চাকরি নেওযা সম্ভব নয়।

এই কালকেই লোকটাকে শিরোপা দিযে প্রথামত, কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠির প্রধান গোমস্তা পদে নিযোগ করা হযেছে। আহ্লাদে ডগমগ হযে লোকটা তখন উল্লাসে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছিল, দেখবেন সাহেব, কুঠির কাজ কি ধরণে চালাই আমি। স্টকহাউসও বিশ্বাস করেছিলেন। লোকটা করিৎকর্মা। সুলুক সন্ধান জানে দাদনি ব্যবসার। বহুদিন ধরে। রেশমের বাজারে ঘুরাঘুরি করছে। সব রকম কাজ বোঝে। এমনি একটা লোকই চেয়েছিল কোম্পানী।

কেন? অসুবিধাটা কি আপনার? স্টকহাউস জিজ্ঞাসা করে থাকবেন। অন্যান্য সাহেব কর্মচারীরা ঝুঁকে পড়ে থাকবে লোকটাকে ঘিরে, —'হোয়াটস রঙ্?' কি হল কি অসুবিধা?

কিন্তু কারও প্রশ্নের কোন জবাব দিলে না বুড়া দত্ত। অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হ'ল না। এবং একসময়ে প্রথামত নমস্কার করে সে বিদায় নিলে। কাশিমবাজার কুঠি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে অপস্রিয়মান বুড়ো দত্তকে-যতদূর দেখা যায় —দেখতে লাগল। ওপরে জলভরা মেঘঢাকা ভাদ্রের আকাশও যেন খানিকটা থমকে গেল। সতেরশ' ত্রিশ। সেপ্টেম্বর মাস। নব্বই। সত্যিই তাজ্জব ব্যাপার তো! জন কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠির গোমস্তার চাকরি তো সোনার চাকরি। যে পায়, সেত হাতে পরশ পাথর পেয়ে গেল। আর সেই স্পর্শমণি কিনা একটা লোক হেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গট গট করে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু গোমস্তা নইলে তো কুঠি চলবে না। চাই—এখুনি চাই। কাজেই কাশিমবাজার কাউন্সিলের জোর মিটিং বসে গেল। অনেক তামাক পুড়িয়ে, ভ্যাপসা গরমে বার বার ঘামে ভেজা জামা পাল্টে কোম্পানীর কর্তারা এটাই বুঝলে সেই লোকটা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর নেই। যে লোকটার হাত থেকে তাঁরা অব্যাহতি চেয়েছিলেন। লোকটার নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী বা দাস। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আছেন কৃষ্ণনগরে, কাজেই কান্ত কৃষ্ণবর্জন করেছেন। 'তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুণা' বৈষ্ণব বিনয়ে কান্ত পদবীও বর্জন করেছেন। তাঁকে সবাই কান্তমুদি বলে ডাকে। তাঁর কি আদিকালে মুদির দোকান ছিল? হয়ত-বা। তাঁর দোকানেই কি আশ্রয় নিয়েছিলেন পলায়নপর ওয়ারেন হেস্টিংস? হবেও-বা। সেই থেকেই কি লোকে তাকে কান্ত মুদি বলে ডাকে? ডাকুক তাতে তো আর ফোস্কা পড়ে না। কান্ত মানীজনের মান রাখতেজানে না আর জানেন কাজ আদায় করে নিতে। আর সেই ভাবেই না অমন বাঘা সাহেব হেস্টিংসকে বশ করেছিলেন তিনি! তাঁর সঙ্গে তো বলতে কি প্রগাঢ় দোস্তী হয়ে গিয়েছিল কান্তর।

যে কথা হচ্ছিল। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি তো চলছে বেশ চুলবুল করে, কিন্তু পয়সাটা কার? যতই কর নাপুর নুপুর, ধন দিয়ে যায় কাদের ঠাকুর? কার আবার সারা বাঙলা দেশটা যাদের টাকায় চলছিল তখন —সেইজগৎ শেঠদের। টাকাটা তাঁদের। কিন্তু তাঁরা তো ব্যবসায়ী মানুষ। যাকে তাকে তো আর টাকা ধার দিতে পারেন না। তাঁদের বিশ্বাসী লোক চাই। আর এই বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হচ্ছেন কান্ত মুদি। আর কান্ত হচ্ছেন ইংরেজ কুঠির প্রধান গোমস্তা।

এখন কান্ত একদিন বেপাত্তা। নিরুদ্দেশ। ইংরেজ কুঠির পিয়ন গেল কান্তর দোকানে, কান্তর বাড়ীতে। যেখানে যেখানে কান্তবাবু থাকতে পারেন—সব জায়গায় ঘুরে এল। মুখ বিরস করে। স্টকহাউস জানালেন কলকাতায়—কান্তকে পাওয়া যাচ্ছে না। কোম্পানীর কাজ কারবার বন্ধ। কেন? বন্ধ কেন? কান্ত এমনকি

গুরুঠাকুর যে তাঁকে বিনা জগৎ অন্ধকার? সেই রহস্য স্টকহাউস নিজেই জানিয়েছিলেন কলকাতা কাউন্সিলকে। নতুন করে দাদন দেওয়া যাচ্ছে না। কেননা টাকা নেই। জগৎ শেঠ টাকা দিচ্ছেন না। তারা বলছেন, কান্তর হাত দিয়ে তারা কাশিমবাজার কুঠিকে দুই লক্ষ পঁয়তালিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছেন। সে টাকার কিছু উসুল না পেলে আর টাকা দেওয়া সম্ভব হবে না। এচিঠি সতেরশ' ত্রিশ সালের। তারিখটা পনেরই এপ্রিল। কোম্পানীর 'কনসালটেসনস বুকে' লিপিবদ্ধ হয়েছে ত্রিশ তারিখে।

জগৎ শেঠ তো ব্যবসায়ী মানুষ। কাজেই তাঁর চিঠির মধ্যে তাঁর ব্যবসায়ী বক্তব্যটা প্রত্যক্ষভাবে না বলে ইঙ্গিতে সারা হয়েছে। মোদ্দাকথা—কান্তকে না হলে তাঁরা টাকা দেবেন না। কেননা তাকেই তাঁরা প্রত্যয় করেন। কোম্পানীকে না।

বোধ করি শেঠদেরই সনির্বন্ধ অনুরোধে কান্ত নন্দীকে একদা ধরাধামে তথা কুঠিধামে অবতীর্ণ হতে দেখা গেল। এবং কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ! তাঁর খাতাপত্র সব উকুন বাছার মত বেছে দেখা গেল, কান্তবাবু শুধু কোম্পানীর দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা নিয় আরও এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার ধার করেছেন শেঠদের গদী থেকে। নিজের নামে। তবে নিজের স্বার্থে নয়। তবে, কার স্বার্থে?

সেটাই তো মুশকিল কাণ্ড। কোম্পানীর কর্মচারীদের খাস বিলেতে যখন নিয়োগ করা হয় তখন একটা উপদেশ বার বার দেওয়া হয়ে থাকে। এবং এই উপদেশ তাঁদের সেই স্যর্ টমাস রোর আমল থেকেই দেওয়া সুরু হয়েছে। তাঁদের বলা হয়, বাপুহে, কোম্পানীর কাজে যাচ্ছ। মাইনে পাবে। সব কিছু সুযোগ-সুবিধা পাবে। 'পার্কস', 'পেনসন' পাবে। কাজেই সেখানে গিয়ে কদাচ ব্যবসা করো না। কারণ, করলে বুঝি সেই কাজটা করার দিকে ঝোঁকটা বেশি পড়ে। ইংরেজ 'রাইটার' বা 'ফ্যাক্টররা' এসেই সেই কাজ সবচেয়ে বেশি করে। করবে নাতো কি? বাংলায় তখন ব্যবসার মরশুম চলছে। সেখানে টাকা উড়ছে। সেখানে সোনার ফুল ফোটে। এমন কে অর্বাচীন যে এই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবে? আর এই ব্যবসা করতে যে টাকা লাগে, সে টাকা কোম্পানীর দেশী কর্মচারীদের জোগান দিতে হয় নানা ফন্দি ফিকির করে। দালাল বল দালাল, উকিল বল উকিল, গোমস্তা বল গোমস্তা—কান্তকেও এই টাকা জোগাড় করতে হয়েছিল সেকালের ব্যাঙ্কার-প্রধান জগৎ শেঠের কাছ থেকে। জন স্টকহাউসের আগে কাশিমবাজারের প্রধান কুঠিয়াল ছিলেন এডওয়ার্ড ষ্ট্রিফেনসন। বছর তিনেকের জন্যে তাঁকেই তো কান্ত দিয়েছেন একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা। তাঁর বেনিয়ান নিয়েছেন হাজার

সাতেক টাকা। কান্ত বললেন, ঐসব টাকা উসুল না হলে তিনি টাকা দেবেন কি করে?

তবে কান্ত তো আর লেংটিপরা ভিখিরী নন? তারও কিছু জমিজিরেত ব্যবসা-পত্র আছে ঈশ্বর অনুগ্রহে। তা তাঁকে মুদিই বলুন আর যাই বলুন, কান্ত তৎক্ষণাৎ দুই লাখ বাহাত্তর হাজার টাকার সম্পত্তি এই দেনার জন্যে শেঠেদের গদীতে বন্ধক রাখতে রাজী হয়ে গেলেন। জগৎ শেঠও ঘোড়েল ব্যবসায়ী মানুষ। ইংরেজদের বললেন, দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকার একটা হাতচিটা লিখে দিতে। তাহলে তিনি আরও আশি হাজার টাকা দেবেন।

জন স্টকহাউস একটু টে টিয়া টাইপের লোক। বললেন, তাঁরা হাতচিটাতে লিখে দেবেনই না, পরন্তু কান্তকে বরখাস্ত করবেন। বেশ বোঝা যায়, ফ্যাক্টর সাহেব জগৎ শেঠের হাত থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিলেন। শেঠেরা দেখলেন কান্ত গেল তো তাঁদের টাকা গেল। কালবিলম্ব না করে, তিনি পাল্কী বার করতে বললেন। সোনার ঝালর দেওয়া তাঁর সুদৃশ্য অলঙ্কৃত পাল্কীটা তার মহিমাপুরের প্রাসাদ থেকে কাশিমবাজারের কুঠির উদ্দেশে যাত্রা করল ছয় বেহারার কাঁধে। ফতে-চাঁদ জগৎ শেঠ এসে স্টকহাউসকে এই ব্যাপারে শেষকথা জানিয়ে গেলেন। বললেন, দেখুন কান্তকে যদি আপনারা ছাড়িয়ে দেন, আমরা ভাবব আপনারা আমাদের সঙ্গে বৈরিতা করছেন। এইটা জেনে রেখে আপনারা আপনাদের ইতিকর্তব্য স্থির করবেন।

স্টকহাউস সব শুনলেন। কিন্তু তখুনি কিছু বললেন না। জগৎ শেঠ বলে যেতেই তিনি নবাবের দরবারে লোক লাগালেন। এই ব্যাপারে কি করা যায়, তার হদিশ পাবার চেষ্টা করলেন। নবাব সুজাউদ্দৌল্লার দরবার তো জগৎ শেঠদের আস্তানা। নবাবপুত্র সরফরাজ খাঁর দরবারে ঘোরা-ফেরা করতে লাগল কোম্পানীর লোক। টাকা উপঢৌকনের শ্রাদ্ধ হতে লাগল। কিন্তু না। সেখানেও কোন কাজ হ'ল না। আলীবর্দীর দাদা হাজী আহম্মদ খাঁ—তাঁর নিজেরও বড় ব্যবসা—সোজা জানিয়ে দিলে যে, নবাব মনে করেন জগৎ শেঠের সঙ্গে শত্রুতা তাঁর সঙ্গে বৈরিতারই সামিল।

কলকাতা কাউন্সিল চাপ দিতে লাগল। একজনের জিদে কি ব্যবসা লাট উঠবে নাকি তার চেয়ে জগৎ শেঠের সঙ্গে মিটমাট করে ফেল। জগৎ শেঠ মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জন স্টকহাউস তার প্রসারিত হাত কি ফিরিয়ে দেননি? ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠলো বুড়া দত্তের চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে। সাধারণতঃ কেউ চাকরি দিলে মুখ ফিরিয়ে নেয়না। কাজেই পিছনে কারও চক্রান্ত আছে! বুদ্ধিমান

স্টকহাউস বুঝলেন জগৎ শেঠকে বাদ দিয়ে ব্যবসা চলবে না কাশিমবাজারে। আর কান্তকে বাদ দিয়ে কাজ কারবার করবেন না শেঠজী। কাজেই কাশিমবাজার কুঠির দালাল হিসেবে আবার পুর্ণনিযুক্ত হলেন কান্ত নন্দী। আবার ইংরেজের ব্যবসার পালে হাওয়া লাগল।

কিন্তু কাশিমবাজার কুঠি স্থাপনা হল কবে? ইংরেজি ষোলশ' চুয়ান্ন সালে স্টিফেনস বলে এক কুঠিয়াল এখানে এসে কাজ কারবার সুরু করেন। এবং এখানেই দেহরক্ষা করেন। অনেকেই মনে করেন, ষোলশ' চল্লিশ সালেই এই কুঠির পত্তন। স্টুআর্ট বলেছেন ষোলশ' আটান্নয়। সরকারি কাগজপত্রে দেখা যায় জন কোম্পানীর বড়কর্তারা ফিলপট লেনের বাড়ীতে বসেই হুগলী,বালেশ্বর, পাটনা ও কাশিমবাজারে কুঠি বসাতে বলেন 'এজেণ্ট এ্যাট দি বে' জর্জ গাউটনকে। চিঠির তারিখ সাতাশে ফেব্রুআরি। মনে হয়, এসব সরকারী অনুজ্ঞাপত্র যবেই পাক না কেন, এখানকার কর্মকর্তারা, যাকে বলে খোঁজখবর বা 'স্কাউং'-এর কাজ আগে থেকেই সুরু করেছিলেন। হুগলী কুঠির যেমন একদিকে পর্তুগীজ অপর দিকে ডাচ; কাশিমবাজারেও তেমনি এক পাশে ডাচেদের কালিকাপুর অপর দিকে ফরাসীদের সৈদাবাদ। যা' নাকি পরে হয় ফরাসডাঙা আর মাঝে ইংরেজদের কাশিমবাজার। অন্য এই জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা ব্যবসার ভালজায়গার সুলুকসন্ধান করছিল। এই হুগলী কুঠির ভিত পড়েছিল-ষোলশ' পঞ্চাশে। কিন্তু এর জন্যে জন ব্রিজম্যানরা পাড়ি জমিয়েছিল অনেক আগে। সে গল্প আমরা আগেই করেছি। অথচ এটা স্থাপনের সরকারী হুকুম তো আসে আট বছর পরে। কাশিমবাজারের কাহিনী একই রকম বলে সন্দেহ করা অন্যায় হবে না। পাটনার ব্যাপারেও এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি আমরা জব চার্নক সম্বন্ধে আলোচনার সময় লক্ষ্য করেছি। ষোলশ' আটান্ন উনষাট, খ্রীষ্টাব্দে যদিও চার্নক সরকারীভাবে কাশিমবাজার কুঠির জন্য নিযুক্ত, তিনি সেই সময়ে রাজমহলে গিয়ে পৌঁছেছেন! সে কি কোন কোম্পানীর কাজে নাকি 'স্রোতের শ্যাওলার মত' ভেসে বেড়াচ্ছেন, কে জানে? তবে ষোলশ' সাতান্ন-আটান্ন খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজার কুঠিতে যে চারজন কুঠিয়ালকে বিলেত থেকে চাকরি দেওয়া হ'ল তাঁদের কনিষ্ঠতম জব চার্নক,বেতন—বিশ পাউণ্ড। চাকরি দেওয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু চার্নক কাশিমবাজারে, আসেননি তখন। এলেন অনেক পরে। বছর বিশেক এবং তখন কোম্পানী তাঁর কথায় ওঠে বসে। তার আগেই পাটনার তিনি চিফ ফাক্টর। আস্তে আস্তে তাঁর কর্মদক্ষতার প্রকাশ এবং উন্নতি। সে কাহিনীতো পাটনার কুঠি বৃত্তান্ত বলার সময়ে বিশদভাবেই বলা হয়েছে। সেকথা যাক। মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজারের প্রধান যে জিনিস বিলেতের বাজারে নিয়ে যেত জন কোম্পানী সেটা

হচ্ছে রেশম। এবং কুঠির সঙ্গে যে ফ্যাক্টরি থাকত যাতে তাঁতিরা রেশম বুনত। এখানের পাশাপাশি তিনটে কুঠির মধ্যে কালিকাপুরের ডাচ কুঠিই সবচেয়ে বড়। তারপর ইংরেজদের কাশিমবাজার। তবে ডুপ্লের আমলে সৈদাবাদ বা ফরাসডাঙারও খুব বাড়বাড়ন্ত হয়। কালিকাপুরে ডাচেরা তাঁতি খাটাত আটশ'র মত। কাশিমবাজারেও সেই ব্যবস্থা। তবে দেশী তাঁতিদের কাছেও কেনা বেচা হ'ত। ষোলশ' আশিতে জব চার্নক যখন কাশিমবাজারের বড়কর্তা হ'ন তখন সারা বাংলায় জন কোম্পানীর মোট লগ্নি তুই লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের মধ্যে একলক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড শুধু কাশিমবাজারেই ন্যস্ত করা হয়। কাশিমবাজারের সিল্কের তখন এতই কদর। সোরাও কম যেত না। ইংরেজদের পণ তালিকায় রয়েছে এখান থেকে চালান দেওয়া আফিং যদিও সেটা মুখ্যতঃ আসত বিহার থেকে।

অবশ্য এই কাশিমবাজারে বসেই জব চার্নক শায়েস্তা খাঁকে টাকা দিতে অস্বীকার করেন এবং এক সময়ে এখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হ'ল লোটাকম্বল নিয়ে। কাশিমবাজার থেকে হুগলী। এবং একদা হুগলী থেকে সুতানুটি।

কিন্তু যেকথা হচ্ছিল। কাশিমবাজার হচ্ছে কাশিম খাঁর বাজার। কাশিম খাঁকে বাংলার দেওয়ান করে, পাঠিয়েছিলেন সম্রাট শাজাহান। কাশিম খাঁ সেনাপতি হিসেবে দুর্ধর্ষ। লডাই চালাতে যেমন তিনি দড়, লডাই জিতে পরাজিতের প্রতি নিষ্ঠুরতায় তিনি তেমনি নির্বিকার। ম্যাণ্ডচি বলেছেন, সিংহাসনে বসবার আগে শাজাহান বেগমমমতাজমহলকে নিয়ে একদা এসেছিলেন হুগলীতে। হুগলীতে পর্তুগীজদের তখন খুবই দাপট। কাউকে তারা তোয়াক্কা করে না। 'রাত্রিদিন বহে যায় হার্মাদের ডরে'। স্বয়ং মমতাজমহলকে আক্রমণ করল মগদস্যুরা। বেগম সাহেবা বেঁচে গেলেন। কিন্তু তাঁর কয়েকজন বাঁদীকে পর্তুগীজ দস্যুরা অপহরণ করে নিয়ে গেল। অনেক ঐতিহাসিক অবশ্য বলেন শাহাজান যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, পর্তুগীজরা তাঁকে সাহায্য করেননি। আমল দেননি। তাঁর রাগ সেই থেকেই। কারণ যাইহোক, শাজাহান পর্তুগীজদের ওপরে ক্ষেপেই ছিলেন।

সিংহাসনে বসেই মুঘল রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। কাশিম খাঁকে পাঠালেন অচিরে পর্তুগীজদের উৎখাৎ করতে। ষোলশ' বত্রিশ। কাশিম খাঁ পর্তুগীজদের একেবারে ঝাড়েবংশে শুধু উচ্ছেদই করলেন না হুগলী থেকে, কয়েকজন পর্তুগীজ মহিলাকে বেঁধে নিয়ে গেলেন। আর কাশিম খাঁ নিজেও তো আর ভগবান শুকদেব। এই অপহৃত শ্বেতাঙ্গ রমণীদের সবাইকে তিনি দিল্লী নিয়ে গেলেন না। কয়েকজনকে

রেখে গেলেন— কোথায়, না এই কাশিমবাজারে। দিল্লীর নজর থেকে একটু দূরে। একটু বা গোপনে।

কাশিম খাঁর নামেই যে কাশিমবাজার এটা যদিও-বা কিংবদন্তী বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কাশিম খাঁর দৌলতেই কাশিমবাজারের প্রতিষ্ঠা— সন্দেহ নেই। নদীর এককূল ভাঙে তো আর এক কূল গড়ে। অর্থনীতিরও তাই। হুগলীর পতন থেকেই কাশিমবাজারের উত্থান। অবশ্য হুগলীতে পর্তুগীজদের পতন মানেই ইংরেজদের উত্থান। তারা ব্যাণ্ডেল থেকে সরে কুঠি করলে হুগলীতে। তারপর গ্যাব্রিয়েল বাউটনের দৌত্যে বাংলার বাণিজ্যের সনদ পেয়ে গেল। সে গল্প আমরা পরে করব। এখন কাশিমবাজার আর জব চার্নকের কথায় ফিরে আসা যাক।

আরঙ্গজেব জন চাইল্ডের ছাঁটাই আর নগদ টাকা খেসারতের বিনিময়ে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার ফেরৎ দেন ষোলশ' নব্বই-এ। দিল্লীশ্বরের এই ফতোয়ার কল্যাণে বাংলাদেশের ইংরেজরা বাণিজ্য ফেরৎ পেল। জব চার্নক ফিরলেন সুতানুটিতে। কাশিমবাজারের হালসে। লীডেনহল স্ট্রীট থেকে জরুরী হুকুম এল ষোলশ' ছিয়ানব্বই-এর ছয়ই মার্চ—কাশিমবাজার কুঠি যেন চালু থাকে! অবশ্য-অবশ্য।

এদিকে কাশিমবাজারের কপাল ফিরে গেল। মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে রাজধানী সরিয়ে আনলেন মুকশুদাবাদে। নামকরণ করলেন মুর্শিদাবাদ। আর কাশিমবাজার তো মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠ। মাইল তিনেক দূরে। আর বড়গাছের ডালে বসার মজাও যেমন তার জুটল, তার ঝড়ও তার গায়ে লাগতে শুরু করল। বন্দর কাশিমবাজার হ'ল রাজধানীর বন্দর। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে দিনেমার আর আর্মানিয়ানরা এখানে আর কুঠিই বানাল না। আর ইংরেজ কুঠির কর্তা উইলিঅম বগডেন নবাব দরবারে ত্রিশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ইংরেজ কুঠির আযতন বাড়িয়ে নিলে। সতেরশ' সাত।

আর ঐ বছরই আরঙ্গজেব মারা গেলেন। মুর্শিদকুলি হলেন স্বাধীন নবাব। আর মুর্শিদকুলির দোস্ত শেঠ মানিকচাঁদও ঢাকা থেকে সরে কাশিমবাজারের কাছে-পিঠে থিতু হয়ে বসলেন। এবং বছর দশেক না যেতেই নিজেরাই টাঁকশাল তৈরি করলেন। তখন অবশ্য আসল 'জগৎ শেঠ' শেঠ ফতেচাঁদ গদীতে বসেছেন। অবশ্য তখনও ফতেচাঁদ জগৎ শেঠ হননি। কেননা তার জন্যে তাঁকে দিল্লীতে কমসেকম এক কোটি টাকা নজরানা দিতে হয়েছিল তৎকালীন সম্রাট মহম্মদ শাহকে। তবে ইতিমধ্যে ইংরেজদের সঙ্গে জগৎ শেঠদের আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে এবং রঙ্গমঞ্চে আরও একজন বাঙালী আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি আটটাকা মাইনের গোমস্তা

—নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। তখন খেয়াল খুশি মত মর্জিমাফিক দিল্লীর দরবার থেকে টাকার তাগিদ আসত আর সে টাকার যোগান দিতে মুর্শিদকুলি দোহন করতে তাঁর কামধেনু এই বিদেশী কুঠিয়ালদের। মাঝে মাঝে তারা টাকা বুঝিয়ে দিয়ে আসত জগৎ শেঠদের। মাঝে মাঝে বেগড়বাই করত। আর তখনই সুরু হত নবাবী উৎপাত : মালপত্র সব বাজেয়াপ্ত কর। কুঠিয়ালদের বেঁধে ফেল।

সতেরশ' একুশে এমনি এক কাণ্ড। কান্তবাবু বান্দী হলেন। নবাবী সৈন্য ইংরেজ কুঠি ঘিরে ফেলল। ফতেচাঁদ কথাবার্তা বলে সেবারে কান্ত মুক্তির ব্যবস্থা করলেন। অবরোধ উঠে গেল। ইংরেজরা আবার ব্যবসা করতে লাগল। কিন্তু পরের বছর আবার নজরানার হামলা। ইংরেজ ও ডাচ—দুই কুঠির 'ভকিল'রাই কয়েদ হলেন। কাপ্তেন বোরল্যাস জগৎ শেঠকে ইংরেজদের আপত্তি জানালে দৃঢ়ভাবে। কিন্তু জগৎ শেঠই বা কী করবেন? ইংরেজরা না দিলে তাঁদেরই দিতে হবে। টাকা চাইই।

এদিকে কলকাতা থেকে অতিরিক্ত নজরানা চাওয়া হ'ল চুয়াল্লিশ হাজার টাকা। কোম্পানী বললে, না। দেব না: আবার কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ। কান্তবাবু সোজা ইংরেজ কুঠিতে। আবার জগৎ শেঠ এলেন মধ্যস্থতা করতে। নতুন কুঠিয়াল ষ্টিভেনশনও কথাবার্তা বললেন। শেষবেশ বিশ বাজার টাকা মুর্শিদকুলির শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করে ইংরেজরা সে যাত্রায় রক্ষা পায়। মুর্শিদকুলি খাঁ এই ঘটনার মাস খানেকের পরেই কবরে চলে যান। সেখান থেকে আর সাহেব দোহনে টাকার জন্য হাত বাড়াতে পারেননি তিনি এই যা রক্ষে।

মুর্শিদের জামাই উড়িষ্যার সুবেদার সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ ওরফে সুজাউদ্দৌল্লা আসাদ জঙ্গ এসে বসলেন বাংলার মসনদে। এই ভদ্রলোক বিশেষ কষ্ট দেননি ইংরেজদের। তবে একেবারে যে দেননি তা'নয়। কেননা নবাব একবার আর্কটী বা মাদ্রাজী টাকার দাম কমিয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য এই 'ডিভ্যালুয়েশনে' ইংরেজদেরই মুখ্যতঃ বিপদে ফেলল, কেননা আর্কটী টাকাতো তাদেরই। তারা তেইশ বাক্স রুপো জগৎ শেঠকে নজরানা দিয়ে সে যাত্রায় উদ্ধার পায়।

মুর্শিদের আমলে শুধু বিদেশী বণিকদের অর্থদোহন হয়েছে এটা একদিককার খবর। আর একটি দিক ছিল। তখন দেশে শান্তি ছিল। কঠোর হাতে রাজ্য-শাসন করতেন তিনি। কাজেই পণ্য সরবরাহ খুবই নিরুপদ্রব হতে পারত। লোকে নাকি দরজায় হুড়কো না দিয়ে ঘুমুতে পারত। শাসন ছিল এমনি কড়া। কাজেই ব্যবসার স্বর্ণযুগ। ইংরেজরা চুটিয়ে ব্যবসা করত তখন।

এবং এমনি ব্যবসাই চলত যদি না মারাঠারা এসে ফতেচাঁদের গদী লুঠ করে

নিয়ে যেত। আলীবর্দীও জাঁদরেল নবাব। কিন্তু মারাঠাদের সঙ্গে পেরে উঠতেন না। তাদের 'ব্লিৎসক্রিগ' ঝটিকাবাহিনীর তড়িৎ আক্রমণ বারে বারে তাঁকে বোকা বানিয়ে যেত। এবং এই বর্গীর হাঙ্গামার সুবাদে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির আরক্ষা বাড়িয়ে ফেললে ইংরেজরা। কয়েকটা গম্বুজ তৈরী হ'ল; কামান বসান হ'ল, কিন্তু মুর্শিদাবাদের নিয়মশৃঙ্খলা ফিরল না। এটা সতেরশ' বিয়াল্লিশ—তেতাল্লিশ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বর্গীদের সঙ্গে এই লড়াই আলীবর্দী চালান ঝাড়া নয় বছর। সতেরশ' একান্নয় সন্ধি হ'ল। উড়িষ্যা ওদের হাতে তুলে দেওয়া হ'ল, চৌথ হিসেবে।

কিন্তু এই লড়াই চলতে চলতে কপাল ভাঙল ইংরেজদের। আলীবর্দী খবর পাঠালেন কলকাতায়। সেই একই দাবী—টাকা চাই, টাকা। লড়ায়ের খরচ ত্রিশ লক্ষ টাকা। ইংরেজরা জানত এমনি একটা হামলা আসবে। এতদিন আসেনি এইটেই আশ্চর্য। বললে, আচ্ছা, পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব। আলীবর্দী বললেন, দেখ বাপু, আগে ছিল তোমাদের খান চার-পাঁচেক জাহাজ আর এখন তার দশগুণ জাহাজ কাশিমবাজার বন্দরে নোঙর করে। তারপর তাদের কলকাতা শহর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ত নবাবেরই। কাজেই অন্ততঃ পঁচিশ লাখ টাকা ছাড়। ইংরেজ কাউন্সিল অনেক গাঁইগুঁই করে লাখটাকা পর্যন্ত রাজী হলেন। কাশিমবাজারের কুঠিয়াল তখন জন ফস্টার। ফতেচাঁদ তখনও বেঁচে। বলে কয়ে, আলাপ আলোচনা করে তিনলক্ষ টাকায় সেযাত্রায় ব্যাপারটা রফা হ'ল। তবে এই সুযোগে একটা পরোয়ানা আদায় করে নিলে জন কোম্পানী। হুগলী, পাটনা, ঢাকা ও কাশিমবাজার—প্রভৃতি বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর বাণিজ্য অধিকার নবাব স্বীকার করে নিলেন।

মারাঠাদের সঙ্গে যখন সন্ধি করলেন আলীবর্দী তখন ইংরেজদের ব্যবসা কেমন চলছে? আলীবর্দীও মুর্শিদকুলি খাঁর তই জবরদস্ত শাসক। তিনি শান্তি পাননি, তবে যতটুকু পেয়েছেন, রাজ্য চালাবার জন্য সবরকম চেষ্টা করে গেছেন। আর এই সুমন্দ পবনে ইংরেজদের বাণিজ্য তরী অবাধে ভেসে বেড়িয়েছে। সেকালের এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে এই সময়ে বাংলাদেশে তাদের লগ্নী মোট প্রায় চৌত্রিশ লক্ষ টাকা। আর প্রায় ছয় লক্ষ টাকা লগ্নী কাশিমবাজারে। এবং শুধু কোম্পানীই ব্যবসা করেছেন বলা বোধকরি ঠিক নয়। অনেকেই করেছেন। করেছেন কান্তবাবুও। আলীবর্দীর এন্তেকাল হবার ঠিক আগের চার বছরে কৃষ্ণকান্ত নন্দী ওরফে কান্তবাবু পাঁচটি বড় বড় সম্পত্তি কেনেন। তিনটি স্বনামে। দুটি বেনামে।

এই সময়ে আর একটি লোকের আবির্ভাব হয় কাশিমবাজার কুঠিতে। ইনি ওয়ারেন হেস্টিংস, ভায়া মাদ্রাজ এবং কলকাতা, কাশিমবাজারে যখন এলেন, তখন

তাঁর বয়স বছর কুড়ি। মাইনে বছরে পাঁচ পাউণ্ড। মাসিক কুড়ি টাকা। ধোবার খরচও কিছু পাওয়া যেত। উইলিঅম ওয়াটস তখন বড়কর্তা। রেশম কুঠির ভার পড়ল হেস্টিংসের। গ্রামে ঘুরে ঘুরে তাঁকে রেশম কিনতে বা দাদন দিতে হ'ত। হাজার দশেক টাকা তাঁকে রেশম কিনতে দেওয়া হ'ত। তিনি প্রথমে ঘুরতেন। কাশিমবাজারের গণ্ডী পেরিয়ে বাঙলাদেশের আপামর মানুষজনকে চিনতেন! তাদের সঙ্গে সেই কঠিন দাবদাহে, কখনও বা কোন মেঘমেদুর প্রভাতে বা প্রখর দ্বিপ্রহরে কিংবা কোন বিষণ্ণ অপরাহ্ণে গ্রামীণ বাঙলার সঙ্গে পরিচয় হ'ত তাঁর। বছর দুয়েকের মধ্যে দেখা গেল তাঁর প্রমোশন। মাইনে বাড়ল বছরে একষট্টি পাউণ্ড। কলমও তাঁর ভালো চলে। তাই কাশিমবাজার কাউন্সিলে সভার কার্যবিবরণী লেখার ভার পড়ল তাঁর ওপর। পরের বছর নতুন দায়িত্ব। কাউন্সিলের সেক্রেটারী। অপিচ স্টোরকিপার। এই সময়ে ভারী বর্ষায় কাশিমবাজার ভেসে যেত। আর হেস্টিংস আর তাঁর বন্ধু ম্যারিয়ট জলবন্দী হয়ে মজা করে তাদের প্রবাসের কাল কাটাতেন।

কিন্তু এ আনন্দ নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। কেননা কয়েকমাসের মধ্যে আলীবর্দীর ফেলে যাওয়া মসনদে বসলেন হেস্টিংসেরই প্রায় সমবয়স্ক নবাব সিরাউদ্দৌল্লা। এবং বসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক টা-টা রোদ্দুরের দিনে কাশিমবাজারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দোসরা জুন। সতেরশ' ছাপান্ন। সব সম্পত্তি অধিকার করলেন। ওয়াটস, ও তাঁর সহকারী কলেট দুজনেই বন্দী। বন্দী ওয়ারেন হেস্টিংসও। নবাব কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির কলেট সাহেবের বাড়ীতে প্রায় সপ্তাহখানেক কাটিয়ে সেখান থেকেই সোজা কলকাতা অভিযান করলেন। আসলে তো তাঁদের মধ্যে পাঠান যুদ্ধ-ব্যবসায়ীর রক্ত। তার দাপানি যাবে কোথা?

এই সময় বাঙলাদেশের রঙ্গমঞ্চে আর একটি ছোট ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনাটা ছোট্ট। কিন্তু এর ফল সুদূরপ্রসারী। হেস্টিংস সাহেব তো বন্দীদশায় কাল কাটাচ্ছিলেন। দেশী এক ভদ্রলোক তাঁর খোঁজখবর করতে লাগলেন। সেকালে ডাচেদের ওপর নবাদের কর্মচারীরা অনেক সদয়। কেননা তারা তখনও জোর-জবরদস্তির কাছে মাথা নত করে। নবাবী নজরানা কমবেশি দিয়েই যায়। ইংরেজ-দের মত এত চেঁচামেচি করে না। অত নেই নেই বাই নেই তাদের। তাদেরই বড়কর্তা তখনও কালিকাপুরে। মানে কাশিমবাজারেরই উপকণ্ঠে। বাঙালী ভদ্র-লোক সোজা গিয়ে ডাচ ফ্যাক্টর ভেরনেট সাহেবের কাছে কথাটা পেড়ে থাকবেন। সাহেব তো তোমাদেরই স্বজাত। বাচ্চা ছেলে। কয়েদে কষ্ট পাচ্ছে। তুমি জামিন হও। আমি টাকাটা দিয়ে দেব। ভেরনেট রাজী হলেন। তিন হাজার টাকা।

জামিন মূল্য। হেষ্টিংস ছাড়া পেলেন। এই বাঙালী গোমস্তাটি আর কেউ নন — কান্তবাবু। কাশিমবাজার রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা। হেষ্টিংসের আজীবন সখা। কাগজে কলমে 'বেনিয়ান'।

তারপর একসময় কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠি সিরাজকে গদীচ্যুত করার চক্রান্তে মশগুল হয়ে গেল। এখানে আনাগোনা করতে লাগলেন ফতেচাঁদের দুই ছেলে মহাতব আর স্বরূপচাঁদ জগৎ শেঠ। পাল্কীর ঘেরাটোপের মধ্যে অতি সন্তর্পণে এলেন মীরজাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ। তাঁদের সঙ্গে জোর পরামর্শ হতে লাগল ওযাটস, কোলেট, হেস্টিংসের। পলাশীর লড়াযের এগার দিন আগে মীরজাফরের সঙ্গে ওয়াটসের গোপন চুক্তি হয়ে গেল। আর কাল বিলম্ব না করে, কুঠি ফাঁকা করে ইংরেজ কর্তারা পালালেন। এবং ফিরলেন যখন, কুঠি কাশিমবাজার গমগম করছে। আর রবার্ট ক্লাইভের একান্ত বাধ্য সহকারী ওয়ারেন হেষ্টিংস তখন স্টোরকীপার বা কাউন্সিলের সেক্রেটারী নন। রেসিডেণ্ট দীর্ঘ পাঁচ বছরের জন্য। ততদিনে কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠিতে রেশমের সুতো তৈরী হচ্ছে। অনেকে একাজে লেগেছেন। সুদূর গুজরাতী বেনিয়ারা এসে আস্তানা বেঁধেছেন মহাজনটুলিতে। ব্যবসা বেড়েছে সোরারও। কেননা পাটনা থেকে সোরার চালান এখানে সোরাখানায় এসে:নামান হ'ত। তারপর চালান যেত কলকাতা।

তবে ওযারেন হেস্টিংসের এই সময়টা বড় বেদনার কালও বটে। ফলতা থেকে বিয়ে করা আনা বউ জন লুকাননের বিধবা স্ত্রী মেরী আর মেয়ে এলিজেবেথকে এই কাশিমবাজারের কবরখানায় একদিন মাটিচাপা দিয়ে এলেন সাতাশ বছরের এই তরুণ ইংরেজ। তবে আশ্চর্য মনের জোর; ভেঙে:পড়লেন না। শুধু কোম্পানীর কাজই নয়, নিজেও ব্যবসা করতে লাগলেন। এব্যাপারে রবার্ট ক্লাইভই তাঁর গুরুদেব। তবে চেলাও কম যান না। ছোটখাট যে কোন ব্যবসা তো যে কোন'কণ্ট্রাক্ট'—যাতেই দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাবেন—তাতেই হেস্টিংস একপাযে খাড়া। বিলেতে টাকা পাঠাচ্ছেন। ব্যাঙ্কে 'ফিকসড ডিপোজিট' পাঠাচ্ছেন বছরের প্রায় সাড়ে ন'শ পাউণ্ডের মত। আর এই যে 'ব্যাওসা' তাতে মদত যোগাচ্ছেন কে? সেই মধ্যমণি মুদি কান্ত। বাঙলার এই রাষ্ট্রবিপ্লবে কান্তবাবু দেখা যাচ্ছে তাঁর কাজ ভালই গুছিয়ে চলেছেন। হেস্টিংসের বেনিয়ান হয়ে তিনিও দু'হাতে সম্পত্তি কিনছেন। হেস্টিংসের আমলে তিনি প্রায় বাইশটা সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। স্বনামে সতেরটা। বেনামে পাঁচটা। তিনি তাঁর জমিদারি পত্তন করেন ফুলবেড়িয়া পরগণা কিনে। পরে তিনি জোত সর্বজয়ও খরিদ করেন। রাণী ভবানীর কাছে তিনি এই সময়ই শ্রীপুর প্রভৃতি মহাল কিনে নেন। পরগণা সমরখালি তিনি রামসেনের বেনামে কেনেন। এই

একই সময়ে দু' আনি পরগণা কিনে তার নাম দেন কান্তনগর। আর টাইটেল পান চৌধুরী। বিচিত্র মানুষের মন। নিজের গাঁয়ের শ্রীপুরের সম্পত্তি কিন্তু তিনি কেনেন বেনামে!

পলাশীর যুদ্ধের পর জন কোম্পানীর বাঙলায় লগ্নী বাড়াতে লাগল। ছয় বছরের মধ্যে এই লগ্নী বেড়ে দাঁড়াল চল্লিশ লক্ষ টাকা। একই অনুপাতে বাড়ল কাশিমবাজারের লগ্নী। সেখানে তারা লগ্নী করল নয় লক্ষ টাকা। এবং কালে কালে রেশমের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসেবে কাশিমবাজারের নাম ও যশ সারা পৃথিবীর বাজারে ছড়িয়ে গেল। কান্তবাবু শুধু নিজে নন, তার ভাই নৃসিংহ নন্দী, ভাইপো বৈষ্ণবচরণ নন্দী কোম্পানীর বাইরের সিল্কের ব্যবসাদারদের সঙ্গে পার্টনারশিপে প্রচুর মুনাফা করতে থাকেন। মহাজনটুলিতে যে গুজরাতী ব্যবসাদারেরা এসে বসবাস করছিলেন, এরাও ছিলেন নন্দী পরিবারের বড় খদ্দের। কান্তবাবু নিজেই তাঁর ছেলে লোকনাথের নামে জন কোম্পানীকে রেশমের কাটা কাপড় বিক্রি করতেন নিয়মিত।

তবে শুধু কান্তবাবুকে দুষলে অন্যায় হবে। ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে শুরু করে সাইকস, বারওয়েল সবাই কাশিমবাজারের লাভে ভাগ বসিয়েছেন। কেউই কম নয়। তবে বোল্টসই সবচেয়ে বেশি। তাঁকে জন কোম্পানী ঠেলে জাহাজে তুলে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাসত্বেও পকেটে করে নয় লক্ষ কড় কড়ে টাকা গুণে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি!

অবশ্য শুধু কাশিমবাজার নয়। কাশীতে চৈৎসিং-এর সঙ্গে হেস্টিংসের বৈরিতার সুযোগে কান্তবাবু জোর মজা লুটেছেন। কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী তাঁর কাব্যে সেটা রেকড় করে গেছেন। এবং একসময় হেস্টিংস কাশিমবাজার ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে উঠেছিলেন। এবং হেস্টিংস তাঁর বেনিয়ানকে ভোলেননি। কলকাতার একনম্বর সিটিজেনের মান দিয়েছিলেন তাঁকে। বাঁচিয়েছিলেন ক্লেভারিং-এর রোষবহ্নি থেকে। নন্দকুমারের বিচারের প্রহসনে তাঁকে ডাকা হলে তিনি সাক্ষী দিতে আসেননি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে নন্দী উপাধি দিয়েছিলেন। সেটাই তিনি শেষ অবধি ধারণ করেছিলেন। কলকাতার কবি তাঁকে নিয়ে ছড়া বেঁধেছে—

"কান্তবাবু হয়ে কাবু হাবুডুবু খায়,
তুড়ুং লাগান হোক ক্লেভারিং এর পায়।
হেস্টিংস যাহার হাত তারে করে কাবু,
বাঙলার হেন লোক আছে কে হে বাবু॥"

কান্তবাবু জাত কাছারির কর্তা হয়েছিলেন। কলকাতায় তার গগনচুম্বী ঐশ্বর্য।

আর সেই ঐশ্বর্য এই কাশিমবাজারের কল্যাণে। হেষ্টিংস যে তাঁর হাত-ধরা, তারও সূত্রপাত তো এই কাশিমবাজার থেকেই!

কিন্তু শুধু কান্তবাবুর কথা বললেই কাশিমবাজারের কাহিনী শেষ হবে না। চার্নকের গল্প আপনাদের শোনাতেই হবে নয়তো আদ্যিকালের কাশিমবাজারের ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এছবি হচ্ছে মূলতঃ হুগলীর প্রধান কুঠিয়াল এবং জন কোম্পানীর বে অব বেঙ্গলের সকল এজেন্সীর সর্বময় কর্তা এজেণ্ট,রাইট ওয়রশিপফুল উইলিঅম হেজেসের সঙ্গে কাশিমবাজার কুঠির বড়কর্তা জব চার্নকের সংঘর্ষের গল্প। অবশ্য যাঁকে নিয়ে এই গল্পের সুরু তিনিও ছিলেন কোম্পানীর আমলা এবং কাশিম-বাজারের নন, হুগলীরই। এবং সেখানেই এই বিচিত্র নাটকের যবনিকা উঠল যখন, জব চার্নক কাশিমবাজার কুঠিতে বছর দুই বহালতবিয়তে রাজপাট চালিয়েছেন। বৈশাখ মাস। ইংরেজির এপ্রিল। মাঝে কযেকদিন খুব জোর ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। তবু তাপ কমেনি ধরিত্রীর। গা জুড়োযনি। একদিন সকালে মথুরা শা' বলে একজন মহাজন উইলিঅম হেজেসের কাছে দীর্ঘ একটি চিঠি দিযে গেল। চিঠি ঠিক নয়—অভিযোগ পত্র। এবং তাতে সই তাঁর একার নয়, মথুরা শা ছাড়াও হয়েছে রূপ সুলেমান, রঘু দে, নয়াচাঁদ সা, রঘুনাথ, হরেকৃষ্ণ কোঠমা, রামচাঁদ পরামাণিক, রামনারায়ণ এবং মধু খাঁর। দীর্ঘ অভিযোগ গুদামবাবু ফ্রান্সিস এলিসের বিরুদ্ধে। অভিযোগ এমন কিছু-নতুন নয। এব্যাপারটা তারা মুখে আগেই কোম্পানীর বড়কর্তাদের গোচরীভূত করেগিয়েছিল। এবারে লিখিত। মোদ্দা কথায় সেই অভিযোগ হচ্ছে—চার হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছে এলিস। কোম্পানীর জাহাজে চালানী:মাল "পাশ" করার জন্যে। এলিস স্বীকারও করেছে যে, সে টাকা নিয়েছে, তবে অত নয়। নয়শত টাকামাত্র। এবং এই অভিযোগ পেয়েই এজেণ্ট সাহেব তাঁর গুদামবাবুর চাকরি খতম করে দিলেন, এবং তাড়াঘড়ি যোশেফ ডড বলে এক সাহেবকে তার জায়গায় বসিয়ে দিলেন।

হেজেস সাহেবের ডায়ারিতে এই সময়ের বাঙলাদেশের তাঁতিদের যেসব অভিযোগ আছে, তা থেকে সে যুগের ইংরেজ কুঠির একটা বিচিত্র ছবি ফুটে ওঠে। রঘু দে নামে এক তাঁতি উইলিঅম হেজেসের কাছে অভিযোগকরেছিলেন যে,এজেণ্ট সাহেব বালেশ্বর যাবার সময় বলে গিযেছিলেন যে মলমল কাপড় সংগ্রহ করতে জাহাজে চালানের জন্যে প্রচুর পরিমাণে মজুত করতে। সেইসূত্রে এলিস সাহেব তাকে ডেকে পাঠায়।' বলে রঘু.'তোমার মাল আমি কাটিয়ে দেবো,কিন্তুআমায় একশ'টাকা দিতে হবে।' আমি হুঁজুর রাজী হ'লাম। রামনারায়ণ বলে আমারই এক ভাই-বেরাদর আমার জামিন হ'ল। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই এলিস সাহেব আবার ডেকে

পাঠালে। বললে, "রঘু, মাত্র একশ' টাকায় হচ্ছে না, দুইশ' টাকা না হলে তোমার পাঁচশ' থান মলমল তো পার হবে না বাপু।" আমি বললাম, 'হুজুর আমি গরীব মানুষ এতটাকা পাব কোথা?' এলিস বললে, 'তবে পথ দেখ।' কত বড় অন্যায় বলুন এজেণ্ট হুজুর? অবশ্য এলিস বলেছিল, কিছু মাল আমার কাছ থেকে সে নেবে। কিছু নিয়েও ছিল। এখন হুজুর, আপনি এসে পড়েছেন। বিচার করুন। গরীব তাঁতিকে বাঁচান।

এর পরেই সেই 'জয়েণ্ট পিটিশন' যৌথ দরখাস্ত—ছোট খাট গণ দরখাস্তও বলতে পারেন—। তাতে হুগলীর তাঁতিরা এলিসের নাম অভিযোগ আনলে নগদ টাকায় এবং মালে তিনি প্রচুর ঘুষ নিয়েছেন। তালিকাটা এমনি—মথুরা শা—এগারশ' পঞ্চাশ টাকায় এবং মালে—গয়াচাঁদ শা—নগদ তেয়াত্তর টাকা; হরেকৃষ্ণ কোঠমা—একশ' দু'টাকা আট আনা—টাকায় এবং মালে; রামনারায়ণ—কয়েকথান মলমল, রঘুনাথ, রামচন্দ্র পরামাণিক, মধু খাঁ রঘু দে—প্রতি পিসে চার আনা করে চার হাজার চারশ' তেপান্নটি টুকরায মোট এগারশ' তের টাকা চার আনা—এবং এই শেষোক্ত হিসেবে আরও রয়েছে এলিস রঘুনাথের একটা পেটি থেকে পাঁচশ' পিস মাল বার করে নিয়েছে।

এলিসের তো চাকরি গেল। তাকে ফ্যাক্টরী ত্যাগ করার হুকুম দেওয়া হ'ল। কিন্তু হুগলীর তাঁতিরা আর একটা অভিযোগ আনল। তাতে তারা বলল, 'এলিস সাহেবকে আরো অনেক টাকা দিয়েছে তারা। গত জাহাজে মাল চালান দেবার জন্যে।' এই নতুন ফর্দটা এই রকম, মথুরা দাস—নগদ ছয়শ' টাকা; রুমাল ইত্যাদিতে—সাতশ'—মোট তেরশ' টাকা। রঘুনাথ—মাল—দাম মোট এগারশ' পঁচাত্তর টাকা। রামনারায়ণ—নগদ নয়শ' টাকা। পনেরই জানুআরি—প্রথম কিস্তি একশ' টাকা; একুশে জানুআরি—দ্বিতীয় কিস্তি—আটশ'টাকা। এবং মাল—শতরঞ্চী চারকোণা ও মলমল, লুঙ্গি একশ' পঞ্চাশ টাকা।—সব মিলিয়ে, সবাই মিলিয়ে পঁয়তিরিশ শ' তিরিশ টাকা।

এলিস সাহেবকে ডাকা হ'ল। বাদী, প্রতিবাদী উভয় পক্ষই হাজির। এলিসের সেই আগের চাল, কিছু স্বীকার করে। কিছু অস্বীকার। তুমুল বাদানুবাদ। হৈ চৈ হট্টগোল। শেষে ঠিক হ'ল আগামীকাল—অর্থাৎ ছাব্বিশে জুন সকাল নয়টায় আবার কাউন্সিলের সামনে দুই পক্ষই হাজির থাকাকালীন এলিস তার অভিযোগের জবাব দেবে। বণিকরা বলল, এলিস তার মা মেরীর নামে শপথ. করে তার ঋণ অস্বীকার করুক। তাঁতিরাও তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে বললে তাদের পাওনার কথা।

এলিস একটা জব্বর চাল চাললে। বললে, সে শপথ করে সব স্বীকার বা অস্বীকার করবে। যদি কোম্পানী তার চাকরি ফেরৎ দেয় বা এতদিনে তার যা' ক্ষতি হয়েছে, পুষিয়ে দিতে স্বীকৃত হয়। তারও সব খাতা-পত্র আছে। কাউন্সিল দেখা যাচ্ছে, বেশ প্যাঁচে পড়ে গেল। তারা হ্যাঁ—না কিছু বলতে পারল না।

এবং এই অবকাশেএকদিন নৌকা করে এলিস সোজা গিয়ে উঠল কাশিমবাজারের ঘাটে। এবং পায়ে পায়ে একেবারে সেইবেয়াড়া কুঠিয়াল জব চার্নকের খাস কামরায়। এবং সেই নিয়েই বেঁধে গেল রঙ্গ। হেজেসের সঙ্গে চার্নকের মোটেই বনিবনা হচ্ছিল না। চার্নকের ধারণা—এতবড় কাজ চালাতে গেলে, এসব একটু আধটু থাকবে। কে কাকে গালি দিল, কে কাকে মারতে গেল, কে বললে হুগলী কাউন্সিলের আমি থোরাই কেয়ার করি—আমি কোম্পানীর চাকর এইসব নিয়ে মাথা ঘামালে কোম্পানীর বড়কর্তার কাজ চলে না। এমনি একটা উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন এজেন্ট উইলিঅম হেজেসকে। বলেছিলেন, এসব পেঁতি ব্যাপার যদি কানে তোলেন, কোম্পানীর ঝুট-ঝামেলা বাড়বেই শুধু। চার্নক যে ঘটনাটিকে লক্ষ্য করে হেজেসকে কথাগুলি বলেছিলেন সেটি ঘটছিল—কাশিমবাজারের স্যামুএল ল্যাঙ্গলে বলে এক সাহেবকে কাশিমবাজার কুঠির চতুর্থ কুঠিয়াল ওয়াটসন গালিগালাজ করেছিল; 'স্ত্রীর ভ্রাতা'—বিশেষণে সম্মানিত করেছিল। তাই নিয়ে ল্যাঙ্গলে করেছিল হুগলীতে দরখাস্ত। হেজেস তাকে ডেকে পাঠালেন এবং গালিগালাজের শুধু বিচার করলেন না। ওয়াটসন সাহেব নাকি বলেছিলেন তিনি হুগলী কাউন্সিলের লোক নন। তিনি কাশিমবাজারের। হুগলীর তাঁবে নন। কাজেই হুগলীর ছড়ি ঘোরান তিনি মানবেন কেন? তার বিরুদ্ধে 'ইনসাবরডিনেশন' কর্তৃত্ব অস্বীকারের অভিযোগ এনে হুগলীর এজেন্ট হেজেস তাকে সাসপেণ্ড করে দিলেন। এখন এলিসকে পেয়ে জব চার্নকও একটু সক্রিয় হয়ে উঠলেন। কাশিমবাজার—বনাম-হুগলী লড়াই জোর জমে উঠল।

দেখা গেল, চাকরি যাওয়ার মাস ছয়েকের মধ্যে কাশিমবাজার থেকে ফ্রান্সিস এলিস একটা সরকারী নির্দেশনামার লাইন তুলে দিয়ে বললেন যে, আগে তো 'কাউন্সিলের অব বে'র অন্যান্য কুঠির কর্মচারীরা বিশ্বস্তভাবে ও পরিশ্রম সহকারে কাজ না করলে তাদের চাকরি খাবার এক্তিয়ার ছিল। কিন্তু তা থেকে হুগলী কুঠি বাদ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এক নির্দেশে যদিও সেই কর্তৃত্ব হুগলী কুঠি পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তবু তাদের সাময়িক বরখাস্ত করার অধিকারই দিয়েছে জন কোম্পানীর সদর দপ্তর। চাকরি খাবার অধিকার নয়। এলিস হুগলী কুঠির লোক, তাকে কি করে একবার বরখাস্ত করল হুগলীর এজেন্ট? এলিস কাশিমবাজার থেকে চমৎকার মুন্সিয়ানা করে লেখা চিঠিখানায় আরও বলেছিল, আপনাদের আমার চাকরিটা

...বার ছুতোটা কি না—মথুরা দাসের বদমায়েসিতে আমারও হাত ছিল। তা'হলে মথুরা দাসকেও কোম্পানী 'ব্লাকলিষ্ট' করল না কেন কোম্পানী? তা'ছাড়া, সে ...টা তো আরও অপকর্ম করে থাকে, যেটা এজেন্ট বাহাদুরের অজানা নয়। সে যে ইন্টার লোপার—অবৈধ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগসাজস রেখেছে, তার ভাই বল্লভদাসের বকলমে, তাও কি কোম্পানীর অজানা? আর এত শয়তানি সত্ত্বেও সে তো আমাদের 'দস্তক' নিয়ে বহাল তবিয়তে ব্যবসা করছে—তার কি করছেন এজেন্ট বাহাদুর?

এজেন্ট বাহাদুরকে আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিল এলিস। বলেছিল, সার্ যশুয়া চাইল্ডের একটা চিঠি আমাকে দেখিয়েছিলেন সার্ যাতে মথুরা দাস আর তিন-চারজন বেনিয়ার সম্ভবতঃ জয়চাঁদ শা',রামনারায়ণ, রঘুনাথ এবং রামচাঁদ—সঙ্গে কোনরকম সম্বন্ধ রাখতে নিষেধ করা ছিল। আর সেই মথুরাদাসের ব্যবসা বন্ধ করা তো দূরের কথা—তার কাজকারবার আরওফালাও করে চলছে কোম্পানীর সঙ্গে—এর রহস্যটা কি হুজুর?

এদিকে হেজেস জানালে, কাশিমবাজারের দু'জন ব্যবসাদার চিতোরমল আর দীপচাদ তাকে জানিয়েছেন যে, জব চার্নক তাঁতিদের কোম্পানীর সিক্কাটাকায় যে দাদন দেয় তার সুদ নেয় শতকরা দু'টাকা। অথচ কোম্পানীকে দেখায় পাঁচ সিকে আর এই বার আনা পয়সা দিব্যি পকেটজাত করে। এই করে চার্নক সাহেব বছরে কমসে কম হাজার পাউণ্ড কামায়। এ অভিযোগ নতুন নয়। পাটনা কুঠিতেও চার্নকের এই সুনামের কথা শোনা গেছে এবং এটা বোধকরি সেকালের প্রচলিত রেওয়াজই ছিল। হেজেস তাঁর ডায়ারিতে আরও লিখেছেন, নেলর বলে যে নতুন 'ইন্টার লোপার' এসেছে তার সঙ্গে চার্নকের খুব দোস্তী। কাশিমবাজারে সে জোর ব্যবসা করছে। শুল্কই দিয়েছে সাতাশ শ' টাকা! চার্নকের সাহায্য ছাড়া কি এত মাল পেত নেলর?

এরপর আরও একটা ঘটনা ঘটল সেই ওয়াটসনকে নিয়ে। সে একদিন হেজেসকে গিয়ে বললে, কাশিমবাজারে এক বজরা পারশ্যদেশীয় কিছু কল যাবে তার একটা দস্তক দিতে। সেই দস্তক নিয়ে, নৌকাটা কাশিমবাজারের জন্যে পাল তুলে দিয়েছে এমন সময় ধূমকেতুর মতন উদয় হল ওয়াটসন সাহেব। সঙ্গে জন কোম্পানীর বরখাস্ত কর্মচারী জেমস হার্ডিং। বিনা অনুমতিতে ব্যবসা করা বর্তমানে তার পেশা। 'ইন্টার লোপার' আর কি? মাঝি সব জানত। ইন্টার লোপারদের নিয়ে যাওয়া বেআইনী। সে বললে, না বাপু, এ সাহেবকে আমি নিয়ে যেতে পারব না। দু' এক কথা হতে না হতে ওয়াটসনের মেজাজ গেল চড়ে। সে জোর দুটো থাপ্পড় বসিয়ে

দিলে মাঝির গালে। হৈ হৈ ব্যাপার! হুগলীর তুনম্বর কর্তা তখন বিয়ার্ড সাহেব। তাঁর তো, শুধু তাঁর কেন, প্রায় সবারই, কেবল হেজেস ছাড়া সকলেরই ইন্টার লোপারদের সঙ্গে দিব্যি সব ব্যক্তিগত কাজ কারবার ছিল। বিয়ার্ডও এসে বলে থাকবেন, মাঝিকে অগত্যা হার্ডিংকে নিয়ে সেই 'ইন্টার লোপার'কে নিয়েই ইংরেজ বজরা ছেড়ে দিলে! এবং তীরে বসে তাই নিয়ে কাগজে কলমে আক্ষেপ করতে লাগলেন হুগলীর এজেন্ট উইলিঅম হেজেস। দেখতে দেখতে তাঁর বিরুদ্ধে খাড়া হয়ে গেল সবাই। মালদা কাউন্সিলের হারভে, পাটনা কাউন্সিলের জেমস লাউডেন হুগলীর বিয়ার্ড সাহেবের বড় কুটম ঢাকার পৌনসেট—কাশিমবাজারের চার্নক তো আছেনই শুধু নয়। তিনিই অগ্রনি। চার্নকের চিঠিতো এই সব ব্যাপারে একটা জোর দাবী তুলেছিলেন। হেজেসকে লিখেছিলেন, নিজে যা' বুঝবেন তাই করবেন না। বে অব বেঙ্গলের সব কুঠিয়ালকে ডাকুন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা আসতে পারেন, তাদের নিয়ে, তাদের মতামত নিয়ে তবে কাউন্সিল চালান। হেজেসকে তিনি বলেছিলেন, আগেও এরকম সভাডাকা হয়েছে। এ রকম কাউন্সিল যে ডাকা হয়েছে, তার সাক্ষী তিনি নিজেই। আর তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেওয়া যায় এরকম সভা ডাকা হয়নি। কিন্তু সেটা কি ঠিক হয়েছে? সভা ডেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাউন্সিল চালানই কি বিধেয় নয়? আর তিনি তো হেঁজিপেঁজি নয়। এই বে অব বেঙ্গলের কাউন্সিলে তিনি দ্বিতীয়। এবং একদা হুগলীর এজেন্ট হিসেবে মনোনয়নও পেয়েছিলেন।

এসবেরও কোন জবাব দিতে পারেননি হেজেস। ডায়ারিতে বার বার লিখছেন, এরা কেউই আমার কথা শোনে না। আমায় মর্যাদা দেয় না। স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব প্রধান। এমনি করে চললে কোম্পানীর ব্যবসা লাটে উঠবে। আরও লিখেছেন, ওদের কারও ইজ্জত নেই। 'আই লিভ ইন অনার এ্যাণ্ড এষ্টিম'—আমি সম্মান এবং মর্যাদা নিয়ে বেঁচে আছি!

তবে সেটুকুও শেষদিকে পুরোপুরি বজায় থাকেনি। কেননা, চার্নক অভিযোগ এনেছিলেন ডগলাস বলে এক ব্যবসায়ীকে ইন্টার লোপার মাল পাচার করার সরকারি দস্তক দিয়েছিলেন হেজেস। তবে হেজেস ডগলাসকে বিয়ার্ডের এজলাসে ধরে এনেছিলেন এবং তার স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন এই মত যে, ডগলাস যার জন্ত দস্তক নিয়েছিলেন সেটা ডাচেদের মাল, কিছু বা তার নিজেরও। কোন ইন্টার লোপারের মাল নয়। এবং ইন্টার লোপারের মাল পাশ করার জন্য তিনি নিজে কখনও দস্তক চাননি, এবং হেজেস কখনও দেননি।

এদিকে কাশিমবাজারে চার্নকের বিরুদ্ধে অভিযোগের নাকি অন্ত নেই। অন্ততঃ হেজেস সাহেবের তাই খবর। তিনি তাঁর রোজনামচায় জানাচ্ছেন—বারই

জানুআরি—ষোলশ চুরাশি—কাশিমবাজারের বেনে আর পাইকারেরা সবাই মিলে কাজীর দরবারে চার্নকের নামে গুরুতর অভিযোগ আনলে। এইটেই অবশ্য প্রথম নয়। আগেও এনেছে। এবারও আনলে, হুজুর বিচার করুন। হুজুর আর কি করবে চার্নককে ডেকে পাঠালেন। চার্নকের আসতে বয়ে গেছে। অভিযোক্তারা আর কি করবে—কাজীর কাছে তাঁর রায়ের একটা নকল নিয়ে ঠিক করলে তারা ঢাকা যাবে। খাস নবাবের দরবারে।

অবশ্য ঢাকা আর যেতে হয়নি। ব্যবসা কিভাবে চালাতে হয়, চার্নক তা ভালই জানেন। কখন কড়া হতে হবে, কখন নরম—সে চাল তাঁর খুবই রপ্ত। এবার কতকগুলি মুসলমান বণিকদের ধরে তিনি এই ঝামেলার ফয়সালা করে ফেললেন। চার্নক যত রেশম কিনছেন—তার দাম ঠিক হ'ল সের প্রতি পাঁচ টাকা বার আনা।

হেজেস অবশ্য বলেছেন, এ দর বাজার ছাড়া, এতে কোম্পানীর লাখ টাকা গলে গেল। কিন্তু এদিকে কোম্পানী একটা আদেশ পাঠালে বিলেত থেকে। সেটা এল কোম্পানীর ছোট্ট জাহাজ টমাসের কমাণ্ডার হাউ সাহেবের হাতে—হেজেস সাহেব বরখাস্ত হয়েছেন। তার জায়গায় বসবেন বিয়ার্ড। আর কোরমণ্ডল উপকূল ও বঙ্গোপসাগর উপকূলের সর্বময় এজেন্ট হলেন গিফোর্ড। হেজেস খবর পেলেন—সতেরই জুলাই। ষোলশ' চুরাশি।



হেজেস মানুষটা কিন্তু টাকাকড়ির দিক দিয়ে সাচ্চা। তবে এতবড় রাজত্ব চালাবার অনুপযুক্ত। আনাড়ি। জানেন না,এতবড় রাজত্ব শুধু কড়া শৃঙ্খলায় চলে না। সেখানে মানিয়ে চলতে হয়। এখানে আইনতঃ 'ইণ্টারলোপিং' নিষিদ্ধ হলেও ছোট বড় সবাই তাদের সঙ্গে ব্যবসা করে। ফৌজদার দেখেন, তারা ইংরেজ কোম্পানীর শতকরা দুই টাকা, তিন টাকার ওপরে আট আনা বেশি দেয়। কখনও বার আনা। নবাবকে, দেশী আমলাদের প্রচুর উপঢৌকন দেয়। কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের সঙ্গে ব্যবসা করে দু'পয়সা কামায়। কাজেই তাদের সঙ্গে মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে হয়। কিন্তু হেজেস তাদের ওপর খড়্গহস্ত। এতবড় রাজত্বটা চালাতে গেলে হৃদয় দরাজ করতে হয়। ছোটখাট ব্যাপারে মাথা ঘামাতে নেই। ঢাকায় ফ্যাক্টর বিনা অনুমতিতে, 'ক্রোকারি'—চায়ের, খাবার বাসন কিনেছে, বজরা তৈরি করেছে। হেজেস ক্ষুব্ধ। কোন কুঠিয়াল, অন্য এক কর্মচারীকে 'শালা' বলে গালি দিয়েছে; মদের ঝোঁকে অস্বীকার করেছে কোম্পানীর কর্তৃত্বকে। হেজেস তার চাকরি খেয়ে দিলেন। দুই গুদামবাবু সিল্ক ওজন করে, কোম্পানীর আড়তে তোলবার সময়

বেশি নিয়েছে। দেশী ব্যবসাদারদের অভিযোগ এসেছে। হেজেস তাদের 'ট্রান্সফার' করে দিলেন। তাতে কে অসন্তুষ্ট হ'ল, কার বাড়া ভাতে ছাই পড়ল, তার খোঁজ খবর করলেন না—এরকম করে কি কোম্পানীর কাজ চলে?

তার চেয়েও বড় কথা, তিনি দেশী নবাবী আমলাদেরও মানিয়ে চলতে পারেননি। তাদের প্যাচপ্যাচ, ঘাঁত-ঘোঁত বুঝে উঠতে পারেননি। এবং চার বার তাদের ওপর বিশ্বাস করে ঠকেছেন। তাদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে একেবারে 'মাৎ' হয়ে গিয়েছিলেন। সে গল্প শোনবার জন্য চলুন আমরা হুগলী যাই। হুগলী কুঠিতে গিয়ে দেখা করে আসি সেই ধুরন্ধর বাঙালী পরমেশ্বর দাসের সঙ্গে।

হুগলীতে তখন শীত বেশ জমিয়ে পড়েছে। নভেম্বরের শেষাশেষি। হুগলী গঞ্জ-বাজারে ঢি-ঢি করে ঢ্যাঁড়া পড়তে শুরু করল। কার ঢ্যাঁড়া? না, নবাবের ঢ্যাঁড়া। শেঠ বুলচাঁদের ঢ্যাঁড়া যদি অ'বাঙ্ লোকের মত কেউ প্রশ্ন করে বসে—শেঠ বুলচাঁদ আবার কে?—লোকে তাকে নির্ঘাৎ 'দুও' দেবে। আরে, শেঠ বুলচাঁদকে জানো না তো হুগলীর গঞ্জ-বাজারও তোমার অজানা। বুলচাঁদ মানেই তো তখন বাঙলাদেশ। জানি, জানি। বলবেন ঢাকায় নবাব শায়েস্তা খাঁ আছে। দিল্লীতে সম্রাট আওরঙজেব আছে। আছে তো আছে, তাতে কার কি? হুগলী বলতে শেঠ বুলচাঁদ। আর বুলচাঁদ বলতে বঙ্গতনয় পরমেশ্বর দাস। আর তাকে নিয়েই সেদিনের ঢ্যাঁড়া।

ঢিগ্...ঢিগ্...ঢিগ্—বাজারে বাজারে ঘুরে ঘুরে ঢুলি গলার শিরা ফুলিয়ে বলে বেড়াচ্ছিল—যদি কারও কোন পাওনা থাকে পরমেশ্বর দাসের কাছে, অবিলম্বে তারা যেন শেঠজীর বাড়ী হাজি...র-হয়। শেঠজী তাদের পাওনা পাই-পয়সা দেবেন—ঢিগ্... ঢিগ্...ঢিগ্।

এবং খবর পাওয়ার যা অপেক্ষা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেঠ বুলচাঁদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ কমসেকম তিন হাজার লোকে ভরে গেল। সবাই পাবে। কেউ দশ কেউ-বিশ। আর শেঠ বুলচাঁদ যেন কল্পতরু। প্রার্থীরা যে যা পায় প্রত্যেকেরই সব মিটিয়ে দিচ্ছেন। সামনে বসে কাজী সাহেব। বুরুক বুরুক করে আলবোলা টানছেন। তাঁর সামনে শেঠ বুলচাঁদ সেদিন তাঁর খাস নায়েব পরমেশ্বর দাসের যতকিছু অপকীর্তির রোক শোধ করে দিতে চান।—'যে যা' পাও, একটি পয়সা কারও বাকি রাখব না বাপু।' কাঁচাপাকা গোঁফ চুমড়ে শেঠজী বার বার এই কথাটা তাঁর খাজাঞ্চীকে বোঝাতে চাইলেন। আর তামাক টানতে টানতে কাজী সাহেব বলে উঠলেন—'বহুৎ খুব।' 'বহুৎ খুব।' বাইরে প্রতীক্ষমান আম জনতা শেঠজীর জয়ধ্বনি করে উঠল।

কিন্তু শেঠ বুলচাঁদই কেন হঠাৎ নিগৃহীত মানবাত্মার দুঃখে ব্যথিত হয়ে উঠলেন। কেনই বা তাড়াতাড়ি তাদের পাওনা টাকা মিটাতে তার বদ্ধমুষ্টি উন্মুক্ত হয়ে গেল। তাঁর নায়েবের অপহৃত অর্থ প্রত্যর্পণ করার জন্যে কেনই বা তাঁর এই ব্যাকুলতার অভিনয়? অবশ্য এই ঘটনাটাকে পুরোপুরি একটা মস্ত তামাসা বলার মধ্যে কোন অসত্য নেই কেন না সমসাময়িক এক বিবরণে জানা যায় শেঠ বুলচাঁদ

ঢ্যাড়া পিটিয়ে বাজার সরগরম করলেও হাজার দুয়েকের বেশি টাকা পরমেশ্বর দাসের পাওনাদারদের সেদিন ঠেকাননি তিনি! যদিও কারও কারও মতে সেদিনের সেই উত্তমর্ণ সমারোহের মোট পাওনা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা।

অবশ্য এই বিবরণ শেঠ বুলচাঁদের প্রতিপক্ষের লেখা। এবং শেঠজীর ক্রিয়া-কলাপ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর স্বধর্মীরা বা তাঁর স্বদেশবাসীরা কেউই লিখে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। এবং সেই কারণেই ব্যাপারটা একতরফাই রযে গেছে। তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়—বুলচাঁদ কি আগ বাড়িয়ে মুক্তহস্ত মানবের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পারমেশ্বর দাসের দেনা মেটাতে গেলেন? আরে তাকি কেউ যায়, না গেছে কখনও? এই ঘটনার নেপথ্যে আর একটা বিরাট ষড়যন্ত্র কাজ করছিল। যার ফলস্বরূপ, সেদিন সকালে সেই পাঁচই নভেম্বরের শিশিরভেজা ঘুঘুডাকা শান্ত সকালে নবাবের পাঞ্জা নিয়ে যে ঘোড়সওয়ার ঢাকা থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে হুগলীর কাছারীতে এসে যে নন্দীপাঠ করে গিয়েছিল অপরাহ্নে নাটক তারই ফলশ্রুতি! পরমেশ্বর দাসকে আর বাঁচাতে পারলেন না শেঠ বুলচাঁদ। তাকে সোজা বরখাস্ত করলেন চাকরী থেকে। আর আমজনতার প্রাপ্য টাকা তাও কড়াক্রান্তি মিটিযে দিলেন—বা বলা যায় দেবার অভিনয় করলেন?

কিন্তু ঢাকার নবাবেরই বা এত মাথাব্যথা কেন পরমেশ্বর দাসকে নিয়ে? সেকথা বলতে গেলে সেই আশ্চর্য কাহিনীটা বলতে হয়, যাতে দেখা যাবে এক অবাচীন বঙ্গতনয়:পরমেশ্বর দাস কি করে দুর্ধর্ষ জন কোম্পানীর সঙ্গে সমানে পাঞ্জা কষেছিল!

ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম। জন কোম্পানীর কুঠির মধ্যে কুঠি তখন মাদ্রাজ। ফোর্ট সেণ্ট জর্জ। তারই তাঁবে ভূ-ভারতের সব ইংরেজ। সবকিছু কুঠি—সুরাট থেকে সুতানুটি। বালেশ্বর থেকে কাশিমবাজার—মায় হুগলী-ঢাকা-মালদা—সব সব! এখন মাদ্রাজের চোখে তো আর দূরবীন নেই। এতদূর সব দেখে কি করে? হালহদ্দ পায কোন পথে? এদিকে বাঙলাদেশের কুঠির কাজ বাড়ছে। চালানের পর চালানে কাজকারবার দিনে দিনে ফেঁপে উঠছে। একেবারে শশীকলাবৎ প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা। কাজেই লণ্ডনে লিডেনহল স্ট্রীটের বড়-কর্তারা ঠিক করলে বাঙলার জন্যে পৃথক একটা কাউন্সিল। আর তারই সর্বময় কর্তা হয়ে এলেন উইলিঅম হেজেস। বেশ গণ্যিমান্যি লোক। সেকালে তাঁর দাপট ছিল। মুরুব্বি ছিল। ছিল না যেটা সেটা তাঁর ভাগ্য। তা' নয়ত কি? নয়ত ভদ্রলোক হুগলীতে পা দিতে না দিতে সেখানকার কুঠিয়াল ভিনসেণ্ট সাহেব কেঁদে পড়বেন কেন—হুজুর কাজকারবার তো যাবার দাখিল। একটা বিহিত করুন।

হেজেসকে থিতু হয়ে দু'দণ্ড নিশ্বাস ফেলে বসতে দিলেন না ভিনসেণ্ট। কাঁধে

জোয়াল চাপিয়ে দিলে। বুঝিয়ে দিলে, বাঙলার কর্তামি করা সোজা নয় চাঁদ। মুকুট নয় এটা কাঁটার মুকুট। বোঝ ঠ্যালা।

সালটা ষোলশ' বিরাশি। দিল্লীর তখত-ই-তাউসে তখন সম্রাট আওরঙ্গজেব। বাঙলার মসনদে মাতুল শায়েস্তা খাঁ। রাজধানী তাঁর ঢাকা, হুগলীতে তাঁর ফৌজদার শেঠ বুলচাঁদ। মাসটা আষাঢ। আকাশে কিন্তু মেঘ নেই। ক'দিন আগেই একপ্রস্থ জোর বর্ষা হয়ে যাবার পর এখন আকাশটা বেশ ধরে গেছে। কেবল সেই ভারী বর্ষায় ঢল নেমেছে গঙ্গায়। হুগলী নদীতে। ভাগিরথীতে। তার দুকূল ভরে টলটল করছে ঘোলা জল। এই জল কেটে তীরবেগে একটা পানসী সেদিন পৌছল হুগলীতে। কে এল? কে এল?—না সুবে বাঙলার জন কোম্পানীর নয়া বড়-কর্তার দূত। তিনি ততক্ষণে শিবপুর-বোটানিক্যাল গার্ডেন সেকালের থানা অবধি পৌছে গেছেন। 'গুড হোপ' জাহাজ থেকে হেজেস সাহেবের চিঠি এনেছে লোকটা: হুজুর আসছেন। হুজুর আসছেন।

এবং তাঁকে সম্বর্ধনা করার জন্যে তড়িঘড়ি যেন লোকলস্কর পাঠান হয়। ভাওয়াল-পিনিস-নৌকো পাঠান হয়। সাঙ্গপাঙ্গ স্ত্রীপুত্রপরিবার নিয়ে তাঁর প্রায় জনাষাটেক লোক সঙ্গে। সেজন্য সবরকম ব্যবস্থা যেন কায়েম করা হয়। আর—? চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে সাহেব তো সাফ্ সাফ্ জানিয়ে দিয়েছিলেন—বে অব বেঙ্গলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে যাচ্ছি।—'দি অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হ্যাভ থট গুড টু মেক দি সেভারেল ফ্যাক্টরিস্ ইন দি বে অব বেঙ্গল অ্যান এজেন্সী ডিস্টিংক্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডাণ্ট ফ্রম দ্যাট অফ কোর্ট জজ।' কাজেই খাতিরের ব্যবস্থা করো বাপু। অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয়।

হয়নি। একেবারে ভোর হয় কি না হয়। দূরে মুঘল ফৌজদারের প্রাসাদে রাত পাহারার লোক তখনও 'ওয়াচ টাউয়ার' ছেড়ে নেমে যায় নি। হুগলী কুঠির এক কর্তা গভর্নর হেজেসকে তাঁর বোটে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল। আর বেলা দশটা নাগাদ স্বয়ং কুঠিয়াল দি ওঅরশিপফুল ম্যাথিআস ভিনসেন্ট এসে হেজেসের কাছে 'বাউ' করলে। সঙ্গে নৌকা আর বজরার ছড়াছড়ি। এক আধটা নয়—পঁয়ত্রিশজন বন্দুক উঁচিয়ে বরকন্দাজ। আরও পঞ্চাশ-জন পাগড়ীবাঁধা রাজপুত সেপাই।—যাকে বলে সেকালের খাস ভি-আই-পি ট্রিটমেন্ট। ভিনসেন্ট একেবারে আভূমি কুর্নিশ করে হেজেসকে বললে, হুগলী তাঁকে অভ্যর্থনা করতে তৈরী। খানাপিনার ইলাহী কাণ্ড।

সে জায়গাটাকে সেকালে বলত ডাচ গার্ডেন। বেশ খোলামেলা জায়গা। বাহারও কম নয়। কিন্তু তা' না হয় হ'ল। খানাপিনা না হয় রাজসূয়। চর্ব

চুরুলেহুপের—রাজসিক আয়োজন। একটু বা মুঘলাই ধরনের নৃত্যচঞ্চল চরণের ঘুঙুরের সুরেলা আলাপ। একটু বা রোশনাই। এবং এমনিতর ব্যবস্থায় সাহেব যখন মশগুল, মশলার ভুরভুর গন্ধে বাতাসের সঙ্গে সাহেবেরও মেজাজ শরিফ—বেরসিকের মত হুগলীর ইংরেজ কুঠিয়াল ভারতবর্ষের শ্যামল স্বর্গে শয়তানের অস্তিত্বের কথা জানালেন। 'মি লর্ড বেঙ্গলের কাজকর্ম চালান যে কি ঝামেলার কাজ কি বলব।' হেজেসকে বেশি কথা বলতে হল না। খানাপিনার স্বাদ সাহেবের কাছে কেমন যেন তিক্ত হয়ে গেল। ডাচ গার্ডেন থেকে সাহেব যখন জাহাজে ফিরে গেলেন, ভিনসেন্টে দেওয়া দুঃসংবাদটা তাঁর মনে কাঁটার মত খচখচ করে বিঁধতে লাগল। বাঙলার ইংরেজ কুঠি অত্যাচারে জরজর। আর কে সেই দুর্বৃত্ত, যে নাকি এইসব চক্রান্তের পিচনে দাঁড়িয়ে কলকাঠি নাড়ছে। কে সেই শয়তান যে ইংরেজদের এই স্বর্ণস্বর্গে ছোবল বসাতে চায় বারবার?

সেই বঙ্গজ ব্যক্তিটির নাম পরমেশ্বর দাস। সাকিম—হুগলী। তার ওপর ইংরেজদের ভারী ক্রোধ। কিন্তু দাসমশায় একেবারে সামান্য ব্যক্তি। দাসানুদাস। বাঙলাদেশের এদিককার আসল মালিক তখন বুলচাঁদ। নিবাস মুর্শিদাবাদ। তাঁরই গোমস্তা বল গোমস্তা, নায়েব বল নায়েব—এই পরমানন্দ দাস। নবাবের শুল্ক আদায়ের ভার তাঁর ওপর। কাজেই ইংরেজরা বলত—'কাস্টমার অ্যাট হুগলী'। এবং এই বৈষ্ণববিনয়সম্পন্ন বঙ্গসন্তান কিভাবে ক্ষুরধার বুদ্ধি ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের নাস্তানাবুদ করেছিল ইংরেজরা বারবার সখেদে তাই নিয়ে বিলাপ করেছে।

না করে করবে কি? উপায়টা কি? বুলচাঁদের প্যাঁচ পরমেশ্বরের ক্ষুরধার পাটোয়ারী বুদ্ধি পদে পদে ইংরেজদের নাজেহাল করছিল এবং তিতিবিরক্ত হয়ে কলকাতা কাউন্সিলের প্রথম গভর্নর হেজেস সাহেব বললেন, তিনি ঢাকায় যাবেন। খাস ঢাকার দরবারে তিনি এর বিহিত প্রার্থনা করবেন। বলবেন—নবাবকে, খাস দিল্লী থেকে পাওয়া ফরমানের জোরেই না তাঁরা বাঙলায় ব্যবসা চালাচ্ছেন। তাঁদের কর দেবার কথা বাৎসরিক তিন হাজার মুদ্রা। সেটা তো তাঁরা ঠিক নিয়মমত কোষাগারে জমা দিয়ে আসছেন। ব্যাস, আবার নিত্যি নিত্যি এসব হামলা কেন বাপু? এ দাও, সে দাও। এত দাও তত দাও। আমরা তো অবাধে বাণিজ্য করব। কারও কোন শুল্ক মাশুল আমাদের জন্যে নয়। জন কোম্পানীর পতাকা উড়িয়ে দস্তক হাতে যে জাহাজ যাবে ভাগীরথীর বুকে হাজারো দাঁড়ের আল্পনা কেটে—তাকে রোখে কোন আইনে?

কিন্তু সেসব যুক্তিতে কর্ণপাত করার বান্দা নয় পরমেশ্বর দাস। নবাবের রাজ্যে

লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করবে আর মাত্র তিন হাজার টাকা ঠেকিয়ে পার পাবে, ইংরেজকে এহেন গুরুঠাকুর হিসেবে মানতে দাসমশায় সত্যিই নারাজ। তিনি চলেন তাঁর নিজের আইনে। দিব্যি ইংরেজ জাহাজ ধরেন—আর অন্যসব জাহাজ যে হারে শুল্ক দেয় কানমলে সেই হারে মাশুল আদায় করে ছেড়ে দেন। নালিশ মকদ্দমা যা হয় ঢাকায় গিয়ে কর। মুর্শিদাবাদে আমার নামে লাগাও গে যাও। দাসমশায় নির্বিকার। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ইংরেজরা যে ফাঁকি না দেয় তা নয়। তবে সে কাজ শক্ত। কেননা পরমেশ্বর দাসের চারচোখ। নজর এড়ান শক্ত।

এতে কার না রাগ হয়। ইংরেজরা মুখ লাল করে কর দেয়; আর ঢাকায় তাদের উকিলকে বলে নবাবের দরবারে নালিশ করতে। কিন্তু অভিযোগ করলেই সব যে নবাবের কানে উঠবে, মুঘল দরবার সে পাঠ পড়েনি। ইংরেজ উকিল ক্রুদ্ধ কুকুরের মত গরগর করতে থাকে রাগে।

এহেন যখন সঙ্গীন অবস্থা, হেজেস এলেন কলকাতায়। এবং আগে তো বলাই হয়েছে, ঠিক করলেন, ওসব উকিল-টুকিল নয়, তিনি স্বয়ং যাবেন নবাবের দরবারে বিচার প্রার্থনা করতে। কিন্তু যাব বললেই কি যাওয়া হয়? পরমেশ্বর দাস রয়েছেন না? তাঁকে তো জানাতেই হবে। কেননা, নবাবের দরবারে তো শুধুহাতে যাওয়া যায় না। কিছু ভেট সঙ্গে নিতে হবে। আর বিনা শুল্কে সেগুলি নিয়ে যাবার পরোয়ানা দেবে কে?—সেই বঙ্গতনয় পরমেশ্বর দাস না?

কিন্তু পরমেশ্বর দাস ব্যবহারে পরম বৈষ্ণব। নবাবের দরবারে যে হেজেস সাহেব তার বিরুদ্ধে লাগাতে যাচ্ছেন, সেটুকু বুঝতে তার বিন্দুমাত্র কষ্ট হ'ল না। কিন্তু সেদিকে গেলেনই না। বললেন, কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য। খাস গভর্নর সাহেব যাবেন নবাব-দর্শন করে ধন্য হতে, এরচেয়ে ভালো কথা আর কি হতে পারে? এই মহৎ কাজে পরমেশ্বর দাস সাহায্য করবে না, এ কখনো হতে পারে। কক্ষনো না। কক্ষনো না। তোবা। তোবা। পরমেশ্বর দাসকে ইংরেজ ফ্যাক্টরীর লোক গিয়ে বলতেই তিনি তক্ষুনি রাজী হয়ে গেলেন! শরতের এক প্রসন্ন সন্ধ্যার আকাশে তখন দুটো-একটা করে তারা দেখা দিয়েছে। গঙ্গার বুকে তাদের ছায়া পড়তে শুরু হয়েছে। অদূরে কোন নাম-না জানা গ্রামের এক শান্ত নিস্তব্ধ কুটিরে রেড়ীর তেলের প্রদীপের আলোয় একটা মিষ্টিস্বপ্নের জন্ম হচ্ছে। ঠিক এমনি সময়ে, দুটি বজরা আর কয়েকটা ছোট পানসী নৌকোয় তেইশজন গোরা, পনেরজন কালা রাজপুত বরকন্দাজ নিয়ে কোম্পানীর বড়কর্তা হেজেস ঢাকার পথে হুগলীর ইংলিশ গার্ডেনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

। গিয়ে তীরে ভিড়তেই একজন ভদ্রলোক বজরার সামনে সেলাম করে

দাঁড়ালো। গায়ে পিরান। মাথায় পাগড়ী। কপালে ফোঁটাকাটা। পরনে মালকোচমারা কাপড়। সাহেব বজরা থেকে বেরিয়ে এসে বললে, কি চাও?

লোকটা আভূমি কুর্নিশ করে বললে, অধীনের নাম মথুরা দাস। দাসমশায়ের ভৃত্য। হুজুরকে নিয়ে যেতে পাল্কী এনেছি। পরমেশ্বর দাস মশায় বলে পাঠিয়েছেন হুজুরদের সঙ্গে যতকিছু গোলমাল সবকিছুই হুজুরের সঙ্গে আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলা হবে।

হেজেস ফার্সী জানত। কাজেই দিশিলোকের এই ফার্সী বিনয়ন বচনে বোধকরি গলে গিয়ে থাকবেন। বললেন, বহুৎ আচ্ছা! আমি যাব। অপেক্ষা কর।

কয়েক দণ্ড গেল না। তৈরী হয়ে নিযে সাহেব বেরিয়ে এলেন। এবং বেশ কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ সমভিব্যাহারে, পাল্কীর দুলুনিতে কিঞ্চিৎ তন্দ্রা উপভোগ করতে করতে অস্থির পরমেশ্বর দাসের বাগানে গিযে হাজির হলেন। পরমেশ্বর দাস সেখানে সেলাম করতে করতে হাজির।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা পরমেশ্বর দাস হেজেস সাহেবের সঙ্গে সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে একটা মিটমাট করে ফেললেন। কিম আশ্চর্যমতঃ পরং! ঠিক হল, বেশি নয় অতিরিক্ত দুটি হাজার তঙ্কা বিনিময়ে কোম্পানী তাদের মালপত্র বিনা বাধায় বিনা শুল্কে আমদানি-রপ্তানি করতে পারবে। তবে হ্যাঁ, কথা আছে। এই চুক্তি দুই মাস বলবৎ! এর মধ্যে কোম্পানীকে একটা কাজ করতে হবে। দিল্লীর ফরমান এতদূরে বাপু কাজ হবে না। ঢাকার নবাবের কাছ থেকে বিনা শুল্কে ব্যবসার পরোয়ানা এর মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে কোম্পানীকে।

কাজকর্ম মিটে যেতেই একটু আনন্দের আয়োজন। সেদিন দাসমশায়ের বাগানে তওফাওয়ালীর বিলোল কটাক্ষে তার চঞ্চল ঘুঙুরের বোলে, তার মিঠিগলায় ফার্সী গজলের আলাপে হেজেস সাহেবের চিত্ত একবারে প্রসন্ন হয়ে গেল। তাঁর মনটন সত্যিই আনন্দে লাফাচ্ছিল কেননা পরমেশ্বর দাস এও স্বীকার করেছেন তাঁর লোকলস্করেরা ইংরেজদের বিলটি চোখবুজে মেনে নেবে। দেখবেও না, কি মাল যাচ্ছে। ওজনও করবে না কতটা যাচ্ছে। যাকে বলে একেবারে স্বরাজ!

কিন্তু রাতের মুক্তো দিনের আলোয় একেবারে ঝুঁটো বলে প্রমাণিত হয়ে গেল। তখন আঁধারের ঘোর কাটেনি হুগলীর প্রশস্ত বন্দরে। আম-জাম-জামরুলে ঘেরা দিকচক্রবালের কোণে কোণে তখন রাত্রির রেশ রয়েছে। দু'একটা বক বালুচরে উড়ে উড়ে এসে বসতে সুরু করেছে মাছের প্রত্যাশায়। এমনই সময়ে হেজেস সাহেবের বজরায় এসে 'নক' করলে জন বিয়ার্ড। ধড়মড় করে উঠে বসে হেজেস বললে, 'ইয়েস হোয়াট হ্যাপনড্?'

—আর হ্যাপনড, ? যা ঘটবার নয়, তাই ঘটে গেছে। কালরাত্রে ইংরেজরা যখন দাসমশায়ের আতিথ্যে আপ্যায়িত হচ্ছিলেন বিগলিত হচ্ছিলেন, সেই অবকাশে ইংরেজদের একটা কাপড় বোঝাই নৌকা দাসমশায়ের অনুচররা গায়েব করে নিয়ে গেছে। বিয়ার্ড উত্তেজিত কণ্ঠে অবস্থাটা বিবৃত করে থাকবেন। সাহেবের যেন প্রত্যয় হল না। চোখ রগড়ে আবার বললেন, 'হোয়াট ডু যু মিন ?'

মানেটা সরল। কেবল সাহেব যে কার পাল্লায় পড়েছেন সেটাই তিনি তখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। এবং যখন বুঝলেন তখন এও বুঝলেন যে, যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল না হলে চলবে না। এবং ইংরেজরা এদেশে দাওয়াই বলতে বুঝত বন্দুকের জোর। কাজেই সাহেব ফস্‌করে একেবারে অস্ত্রের শরণ নিয়ে ফেললেন। দু'জন কর্মচারীকে সসৈন্যে পাঠালেন হুগলী বন্দরের 'মীরবহর' বা শুল্ক অধিকর্তার কাছে। তার হারানো নৌকা উদ্ধার করতে।

ইংরেজ যে অত তাড়াতাড়ি দুমকরে একেবারে তলোয়ার বের করে ফেলবে, পরমেশ্বর দাস বোধহয় ততটা আঁচ করেননি। কাজেই ইংরেজরা যখন তাদের নৌকাটা মীরবহরের কাছ থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কেউই তাদের পারত-পক্ষে বাধাই দিলে না। তবে হেজেসও আর হুগলীতে কালক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করলে না। সেদিনই বজরা ছেড়ে দিলে মন্দ মন্দ শরৎ পবনে নৌকা ভেসে গেল সঙ্গে।

কিন্তু সেই বা কতটুকু। একটু-একটু করে বেলা পড়তে না পড়তেই মাঝিরা হঠাৎ লক্ষ্য করল ধুলো উড়িয়ে ঘোড় সওয়ার আসছে গঙ্গার বেলাভূমি দিয়ে। একটি নয় দুটি নয়। অনেক। এবং আর্তবিস্ময়ে লক্ষ্য করল নক্ষত্রবেগে কতকগুলো দ্রুতগামী ছিপ আসছে উজান বয়ে। কানাকানি করে তারা বলাবলি করতে লাগল নবাবের প্যায়দা, নবাবের প্যায়দা।

কথা তার শেষ করতে পারল না। জলে কুমীর। ডাঙ্গায় বাঘ। নবাবের সৈন্য একেবারে ছেয়ে ফেলল ইংরেজ বহর। ইংরেজরা বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। দাস-মশায়ের পেয়াদাদের হাতে বর্শা। উভয়পক্ষই নাছোড়বান্দা। হেজেস ভেবেছিলেন বন্দুকের নল দেখেই এরা পিঠটান দেবে। কিন্তু তাত দিলই না। উপরন্তু ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে দেখা গেল—কাজীর নায়েব, মীরবহরের সহকারী আর চুঁচুড়োর ওলন্দাজ ডিরেক্টরের উকিল—সবাই এসে হাজির। ভাঁটারটানে ফেরৎ যেতে হবে, উজানে যতটুকু এগিয়েছিলেন!

হেজেস তাঁর রোজ নামচায় লিখেছেন—উপস্থিত সবাই তাঁকে দিব্যি কেটে ঈশ্বরের নামে বলেছিল, সাহেব যেন পরমেশ্বর দাসকে আর একবার তাঁর ভুল

শোধরাবার সুযোগ দেন। সাহেবের বন্ধুত্ব, সাহেবের সখ্যতা ছাড়া আর কি কাম্য আছে দাসমশাইয়ের? হেজেস যে একটা ভুল ধারণা নিয়ে ঢাকায় যাবেন, এটা কি কথার মত কথা নাকি? সাহেব অবশ্য স্বীকার করেছেন, ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিইবা গত্যন্তর ছিল তাঁর। কেননা, যতই না বন্দুক উঁচিয়ে ধরুন তাঁরা, এটা তো ঠিক কোনক্রমে যদি নবাবী সৈন্যের রক্তপাত হত সেদিন, তাহলে কি আর নবাবী কোপ তাদের আস্ত রাখত নাকি? তার ফলে বাংলাদেশে তাদের চাটিবাটি গুটোতে যে হ'ত না, তাই বা কে বলতে পারে?

কাজেই সাহেব পরমেশ্বর দাসের ব্যূহভেদ করার সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন। ইংরেজ বজরা মুখ ফেরাল। আকাশে সেদিন অজস্র জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। হাজার তারার চুমকি দেওয়া শরতের নিষ্কলঙ্ক নীলরাত্রি একসময়ে গাঢ় হয়ে এল। এবং সেই মোহিনী রাতটা হুগলীর নদীবক্ষে কাটিয়ে সকাল সূর্যের আলোয় সুবোধ বালকের মত হেজেসের বজরা তীরে গিয়ে ভিড়ল। বারই অক্টোবর ষোলশ' বিরাশি।

আর ঘাটে নামতেই মথুরা দাস আর কাজীর নাহার। তারা বললে, হুজুর আজকের দিনটা ইংলিশ গার্ডেনেই অবস্থান করুন। কাল প্রাতে পরমেশ্বর দাস তাঁর শ্রীচরণে হাজির হবে। সাহেবই বা করবেন কি? রাস্তা তো বন্ধ। উইলিঅম হেজেস হুগলী কুঠিতেই গিয়ে উঠলেন এবং সেখানকার ফ্যাক্টরী সাহেবদের সঙ্গে জোর সলাপরামর্শ সুরু করে দিলেন। কর্তারা সব পাঁচমাথা এক করে কর্তব্য নির্ধারণে ব্রতী হ'ল। একসময় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ল বিকেল ফুরিয়ে রাত। হুগলীর গঞ্জের সারাদিনের প্রাণচাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে একেবারে শান্ত হয়ে এল; আকাশের চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়ল; তখন ঠিক হ'ল যদি সোজাপথে ঢাকা যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা করে পরমেশ্বরের লোকেরা, অন্য কোন পথে খড়ো বা জলঙ্গী নদী ঘুরে তারা ঢাকা যাবে। কিন্তু ঢাকা তারা যাবেই। সহ্যের একটা সীমা আছে তো! এবং যে কথা সেই কাজ। পরদিনও যখন পরমেশ্বর দাস হেজেসের সঙ্গে দেখা করলেন না, সাহেব বজরায় চেপে গিয়ে বসলেন। উদ্দেশ্য তো ঠিকই আছে। কিন্তু দেখা গেল পরমেশ্বর তা জানেন। কয়েকদিন টালবাহানা করে ইংরেজদের সহ্যের সীমাটা বেশ খানিকটা পরখ করে দাসমশায় একদা হেজেসের বজরায় গিয়ে এত্তেলা দিলেন: 'হুজুর' দাস হাজির।' ক্রুদ্ধ হেজেস তো বুনো শুয়োরের মত 'ঘোঁৎ' 'ঘোঁৎ' করে উঠল। কিন্তু কতক্ষণই বা। মানুষকে কব্জা করতে পরমেশ্বর দাস অদ্বিতীয়। পরমেশ্বর এতদিন কেন যে সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার ফুরসৎ পাননি, সেদিক দিয়েও গেলেন না। বললেন, সাহেব বজরায় কি কথা হয় নাকি? তীরে চলুন। কুঠিতে ফিরে চলুন। দাসমশায় সবিনয়ে বোঝাতে চাইলেন. গেলে জন কোম্পানীর ভাল বই মন্দ

হবে না। কেননা, অতিথি সংকারের মূল্য হিসেবে তারা হেজেসের সোজাপথে ঢাকা যাবার সব বন্দোবস্ত করে দেবে। এবং চাই কি, তাদেরই হবে তার মুনিব মুর্শিদাবাদের শেঠ বুলচাঁদের কাছে একটা অভিজ্ঞানপত্র—'লেটার অব ইন্ট্রোডাকসন'ও লিখে দেবে!

এ টোপ ফস্কাল না। সাহেব নিমরাজী হয়ে শেষে বজরা ছেড়ে পরমেশ্বরের হাত ধরে ইংরেজ কুঠির পথ ধরলেন। দাস মশায়ের সঙ্গে তাঁর কয়েকশ' পাইক-পেয়াদা। আর সাহেবের সঙ্গে তাঁর পিছনে হুগলীর যাবতীয় ইংরেজ ভেঙে পড়েছে। এখানে হেজেসকে পৌঁছে দিয়ে যাবার সময় পরমেশ্বর দাস বলে গেলেন, 'কাল সকালে হুজুর গরীবখানায় একজন নফরকে পাঠিয়ে দেবেন। তার-হাত দিয়ে চিঠিখানা দেব। কথাটাও পাকাই হয়ে গেল।'

পরদিন সকালে সাহেব কুঠির রাত্রিবাস শেষে শুনলেন আর এক কাণ্ড! কুঠির যেসব দিশি কর্মচারী দাসের লোকজন তাদের শুধু ধরেই নিয়ে যায়নি, কয়েকজনকে ধরে বেধড়ক পিটিয়েছে। কাউকে বেঁধে রেখেছে। কারও বাড়ী থেকে ছেলেবউকে ডেকে এনে শাসিয়েছে—খবরদার বলছি, সাহেবদের কাছে চাকরি করতে মানা করবে কর্তাকে। নয়তো বুঝবে ঠ্যালা। এমন কি ঢিপ ঢিপ করে ঢ্যাঁড়া পড়েছে গ্রামে গ্রামে—'সাহেবদের কাছ থেকে যে ক্রীতদাস পালাবে তাকে আর দাস হয়ে থাকতে হবে না। সে মুক্ত।'

হেজেস সব শুনলেন। বুঝলেন। কিন্তু গরজ বড় বালাই। মুখে যতই গর্জান না কেন, আসলে তো এক বেনে জাতের প্রতিনিধি। ব্যবসাপত্তর কলাও না করতে পারলে লিডেনহল স্ট্রীটের বড়কর্তারা তো আর মুখে গুড় দেবে না! কাজেই এমন-ভান করলেন, ঐসব কিছুই তাঁর কানে আসেনি। মানসম্মানের মাথা খেয়ে পরদিন সকালবেলা ঠিক তাঁর লোক পাঠালেন পরমেশ্বর দাসের কাছে। সেই যে দাসমশায় বলেছেন ইংরেজদের হয়ে বুলচাঁদের কাছে একটা চিঠি লিখে দেবেন—সেই চিঠির প্রত্যাশায় তীর্থের কাকের মত হেজেস সাহেবের লোকটা দাসমশায়ের দরবারে ঠায় বসে রইল!

আর পরমেশ্বর-দাসের সেইটেই তো তুরুপের তাস। একেবারে সেই আদ্যিকালেও বঙ্গসন্তান পরমেশ্বর দাস ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন ইংরেজদের আসল দুর্বলতাটা কোথায়? দাসমশায় জানতেন, এরা আসল বেনের জাত। মানসম্মান সুবিধে-অসুবিধের চেয়ে বেশি বোঝে ব্যবসা। তার জন্যে, না পারে হেন কাজ নেই। আর সেই টোপেই মাছ গেঁথে ইংরেজদের তিনি দিব্যি খেলাচ্ছিলেন! আর সেই কারণেই, অতক্ষণ আটকে রেখে হেজেস সাহেবের লোককে তিনি ফিরিয়েই দিলেন।

ভাবখানা এই অত সহজে, এত বড় দাঁও কি হয় বাছা। একি ছেলের হাতে মোয়া ! ঘোর দু-চারদিন। তবে তো !

লোক ফিরে এসে গোমড়ামুখে হেজেস সাহেবকে জানালেন, দাসমশাই বড় শক্ত ঠাই বলেই তো মনে হচ্ছে। মনে তো হয় না, ইংরেজদের সুবিধার জন্যে পরমেশ্বর দাস আদপেই বুলচাঁদকে কিছু লিখে দেবে। হেজেস সাহেব এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিলেন হুগলীর সেই ফ্যাক্টরটার কথা। আর বুঝিবা ভাবছিলেন বেঙ্গলের এই বিচিত্র 'কাস্টমার' টা আচ্ছা লোক তো ?

হুগলীর ইংরেজ ফ্যাকটরটা তখনও বলে চলেছে—ইয়েস মি লর্ড। শেষ বেশ পরমেশ্বর তাকে কি বলেছে জানেন—দাস তাকে সাবধান করে দিয়েছে—ইংরেজদের নৌকা 'সার্চ' না করা পর্যন্ত সেগুলি যেন হুগলী ত্যাগ না করে। একটু বা হুমকি দিয়েছে—দেখ বাপু, কথা না শুনে যদি উজানে নৌকা ছাড ত্রিবেণী পেরোতে পারবে না। সেখানে থানা আছে। এবং সেখানে আমরা জানিয়ে রেখেছি।

এইবার হেজেসের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। উটের পিঠে যেন শেষ খড়গাছি কি এতবড় স্পর্ধা। আমার নৌকা খানাতল্লাসী। ভেবেছে কি পরমেশ্বর। কালবিলম্ব না করে হেজেস রাত্রির অন্ধকারে নৌকা ছাড়বার হুকুম দিয়ে দিলেন। সবার আগে গেল মালপত্র বোঝাই নৌকা নিয়ে জনসন সাহেব। তারপর চলল কোম্পানীর ফৌজ। তারপর স্বয়ং হেজেসের বজরা। সবশেষে একটা হাল্কা পানসি করে ইংরেজ আর একজন 'স্পানিয়ার্ড' সেপাই !

রাত্রি তখন প্রায় দুটো বাজে। আকাশের বুকে তারা আর ধরে না আর তারই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ যেন গঙ্গার ধারে ধারে আম-কাঁঠালের ডালপালা জুড়ে। সেখানে লক্ষ জোনাকীর রাজত্ব। মাঝে মাঝে কোন রাতচরা পাখীর পাখসাটের খবর এসে মিশছে দাঁড়টানার ছপ্ ছপ্ শব্দের সঙ্গে। তাছাড়া, সারা প্রকৃতি যেন নিশ্চল। সময়ের একটা শুব্ধ কালো গুহার ভেতর দিয়ে হাতেড়হাতড়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে চলেছে পালটানা ইংরেজ নৌকাগুলো।

হঠাৎ পানসিতে সেই স্প্যানিয়ার্ড সেপাই-এর চোখজোড়া সন্ধানী কুকুরের মত জ্বলে উঠল। অনতিদূর দিকচক্রবালে এক সশস্ত্র লোকবোঝাই ছিপ নৌকা কোত্থেকে যেন ভেসে উঠল। এতই নিঃশব্দে, এতই দ্রুত এসেছে ছিপটা, কেউই জানতে পারেনি। যখন পারল, চমকে উঠল। নৌকা একেবারে কাছে এসে গেছে। স্প্যানিয়ার্ড সেপাই চিৎকার করে উঠল—কে যায় ?

—তোর বাবা।

সাহেব সেপাই-এর এদেশে বেশ কিছু দিন কেটেছে। ঐ ভাষা তার রপ্ত।

বললে—'সামহালকে'। খবরদার আর এক পাও যেন নৌকা না এগোয়। [illegible] কার কড়ি ধারে। নৌকাটা দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। সিপাইরা আর দেরী করলে না। তার গাদা বন্দুক জলের দিকে তাগ করে দুম দুম করে দেগে দিলে। ভাগীরথীর দুইকূলে তার প্রতিধ্বনি জরুরতর হয়ে ভাসতে লাগল অনেকক্ষণ। আগন্তুক ছিপের আরোহীরা বুঝল সুবিধে হবে না। ছিপের সঙ্গে পান্সীর দূরত্ব বাড়তে লাগল।

রাত গড়াতে লাগল। ইংরেজবহর তখন ত্রিবেণী পেরোচ্ছে। আবার দিগন্ত-রেখায় ভেসে উঠল সেই কালো নৌকা। সেই সশস্ত্র মানুষগুলো। আবার চিৎকার। হাঁকা-হাঁকি। হৈ-চৈ। আবার হুমকি। আবার বন্দুক। এবং সেই পশ্চাদপসারণের পুনরাবৃত্তি। বাকি রাতটা কিন্তু ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। চৌদ্দই অক্টোবর ষোলশ' বিরাশি। এবং শুধু বাকি রাতটাই নয়, বাকি পথটাও। ঢাকা যাবার বাকি পথটা সত্যি শক্তের ভক্ত কে নয়!

কিন্তু এত করেও পরমেশ্বর দাসের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল না। এর পর ক'টা দিনই বা কেটেছে। ক'বারই বা যাতায়াত করেছেন হেজেস সাহেব ঢাকার দরবারে। একটা দুঃসংবাদ গেল হুগলী থেকে। নভেম্বরের দোসরা। ঢাকায় তখন শীত পড়-পড়। দেওয়ান হাজি সফি খানের কাছে বহু বাঞ্ছিত পরোয়ানার জন্যে দরবার করে ইংরেজ উকিল জেমস প্রাইস সবে ফিরেছে কুঠিতে। হেজেস সাহেব তারই সঙ্গে বসে শুনছিলেন সারাদিনের রিপোর্ট, এমনসময় একজন ক্যাডর 'বাউ' করে দাঁড়াল। হেজেস জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়েস, হোয়াট ডু-য়ু ওয়ান্ট।

এ লেটার ফ্রম হুগলী।

হেজেস হাত বাড়িয়ে দিলেন। জন বিয়ার্ড লিখেছে হুগলী থেকে। ইংরেজ উকিল রামজীবনকে ডেকে পাঠিয়েছিল পরমেশ্বর দাস। এবং নবাবের কাছারীতে রামজীবনের পৌঁছাতে যা দেরী। পাইক-পেয়াদারা হুড়মুড় করে এসে তাকে বেঁধে ফেললে। তারপর তাকে গারদে পুরে ফেললেন দাসমশাই। শুধু তাই নয়, কাছারীর একগাদা লোকের সামনে জুতিয়ে লম্বা করে দিলে জন কোম্পানীর কর্মচারীকে। এবং এইখানেই শেষ নয় হেনস্থার। পরদিন বিকেলে আবার তাকে গারদ থেকে কাছারীতে হাজির করা হল। ঐদিন [illegible] আবার [illegible] আছেন। পরদিন আবার বিকেলে। এবার চাবুক। [illegible] সহ্য করা সম্ভব হল না রামজীবনের। [illegible] কোম্পানীর [illegible]
[illegible]

সাহেবকে পাঠিয়ে দিয়ে পরমেশ্বর দাস লিখেছে—খতের টাকাটা অবিলম্বে যদি নবাবের কোষাগারে না পাঠানো হয়, রামজীবনের জীবন সংশয়। বিয়ার্ড সেই বৃত্তান্ত লিখে পাঠিয়েছেন। হুগলী থেকে ঢাকা। হেজেসের কাছে। বিহিতের জন্যে। হেজেস তো বিষম খাপ্পা। এতদিন তো রেগেই ছিলেন, এবার অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। কিন্তু করবেন কি? পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত বার কয়েক পায়চারি করলেন ঘরে। তারপর মনের রাগ মনে চেপে প্রাইসকে বললেন, পাল্কী ঠিক করতে বল।

চার বেহারার ঝালর দেওয়া ঝকঝকে পাল্কী চেপে হেজেস গেলেন অপর এক বঙ্গসন্তান রায় নন্দলালের বাড়ী। ঢাকার দরবারে তাঁর প্রভূত প্রতাপ। কিন্তু বিধি বাম। হেজেসের পাল্কী রায়বাড়ীর দেউড়ী পেরোতে হ'ল না। খবর এল রায়মশায়ের অসুখ। বাঙালী গোমস্তা খাগের কলমকানে গুঁজে সবিনয়ে জানালে, এখন তো হুজুরের সঙ্গে মোলাকাৎ হবে না!

নন্দলাল রায়ের গোমস্তা তো বলেই খালাস। কিন্তু উইলিঅম হেজেসকে তো কিছু একটা করতেই হয়। চুপ করে বসে থাকলে তো একদিন চুপিচুপি বাঙলাদেশ থেকে পাততাড়ি গুটোতে হবে। অগত্যা ঢাকার দেওয়ান হাজি সফি খাঁর ছেলে সফেদ মহম্মদের সঙ্গে ইংরেজদের যে আলাপ ছিল, সেইটেই ঝালাতে গেলেন হেজেস। বাঁচোয়া, সফেদ মহম্মদ বাড়ী ছিলেন। হেজেস তার সঙ্গে দেখা করে সবরকম কুশল বিনিময় করে একথা সেকথার পর আসল কথায় এসে পড়লেন। সফেদ বললে, চল সাহেব, বাবাকে গিয়ে বলি। দেখি কি হয়।

দুটো পাল্কী আগাপিছু করে সেদিনের প্রসন্ন অপরাহ্নে হাজির হ'ল হাজি সফি খাঁর দরবারে। হেজেসকে বারবাড়ীতে বসিয়ে সফেদ দেওয়ানজীর খাস কামরায় ঢুকে গেল। দুপুরের ঘুমটুকু শেষ করে দেওয়ানজী সবে আলবোলার নলটিমুখে তুলেছিলেন, সফেদ গিয়ে এত্তেলা দিলে। তারপর পিতাপুত্রে গুজগুজ ফুসফুস করে কি যে কথা হল, এক-সময়ে বিমর্ষ পুত্র ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মুখখানা কালো করে হেজেসকে বললে, না সাহেব, কিছুই হ'ল না। কৈফিয়ৎ এর সুরেই অনেকটা বললে, আমার বাবা তো আর ঢাকায় থাকছে না। নতুন দেওয়ান আসছে। কাজেই আমার বাবার কথা তো আর চলবে না!

সাহেবের তো দস্তুর মজার অবস্থা। অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিল দেওয়ানের কাছে। বাড়া ভাতে ছাই পড়ল। সাহেব অনেকক্ষণ ভাবলে। সফেদের সঙ্গে দু' একটা আরও কথা বলতে, তার কেমন যেন ধারণা হ'ল, এর মধ্যে রহস্য আছে। দেওয়ান যে কিছু করতে চাইছে না, তার পিছনে অকথিত কিছু কারণ আছে।

সফেদকে সাহেব পষ্টাপষ্টি জিগ্যেস করে বসল, খোলসা করে বল তো সাহেব, আসল কারণটা কি ? না তোমরা আমাদের এই বিপদে না কিছু করতে চাইছ, না ব্যবস্থা করছ আমাদের ফরমানের। এই বৈরাগ্যের উদ্দেশ্যটা কি ?

হেজেস সাহেবের ঢাকা আসার প্রধান কারণ এই ফরমান। হেজেস চাইছিলেন বাঙলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার ফরমানটার মেয়াদ আরও সাতমাস বাড়িয়ে নিতে। ইতিমধ্যে তারা দিল্লী থেকে খাস বাদশাহী হুকুমৎ আবার নতুন করে আনিয়ে নেবে। নয়ত পরমেশ্বর দাসের জ্বালায় তারা তো মারা যাবার দাখিল।

সেদিন ঢাকার বুকজুড়ে শীতের সন্ধ্যা আরব্য রজনীর নিশাচরীদের মত তার কালো বোরখা পরে নেমে এসেছিল। বান্দা এসে রেড়ীর তেলের সেজ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। আর সেই অপ্রশস্ত আলোয় সফেদ মহম্মদ বাঙলার ইংরেজ কুঠির দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকে না রেখে ঢেকে সাফ বলে দিলে, দেখ সাহেব, বুলচাঁদ শেঠ মুর্শিদাবাদ থেকে খবর দিয়েছে, এই সাত মাস যদি শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়, সাত মাস পরে কি আর তোমরা এদেশে থাকবে ? তল্পিতল্পা গুটিয়ে তো হাওয়া দেবে। মাঝখান থেকে নবাবী তোষাখানায় এতগুলো কড়কড়ে টাকা হাতছাড়া। কাজেই সাত মাস শুল্ক রেয়াতের ফরমান দেবে—নবাব কি এতই বেকুফ্ নাকি ? হেজেস দেখলে সমূহ বিপদ। কিন্তু ইংরেজদের এই একটা মস্ত গুণ বিপদে যেন তাদের বুদ্ধি বেশি খোলে। হেজেস মাথা ঠিক রেখে এমন একটা চাল চেলে দিলে যে, বুলচাঁদ পরমেশ্বর কোম্পানী একেবারে মাৎ হয়ে গেল। হেজেস হেসে বললে, খাঁ সাহেব, ইংরেজরা আপনাদের সখ্য কামনা করে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় তাদের আপনারা বিশ্বাস করতে পারছেন না। যাই হোক, আমরা জামিন দেব। ঢাকার বণিকরা আমাদের হয়ে জামিনে দাঁড়াবে। তাহলে আর আপনাদের টাকা মার যাবার ভয় নেই। সফেদ খাঁ যুক্তিটা ফেলতে পারলে না। বললে, আচ্ছা, কাল আসবে। বাবাকে প্রস্তাবটা বলে দেখব।

কিন্তু ইংরেজরা ব্যাপারটা ফয়সালা না করতে করতে পরমেশ্বর দাস একটা মোক্ষা দাঁও মেরে নিলেন। ঢাকার জন্যে তো হুগলী বসে থাকতে পারে না। পরমেশ্বর জন বিয়ার্ডের কানমলে কড়কড়ে চার হাজার টাকা আদায় করে নিলে—সাময়িক একটা রফা হিসেবে।

হেজেস খবর পেয়ে আর একটু ক্ষিপ্ত হলেন এবং দেওয়ান সাহেবও তদীয় পুত্রের মনভেজাবার জন্যে নজরানার বহর একটু বা বাড়িয়ে দিলেন। এবং একদা দেখা গেল, কাজ হয়েছে। ঠাকুরের ফুল [illegible] ঢাকার সালতত দরবারে [illegible]

করতে করতে হাজির হয়েছেন প্রেসিডেন্ট অব দি ইংলিশ কাউন্সিল ইন বেঙ্গল উইলিঅম হেজেস। সিংহাসনে আসীন রণকুশলী মুঘল কূটনীতিবিদ শায়েস্তা খাঁ। ষোলশ' বিরাশি। আঠারই নভেম্বর।

নবাবের পাকাদাড়ি হাওয়ায় উড়ছে। দাড়ি-গোঁফ চুমরে একটু আতরের গন্ধ নিয়ে, নবাব বাহাদুর বললেন, দেখ বাবা, জামিন যদি দাও, মাশুল নেওয়া কয় মাসের জন্যে না হয় স্থগিত রাখতে পারি, তবে এ কথাও বলে রাখছি দিল্লী বড় শক্ত ঠাঁই। সেখানে সূঁচ গলান শক্ত। ফরমান পাওয়া ভারী কঠিন। নবাবের মেজাজ নরম দেখে হেজেস এই অবকাশে তাঁর মনের বহুদিনের পুরনো ঝাল মিটিয়ে নিতে চাইলেন। আরও একটা আর্জি শায়েস্তা খাঁ সমীপে পেশ করে থাকবেন। হুজুর পরমেশ্বর দাসের হাত থেকে আমাদের অব্যাহতি দিন। শেঠ বুলচাঁদের এই নফর আমাদের হাড়মাস কালি করে ছাড়লে। না মানে আইন, না মানে কানুন। জোর করে টাকা আদায় করে। বাধ্য হয়ে আমরা দিই। সেগুলো যাতে ফেরৎ হয় তারও একটা ব্যবস্থা হোক হুজুর।

প্যাঁচ আগে থেকেই সাহেব কষে রেখেছিলেন। ঢাকার যে মুঘল লবি—খোদাবক্স খাঁ, নবাবের বকসী মির্জা মজুফা, রায় নন্দলাল, আরও দু'চারজন তাবড় তাবড় লোককে আগে থেকেই বেশ ভিজিয়ে রেখেছিলেন হেজেস। বৃদ্ধ নবাব শায়েস্তা খাঁ খুশমেজাজে অর্ধনিমিলিত নেত্রে বললেন, ঠিক হ্যায়। এবং যথাবিহিতভাবে ক'দিন পরেই ডিসেম্বরের দশই নবাবের পাঞ্জা বসে গেল পরোয়ানায়—পরমেশ্বর দাসের চাকরী খতম। টাকাকড়ি যা জোর করে গিলেছিল, সব ওগরাতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং পরদিন কাকডাকা সকালে নবাবী পরোয়ানা নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে লস্কর চলে গেল মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজার—শেঠ বুলচাঁদের কাছে। তারই নকল গেল হুগলী। ইংরেজ কুঠিতে। বিয়ার্ড সাহেবের অবগতির জন্য।

ডিসেম্বরের শেষ হয়ে এল প্রায়। বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। হেজেস ঢাকার তাঁবু উঠিয়ে বজরায় চেপে বসলেন। হুগলীর উদ্দেশে বহর পাল তুলে দিলে। পথে পেলেন শেঠ বুলচাঁদের আমন্ত্রণ। মুর্শিদাবাদ থেকে। হেজেস সাহেব যেন শেঠজীর গরীবখানায় একবার পায়ের ধুলো দেন। আর সেখানে তার বহর দেখে কে? এলাহী ব্যাপার! সাহেবের পাল্কী শেঠজীর দেউড়ীতে এসে ঢুকতেই বুলচাঁদ শশব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন কাছারী থেকে। পাল্কী থেকে নামতেই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন শেঠজী: আসুন, আসুন। আসতে আজ্ঞা হোক। তারপর কুশল বিনিময়। ঢাকা থেকে আসতে পথে তকলিফ্ হয়নি তো? মেজাজ-শরীফ? শরীর কুশল? খোশআমদেদ—মেহেরবানেরা?

সে মানুষই নয় শেঠ বুলচাঁদ যাঁর গোমস্তা পরমেশ্বর দাসের কল্যাণে ইংরেজদের ব্যবসাপত্তর লাটে ওঠার দাখিল। আলবোলার নলটা এগিয়ে দিয়ে হেঁকে বললেন, ওরে কে আছিস, এক্ষুনি একটা পরোয়ানা জারী করে দে মহলে মহলে, ইংরেজ জাহাজ কোনভাবেই যেন বেআইনীভাবে আটক না পড়ে। জন কোম্পানীর ব্যবসায় কোন ক্ষতি না হয়। তারপর একথা সেকথা পাঁচ কথা। তারপর খানাপিনার আয়োজন। অতিথি মানুষ তো!

কথায় কথায় কত কথা। ঢাকার গোলাপ রায়কে ইংরেজরা জামিন দিয়েছে—সে খবর শেঠ বুলচাঁদের অজানা নয়। খুব ভালো কথা। তবে শেঠজী নিজেই যাচ্ছেন ঢাকা। ক'দিনের মধ্যে। এবং দিল্লী থেকে ইংরেজদের পরোয়ানা যাতে সহজেই হয়ে যায়, তার জন্যে অবশ্যই তদ্বির করবেন। বন্ধুকৃত্য বলে একটা কথা আছে তো!

কিন্তু এ সবই যে কথার কথা, অবশেষে সেটা প্রকাশ পেল। শেঠজী নবাবী ফরমান পেয়েছেন পরমেশ্বরকে বরখাস্ত করার জন্য। কিন্তু কি জান সাহেব, বুলচাঁদ ব্যক্ত করলেন, দাস আমার খুব পাকাপোক্ত লোক (ইংরেজরা তো সেটা হাড়ে হাড়ে জেনেছে!) এই হুগলীর বিরাট মহলের সবকিছুই তাদের নখদর্পণে। কাজেই, তাকে সরালে, কাজকর্ম তো সব অচল হয়ে যাবে। ইংরেজদের মালবহরের তালিকা দেখার জন্যে না হয় অন্য লোক নিয়োগ করবেন তিনি। এবং সাহেব অমত না করলে দাসের চাকরীটা রেখেই দেন তিনি!

মিষ্টিকথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু মন ভেজে। অন্ততঃ অমন জবরদস্ত সাহেব—উইলিয়ম হেজেস দিব্যি ভিজেছিলেন। তার বোধকরি কারণও ছিল। কয়মাস এদেশে কাটিয়ে হেজেস বুঝেছিলেন, এদেশের পরমেশ্বরেরা সব পারে। আজ রাজী না হলে, ইংরেজের গণেশ যে কোন সময়ে উল্টে দেবার হিম্মত রাখে। কাজেই জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই হাতে পেয়েও পরমেশ্বরকে তিনি ছেড়েই দিলেন।

কিন্তু এই নিয়ে ঘোঁট পাকাতে লাগল হেজেসের নিজের লোকজনেরা। তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ জব চার্নক তার বিলেতের চিঠিতে জানিয়ে দিলে হেজেসের ডাকাদোত্য একটা পরম পরিহাস। চার্নক তার চিঠিতে লিখল—'বাট টু দিস ডে উই নো, পরমেশ্বর দাস ইজ নট ডিসপ্লেসড। অ্যাণ্ড মাচ ফিয়ার—নন অফ দি মানি ইজ ইয়েট রিট্রিভড।' অর্থাৎ, আমরা যতদূর জানি, পরমেশ্বর দাস এখনও বহাল তবিয়তে কাজ করছে, আর ভয় হয়, আমাদের পাওনা টাকা কিছুই এখনও ফেরত পাওয়া যায়নি।

এবং এদিকে যথা পূর্বং তথা পরং! আবার সেই পরমেশ্বর দাস। কবে যেন তাঁর নামে কি একটা নবাবী পরোয়ানা বেরিয়েছিল, কে আর সেসব মনে রাখে? বিনা শুল্কে ব্যবসা, ওসব হবে না বাপু। ফেল কড়ি। মাখ তেল। দুঃসহ অবস্থা। অসহায় হেস্টিংস কি করেন, ঢাকার উকিল জেমস প্রাইসকে লিখে পাঠালেন নবাবের গোচরে আন, তাঁরই রাজত্বে তাঁর হুকুম কায়েম হয় না। এ কি কাণ্ড!

ইংরেজরা কাঠখোট্টা জাত। নবাবকে কুর্নিশ করে একদিন বলেই ফেললে। আর শায়েস্তা খাঁর মুঘল রক্ত মাথায় চড়ে গিয়ে থাকবে। বৃদ্ধ স্থবিরবৎ জরাজীর্ণমুখে শিরাগুলো ফুলে উঠে থাকবে। আর তারই কিছুক্ষণ পরে এক নবাবী ফৌজ টগবগে পারশি ঘোড়ায় চেপে ঢাকার মুঘল দরবার থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হয়ে গিয়ে থাকবে ধুলো উড়িয়ে। আর সেই ধাবমান ধূলিজালের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঢাকার আমজনতা বোধকরি আন্দাজ করে থাকবে- কার বুঝি গর্দান গেল।

তা' গর্দান যাওয়া নয়ত কি? ঢি-ঢি ঢ্যাঁড়া পড়ল। গঞ্জে গঞ্জে। অমন চাকরীটা গেল দাসমশায়ের। এর চেয়ে মাথা যাওয়া কি বেশি দুঃখের? এবং পরমেশ্বর দাস যেমন দুঃখ পেলেন, ততোধিক আনন্দ পেলেন ইংরেজ কুঠিতে উইলিঅম হেজেস প্রেসিডেণ্ট অব দি কাউন্সিল ইন বেঙ্গল সাহেব তখন নাকি খানা-টেবিলে। মেমসাহেব, ছেলেমেয়েদের নিয়ে উত্তরকালের কলকাতার গভর্নর ভাইপো তরুণ রবার্ট হেজেসও ছিলেন বোধহয়। তখন টানাপাখা কোথায়? পাখাবরদাররা তালপাতার পাখায় বাতাস করে মাঝে মাঝে খাস বিলেত থেকে পেটিকযেক মদ আসে—বীয়ার কিংবা ক্লারেট, স্যাক কিংবা মদিরা—তা যা' একটু সুখ। নয়ত এত ঠাণ্ডাতেও সাহেব ঘেমে ওঠেন। পাখার হাওয়ায় গরম কাটে না। মনে মনে দিশি আবহাওয়া আর পরমেশ্বর দাসকে একই সঙ্গে অভিশাপ দেন। এমন সময় এক কাশিমবাজারের ডেসপ্যাচ। আর পড়তে পড়তে খুশিতে একেবারে ডগমগ হয়ে উঠলেন প্রেসিডেণ্ট! অ্যাট লাস্ট, অ্যাট লাস্ট!

কৌতূহলী মেমসাহেব হয়ত বলে থাকবেন—ইয়েশ উইলিঅম। উজ্জ্বলচোখে হেজেস বর্ণনা করে থাকবেন, কি করে তাঁর এতদিনের চেষ্টা সফল হল। 'ভাট ভিলেন ইজ গন!'

কিন্তু মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী। সাহেবের আনন্দ অধিবাস টিকল না। দুটো পুরো দিনও কাটল না। খবর এল: সেই ঢ্যাঁড়া, সেই বরখাস্ত, সেই ঋণশোধ—সবটাই একটা মস্ত প্রহসন। দুদিন পরেই পরমেশ্বর দাসকে একটা দামী শিরোপা দিয়ে পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন বুলচাঁদ। শুধু তাই নয়, ক

যারা টাকা উশুল নিয়েছিল, কয়েদ করে গলায় গামছা দিয়ে সেইসব টাকা আদায় করে নিলে পরমেশ্বর দাস। অথচ কাজীর সামনে এসে গুটি গুটি তারা লিখে দিয়ে গেল, 'তাদের সব প্রাপ্য বুঝে পাইয়া সুস্থ মনে এই রসিদ লিখিয়া দিলাম।' বঙ্গভূমির পরমেশ্বর দাসের সঙ্গে কূটনৈতিক লড়াইয়ের শেষ দৃশ্যে দেখা গেল উইলিঅম হেজেস একেবারে 'নকড্ আউট।'

কিন্তু পরমেশ্বরের বোড়ের চাল তখনও বাকী ছিল। হেজেস ভাবতেই পারেননি, জন কোম্পানীর কি সর্বনাশ করে দিলেন হুগলীর এই সামান্য বাঙালীটি। জন কোম্পানীর বিনা শুল্কে বাণিজ্যের বিরুদ্ধে আর একদল ইংরেজ—যারা কোম্পানীর পাঞ্জা ছাড়াই বাংলাদেশের দরিয়ায় বাণিজ্যলক্ষ্মীর আরাধনা করতে এসেছিল, নাক সিঁটকে জন কোম্পানী যাদেব বলত 'ইন্টার লোপার' তাদের ওপর কৃপা করলেন দাসমশায়। তাদের একটা হিল্লে করে দিলেন। এরা শতকরা জন কোম্পানীর ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশি টাকা শুল্ক দেয়। উপরি টাকা দিতে কার্পণ্য করে না। বাংলাদেশের বাণিজ্যের ওপর কোন একচেটিয়া অধিকার চায় না। বাঙালী পরমেশ্বর তাদের সঙ্গে হাত মেলাবে না কেন? এখানে প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ইংরেজদের এই সুবিধা অনেকেরই চোখে পড়েছিল। চোখ টাটিয়েছিল। আদিখৃষ্টান যখন বর্ধমান গিয়েছিলেন, সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে সেখানকার ডাচ কুঠিয়াল তো তাঁকে সোজাসুজি বলেছিল এ কি কথা হুজুর? এরা মাত্র বছরে তিন হাজার টাকার অবাধ বাণিজ্য করবে, এ পার্থক্য কেন?

ইতিমধ্যে কাপ্তেন অ্যালি বলে একজন 'ইন্টার লোপার' এসে গেছেন। তাঁকে ফৌজদারের দরবারে নিয়ে গেছেন তিনি। ফৌজদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। স্থানীয় দাদনী বণিকদের তার সঙ্গে ব্যবসা করার জন্যে ফৌজদারকে দিয়ে অনুরোধ করিয়ে দিয়েছেন। সেমজার গল্প একটু বিষদ করে বলি। অক্টোবরের আট তারিখ। ষোলশ' তিরাশী। 'হুমব্রহো', 'হুমব্রহো' শব্দ করে আট বেহারা একটা সোনার ঝালর দেওয়া পাল্কী নিয়ে চলেছিল হুগলীর ফৌজদারের কুঠিতে। সোনার লেস দেওয়া রক্ত-রাঙা সাজ পরে ইংরেজ ইন্টার লোপার কাপ্তেন এ্যালি বসেছিলেন তাতে। সমুদ্র-নীল টুপি, গাঢ়নীল কোর্তা। হাতে বন্দুক দশজনরক্ষী চলেছিল আগে আগে। তাদেরও আগে জনা আশী পিওন। দুটো পতাকা উড়িয়ে চারজন বাজনাদার চলেছে তাদের সামনে। সে একেবারে এলাহী ব্যাপার। মনে হবে যেন কোন রাজা মহারাজা চলেছেন। বা চলেছেন কোন ইংরেজ কোম্পানীর এজেন্ট। আমজনতা রাস্তার ধারে ধারে অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগল সেই জনপ্রবাহ। এ্যালি যাবে ফৌজদারের বাড়ী সঙ্গে থাকে কে? হুগলীতে আছে পরমেশ্বর দাস কোমর বেঁধেছে।

ফৌজদার সাহেব সিংহাসনে বসে দাড়ি চুমড়াচ্ছিলেন। এ্যালি আর পরমেশ্বর দাস কুর্নিশ করে দাঁড়ালে। এবং এক সময় আসন সংগ্রহ করলে। বাজখাঁই গলায় ফৌজদার বললে,—আগে আসেননি কেন?

কাপ্তেন এ্যালি সোজা কথাই বললে, হুজুর, আপনি তো জন কোম্পানীর প্রতি যথেষ্ট করুণা করেন। আমাকে কি আর আপনি করুণার চোখে দেখবেন?

ফৌজদার বললে, তা' এখানে এসেছেন কেন?

এ্যালি বললে, কেন আর হুজুর? ইংরেজরা যেজন্য এসেছেন—সেই একই কারণে, বাণিজ্য করতে।

ফৌজদার বললে, তাদের তো অনেক পরোয়ানা—নবাবের কাছ থেকে। দেওয়ানের কাছ থেকে। তোমার কি আছে যে তুমি বাণিজ্য করবে? এ্যালি কি বলবে? চুপ করে রইল। আর এই অবকাশে কথা কইলেন বঙ্গতনয় পরমেশ্বর দাস। বললে, সে হুজুর ভাববেন না। এ সাহেবের কেউ নেই, কিন্তু আপনি তো আছেন। আপনাকে সব বিষয়ে খুশি করে দেওয়া হবে হুজুর। আপনি এখন প্রসন্ন হলেই হয়।

এবং বলা বাহুল্য, দৌত্য যেখানে পরমেশ্বর দাসের সেখানে কি ব্যর্থতা বলতে কিছু আছে? এ্যালির সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। দিব্যি ব্যবসা চালাতে লাগল সে। অবশ্য মাঝে মাঝে ঝামেলা যে হ'ত না তা নয়। ফৌজদার পর্তুগীজ প্যায়দা পাঠালে ইণ্টার লোপারদের ধরে আনতে। তারা যাচ্ছি যাব বলে শরণাপন্ন হ'ল বুলচাঁদের। এ দিকে পর্তুগীজ প্যায়দা দু'জন ইণ্টার লোপার সাহেব—ডেভিস আর পার্কিস ধরে নিয়ে গেল। বললে, কাপ্তেনদের না পেলে, এদের ছাড়বে না।

এইবার বোধকরি পরমেশ্বর দাসই তাদের বুলচাঁদকে ধরতে বলে থাকবে। বুলচাঁদ ফৌজদারকে বললে, সাহেবদের ছেড়ে দিতে। তাদের জন্য কৈফিয়ৎ দেবেন তিনি ঢাকায়। এবং একসময় তিনি স্বয়ং এ্যালি সাহেবের বাঙলোয় পায়ের ধুলো দিলেন। পকেটে গুঁজলেন নগদ চার হাজার টাকা নজরাণা: এবং এক সময়ে হেজেস সাহেব সখেদে তাঁর ডায়ারিতে লিখছেন: "বুলচাঁদ এ্যালিকে তাঁর নিজের দস্তকে বাণিজ্য করার অবাধ অধিকার দিয়েছেন!" এবং তার আগেই অবশ্য এ্যালি সাহেব বুলচাঁদের একটা নতুন বাড়ী—অনেকটা চুঁচড়োর কাছে—ডাচ কুঠির নীচে—নগদ দশ সহস্র মুদ্রায় কিনে নিয়েছেন!

ফৌজদার অবশ্য মাঝে মাঝে ঢাকার চাপে পড়ে 'ইণ্টার লোপারে'র সঙ্গে বাণিজ্য করতে নিষেধ করেছেন। পরমেশ্বর দাসেরও তা' নিয়ে একটু-আধটু অসুবিধা না হয়েছে তা নয়, কিন্তু বন্ধু টানাপোড়েনের মধ্যে এমনি একটা অবস্থা সৃষ্টি করে

তুলেছেন, যাতে অনতিকাল পরে—এই ঘৃণ্য ইন্টার লোপারদের সঙ্গেই আঁতাত করে নতুন কোম্পানীর ভিত ফাঁদতে হয়েছিল জন কোম্পানীকে—কয়েকটা বছর পরেই! ওস্তাদের মার শেষ রাতেই সেরে গেলেন পরমেশ্বর!

কিন্তু কে এই পরমেশ্বর দাস? কি তাঁর পরিচয়? এতে হেজেসের একতরফা বিবৃতি। তাঁর বক্তব্য কি! বাঙলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রবিপ্লবে সারা দেশটা যখন উথালপাথাল হয়ে গেল তখন কোথায় ছিলেন তিনি? তাঁর কি কোন ভূমিকা ছিল? কে সেই ভাবীকালের ঐতিহাসিক এইসব পরমেশ্বর দাসদের বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে টেনে এনে তাঁদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবেন। বাঙলাদেশের সেই নতুন ইতিহাস কবে রচিত হবে?

কে জানে? বাঙলাদেশের ভাগ্যবিধাতা এই পোড়া দেশের প্রায়ান্ধকার রঙ্গমঞ্চের জন্য যে এক বিচিত্র নাটকের খসড়া করেছিলেন, হুগলীর এই অখ্যাত বঙ্গতনয়ের জন্যে তাতে রোমাঞ্চকর একটা মস্ত ভূমিকা দিয়ে ফেলেছিলেন। দেখা গেল, বিধাতার সেই গুরুদায়িত্ব তিনি শুধু সুষ্ঠুভাবে পালনই করেননি, যবনিকা পড়ার সময়ে একেবারে মাৎ করে দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখ এই, পাদপ্রদীপের আলো নিভতেই সেই যে মিলিয়ে গেলেন, কেউ আর তার কোন হদিশ পেলে না।

অবশেষে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে জব চার্নক হুগলীর গদীতে বসলেন। বার বার দু'বার তাঁকে এই পদ দেবার কথা উঠেও দেওয়া হয়নি। প্রথম বার কথা হয় হেজেস আসবার আগে। ম্যাথিয়াস ভিনসেণ্টের চাকরি যাওয়ার পরই তাঁকে এই বহু আকাঙ্ক্ষিত পদটি দেবার কথা বলেছিল কোর্ট অব ডিরেক্টরস। কিন্তু কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন হেজেস। চার্নকের ক্ষুব্ধ হবারই কথা। হলেনও। অনেকে বলেন হেজেসের সঙ্গে তাঁর যা বিরোধ তার কিন্তু এই 'সুপারসেশন'। আবার হেজেস গত হলে তো গিফোর্ড এলেন। চার্নক গেলেন না। আর তিনি মাস কয়েক থেকে যেই গেলেন তো এলেন বিয়ার্ড। তবে এবার রাগটা কম। কেননা বিয়ার্ড চার্নকের দলের লোক। হেজেসের সঙ্গে লড়াযে তার বিরুদ্ধে লণ্ডনে চিঠি চালাচালি করেছে। সে বার বার হেজেসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। তবে বিয়ার্ড অনেকটা ধর্মভীরু লোক। চার্নকের মত দুঁদে বেপরোয়া নয়। এবং ভদ্রলোক নিরীহ গোবেচারা ধাঁচের মানুষ। হুগলীতে তখন ফৌজদার ও তাঁর আমলাদের সঙ্গে কোম্পানীর নিত্যি ঝামেলা। বিয়ার্ডের অত ধকল সইবে কেন? ভরা ভাদ্রের এক পচা গরমের দিনে তাঁর এন্তেকাল হ'ল। এবার তাঁরই অকাল মৃত্যুতে এতদিন পর চার্নকের কপালে এই হুগলীর রাজপাট জুটে গেল।

কিন্তু আগেই বলেছি। হুগলীতে তখন ঝোড়ো হাওয়া বইছে। নিত্য নিত্য গণ্ডগোল। ফৌজদার সাহেব ইংরেজদের ওপর নারাজ। সেণ্টজর্জ থেকে কেবল তাগিদ আসছে গঙ্গার ধারে কুঠি সব তুলে দাও। কিন্তু দেব বললেই তো দেওয়া যায় না। কেননা কোম্পানীর দেনা-পাওনা আছে। আরও একটা ব্যাপার আছে বোধহয়। কোম্পানীর কুঠিয়ালরাও তো নিজের নামে ব্যবসাপাতি করতেন। কুঠি তুললেন তো সেসব ব্যাপার তুলে দিতে হয়। কোম্পানী যখন পাটনা কুঠি শেষ বেস তুলে দেবার হুকুম দেয়, তখন এই কারণেই কুঠিয়ালরা বাধা দিয়েছিল। তার অনেক প্রমাণ আছে। তারপর কোম্পানীর দুর্দিন বুঝে দেশী বণিকেরাও সব কাজীর কাছে নালিস জানাতে লাগল নানা দাবী দিয়ে। কাশিমবাজারের বৃত্তান্ত বলার সময় আমরা দেখেছি, তারা তেতাল্লিশ হাজার টাকার একটা ডিক্রি পেয়েছিল কোম্পানীর বিরুদ্ধে। কিন্তু জব চার্নক দিলে তো? কুঠি অবরোধ করে রইল ফৌজদারের লোক। হুগলীতেও সেই একই কাহিনী। ফৌজদার আবদুলগনি

এক লম্বা ফিরিস্তি পাঠাল হুগলী কাউন্সিলের কাছে। সেগুলি যেন অবিলম্বে ফৌজদারকে পাঠানো হয়। কাউন্সিল বললেন, ওসব হবে না নিত্যি নিত্যি এত খাঁই কোম্পানী মেটাতে পারবে না। না তো ঠ্যালা বোঝ। গনি সাহেব প্রকারান্তরে কুঠি অবরোধ করলেন। স্থানীয় তাঁতীরা কেউই কোম্পানীকে মাল বিক্রি করবে না। সেইখানেই শেষ হ'ল না। দেশী পিঅন, দেশী ভকিল, তারাও কাজে আসা বন্ধ করে দিলে। কুঠিয়ালরা খোঁজ খবর করতে গিয়ে তাদের দেখা পেলেন না। বাড়ীর লোকেরা বললে, কি জানি বাপু, কোথায় বেরিয়েছে? কেউ বা মুখের ওপর সাফ্ কথা বলে দিলে, ফৌজদারের নিষেদ তারা কাজে যাবে না। কাজে গিয়ে মরবে নাকি?

সেখানেই শেষ নয়। কুঠিয়ালদের বার বার ডেকে পাঠাতে লাগল কাজী সাহেব। নবাবী প্যায়দা এসে লাঠি ঠুকে বলে কাজী ডাকছে। দিনে এমনি ঘটনা অনেকবার। কোতেয়ালী আর কুঠি করতে করতে সাহেবদের পায়ের জুতা ছিঁড়ে যাবার দাখিল। কুঠিয়ালদের আর কাজকর্ম নেই না কি? আগে কাজী ডাকলে, কুঠি থেকে লোক পাঠালেই হ'ত। এখন কুঠিয়ালকে স্বয়ং হাজিরা দিতে হয় কাজীর এজলাসে। এখন নতুন ব্যবস্থা।

অবশ্য এ কাহিনী তখন হুগলীতেই নয়। কাশিমবাজার পাটনা, বালেশ্বর—সর্বত্র। বালেশ্বরের তো একটা জবর লড়াই হয়ে গেল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—বালেশ্বর কোতোয়ালীর একটা লোক হঠাৎ খুন হযে গেল! খবর নিয়ে জানা গেল জনৈক ইংরেজ কর্মচারীর সঙ্গে তার গণ্ডগোল হয়েছিল। কাজেই সহজেই সেই খুনের দায় ইংরেজ কুঠির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল। কোতোয়ালীর লোক খুন! 'ল এণ্ড অর্ডার' বলতে আর রইল কি দেশে? ফৌজদার একেবারে তো ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে এলেন। অবশেষে. অনেক হাতে পাযে পড়ে, বহু ঝামেলা পুইযে, ব্যয়ভার বহন করে, জন কোম্পানীর বালেশ্বর সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল।

তবে এ ভাবে ক' দিন যাবে। মহম্মদ হানিফ বলে এক ভকিলকে কোম্পানী দিল্লী পাঠালে। কিন্তু 'দিল্লী হনুজ দূর অস্ত'—দিল্লী গেলেই কি আর দিল্লীর কাজ হাসিল হয়। দিল্লী পৌছাতেই অনেক দেরী হয়ে গেল তাঁর। খরচ হ'ল বেশ কিছু টাকাকড়ি। কিন্তু ফল হ'ল লবডঙ্কা।

এদিকে জন বিয়ার্ড দেহরক্ষা করলেন। ভাবতে ভাবতে কেম্পানীর এস্টেটের ভবিষ্যৎ ভেবেই বোধ করি তাঁর প্রাণযন্ত্রটা অকস্মাৎ ক্রিয়া বন্ধ করে দিলে। আঠাশে আগষ্ট। ষোলশ' পঁচাশি। ডাক পড়ল চার্নকের। কিন্তু চার্নক কাজের লোক। কাশিমবাজারের কর্তা। বিগত দেয়ে দুয়ে বসে নেই যে, ডাক আসবে আর

গাড়ীতে চাপবে, চলে যাবে ? সেখানকার কাজকর্ম মেটাতে, বুঝিবা নিজের ব্যবসাপত্তনের পাওনা থাওনা হিসেব নিকেশ করতে তাঁর মাস আস্টেক লেগে গেল। তা' ছাড়া তার নামে সেই তেতাল্লিশ হাজার টাকার ডিক্রি ছিল না ? নবাব তাঁকে ঢাকায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ঢাকায় যাওয়া মানেই তো নবাবের খপ্পরে পড়া। কে আর সাধ করে সিংহের মুখে নিজের মাথাটা গুঁজে দেয় ? সেখানে তো বাঘের মত নবাব শায়েস্তা খাঁ। চার্নকের যেতে বয়ে গেছে। কাশিমবাজার কুঠিতে চার্নক প্রথমে নজরবন্দী হয়ে রইলেন। তারপর একদা নিশীথে নবাবের আমলা গোমস্তাকে ঘুষ দিয়ে, না চোখে ধুলো দিয়ে কে জানে, তিনি লোকজন সৈন্য জাহাজ সমেত হুগলীর উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। ষোলশ' ছেআশির এপ্রিল মাস।

চার্নকের কপালটায় সত্যিই শান্তি ছিল না। সেই বহু আকাঙ্ক্ষার ধন মিলল ঠিকই ; কিন্তু এত কাঁটার মুকুট। হুগলীর ইংরেজ কুঠিতে পৌছে দেখলেন, এ কোথায় এলেন তিনি ? তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন যে ! কাশিমবাজারে খুবই গোলমাল। তবু রেশম, চিনি কিছু কিছু বোঝাই হচ্ছিল। দেশী দোকানদার, গোমস্তা, দালালরা একেবারে অসহযোগ করেনি। মাঝে মাঝে কাজ-কর্ম হচ্ছিল। খাবার-দাবার কিনতে পারছিলেন কুঠির লোকেরা ঠিকই। আর হুগলীতে তো কাজকর্ম একদম বন্ধ ! চারদিক দিয়ে অবরোধ। সবরকম মালবিক্রি বন্ধ সাদা চামড়ার এই বিধর্মীদের ! ইংরেজ কুঠি একেবারে হাত গুটিয়ে তখন বসে।

ব্যাপারটা হয়েছিল কি, ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁ বড় জবরদস্ত লোক। ঔরঙ্গজেবের মামা। ভাগনের চেয়ে এককাঠি সরেস। ইংরেজরা নিজেদের গুটিয়ে আনছে হুগলীতে ; সৈন্য সংগ্রহ করছে, বুঝিবা লড়ায়ের জন্য তৈরী হচ্ছে। খবরটা তাঁর কানেও পৌছেছিল। তিনি ভেতরে ভেতরে এই লালমুখো জাতদের স্পর্ধা দেখে রাগে গরগর করছিলেন। হুগলীর ফৌজদার আবদুলগনি মনিবের ক্রোধের খবর জানত। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। সে বললে ইংরেজদের সব বন্ধ। তেল তামাক বন্ধ। ধোপা নাপিত বন্ধ। ব্যবসা বন্ধ। তাদের কাছে খাবার দাবার বিক্রি বন্ধ। হাতে না মেরে ভাতে মার। কাজেই ক্ষোভ ধোঁয়াতে শুরু হয়েছিল।

ধূর্তবুদ্ধি চার্নকেরও ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হ'ল না। বুঝলেন ব্যাপারটা একেবারে চরম মুহূর্তে পৌছে গেছে। এসে গেছে 'ব্রেকিং পয়েন্ট' ! মাস ছয়-সাত তিনি ছিলেন হুগলীতে। এবং এই সময়টায় এই অসহ অবস্থাটা তাঁকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে আবেদন নিবেদন তা আর হবে না।

বহুব্যয় করে বহু কর্ম স্বীকার করে দিল্লীর ফরমান শুবে বাঙলায় আনতে তা'

একখণ্ড মূল্যহীন কাগজে পরিণত হয়। এক নবাবের 'নিশান', হসবল হুকুম অপর দেখাওন 'ফুঃ' বলে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। এবং সেইসব অসহনীয় অবস্থার কথা জন কোম্পানীর সদর দপ্তরে জানতে ভুল করেননি। এবং সেখানেও আস্তে আস্তে পাল্টাতে শুরু করেছিল। দ্বিতীয় চার্লস আর দ্বিতীয় জেমসের আমলের বাড়বাড়ন্ত থেকে ইংরেজদের ভাবনা। মেজাজ পাল্টে যাচ্ছিল। সেখানে বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডের রূপ দেবার বাসনা অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করেছিল। জন কোম্পানীর পয়সায় তখন লণ্ডনের সমাজ পাল্টাচ্ছিল। নতুন 'ব্যাবণ'রা এসে সুমন্দ পবনে, উর্বর ভূমিতে ভারতের মাটিতে তো জায়গীর চাইছিল এই নতুন ইংরেজ চিন্তার ঢেউ এসে লেগেছিল ভারতবর্ষের কুঠিতে কুঠিতে। যশুযা চাইল্ডেব এই নব চিন্তার অনুরণন হুগলীর এজেন্ট চার্নককেও অনুপ্রাণিত না কবে পারেনি। কাজেই, কাজের লোক চার্নক ভেতরে ভেতরে লডায়ের জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন। এবং একদিন সেই চরম সন্ধিক্ষণ এসে গেল।

আটাশে অক্টোবর। সকাল বেলার ঘটনা। প্রসন্ন শরতের সকাল। রাতের যেসব শিউলি ফুল সকালের গাছতলায বিছিয়ে বসেছিল গ্রাম-হুগলীর বনে বনে, হাল্কা পেঁজা কার্পাস তুলোর মত মেঘ সূর্যের আলোয রঙিন হয়ে উঠেছিল, অজস্র সাদা কাশ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছিল ল্‌ বাতাসে—তারা কেউই বোধহয জানত না কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ভীষণ অগ্ন্যুদ্গীরণে খানখান হয়ে ভেঙে পডবে হুগলীর এই শান্তির জীবন। বহুদিনের জমা ক্ষোভ লাভাস্রোতের মত বেরিয়ে আসবে অনর্গল। বন্দুকের গুলিতে, কামানের গর্জনে, অস্ত্রের ঝনঝনায় দিগ্‌বিদিক প্রতিধ্বনিত হবে নিরন্তর। শান্ত কুটিরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলবে, আহত সৈন্যের আর্তনাদে বাতাস ভরে যাবে; কেউবা কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে দুদ্দাড় পালাতে সুরু করবে ঘর দোর ছেড়ে।

তাই হ'ল। অথচ ব্যাপারটা সুরু হযেছিল নিতান্ত সামান্যভাবেই। হুগলীর বাজারে সামান্য একটু তর্কাতর্কি। কোম্পানীর গোরা সৈন্যের জনাতিনেক গিয়েছিল ময়রার দোকানে কিছু খাবার-দাবার কিনতে। সকালের নাস্তা সওদা করতে। দোকানী বললে, হবে না। ইংরেজদের তারা খাবার-দাবার বিক্রি করবে না। ক্ষুধিত গোরা। কাজেই বাগবিতণ্ডা। কয়েকজন নবাবী সৈন্য বুঝি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তারা—'কি হয়েছে', 'কি হযেছে' বলতে বলতে দোকানে এসে ঢুকে পড়ে থাকবে। এবং অচিরেই দুই দলে সংঘর্ষ। গোরারা তখন কুল্যে তিনজন। ফৌজদারের লোকলস্করেরা সংখ্যায় বেশি। তাছাড়া দেশী লোকেরাও তাদের দলে। তাই প্রথমে গোরারাই মার খেল বেধড়ক। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই খবরটা ইংরেজ-

কুঠিতে পৌঁছে গেল। আর যায় কোথা? সেখান থেকে পিলপিল করে গোরা সেপাইরা আসতে লাগল। লেগে গেল ধন্দুমার।

খবরটা একসময় সেই বেয়াড়া মানুষটার কানেও পৌঁছাল। তিনি তো সবই বুঝতে পেরেছিলেন। আঁচ করতে পেরেছিলেন ঝড় উঠবে। আর কাশিমবাজার পাটনায় বহুদিন কাটিয়ে তাঁর ধারণা হয়েছে। তলোয়ার না হলে হবে না। এখানে সে ধারণা পাকাপাকি হয়ে গেল। কাজেই এই সুযোগ তিনি ছাড়লেন না। আগে থেকে ব্যবস্থা করাই ছিল। কাপ্তেন নিকলসনের জাহাজে হুগলীর ইংরেজ কুঠির অস্থাবর সম্পত্তি তুলে দিলেন। লোকজন তুলে দিলেন। তারপর জলের ছেলে জলে। এবং সেখান থেকেই লড়াই চালাতে শুরু করলেন। কাপ্তেন র‍্যারবুথনটের জাহাজ থেকে কামানের গোলা গোলঘাটের কাছে নবাবীর তোপখানায় গিয়ে পড়ে আগুন ধরিয়ে দিলে। আগুন ধরে গেল পাঁচ ছয় শ' ঘর নবাবী ছাউনিতে ইংরেজ জাহাজ থেকে ছোঁড়া কামানের গোলায়। ফৌজদারের কুঠির সামনে তোপ পড়ল। ফৌজদার আবদুল গনি তো এতটা ভাবতেই পারেননি। তিনি দেখলেন সমূহ বিপদ! শেষ-বেশ, বোরখার মধ্যে, ছদ্মবেশে, যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। গনি পালালেন। বারুদের ধোঁয়া সরে গেলে, আহতের আর্তনাদ থেমে গেলে দেখা গেল, ইংরেজদের হুগলীর কুঠিতে রাখা সোরার বেশ ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে কুঠিয়ালদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির। ইংরেজদের পক্ষে মৃত্যু—এক। আহত বেশ কয়েকজন। মুঘলদের নিহতের সংখ্যা ষাট। তাদের মধ্যে জনাতিনেক অন্তত বিশিষ্ট ব্যক্তি। আহতের তো লেখাজোখা নাই। চার পাঁচশ'র মত বাড়ীই পুড়ে যায়। হুগলীতে যে বাড়ী খুব পুড়ে যায়—প্রলয় অগ্নিকাণ্ডের মত ঘটনায়, তার সবুতি দিয়েছেন দেশী ঐতিহাসিক রিয়াজ-ই-সালাতিন। তিনি বলছেন এক অবাক কথা! চার্নক তাঁর হুগলী ত্যাগ চিহ্নিত করেছিলেন শহরের একাংশ পুড়িয়ে দিয়ে। তাঁর জাহাজের পাটাতন থেকে একটা আতস কাঁচ—'লেন্স' ঘুরিয়ে তিনি নাকি এই অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করেন!

উইলসন সাহেব বলছেন, চার্নকের এই কীর্তিকলাপ দেশী লোকের মনে তাঁকে ঘিরে এক কল্পকাহিনী রচনা করেছিল। সেই গল্পটা এইরকম: চার্নক হুগলীর এজেন্ট থাকার সময় গঙ্গার বুকে একদা এক সাংঘাতিক ঝড় ওঠে। জলস্ফীতি হয়। এতে হুগলীর ইংরেজ অঞ্চলটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ইংরেজরা আর কি করে, গাছপালা কেটে—বন কেটে নতুন বসত বসাতে থাকে। এবং যাতে ভবিষ্যতে জলস্ফীতি তাদের বাড়ী-ঘরের ক্ষতি করতে না পারে সেই কারণ তারা দু' তোলা, তিনতোলা সব বাড়ী বানাতে থাকে। এতে মুঘল আমীর-আমলারা সব ফৌজদারের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে, 'খোদাবন্দ, এই বিচিত্র কুত্তার দল—

ইংরেজরা তাদের বাড়ীঘর এত উঁচু করে তৈরি করছে যে তাতে আমাদের মেয়ে বউদের আব্রু নষ্ট হবে। হুজুর, এ-ত চলতে পারে না। ফৌজদার তো আর চার্নককে এসব কথা বলতে পারে না। বললেও শুনবে কিনা, কে জানে? কাজেই বোধহয় যেসব রাজমিস্ত্রী, ছুতোর কাজ করছিল ইংরেজদের, তাদের বললে। কাজে যেও না ইংরেজদের। চার্নক গেল রেগে। এবং লড়ায়ের জন্য তৈরি হতে লাগল। মুঘলদের অজস্র অগণ্য সৈন্য সংখ্যা। কিন্তু চানকের লোকসংখ্যা তো নগণ্য। কিন্তু চার্নকের ছিল একটা আতসী কাঁচ—'বার্নিং গ্লাস'। তারই সাহায্যে রৌদ্র-রশ্মি দিয়ে চার্নক নদীর একটা পাড়—মায় চন্দননগর পর্যন্ত পুড়িয়ে খাক্ করে দিলে।

ফৌজদার আর করেন কি—দুটো মস্ত মস্ত লোহার শিকল—তার এক একটা কড়ার ওজনই বাইশ পাউণ্ড—দিয়ে তিনি হুগলীর নদীজলে অবরোধ সৃষ্টি করলেন। কিন্তু চানক তলোয়ারের এক ঘায়ে সেই শেকলখানা খান খান করে কেটে ফেললেন। এবং তাঁর জাহাজ ভাসিয়ে দিলেন দাক্ষিণাত্যের উদ্দেশ্যে। এবং সেখানে তখন স্বয়ং সম্রাট আরঙ্গজেব। তিনি তার পিতৃপুরুষের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে এসেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বুকে মুঘল পতাকা ওড়াবার কাজে তিনি তখন ব্যস্ত। দিনরাত শুধু যুদ্ধের কলাকৌশল ভাবেন। নতুন 'স্ট্র্যাটেজী'—ফন্দি, তাই নিয়েই অশীতিপর সেই বৃদ্ধ সম্রাট মশগুল। তাঁর গৌর ললাটে ভাবনার দাগ পড়েই আবার মিলিয়ে যায়। আবার জেগে ওঠে—সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গমালার মত। অনবরত।

দাক্ষিণাত্যে তাঁরই দরবারে নাকি গিয়ে সবিনয়ে যুক্ত করে দাঁড়ালেন চার্নক। দরবারে এক আমীর নাকি তাঁর কানে কানে গিয়ে বলে থাকবে—মুঘল সৈন্যের খাদ্য সরবরাহ সব শেষ। সেই চিন্তাই সম্রাটের এই বিরসবদনের কারণ। চার্নক বললেন, এই ব্যাপার? তিনি আছেন না? তাঁর রেশন থেকে গোপনে মদ্য-মাংস খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের হুকুম দিলেন তিনি। চার্নকের এই বদান্যতা মুঘল সম্রাটের হৃদয় জয় করে নিলে। চার্নককে তিনি বলেছিলেন: 'যা চাও বল, তাই দেব তোমাকে।' চার্নক বললেন, আগে আমায় অনুমতি দিন, আপনার শত্রু সংহার করি, তারপর আপনার কাছে ভিক্ষা চেয়ে নেব। এমনিভাবেই সম্রাটের অনুমতি নিয়ে চার্নক মুঘলদের আক্রমণ করে এবং শত্রুদের পরাজিত করে। পালিয়ে যায় সম্রাটের অরিকুল। তারপর চার্নক আবার এসে দাঁড়ালেন সম্রাট সমীপে, এবং প্রার্থনা করলেন গ্রাম কলকাতা—ইংরেজদের জন্যে। সম্রাট রাজী হলেন এবং দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন। চার্নক ফিরলেন এবং বাঙলায় পত্তন করলেন ফোর্ট উইলিয়ম। বলা বাহুল্য এই উপকথা উইলসন সাহেবের বলা। এবং নিঃসন্দেহে এটা উপকথাই। উইলসন সাহেব বলছেন, চার্নকের এই হুগলীর লড়াই—তার শৌর্য

কাহিনী নাকি জনমানসে এতই প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল, যে বুঝি বা ইলিয়াডের মত 'চার্নকাইশড' বা এই ঘটনা নিয়ে কোন কাব্য রচনা অসম্ভব ছিল না কোন লোক কবির।

সে যাই হোক, বা যেভাবেই হোক, হুগলীর লড়াই চার্নকের একটি মস্ত কীর্তি। যদিও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই লড়ায়ের নাযক কাপ্তেন আরবাথনই। তবু এর দায়-দায়িত্ব নিঃসন্দেহে এজেন্ট জব চার্নকের। এবং বহু পোড খাওয়া মানুষ হিসেবে তিনি এই প্রথম স্থানীয় রাজশক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নেমে পডলেন। পাটনা বা কাশিমবাজারেই রাজশক্তির সঙ্গে ছোটবড মনোমালিন্যেব মধ্যে দিযে তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন যে আখেরে তলোযারের মুখেই সব লাভ ক্ষতির হিসেব নিকেশ হবে—এবং হুগলীতে সেই ঘটনাই ঘটে গেল। তবে এব পেছনে স র্ যশুযা চাইল্ড তথা রাজা দ্বিতীয জেমসের যে বরাভয ছিল বা উসকানি ছিল, সন্দেহ নেই।

তবে চার্নক প্র্যাকটিক্যাল' মানুষ। তিনি বুঝেছিলেন, একটা লডাই ফতে হলেও, সব লড়াই হবে না। এবং কুমীরের সঙ্গে লডাই করে' জলে বাস কবা চলবে না। কাজেই এই স্থান তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এবং একদা সব কিছু এবই মধ্যে গোছগাছ করে বোধকরি দেনাপাওনার মোটামুটি একটা হিসেব মিটিযে তিনি তল্পা গোটালেন। তখন হুগলীর জলের শীতের শাস্ত এসেছে। কনকনে ডিসেম্বর মাস। মাঝে মাঝে হুগলীর আম জাম কাঁঠাল জারুলের বনে কুযাশার ঝুপডি নামে। বিশ তারিখ। জব চার্নক তাঁর হুগলীর পাট তুললেন চিরকালেব তরে! নয দিনের দিন পৌছালেন সুতানুটি। কিন্তু সে কাহিনী বলার আগে, আগে, হুগলী ছেড়ে চার্নকের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে সুতানুটিতে বসবাস করার প্রাক্কালে হুগলী কুঠির একেবারে আদি পর্বের স্মৃতিরোমন্থন করে নিই আসুন।

সেই যে ব্রিজম্যান সাহেব আর তাঁর তিন সঙ্গী হুগলীর কাছে গোলঘাটের বুকে ইংরেজ কুঠি পত্তন করলে। সেই দিনে ফিরে যাই আসুন। ব্রিজম্যান হুগলী পৌছে একটু থিতু হয়ে বসেছেন কি বসেননি মাদ্রাজ থেকে হুকুম এল রাজমহল চলো। কেন? কেন? বাঙলায় যে কুঠি বানাচ্ছ তার হুকুম কই? পরোয়ানা কই? কে দেবে সেই পরোয়ানা! বাঙলার সুবেদার। আরে জানো না বুঝি, সম্রাট শাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা তখন বাঙলার সুবেদার। রাজমহলে তিনি তখন দরবার বসিয়েছেন। সুবে বাঙলার তিনিই তো দণ্ডমুণ্ডের মালিক। তাঁর কাছেই বাঙলায় ব্যবসা করার ফরমান নিয়ে এসে গো যাও। কোম্পানী আশ্বাস দিয়ে বললে, ভয় নেই, ভয় নেই, সেখানে ডাক্তার গ্যাব্রিএল বাউটন আছেন। তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন। কাল বিলম্ব না করে রাজমহল যাও। ব্রিজম্যান আর কি করে? বেরিয়ে পড়ল।

চলুন, এইবার হুগলীর অধ্যায় বন্ধ করে খাস কলকাতার বুকের পাতা একটি একটি করে খোলা যাক। অবশ্য তখন কলকাতা নয়, সুতানুটি। হুগলী থেকে জাহাজ ছাড়বার নয় দিনের দিন চার্নকের জাহাজ সুতানুটির ঘাটে এসে ভিড়ল। সেই সুতানুটি জায়গাটা কি আজকের বড়বাজার অঞ্চল? তাহলে সেকালের হাটখোলাটা কোথায়? ঘাটের পাশেই নাকি? এই সময়ে জন কোম্পানীর সদর দপ্তরে রাখা জব চার্নকের রোজনামচার কিয়দংশ: এগুলি এখানে তুলে দেবার কারণ, এগুলিই আকর তথ্য। এই মূল তথ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কলকাতার ইতিহাস তৈরি করতে হবে। এগুলিকে ভুললে চলবে না।

উনত্রিশে ডিসেম্বর ষোলশ' ছিয়াশি।—হুগলী ছাড়লাম এবং গেলাম সুতানুটিতে। নয়ই ফেব্রুয়ারী, ষোলশ' সাতাশি।—নবাবের নিমক কুঠিগুলি ভেঙে দিলাম। এগার তারিখে থানা দুর্গগুলি জয় করে নিলাম এবং সাতাশ তারিখে আশ্রয় নিলাম হিজলীতে। বালেশ্বরের পথে মুরদের জাহাজগুলি দখল করে নিলাম এবং দখল করে নিলাম বালেশ্বর শহর। এই হিজলী থেকেই আসল ভূখণ্ডে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। জুনমাসে মুরদের দ্বারা আক্রান্ত। আট তারিখে নবাবের সেনাপতির সঙ্গে সন্ধি। হিজলী থেকে তারা নদী থেকে উজানে যাবে এবং থানা দুর্গ থেকে নীচে তিনমাস আটকে থাকবে যতদিন না ঢাকা থেকে নবাব এই সন্ধি শর্তগুলি অনুমোদন করেন। তিরিশে ডিসেম্বর, ষোলশ' সাতাশি—শর্তগুলি অনুমোদিত হয়নি; কিন্তু ইংরেজদের সুতানুটিতে যাবার অনুমতি মিলেছে। হুগলী কুঠির ছন্নছাড়া অবস্থা। যে 'হোল' থেকে জাহাজ তীরের দিকে এগোত সেত প্রায় বুজে এসেছে। সুতানুটিতে বসবাস করার অনুমতির জন্য আবেদন করা হ'ল।

সাতাশে জুন, ষোলশ' অষ্টআশি—এখনও সুতানুটিতে। নতুন নবাব বাহাদুর খান এসে গেছেন।

একুশে আগষ্ট, ষোলশ' অষ্টআশি—হুগলী থেকে ব্যবসাটাকে সুতানুটিতে সরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিশে এপ্রিল, ষোলশ' উননব্বই—জুন, ষোলশ' অষ্টআশিতে আয়ার ও ব্র্যাডিলকে ঢাকায় নবাবের কাছে পাঠান হ'ল চুক্তি করার জন্যে। নবাব আরাকানের রাজার সঙ্গে লড়াই-এ ইংরেজদের সাহায্য চেয়েছেন। ইংরেজরা দিতে

রাজী আছে, যদি নবাব তাদের দুর্গ বানাবার অনুমতি দেন। মাঝে একজন হীথ যিনি নাকি জাহাজ এবং সৈন্যদের কাপ্তেন জোরাজুরি করছেন যে এজেন্সী যেন বাঙলাদেশ ছেড়ে চলে যায় এবং আটই নভেম্বর (ষোলশ' অষ্টআশি) কলকাতা ত্যাগ করা হ'ল এবং বালেশ্বর পৌছান হ'ল যাতে সেখানকার মালপত্র এবং লোকজনদের নিয়ে যাওয়া যায়।

সতেরই মার্চ, ষোলশ' নব্বই—বাঙলার নবাবের কাছ থেকে অনুরোধ পেলাম আমরা যেন বাঙলা দেশেই ফিরে যাই এবং সেখানেই বসবাস করি।

মাদ্দাপোলাম জাহাজের পাটাতনে।

চব্বিশে আগষ্ট ষোলশ' নব্বই। আজকে আমরা সাঁকরাইলে। কাপ্তেন ব্রুককে হুকুম দেওয়া হ'ল তাঁর জাহাজ নিয়ে সুতানুটি যেতে। আমরা সেখানে পৌছালাম দুপুর বেলা। এবং জায়গাটাকে দেখলাম যাতা অবস্থায়, আমাদের বসবাসের জন্যে কোন কিছুই ফেলে যায় নি এবং দিনরাত্রি বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা আবার নৌকায় ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। বছরের এই সময়ে এইভাবে বসবাস খুবই অস্বাস্থ্যকর। মল্লিক বরখুরদার এবং দেশী লোকেরা আমরা জায়গাটা ছেড়ে যেতেই যা পেয়েছে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে নয়ত যতটা পেরেছে বয়ে নিয়ে গেছে।

আমরা এখানে পৌছাতে থানাদার তাঁর ভৃত্যকে পাঠিয়েছিলেন অভিনন্দন জানাতে।

দেখা যাচ্ছে, পাকাপাকিভাবে কলকাতায় থাকবার জন্যে রবিবারের দুপুর বেলা সুতানুটি এলেন জব চার্নক ও তাঁর লোকজন নিয়ে। সেদিনই কলকাতায় পদার্পণ করতে পারেননি। ঠিক কবে যে এই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল; তার সাবুতি দেওয়া শক্ত তবে দেখা যাচ্ছে পরের বৃহস্পতিবার চার্নক সুতানুটিতে তাঁর কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেছেন এবং কতকগুলি জরুরী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কলকাতার শহর নির্মাণের যেগুলি আদিপর্বেরও সূচনা—সন্ধ্যেবেলার প্রদীপ জ্বালানোর আগে সকালবেলার সলতে পাকানো। কোম্পানীর নথিপত্রে সেই সভার কাজকর্মের যে বর্ণনা আছে তার হুবহু বঙ্গানুবাদ এই রকম :

সুতানুটি বৃহস্পতিবার আটাশে আগষ্ট ষোলশ' নব্বই।

আলোচনা সভায় হাজির ছিলেন রাইট ওয়ারশিপফুল এজেন্ট জব চার্নক, ফ্রান্সিস এলিস এবং জেরিমিয়া পিচে। এই সেই এলিস যাঁকে হেজেস সাহেব

চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিলেন হুগলী থেকে কয়েকজন দেশী গস্তদারের অভিযোগে। এবং এলিস আশ্রয় নিয়েছিলেন কাশিমবাজারের চার্নকের পক্ষপুটে। ভাগ্যের এমনি পরিহাস সেই এলিস রয়ে গেলেন; চার্নকের পরে ইনিই খুব অল্পদিনের জন্য হলেও কলকাতার এজেন্ট হয়েছিলেন আর হেজেস ভাগ্যের এমনি বিড়ম্বনা পড়াভূত বিপর্যস্ত হয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেলেন কেউ তার হদিশই রাখল না।

সে যাই হো'ক এই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল, মিস্টার স্ট্যানলি যেন হুগলীর অন্যান্য লোকজনকে নিয়ে সেখান থেকে এখানে চলে আসেন, কেননা ফরাসীদের সঙ্গে লড়াই ঘোষিত হতে পারে। জোহানের কমাণ্ডারদেরও এই মত হুকুম দেওয়া হ'ল।

আগেকার সব বাড়ীই নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এই সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে নিম্নলিখিত বাড়ীগুলি যত কম খরচে হয় তৈরি করা হবে:

১ম—একটি গুদামঘর।

২য়—একটি খাবার ঘর।

৩য়—সেক্রেটারির অফিস ঘর। এটা সারাতে হবে।

৪র্থ—একটা ঘর যেখানে কাপড় বাছাই করা হবে।

৫ম - একটি রশুইশালা তার অনুসঙ্গ সহ।

৬ষ্ঠ—কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্য একটি বাসগৃহ।

৭ম—এজেন্ট এবং মিস্টার পিচের বাড়ীটা সারাতে হবে। এগুলি ভগ্নঅবস্থায় এখনও টিকে আছে। এলিসের জন্য একটি বাড়ী তৈরি করতে হবে। তাঁর বাড়ীটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

এগুলি সবই মাটির বাড়ী হবে। খড়ে ছাওয়া মটকা। যতক্ষণ পর্যন্ত না কুঠি তৈরির জায়গা পাওয়া যায়। চার্নকের মুগল পর্ব যেমন খুবই সংক্ষিপ্ত, কলকাতা পর্ব ততটা কম না হলেও এখানেও চার্নক বেশী দিন বাঁচেননি। হিসেবে দেখা যায়, আটশ' সত্তর দিন সুতানুটির কোলে কাটিয়েছিলেন তিনি। জানুয়ারীর পয়লা কি ডিসেম্বরের শেষ তারিখে সুতানুটিতে পা দিয়েছিলেন তিনি আর জানুয়ারীর দশ তারিখে ষোলশ' নিরানব্বই—সুতানুটির মাটিতেই চিরকালের জন্যে চোখ বোঁজেন তিনি। অবশ্য তখন তাঁর সাধের শহরের ভিত্তি মোটামুটি পাকা হয়ে গেছে। তবে এখানে বলা দরকার, শেষবার সুতানুটিতে আসবার আগেই লণ্ডন থেকে পাঠান পনেরই ফেব্রুয়ারীর ষোলশ' উননব্বই-এর এক হুকুমে জন কোম্পানী সুতানুটিতে কুঠি বানানর অনুমতি দেন চার্নককে। সেই চিঠিতে ছিল: "এবং যখন সুতানুটি তাঁর পছন্দ, তখন আমরা রাজী যে সেখানে একটা কুঠি বানান হোক,

তবে যতটা কম খরচ করে সম্ভব ততটা কম খরচ করে।" অবশ্য তখনও কোম্পানী কাশিমবাজারের কথা মালদহের কথা ভোলেননি, এবং হুগলী তাঁদের যৎপরোনাস্তি জ্বালা দিলেও সেখানেও একটা ছোট মতন কুঠি রাখার যৌক্তিকতা চার্নককে বোঝাতে চেয়েছেন তাঁরা। তখন অবশ্য জন কোম্পানীর জ্ঞানে বাঙলার মুঘল রাজত্বে শান্তির হাওয়া বইছে এখন সেই দক্ষিণা বাতাস যে বয়েই যাবে, সেটাই কোম্পানীর স্থির বিশ্বাস।

তখন শান্তি এসেছিল ঠিকই; তবে সেটা স্বল্পস্থায়ী। শান্তি এসেছিল অনেক ঝড়ের পর, অশান্তির পর। প্রথম চার্নক যখন আসেন সুতানুটিতে, মাসখানেক খড়ে ছাওয়া কুঁড়েঘরে কাটিয়েছিলেন তিনি। এদিকে খবর নিচ্ছিলেন ঠিকই হুগলীর। কাশিমবাজার, মালদহ, সবচেয়ে বেশি বোধকরি ঢাকার। সেখানে বাঘের মত বসে নবাব শায়েস্তা খাঁ। দুনিয়াকে শায়েস্তা করাই যেন তাঁর পেশা। নেশাও বা। আর ভিনদেশ থেকে একজন ইংরেজ কুঠিয়াল এসে তার সঙ্গে টক্কর দেবে? পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত শায়েস্তা খাঁ রাগে গর গর করতে লাগলেন। এদিকে চার্নক তখন বেপরোয়া। তাঁর রিপোর্টেই আমরা জেনেছি চার্নক সুতানুটি ছেড়ে তখন গঙ্গার বুকে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য খুব সম্ভব কাছেপিঠে খোঁজখবর করা, অন্য কোন অধিকতর সুবিধার জায়গা পাওয়া যায় কিনা দেখা। চার্নক এগোতে লাগলেন। মেটেবুরুজে নবাবের নুনের গোলা পোড়ানোর পরে শিবপুরের দুর্গ দখল করে নিলেন। দ্বীপের মত জায়গা হিজলী। চারিদিকে জল। সেখানেই জাহাজ ভেড়ালেন। এইখান থেকে ছোটখাট সব লড়াই করতে লাগলেন মুঘলদের সঙ্গে। হিজলীতে বেশ চাষ আবাদ হয়। আর হয় লবণ। নিমক মহল। সবই ভাল কিন্তু এই মহল রাখে কে? থাকে কে এখানে? কার বাপের সাধ্যি? একবার খেলে হিজলীর পানি / যমে মানুষে টানাটানি। যেমন পচা জল, তেমনি জঙ্গুলে আবহাওয়া। দেশী লোকেদেরই চিত্তি চড়কগাছ। আর ইংরেজরা তো পড়তা লোক। তাদের তো জ্বরজারিতে কূল উঠে যাবার দাখিল। তবু জব চার্নক এখান থেকেই তাঁর লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। বালেশ্বর শহর দখল করে ফেললেন। আর একদিন মুঘল জাহাজও দখল করলেন। আর এই নিয়েই নাকি বেঁধে গেল যত গোলমাল। সেই দু'খানা জাহাজে নাকি দুটো করে চারটে হাতি ছিল। দুটো খোদ দেওয়ান শায়েস্তা খাঁর। অপর দুটো শাহাজাদার।

খবরটা একসময়ে শায়েস্তা খাঁর কানে গিয়ে উঠল। আর যায় কোথা? শায়েস্তা খাঁ সহ্যের একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে গেলেন। হুগলী-মেটেবুরুজ-শিবপুর-হিজলী-বালেশ্বর শেষ বেশ এই মুঘল জাহাজ। স্পর্ধাত কম নয় এই সাদা কুত্তাগুলোর।

কালক্ষেপ না করে, শায়েস্তা খাঁ এত্তেলা দিলেন তাঁর সেনাপতি কাশেম খাঁকে। সঙ্গে দিলেন তাঁর প্রচুর অশ্বারোহী। পদাতিক। কামান। গোলাগুলি। কাশেম খাঁ এসে আক্রমণ করলে হিজলী।

তখন চোতের শেষ। বোশেখের শুরু। এ সময়টা দেবী ওলাওঠার খাস ইজারা। হিজলীতে মড়ক। জ্বরে মরছে। ওলাওঠায় মরছে। ইংরেজদের কাহিল অবস্থা। কিন্তু চার্নক আগবাড়িয়ে মোকাবিলা করতে গেলেন মুঘলদের। যুদ্ধশাস্ত্রে সেইটেই বিধেয়। এবং অবাক কাণ্ড, প্রথম আক্রমণে তিনিই জিতলেন! দখল করলেন দেড় হাজার মন চালের রসদ। নবাবের তোপখানা উড়িয়ে দিলেন। বসানো কামান-গুলোও নষ্ট হয়ে গেল। ছোটগুলো তো সরাসরি ইংরেজ জাহাজেই তুলে নিলেন।

কিন্তু এটা কতক্ষণ? তখনও মুঘলদের পাল্টা মার আরম্ভ হয়নি। মালেক কাশেম খাঁ সব তোড়জোড় করে যখন হিজলীর বুকেই ইংরেজদের চেপে ধরলেন। তাদের তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। অবশ্য তখন 'হিজলীর পানি' তার জোর প্রকোপ শুরু করেছে ইংরেজ লোক-লস্করের ওপরে। তাদের তখন মড়ক লেগেছে। বহুজনই কবরে চলে গেল। জ্বরে, পেট খারাপে। লড়বে কে? কাজেই চার্নক এখানকার নোঙর তুললেন। মুঘল সৈন্যরা ইংরেজ আস্তানা লুটপাট করল। বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। যাদের হাতে-কাছে পেলে তাদের দুর্দশার কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না!

চার্নক তো আবার জলের ছেলে জলে গিয়ে পড়লেন। যাবেন কোথা? সেই সুতানুটি। পথে পড়ল উলুবেড়িয়া। সেখানেই পলাতক ইংরেজ জাহাজ ভিড়ে পড়ল। জাহাজগুলো সব ভাঙাচোরা হয়েছিল। সেগুলো রিপু করা দরকার। মেরামতি দরকার। সেখানেই ডক বানালেন চার্নক। জাহাজের কাজ চলতে লাগল। কিন্তু চার্নকের বোধকরি মন পড়ে আছে সেই সুতানুটিতে। তাঁর একটু মন হলেই হয়েছিল আরকি। আজকের হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার কপালে কলকাতার সম্মান নাচত! কিন্তু চার্নক সেখানকার পাট গোটালেন। কেননা সেখানে ব্যবসা চলার সুবিধা হবে না বলেই তাঁর ধারণা। ব্যবসা করেই তো যেতে হবে ইংরেজদের। কাজেই যেখানে ব্যবসা জমবে না, সেখানে ইংরেজদের চলবে না। কাজেই হিজলী পরিত্যাগ করে ইংরেজরা এবারও সুতানুটিতে এসে পৌছালেন। ষোলশ' অষ্টআশির জানুয়ারী মাসনাগাদ।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। হিজলী পরিত্যাগের গল্পের ইংরেজী বর্ণনা অবশ্য একটু ভিন্ন। এই পরিচ্ছেদে একটু আগেই সরকারী কাগজ-পত্রের যে হিসেব দেওয়া হয়েছে, তার মোতাবেক ষোলশ' সাতাশীর জুনমাসে পচা-

গরমে হিজলীর লড়াই হয় ইংরেজদের সঙ্গে। এবং দিন আষ্টেক এই লড়াই চলার পর মুঘলদের সঙ্গে একটা সন্ধি হয়। এবং সন্ধি শর্তে ঢাকার রাজী হওয়া সাপেক্ষে তাদের তিনমাস শিবপুরের নীচে যাওয়া বন্ধ করে দেয় মুঘলরা। এই বছরের শেষেই খবর আসে যে সন্ধির শর্তে ঢাকা মঞ্জুর করেনি তবে ইংরেজদের সুতানুটি যাবার অনুমতি মিলেছে। হুগলী কুঠির অবস্থা সঙ্গীন। ইংরেজরা এই অবস্থায় সুতানুটি কুঠি বানাবার অনুমতি চায় এবং দ্বিতীয়বারের জন্য সুতানুটি গিয়ে আস্তানা তৈরি করে।

সে যাই হোক, এই সময়ে ঢাকায় নতুন নবাব এসে গেলেন। মীর মালিক হোসেন বা খাঁ জাহান বাহাদুর। চার্নক সাহেব শায়েস্তা খাঁর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে আবার সাজিয়ে গুজিয়ে বসবার কথা ভাবতে লাগলেন। হুগলীতে যেসব ব্যবসা চলত সেগুলি গুছিয়ে নিয়ে সুতানুটিতে আনবার আয়োজন করতে লাগলেন। ওদিকে ঢাকার নতুন নবাব মগদের হাত থেকে বাঁচাতে ইংরেজদের সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। ইংরেজরা দুর্গ তৈরি করার অনুমতি চেয়েছে। এমনি অবস্থায় ঝড়ের মত এসে পৌঁছালেন কাপ্তেন হীথ। বললেন, সদরের হুকুম; এখানে আমরা ব্যবসাই করব না। চল চট্টগ্রাম। আরাকান। সেখানেই আমরা নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র বসাব। এখানে নয়।

চার্নক আর কি করবেন। খাস কোম্পানীর হুকুম। প্যায়দাপাইক হাজির। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁর সাধের আসন গুটিয়ে নিয়ে জাহাজে উঠে বসলেন। পথে বালেশ্বরের কুঠিতেও তালাচাবি এঁটে সেখানের মালপত্র লোকলস্কর সব গুটিয়ে নিয়ে জাহাজ কিন্তু চলল মাদ্রাজ। চট্টগ্রামের স্বপ্ন এরই মধ্যে বাতাসে মিলিয়ে গেছে। একবার আরাকান রাজ, একবার মুঘলদের, একবার সাপের আর একবার বেদের মুখে চুমু খাওয়া তাদের মোটেই লাভজনক হয়নি। উভয়পক্ষই তাদের সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে এবং শেষে সব ফন্দিই তাদের ভেস্তে যায়। হীথের জাহাজ গিয়ে উঠে মাদ্রাজ। সেখানে তাদের দুর্গ। তাদের জবরদস্ত ঘাঁটি।

তারা মাদ্রাজে থাকতে থাকতেই স্বয়ং সম্রাট আরঙ্গজেবের সঙ্গে তাদের একটা মিটমাট হয়ে গেল। সার যশুয়া চাইল্ডের জঙ্গী নীতির বলি হল তাঁর ভাই। সার জন চাইল্ড বম্বে অবরোধ, পারস্য উপসাগরে মুঘল জাহাজ লুণ্ঠন প্রভৃতির চ্যাঙ্ড়ামি এক ধাক্কায় ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মুঘল সিংহের এক গর্জনেই ইংরেজ শৃগালের শিকারও একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। সার্ জন চাইল্ড সম্রাটের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে ক্ষমা চাইলেন। সম্রাট তাদের ক্ষমা করলেন। দেড়লক্ষ টাকা নগদ ক্ষতিপূরণ ও লুণ্ঠিত জাহাজগুলি প্রত্যার্পণের বিনিময়ে। আর সার্ জন চাইল্ডের চাকরি গেল। অবশ্য সেই হেনস্থার আগেই তাঁর এন্তেকাল হয়। এই ঘটনার

তারিখটা ষোলশ' নব্বই। ফেব্রুয়ারী। সুবে বাঙলার নবাব আবার তখন পাল্টে গেছেন। নতুন নবাব ইব্রাহিম খাঁ। ইনি ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। পড়াশুনা নিয়েই থাকতে ভালোবাসেন। স্বয়ং সম্রাটই যখন ইংরেজদের ব্যবসা করার লাইসেন্স দিয়েছেন তিনিই বা তাদের বাঙলায় ব্যবসা করার জন্য ডাকবেন না কেন? কা জই, চার্নকের কাছে লোক গেল এবং ষোলশ' নব্বই-এর তেরই জুলাই চার্নক আবার সুতানুটির অভিমুখে রওনা হলেন। চার্নকের চোখে আবার তার স্বপ্নের রাজ্য চকচক করে উঠল। চাঁদের যেন কোটাল লেগেছে, স্পন্দিত নদীজল। জ্যোৎস্নায় বালুচর যেন একটা কাঁচা হলুদ সোনার পাতা। পূর্ণিমা রাত্রির মত্ততায় চার্নকের মন উথাল-পাথাল। সুতানুটি। সুতানুটি। আমি আসছি, আমি আসছি। পথে অবশ্য— যাবার সময় যেমন, আসার পথেও তেমনি বালেশ্বর ঘুরে এলেন।

এই তৃতীয় বারে এসেই চার্নক জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুতানুটিতে কাটিয়েছিলেন। এবং এখানে থাকতে থাকতেও চার্নক তাঁর নিজস্ব একগুঁয়েমি ছাড়েননি, সেটা মাদ্রাজ থেকে লেখা জন কোম্পানীর সদর দপ্তরে চিঠি থেকে জানা যায়। ইব্রাহিম খাঁর আমলে ইংরেজরা দাবী করে যে বছরে তিন হাজার টাকা পেশকাশের বিনিময়ে তারা বিনাশুল্কে অবাধে বাণিজ্য করার অধিকার পেয়েছিল এবং নবাব তাদের হুগলীর মাইল দুই দূরে এক জায়গায় কুঠি তৈরি করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু চানক এমনি একবগ্‌গা মানুষ সেসব কথা কানেই নিলেন না। সেই সুতানুটি নিয়েই পড়েছিলেন। এখানে না ছিল কোম্পানীর না মুঘল সরকারের সম্মতি। তাছাড়া কোম্পানীর ভাষায় সুতানুটির কোন নিরাপত্তা নেই। তবু চার্নক অচল, অটল। কিন্তু কেন? জানা যায়, নিজের নিরাপত্তার জন্যে মাদ্রাজ সরকারকে না বলেকয়েই চার্নক একটা পর্তুগীজ যুদ্ধ জাহাজও কিনেছিলেন সুতানুটিতে থাকবার সময়। কিন্তু শত উপরোধ অনুরোধেও সুতানুটি ছাড়েননি।

কিন্তু তাও বা কেন? দেখা যাচ্ছে চার্নকের উপর কোম্পানীর অগাধ বিশ্বাস। তৃতীয়বার এখানে আসবার আগেই জনকোম্পানী সুতানুটিতে কুঠি তৈরি করার অনুমতি দিয়েছিল। তাদের যুক্তি ছিল, যখন চানক সুতানুটি পছন্দ করেন—'সিন্স হি লাইকস সুতানুটি সাচ ওয়েল উই আর কনটেণ্ট হি শুড বিল্ড এ ফ্যাক্টরী দেয়ার'- তখন আমরা আশ্বস্ত যে সেখানে একটা কুঠি তৈরি করা হোক—তবে যতটা সম্ভব কম খরচায়। কাশিমবাজার আর মালদার কুঠি দুটো আবার সজীব করে তোলার কথাও বলেন এই চিঠিতেই। হুগলীর বুকেও ছোটখাট একটা কুঠি যে বিবেচনা করা উচিত এই একই চিঠিতেই লেখা হয়।

তবে কেবল চার্নকের ওপর আস্থাই নয়। কোম্পানীর সদর দপ্তর মুঘল,

ভারতবর্ষের অস্থির দিকগুলির প্রেক্ষাপট ও বিবেচনা করে সুতানুটির ভৌগোলিক অবস্থানটা চুলচিরে দেখেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, যদি মুঘলরা তাঁদের সুতানুটিকে সুরক্ষিত করতে দেয় তাহলে সেখানে আমাদের জাহাজগুলো সোজা গিয়ে উঠবে এবং সমস্ত নদীপথটাই তাঁদের কামানের আওতায় গিযে পড়বে। তাহলে স্ট্রাটেজীর দিক দিয়ে খুব ভালো হবে। তার জন্যে কোম্পানী উপযুক্ত জায়গায় তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকার মত ঘুষ দিতে রাজী। বার বার মার খেযে, বম্বেতে ধাক্কা খেয়েই কোম্পানী সুতানুটির স্থানমাহাত্ম্য উপলব্ধি করে এবং চার্নকের একগুঁয়েমিতে সায় দেয় বোধহয়।

চার্নকের আমলে সুতানুটি পৌঁছাতে একশ বছর কেটে গেল প্রায়। সুরাটে যখন ইংরেজ পতাকা দিকচক্রবাল ভেদ করে ভেসে উঠেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর সূর্য তখন সবেমাত্র উঠেছে। আকাশে অরুণ আলোর বাণী। অরুণিমার আভায তার অভ্যর্থনা। সুতানুটিতে যখন পৌঁছান গেল, শতাব্দীর সূর্য তখন ঢলে পড়ছে। অস্তায়মান সূর্যের আলোয় তখনও পশ্চিমাকাশ লালে লাল। বেনের দলের হাতে তখনও রাজছত্র ওঠেনি বটে, তবে মনে মনে তারা তখনই তৈরি হচ্ছে। সুতানুটির বুকে তারা তখন ছোট জমিদারী পাতবার আযোজন করছে। সে গল্প বলার আগে চার্নকের আমলে কলকাতা বা সুতানুটির কতদূর কি শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল; কতটা হবার পরিকল্পনা ছিল সেটুকু এই অবকাশে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে তথ্য খুবই কম এবং সেই কারণেই বোধ করি বহু গালগল্প আমাদের কলকাতার ঝুলি ভর্তি করেছে। তবে সেসব খোসা বাদ দিয়ে চালের বহরটাও কম নয়। সুতানুটি ডায়ারি এণ্ড কনসালটেশন-এর রেকর্ডে রয়েছে চার্নক সুতানুটিতে চারটে হোটেল—ভিক্‌চুযালিং হাউস—খোলবার অনুমতি দিয়েছিলেন। লাইসেন্স ফি ছিল প্রতিটি হোটেলের জন্য প্রথম বছরে পঞ্চাশ টাকা। এবং বছর বছর সেটা 'রিনিউ' করতে হত। কলকাতার তখন আদ্যিকাল। সুতানুটির গুটি কেটে শহর কলকাতা প্রজাপতি হয়ে বেরোয়নি। তখন থেকেই দেখা যাচ্ছে শহর কলকাতার হোটেল ব্যবসা চালু। কোম্পানীর কাগজপত্রে যে হুকুমনামা রয়েছে তার বঙ্গানুবাদটা নীচে তুলে দেওয়া হল:

ষোলশ' নব্বই সালের চোদ্দই অক্টোবরের আলোচনা অনুযায়ী এই মত হুকুম দেওয়া হল যে সুতানুটিতে কেবলমাত্র চারটে হোটেল (ভিকচুয়ালিং হাউস) রাখবার অনুমতি দেওয়া হ'ল। যারা এইগুলি চালাবেন তাঁদের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে এবং যাঁদের জন্যে খোলা হ'ল তাদের সুবিধেমত চিত্তবিনোদনের জন্য বাড়ী এবং আবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং প্রত্যেক কোম্পানীকে প্রথম

বছরের জন্যে পঞ্চাশ টাকা করে দেবে এবং এই লাইসেন্স বছর বছর 'রিনিউ' করতে হবে।

কিন্তু হোটেলের ব্যবসা নিয়ে তো জন কোম্পানীর চলে না। তাকে ব্যবসা করতে হবে। এবং চার্নক মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছিলেন বাঙলাদেশ জুড়ে যে বিরাট ব্যবসার সাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন, তার কেন্দ্রস্থল হবে এই সুতানুটি। এই কলকাতা। এবং তাঁর ব্যবসাবাণিজ্য দরদাম নাকি করতেন এক বটতলায়। সেটা নাকি ছিল আজকের শিয়ালদা অঞ্চলে। বৌবাজারের রাস্তাটা সটান গিয়ে যেখানে শিয়ালদহে পড়েছে সেখানেই নাকি ছিল এজেন্ট জব চার্নকের কাছারি। সেখানেই নাকি তিনি গড়গড়া টানতেন নবাবী খুশ মেজাজে। আর বাজারের মাল কিনতেন। চালানী মাল ঠিক করতেন। বিলিতী মাল দেশী মহাজনদের বিক্রি করতেন। আর আলবোলা টানতেন।

কিন্তু থাকতেন কোথায় তিনি? কেউ কেউ বলেছেন ব্যারাকপুরে। অতটা দূরে নয়। যদিও কোম্পানীর যে বাড়ীঘর হয়েছিল আদ্যিকালের সুতানুটি সেখান থেকে দূরে। এ ব্যাপারে কোম্পানীর কাগজপত্রে যে তথ্য রয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে ষোলশ' চুরানব্বই সালের উনিশে ডিসেম্বর রাত্রি এগারোটায় অর্থাৎ এক শীত জর্জর পৌষপ্রখর নিশীথে সুতানুটির যে বাড়িটায় এজেন্ট জব চার্নক বাস করতেন সেটা জোর এক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায়। অগ্নি এক প্রলয়ঙ্কর রূপ নেয়। একে খড় ছাওয়া কুঁড়েঘর। তার ওপর গঙ্গার প্রমত্ত বাতাস। বাড়ীটা পুড়ে গেল। অবশ্য কোম্পানীর খাতায় আগুন লাগার কারণটাও রয়েছে। বাড়ীর কাছে পিয়নরা একটা আগুন জ্বেলেছিল। খুব সম্ভব আগুন পোয়াতে। সেকালে সুতানুটির চারদিকেই তো জলজঙ্গল। বর্ষায় যেমন অঝোর বৃষ্টি, রাস্তা চলা শক্ত। হাঁটু ভর্তি কাদা। খাল খন্দ। গ্রীষ্মে ধূ ধূ করছে রোদ। ধুলোয় ঝড় ওঠে, নিত্য নিরত। ঠিক তেমনি শীত। দোলাই কম্বল চাপিয়ে সারা সুতানুটি ঠকঠক করে কাঁপত। আর সেই হাড় কনকনে শীত থেকে নিস্তার পাবার জন্যেই বোধ করি সেই আগুন জ্বালা।

এজেন্ট সাহেবের ঘরে তখন থাকত এলিস সাহেব। সেই কাশিমবাজারের এলিস সাহেব। আগুন। আগুন। এলিস সাহেব চিৎকার করে বেরিয়ে এলেন। অনেক কিছু মালপত্র রয়েছে তাঁর। পিয়নরা প্রথমটা তো হতভম্ব। তারপরই সবাই মিলে লেগে পড়ল। এলিস সাহেবের জিনিসপত্র বাঁচাতে। বাঁচালও। এলিসের বেশীর ভাগ জিনিসই বেঁচে গেল সে যাত্রা।

শীতের এই অগ্নিকাণ্ডের পর গ্রীষ্মে আর এক প্রলয়ঙ্করী ক্ষ্যাপা আগুনের মাতামাতি। এরমধ্যে সুতানুটি বাজারেই একদিন আগুন লেগে গেল। একে গ্রীষ্মকাল।

সব খড়ের বাড়ী। শুকিয়ে একেবারে জতুগৃহ হয়ে আছে। পাশেই গঙ্গা। তার প্রমত্ত বাতাস। সারা বাজারটাই পুড়ে আঙরা হয়ে গেল। কোম্পানীর নাবিক আর সৈন্যদের সব জিনিসপত্র এই সঙ্গে পুড়ে ছারখার। ঘণ্টা দুইয়ের এই আগুনে সারা বাজারটাই ছাই হয়ে গেল।

এই দ্বিতীয় অগ্নিকাণ্ডের দিন দশেক পরে আটই এপ্রিলের এক খবরে জানা যাচ্ছে যে চার্নকের বাড়ী কোম্পানী বিক্রি করে দিলে। খবরটার স্বচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ নীচে দেওয়া হল :

চার্নকের বাড়ী বিক্রি

আটই এপ্রিল—আগে যে বাড়ীটাতে এজেন্ট চার্নক বাস করতেন এবং সম্প্রতি মিস্টার এলিসের যেটি নিবাস ছিল সেটি ছিল খড়ে ছাওয়া। এ দিন রাত্রে আকস্মিক এক অগ্নিকাণ্ডে সেটি পুড়ে যায়। জেনারেল কিপাব মিস্টার করমেল নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সেটি সারিয়ে ফেলা হোক এবং ছাদটা পাকা ইঁটের তৈরি করা হোক। কিন্তু খরচটা যা আশা করা গিয়েছিল তার বেশি—চারশত টাকারও কিছু বেশি পড়বে দেখে এবং ফ্যাক্টরী থেকে জায়গাটা বেশ দূরে থাকায় এবং সেই কারণে কোম্পানীর কর্মচারীদের পক্ষে অসুবিধাজনক হওয়ায় করমেলকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সেটি যেন নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়। সেইমত করা হ'ল এবং পাঁচশ পঁচাত্তর টাকায় বাড়ীটা বিক্রি হয়ে গেল।

অবশেষে বেনে কোম্পানীর কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নকের বাড়িটা নিলামে চড়িয়ে বিক্রি করে দিলে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, চার্নক ঠিক ফ্যাক্টরী সংলগ্ন জায়গায় থাকতেন না তবে ব্যারাকপুরের মত দূর জায়গায় যে তাঁর বাড়ী ছিল, এটা মনে হয় নিছক কল্পনা। তবে তাঁর বাড়ীটা যখন বিক্রি হয় তখন কলকাতার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তাঁর জামাই সার চার্লস আয়ার। জামাই হয়ে শ্বশুরের স্মৃতির প্রতি এতটা অবজ্ঞা বুঝি ইংরেজ জাতের পক্ষেই সম্ভব। টাকা-আনা-পাই ছাড়া তাদের হৃদয়ে আর বুঝি কারও স্থান নেই।

তবে চার্নক কিন্তু তাঁর উইলে তাঁর তিন মেয়েকে ভোলেননি। ভোলেননি তাঁর সরকার বদলী দাস আর দুই পুরাতন ভৃত্য দুর্লভ আর ঘনশ্যামকে। তাঁর বাঙালী ডাক্তারকেও কিছু টাকাকড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন।

তবে আয়ারও ভোলেনি তাঁর শশুরের স্বপ্ন। জানুয়ারী মাসে চার্নক মারা যান আর সে জায়গায় কাজ করতে থাকেন এলিস। এই সময় কোম্পানীর কাজকর্মে যথেষ্ট গাফিলতি দেখা যায়। আমরা আগেও দেখেছি এলিস কিছু কাজের লোক নন। কেবল চার্নকের পক্ষপুটেই, তিনি এতকাল করে খাচ্ছিলেন। কাজেই মাদ্রাজ থেকে

সার জন গোল্ডসবরো কমিশনার জেনারেল এবং কোম্পানীর উপনিবেশের চীফ গভর্নর হয়ে এলেন কলকাতায়। বারই আগষ্ট ষোলশ' তিরানব্বই। তিনি কলকাতার অব্যবস্থা দেখে তো খাপ্পা। তিনি শুধু এলিসকেই একহাত নিলেন না কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নককেও ছেড়ে কথা কইলেন না। এবং অবিলম্বে চানকের জামাই সার্ চার্লস আয়ারকে মাদ্রাজ থেকে ডেকে পাঠিয়ে কলকাতার মসনদে বসাবার হুকুম দিলেন। গোল্ডসবরোর জীবৎকালে অবশ্য এই হুকুম কার্যকর হয়নি, কেননা কলকাতার বুকে মাস দুয়েক কাটাতে না কাটাতে তিনি চোখ বুজলেন। তার মৃত্যুর মাস তিনেকের মধ্যে আয়ার এলেন কলকাতায়। জানুয়ারী পঁচিশ। ষোলশ' চুরানব্বই

এই আয়ারের আমলেই কলকাতায় দুর্গ রচনার অনুমতি পায় কোম্পানী আর এঁরই আমলেই কোম্পানী সাবর্ণ জমিদারের কাছ থেকে কলকাতা, সুতানুটি আর গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম কিনতে সক্ষম হয়। জানিনা, কতটা খাঁটি, তবু এই ক্রয় বিক্রয়ের একটা বাইনামা কোম্পানীর কাগজ পত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে। সেটা অবশ্য ইংরিজি অনুবাদ। অবশ্য সেই বাইনামাটা আলোচনা করার আগে গোল্ডসবরো সাহেব যে ভবিষ্যৎ ফোর্টউইলিয়মের ভিত্তিপত্তন করে গিয়েছিলেন, সে কাহিনীটা এবং যে রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায় ইংরেজরা কলকাতায় কুঠি স্থাপনের সুযোগ পেয়ে গেল, তার একটা হদিশ দেবার চেষ্টা করা যাক।

বাঙলাদেশে মাদ্রাজ বা বম্বের মতই যে একটা দুর্গ তৈরি করতে হবে, একথাটা প্রথম যিনি বারবার ঠেকে অনুভব করেন তার নাম উইলিয়ম হেজেস। সে ভদ্রলোক চার্নকের সঙ্গে লড়ায়ে হেরে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু চার্নককেও, ভাগ্যের পরিহাস, সেই পরাজিত ব্যক্তির সিদ্ধান্তই মানতে হয়। মানবার কারণ আর কিছুই নয়। নবাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে তো তিনিই নামেন প্রথম। এবং হেজেস যেটা শুধু ভেবেই গিয়েছিলেন, তাকে বাস্তবে রূপ দেবার দায়িত্ব বর্তায় তাঁরই প্রতিদ্বন্দ্বীর। চার্নক দুর্গ বানাবার জন্যে কিছুই করে যেতে পারেননি। তবে তার সম্ভাব্য জায়গাটা তিনিই নির্বাচন করে গিয়েছিলেন। এইখানেই তাঁর দূরদর্শিতা। শুধু এই কারণেই ভারতবর্ষে ইংরেজদের ইতিহাসে তার ঠাঁই প্রথম সারিতে রাখার দাবী রাখে।

ফোর্ট উইলিয়ামের যাহোক করে একটা পত্তন করে যান সার্ জন গোল্ডসবরো। তিনি কলকাতায় ছিলেন দিন আশী। এবং এমনি করিৎকর্মা পুরুষ ছিলেন তিনি, যে এরই মধ্যে এই কাজটি করে যান। আকস্মিক মারা যান গোল্ডসবরো। একত্রিশে অক্টোবর, ষোলশ' তিরানব্বই। তার ঠিক আগের দিন, কলকাতার ভাবী এজেন্ট সার্ চার্লস আয়ারকে তিনি একটা চিঠি লেখেন। সেটি দীর্ঘ। এটি আয়ারের একটি চিঠির জবাবে। আয়ার সত্তের তারিখে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সার্ জনের এক 'শীল'ও পাঠিয়েছিল: গোল্ডসবরো এতে খুশি হননি। কেননা নবাবের বা দেওয়ানের কাছে 'ইণ্টারলোপার'দের বিরুদ্ধে তাঁর যে চিঠি যাবে তাতে শীলমোহর করার কোন শীলই তো আর আয়ারের কাছে থাকল না, তাহলে সে চিঠি যাবে কি করে? তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি তো এই পাঠান 'শীল'-টা ফেরৎ পাঠান যাবে কি? তাছাড়া গোল্ডসবরো চেয়েছিলেন শীলমোহরটা তামার কি দস্তার করতে।

মনে হয় কলকাতার বাড়ীঘর তৈরি নিয়ে আয়ারের সঙ্গে তাঁর কোনরকম মতানৈক্য হয়েছিল, তাই তিনি আয়ারকে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিলেন এই চিঠিতে। গোল্ডসবরো লিখছেন: তিনি যখন এখানে এলেন, দেখলেন কলকাতার এজেণ্ট বা কাউন্সিল, ভাগ্য অনুকূল হ'লে কোথায় যে ফ্যাক্টরী বানাবে তার কোনরকম পরিকল্পনাই করেনি, চিহ্নিত করেনি কোন জায়গা। তাদের এই অবহেলার জন্যে কেউই জানেনা, কোথায় বা কেমন করে ঘর তুলতে

হবে এবং সেই কারণে যার যেখানে খুশি সেইখানেই খোঁড়াখুঁড়ি করে বাড়ী বানাতে লেগে পড়েছে—এমন কি যে জায়গাটা ফ্যাক্টরী তৈরির জন্যে অত্যন্ত আদর্শ জায়গা হবে সেখানেও গর্ত করেছে, পুকুর কেটে ফেলেছে। এর ফলে কোম্পানীকে সেই সবগুলো খরচ করে ভরাট করতে হবে এবং এর জন্যে যত সময় লাগবে ততই ক্ষতি হবে। সেই কারণে তিনি আদেশ দিয়েছেন একটা জায়গা কাদার দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখতে যাতে এই নির্মাণের পরোযানা যখন পাওয়া যাবে তখন কাজটা দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। এছাড়াও সাহেব ওয়ালস সাহেবের যে বাড়ীটা কোম্পানীর জন্যে কেনা হয়েছিল তাকে দোতলা করে সেখানে কোম্পানীর কাগজপত্র যেসব এখানে-সেখানে রাখা আছে সেগুলি একজায়গায় জড়ো করে রাখবার পরামর্শ দিলেন তিনি।

এই যে কাদার দেওয়াল ঘেরা জায়গা যেটা গোল্ডসবরো রূপ দিয়ে গিয়েছিলেন—এইটাই সেই আগামীকালের ফোর্ট উইলিয়ম। এবং যে পরোয়ানার জন্যে তিনি অপেক্ষা করছিলেন, কয়েক বছরের মধ্যেই সেইটেও কপালগুণে তাঁরা পেয়ে গেলেন।

তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, গোল্ডসবরো কখনও বলেননি দুর্গ। তিনি বললেন কুঠি। মাটির কুঠি। দুর্গ নয়। তিনি কাজ সুরু করে গেলেন তাই বলে। আয়ারও পেছোলেন না। তিনিও চালিয়ে যেতে লাগলেন। নবাবের অনুমতি ছাড়া ইঁট গাঁথবার হুকুম নেই। তবে সুতানুটি তো জলা, জঙ্গল। আশশ্যাওড়া, কন্টিকারী, বাঁশ, বেতবনের রাজ্য। দিনে শেয়াল ডাকে। রাতে বাঘ হালুম। ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কোথাও সূর্যের আলো ঢোকে না. এই তো কলকাতা। নবাবের নজর থেকে অনেক দূরে। আর নবাব তখন আলিমরদান ইব্রাহিম খাঁ। পড়ুয়া নবাব। বই পড়ে। কাব্য পড়ে। রাজকার্য খুঁটিনাটি দেখবার সময় কোথা?

এমন সময় এক ঘটনা। চেতুয়ার জমিদার শোভা সিংহ বর্ধমান আক্রমণ করে সেখানকার রাজা কৃষ্ণরামকে হত্যা করে বর্ধমান দখল করল। শোভা সিংহ প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার। আর তারই সঙ্গী উড়িষ্যার আফগান—প্রধান নাককাটা রহিম খাঁ। তাঁরা উভয়েই বিদ্রোহের রক্ত-ধ্বজা উড়িয়ে দিলেন। কৃষ্ণরাম রায় খুবই ধনাঢ্য রাজা। তাঁর কোষাগারে ঐশ্বর্যের অন্ত নেই। এবং তিনি দিল্লীর বশম্বদ। কাজেই তাঁরই বিরুদ্ধে যৌথ আক্রমণ। এ সম্বন্ধে ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্ এর সাক্ষ্য কিন্তু ভিন্ন প্রকার। এই গ্রন্থে বলা হচ্ছে বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম চেতুয়ার রাজা শোভা সিংহের রাজধানী লুণ্ঠন করেন। চেতুয়া বর্ধমানের সন্নিকটে। ক্রুদ্ধ

শোভা সিংহ বর্ধমানবাসীদের অপরিজ্ঞাত এক পথ ধরে, বিশাল অরণ্যের মধ্য দিয়ে গিয়ে দামোদর পার হয়ে বর্ধমান শহরের সামনে তাঁর তাঁবু ফেলেন। এবং কয়েক দিনের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াবে কৃষ্ণরাম রায়কে শুধু পরাজিত নয় হত্যা করেন। যুবরাজ জগত রায় ঢাকায় পালালেন। খাস দেওয়ানের আশ্রয়ে।

এদিকে শোভা সিংহের আনন্দ দেখে কে? তার সেনারা মধুবনে বানর সেনার মত যেখানে যা পারল লুঠপাঠ করতে লাগল। এবং এগোতে এগোতে একসময় হুগলীর দুর্গ এবং গঙ্গারতীরে চৌকী দখল করে বসল। অর্থাৎ শোভা সিংহের কাছে কর না গুণে কোন নৌকাই গঙ্গা পেরোতে পারবে না। এ সম্বন্ধে-মাদ্রাজ থেকে জন কোম্পানীর সদর দপ্তরকে লেখা তিরিশে সেপ্টেম্বর ষোলশ' ছিয়ানব্বই এর একটা চিঠিতে বলা হয়েছে: মুঘলরা ডাচেদের সাহায্যে হুগলী দুর্গ পুনরুদ্ধার করেছে। কিন্তু বাঙলা থেকে সদ্য—আসা নাবিকদের মুখে শোনা যাচ্ছে, বিদ্রোহীরা আবার হুগলী দুর্গ দখল করে নিয়েছে এবং তাদের দমাতে পারে সম্রাটের এমন কোন সৈন্যবাহিনীর এখনও দেখা নেই। এবং এই বিদ্রোহীরা কতটা এগোবে বা তারা যা' অধিকার করেছে তা কতদিন তাদের তাঁবে রাখবে তাও অনিশ্চিত। কোম্পানীর এখন যা মাথাব্যথা সেটা হচ্ছে কলকাতা কুঠির নিরাপত্তা আর ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া। কলকাতা কাউন্সিল এবং এজেন্ট এ সম্বন্ধে যে নীতি গ্রহণ করেছে, এই অবস্থায় সেইটিই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। তারা উভয়পক্ষের সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। যাতে বিদ্রোহী শোভা সিংহ তাদের সন্দেহ না করে, আর নবাবও তাদের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ জানায়। মাদ্রাজ কাউন্সিল কোর্ট অব ডিরেক্টরদের অবশ্য জানাচ্ছেন যে এই সাপের মুখে এবং বেদের মুখে একই সঙ্গে চুমু খাওয়ার নীতি বেশিদিন চালিয়ে যাওয়া শক্ত। তাই কোম্পানী কলকাতা কাউন্সিলকে এ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন যে যদি কোনদলে তাদের যেতেই হয় তাহলে তারা যেন মুঘলদের সঙ্গেই ভেড়ে কেননা শেষবেশ তারা বিদ্রোহ-দমনে সক্ষম হবেই এবং যারা তাদের বিরুদ্ধতা করেছে তাদের তৈরি কোন সুরক্ষা ব্যবস্থা বা ঘাঁটি নিশ্চয়ই মুঘলরা ভেঙে দেবে; নয় তো জোর করে সেগুলি বজায় রাখতে হবে। বিপরীতপক্ষে 'হোয়ারএ্যাজ দোজ হু হ্যাড এ্যাসোসিয়েটেড দি গভর্ণমেণ্ট মে প্রোবাবলি বি কনাইভড, এ্যাট ইফ নট টু গ্রেট এ্যাণ্ড টু মাচ লাইক এ কোর্ট'—যারা সরকারকে সাহায্য করেছে, তাদের তৈরি বাড়ীঘর—যদি খুব একটা বড়সড় না হয় বা দুর্গের মত না হয়—তাহলে সেটা হয়ত মেনে নিতেও পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোম্পানীর এই দূরদর্শিতা কাজে দিয়েছিল। এই ডামাডোলের বাজারে তারা কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিল। একটি একটি করে ইটের পর ইট

সাজিয়ে তারা তাদের সাধের দুর্গের পত্তন করে যাচ্ছিল। ষোলশ' সাতানব্বই সালের পয়লা জানুয়ারির সুতানুটি ডায়ারির পাতায় দেখা যাচ্ছে যে তারা মাদ্রাজে দশটা কামান চেয়ে পাঠিয়ে একটা চিঠি লিখেছে—'উই আর এনগেজড ইন ফরটিফাইং আওয়ারসেলভস এণ্ড ওয়ান্টেড প্রপার গানস ফর দি পয়েন্টস ডিজায়ারিং দে উড স্পেয়ার টেন ফর দ্যাট ইউজ'—আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে ব্যাপৃত এবং বিভিন্ন দিকের জন্য উপযুক্ত কামান দরকার এবং তারা যেন এই কাজের জন্য দশটা কামান দেন

বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা যে বলছেন কলকাতা কাউন্সিলকে নবাব ইব্রাহিম খাঁ কেল্লা তৈরির অনুমতি দিয়েছিল, হয়ত প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবেই, তারও কোন ভিত্তি নেই। আসলে ডামাডোলের বাজারে চতুর কোম্পানী কাজ গুছিয়ে নিয়েছিল, যদিও শোভা সিংহের বিদ্রোহের জন্য তাদেরও যে আক্রান্ত হওয়ার ভয় ছিল না, তা নয়। কেল্লায় তারা কি পরিমাণ লোকজন গোলন্দাজ বাড়িয়ে ছিল সেটাও বোঝা যায় সুতানুটি ডায়েরির পাতায় পাতায়। এ বছরই বারই এপ্রিল করমেল সাহেবকে কাউন্সিল নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল এই দুর্গ বানাবার কাজে। ঐ বছরই সাতাশে মের খবরে রয়েছে—কুঁড়েঘর বা খড়োঘর আর নয়, কেননা দুর্গের মধ্যে খড়ে ছাওয়া ঘর রাখা বিপজ্জনক। দুর্গের ভেতর তো তখন প্রচুর বারুদ—'দে আর আর গ্রেট কোয়ান্টিটিস অফ পাউডার'। কোম্পানীর দুর্গে আরক্ষা ব্যবস্থার তোড়জোড় কি বিপুল সেটা আরও ভালোভাবে বোঝা যায় যখন দেখা যায়, শোভা সিংহের বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেলে এবং রহিম সিংহ গত হলে কোম্পানী কমসেকম পঞ্চাশ জনের মত গোলন্দাজকে বরখাস্ত করছে।

কিন্তু যে কথা হচ্ছিল। শোভা সিংহ তাঁর কামনার আগুনে পুড়ে খাক্ হয়ে গেলেন। কামার্ত শোভা সিংহ শুনেছিলেন—বর্ধমান রাজকন্যার অপরূপ রূপের কথা। তার টানা চোখের কালো কাজল, তার কোঁকড়ানো কালো কেশের ঢল, তার ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি—তার পটুয়ার আঁকা রসবতীর মত রূপ—সবই তাঁকে চুম্বকের মত টানছিল। শোভা সিংহ প্রস্তাব পাঠালেন এবং বিচিত্র এই নারীর মন পিতৃহন্তা শোভা সিংহের অঙ্কশায়িনী হতে রাজী হয়ে গেলেন বর্ধমান রাজদুহিতা।

কিন্তু কে জানত সবই ছলনাময়ীর রহস্য। কে জানত শোভা সিংহ সেদিন চলেছেন প্রিয়মিলনে নয়, তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নের দিকে পায়ে পায়ে। কে জানত সেই রাজকন্যার কটিদেশে লুকান রয়েছে তীক্ষ্ণধার ছোরা। আর কামার্ত পুরুষ শোভা সিংহ যেমনি তাঁকে আলিঙ্গনের জন্যে হাত বাড়িয়েছেন অমনি সেই রাজকুমারীর ললিত বাহুর কঙ্কন সশব্দে বেজে উঠবে আর সাপের মত ছোরাটা

জেগে উঠে তাঁকে দংশন করবে। আমূল গ্রোথিত হয়ে যাবে তাঁর বক্ষদেশে। আর চেতুয়ার জমিদার চিরকালের জন্য লুটিয়ে পড়বে সেই সিংহিনী রাজ ললনার রক্তিম পদতলে। তাই হ'ল, শোভা সিংহের বিদ্রোহ এক নিমেষে ফুরিয়ে গেল।

কিন্তু কি হল তার দোস্ত আফগান সর্দার নাককাটা রহিম খাঁর ? সেই উড়িষ্যার নবাবের ? ইব্রাহিম খাঁ যদিও পড়ুয়া লোক, ফার্সী কাব্যে মশগুল থাকতে ভালোবাসেন, তার ছেলে মহম্মদ খলিল, পোষাকী নাম জবরদস্ত খাঁ, সেরকম নন। তিনি বেশ জবরদস্ত লড়াই চালিয়ে রহিম খাঁকে মুর্শিদাবাদ বা উত্তর বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বর্ধমান অঞ্চলেই আটকে রেখে চলেছিলেন। কিন্তু এই পড়ুয়া দেওয়ানকে দিয়ে সম্রাট আরঙ্গজেবের চলছিল না। তাছাড়া নাতি আজিমুশ্বানকে কাছেপিঠে রাখতেও তিনি ভরসা পাচ্ছিলেন না। বাংলাদেশে আফগান বিদ্রোহ দমন করতে তাঁকেই তিনি দিল্লী থেকে পাঠালেন। সপুত্র ইব্রাহিম খাঁ একদিন তল্পী গোটালেন !

জবরদস্ত খাঁ চলে যেতেই রহিম খাঁ আবার তোড়জোড় করতে লাগলেন। নবোদ্যমে সৈন্য সংগ্রহ করে আবার আক্রমণ করার আয়োজন করলেন। মেদিনীপুরের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একসময় হুগলীর ওপর হামলা করলেন এবং গঙ্গা পেরিয়ে নদীয়ার বুক থেকে হাতাটা মুঠোটা যা পেলেন লুণ্ঠন করে শেষবেশ বর্ধমানের কাছে শিবির ফেললেন।

মুঘল সৈন্যও তখন বর্ধমানের অপর দিকে। আজিমুশ্বান ঠাকুর্দাকে হাড়ে হাড়ে চিনতেন। তিনি জানতেন—আফগান বিদ্রোহ দমন করতে না পারলে সম্রাট তাকে রেয়াত দেবেন না। সুবে বাঙলায় এসে তিনি বাঙলা বিহারের জমিদারদের নিয়ে একটা মিটিং করে ফেললেন; তাদের সাহায্য চাইলেন আফগান দমনে। এদিকে রহিম খাঁও পাকা লোক। রাজনীতির অন্ধিসন্ধি সব জানতেন তিনি। আজিমুশ্বানকে বলে পাঠালেন, মিছিমিছি লড়াই করছেন কেন হুঁজুর। আসুন আমাদের দলে যোগ দিন। "আমরা আপনাকে স্বাধীন বাঙলার নবাব বলে স্বীকৃতি দেব। আপনার বুড়ো ভাম ঠাকুর্দার তাঁবে আর কতকাল থাকবেন ? আজিমুশ্বানই বা কম যাবে কেন ? রহিম খাঁকে একটা রূপোর শেকল আর একটা তলোয়ার পাঠালেন তিনি। বললেন, কোনটে নেবে ঠিক করো বাপু। নাককাটা রহিম খাঁ আফগান বাছা। সদর্পে বললেন, তলোয়ারই নিলাম। আরকি তাহলে ? একটা জোর লড়াই অ শ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। আজিমুশ্বান দামোদর পেরিয়ে এগিয়ে এসে বর্ধমানে শিবির ফেললেন। এবং রহিম খাঁকে আর বাড়তে না দিয়ে তাকে আক্রমণ করলেন সরাসরি। রহিম খাঁর তখন পাঁচ হাজার অশ্বারোহী। মুঘলদেরও প্রায় তাই।

কিন্তু এবারে এই বিদ্যুৎগতি আক্রমণের তোড়ে আফগান সৈন্য বানের মুখে কুটোর মত ভেসে গেল। নাককাটা রহিম খাঁর গলা কেটে ফেললে এক আরবি সেনাপতি চন্দ্রকোনার কাছে। আফগান বিদ্রোহও শেষ হয়ে গেল। আজিমুখানের এই আনন্দ মুহূর্তেরও সুযোগ নিলে ইংরেজরা যেমন তারা অশান্তিরও সুযোগ নিয়েছিল। বিদ্রোহ যখন চলছিল তখন লণ্ডন থেকে মাদ্রাজে একটা চিঠি আসে। পয়লা সেপ্টেম্বর। ষোলশ' সাতানব্বই সেটার বঙ্গানুবাদ এই রকম।

"এত দূর থেকে আপনাদের যে বিশেষ কি নির্দেশ দেব জানি না বিশেষ করে এই বিদ্রোহের সম্বন্ধে তথ্য এবং সত্য যখন গোলমেলে। কিন্তু এটা আমাদের অতীব প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় যে এই অবকাশে গত কয়েক বছর ধরে আমরা যা পাবার প্রয়াস পাচ্ছি, তা সেই-বাঙলাদেশের সুরক্ষিত উপনিবেশটিকে-উন্নত করে তোলা। —'বাট থিঙ্ক ইট হাইলি নেসেসারী টু ইমপ্রুভ দি প্রেজেণ্ট অপর-টুনিটি টু গেট এ ফরটিফায়াড সেটলমেণ্ট ইন বেঙ্গল হুইচ উই হ্যাভ বিন ফর মেনি ইয়ারস পাস্ট বিন এন্ডেভারইং টু অবটেন।'

সে যাই হোক, ইব্রাহিম খাঁর অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে তাঁর ছেলে জবরদস্ত-খাঁর সঙ্গে ইংরেজরা একটা গোপন সম্বন্ধ গড়ে তুলেছিল। সেটা বিদ্রোহের সময় বা তারও কিছু আগে থেকেই। তখন ইংরেজদের দুটো সমস্যা—একটা ইণ্টারলোপার-দের দৌরাত্ম্য অপরটা যেমন করে হোক কলকাতায় একটা জাঁদরেল আরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। দুটোর ব্যাপারেই তারা ঢাকার নবাব এবং জবরদস্ত খাঁ—উভয়কেই পীড়াপীড়ি করছিল। টাকাকড়ি, নজরানা কিছু কম দেয়নি জবরদস্তকে। বালেশ্বরের ফৌজদার তাদের সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছিল—মানে আর কি, কিছু বেশি টাকাকড়ি চেয়েছিল। এবং ইণ্টারলোপারদের কোনরকম বাছবিচার না করে তাদের সঙ্গেও ভাব ভালোবাসা করে কিছু আদায় করে নিয়েছিল—এ সেই পুরনো কলই আরকি। ইংরেজরা ঢাকার নবাবের কাছ থেকে এই' ইণ্টারলোপার-দের কোনরকম প্রশ্রয় না দেবার জন্যে বালেশ্বরের ফৌজদারের কাছে একটা আদেশ সংগ্রহ করেছিল। বালেশ্বরের ফৌজদার সেই অর্ডার হাতে করে নিলেন, কিন্তু কিছুই করলেন না। মাঝখান থেকে সব বণিকদের কাছ থেকেই এর ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে লাগলেন।

এদিকে জবরদস্ত একসময়ে বদলি হয়ে গেলেন অযোধ্যায়। সুবেদার হয়ে। বাবা নবাব ইব্রাহিম খাঁও দিল্লী চললেন। ইংরেজরা ধরলে নতুন নবাব আজিমুখান-কে—একেবারে রাজমহলে। এ ব্যাপারে একটা লোকের কথা বলতেই হয়। তিনি আদ্যিকালের কলকাতার বিদেশী বাসিন্দা-এক আর্মেনিয়ান বণিক, নাম খোজা

ইসরায়েল সারহাদ। ইনি বিখ্যাত আর্মেনিয়ান সওদাগর খাজা ফানুস খালান্তরের ভাইপো। শোনা যায় ফররুকশীয়ারের সঙ্গে এর ব্যক্তিগত আলাপ ছিল এবং সেই কারণেই বোধহয় সারমান দৌত্যে তিনিও ছিলেন। এখনও তিনি থাকলেন কোম্পানীর সঙ্গে আজিমুখানের বর্ধমান শিবিরে। তার অর্থ এই নয় কলকাতার জমিদারী কেনার জন্যে ইংরেজরা এই প্রথম দরবার আরম্ভ করলে। বা সারহাদ এই বারই দৌত্য সুরু করলো মোটেই নয়। তারা যখন সুযোগ পেয়েছে, তখনই এই প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। সেকালের কোম্পানীর নথিপত্র ঘাঁটলে দেখা যায়, ঢাকার নবাবের কাছে কার্য উদ্ধার করার জন্যে তারা সব সময়েই একজন নয় একজনকে বসিয়ে রেখেছে এবং তাদের ঢাকার কুঠিতে যত না মসলিন কেনা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হয়েছে, নবাবের কৃপাকণা একটু দাক্ষিণ্য কেনার চেষ্টা। তার জন্যে ঢাকার দরবার ঘিরে যে মুঘল 'লবি' ছিল, এই কুঠি থেকে তাদের সবসময়েই তৈলাক্ত করে রাখবার আয়োজন করা হ'ত। আর ইংরেজরা ব্যবসাদার তো ভালো, কাজেই কোন না কোন প্রভাবশালী ধনাঢ্য সওদাগর—ভাসমল প্রভৃতিকে তারা নিজেদের কাজে লাগাত।

যাই হোক সারহাদকে ইংরেজরা প্রথম পাঠায় জবরদস্ত খাঁর দরবারে। জবরদস্ত খাঁকে তাদের প্রতি নেকনজর দেবার জন্যে তাঁরা তাঁর দরবারে তাদের নিজেদের লোকেদের সঙ্গে এই খোজা সরহাদকেও পাঠালে। কোম্পানীর কাগজে রয়েছে খোজা সাহেব নিজে থেকেই কলকাতা কাউন্সিলের কাছে ইংরেজদের হয়ে দৌত্য চালাবার প্রস্তাব রাখেন। তারিখটা—চব্বিশে জুন, ষোলশ' সাতানব্বই। তখন ইণ্টারলোপারদের জ্বালায় কোম্পানী জ্বলেপুড়ে মরছে। কাজেই কোম্পানী তাদের বিরুদ্ধে নবাব সরকারকে সক্রিয় হতে অনুরোধ জানায়। এবং শুধু হাত মুখে ওঠে না বলে কোম্পানী নবাব পুত্রের কাছে তাদের 'আর্জদস্ত' পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে হাজার টাকার মূল্যের ব্রডক্লথ, অর্থাৎ বড মাপের গরমের কাপড প্রভৃতি সামগ্রী পাঠালে।

খোজা সারহাদ একদা জবরদস্ত খাঁর দরবার থেকেই হুগলী আর ফৌজদারের কাছে 'ইণ্টার-লোপারদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করার হুকুম আনেন বলে প্রকাশ। এই হুকুম নিয়ে অ্যামক সাহেব বালেশ্বরে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সাহু-তুল্লা তার যে কড মর্যাদা দেয়নি, ইণ্টারলোপারেরা যে তাদের কাজকারবার যথাপূর্ব চালিয়ে যেতে থাকে, সে খবর অ্যাডমস সাহেব বালেশ্বর থেকেই সখেদে জানিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতায়।

এদিকে ইণ্টারলোপাররাও বসে ছিল না। তাদের দুজন পেটি আর ক্যাচ-পোল-সোজা জবরদস্ত খাঁর দরবারে গিয়ে নগদ ছয় হাজার টাকা করকরে গুনে দিয়ে

কাজ হাঁসিল করে নিয়েছিল। কোম্পানী খোজা সারহাদকে আবার পাঠালে জবরদস্ত-খাঁর দরবারে এবং কড়ার করলে যদি তাদের কার্যোদ্ধার হয় তারা হাজার বিশেক টাকা পর্যন্ত দিতে পেছপা নয়।

এ সব কথাবার্তাও চলছে, আর জনকোম্পানী তাদের কলকাতা কুঠির প্রতিরক্ষা বাড়িয়েই চলেছে। ইটের পর ইট গেঁথে। এতদিন ধরে কলকাতা দুর্গের একটা রসুইশালা ছিল। সেটা ছিল সেকালের অন্য সব বাড়ীর মতই কুঁড়েঘর। টিনের ছাওয়া। বারকয়েক অবশ্য পুড়েও গিয়েছিল। সেকালে গ্রীষ্মকালে খড়ো বাড়ীতে আগুন লাগা তো কিছু নতুন নয়। জন কোম্পানী করলে কি, এই অবকাশে সেটাকে একেবারে দুর্গের বা কুঠির যাই বলা যাক না কেন ভেতরে নিয়ে এল এবং বাসগৃহের একেবারে শেষে দু'একটা নতুন কুঠুরি সমেত এই রসুইখানাও ইট দিয়ে তৈরি করে ফেললে।

এদিকে ইব্রাহিম খাঁর চাকরি গেল। সপুত্র তিনিও বাঙলাদেশের নাট্যশালা থেকে বিদায় নিলেন। এলেন আজিমুশ্বান। এবং বর্ধমানের কাছে লড়ায়ে নাক-কাটা রহিমখাঁর গলা কাটা গেল। সে গল্পত আগেই বলা হয়েছে। এখন দেশে একটু শান্তি আসতেই আজিমুশ্বানের দরবারে ওয়ালস্, স্ট্যানলী আর খোজা সারহাদ তিনমূর্তি গিয়ে হাজির হলেন। তাদের উদ্দেশ্য তিনটি—প্রথমটা কলকাতার জমি-দারীটা কিনে নেওয়া; দ্বিতীয় রাজমহলে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তিগুলি ফিরে পাওয়া যাযনি তার ক্ষতিপূরণ এবং বিনা শুল্কে ব্যবসা।

এটা ষোলশ' আটানব্বই এর মার্চ মাসের কথা। মাঝে একদিন ঝড় উঠে মুঘল দরবারকে বাংলাদেশের কালবৈশাখীর সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে গেছে। ইংরেজ-দের কুঠিরও বেশ ক্ষতি হয়েছে। তাদের উপহার দেবার জন্য সংগৃহীত পাঁচ ছয় থান বড বহরের গরমের কাপড় 'ব্রডক্লথ' জলে ভিজে নষ্টত হয়েছে। আজিমুশ্বানকে দেওয়া একটা বন্দুক যখন তিনি গুলি ছুঁড়তে গেলেন জলে ভিজে থাকার জন্যই বোধহয় ফেটে গেল। তিনি বললেন, আর একটা পাঠাতে। এদিকে পাটনা থেকে রালফ্ শেলডন জানালেন নতুন নবাব হুকুম দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু রাজমহলের ফৌজদার তো সে হুকুম মানতেই চায় না।

চব্বিশে মার্চ ওয়ালস সাহেব চিঠি পাঠালে যে সম্রাট পৌত্র খুশি হলে হবে কি, তার আমলারা সব খুশি না হলে কার্যোদ্ধার করা শক্ত। এবং খোজা সারহাদ এবং তিনি উভয়েরই ধারণা হাজার পাঁচ-ছয়েক টাকা ব্যয় করতে পারলে মোটামুটি কাজ গুছান যেতে পারে। বলা বাহুল্য কোম্পানী সে টাকা পাঠিয়ে দেয় এবং পয়লা এপ্রিলের একটা চিঠিতে ওয়ালস সাহেব জানালেন, কেল্লা ফতে! 'হি

হ্যাড এ প্রমিশ অফ কামিং দি টাউনস অফ ডিহি কলকাতা, গোবিন্দপুর এবং সুতানুটি'। খোজা সারহাদও একটা চিঠিতে এই খবরের সত্যতা জানালেন। বর্ধমানের মুঘল আমলার অবশ্য আরও কিছু পিস্তল, সাদা বড বহরের গরম কাপড, ঘড়ি, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি চেয়েছেন। মাঝে হুগলীর ফৌজদারও কিছু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছেন। জমিদারদের তরফেও কিছু পাওনার বায়না ধরা হয়েছিল কিন্তু এগারই জুলাই, জন কোম্পানী ঐ গ্রাম তিনখানার জমিদারীসত্ব পেয়ে যায়।

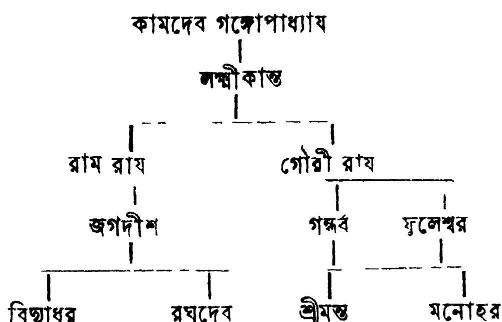
শেষ বেশ জনকোম্পানী নগদ দেড়হাজার টাকা দিয়ে এই তিনটে গ্রামের জমিদারীসত্ব কেনে। এর বায়নানামাটা এইরকম ; কাজীর শীলমোহর এবং জমিদারদের সই সহ ডিহি কলকাতা প্রভৃতি গ্রামের কেনার দলিলের নকল। অনুবাদটি মোটামুটি নিম্নরূপ :

ইসলামের প্রতি অনুগত আমরা আমাদের নাম ও বংশ নিম্নরূপ ঘোষণা করিতেছি যে মনোহর দাট তস্য পিতা বাসদেও তস্য পিতা রঘু, রামচাঁদ তস্য পিতা বিদ্যাধর, তস্য পিতা জগদীশ, রামভদ্র তস্যপিতা রামদেও তস্যপিতা কেশু, প্রাণ তস্য পিতা কালেশ্বর তস্য পিতা গৌরী এবং মনোহর সিং তস্য পিতা গন্ধর্ব তস্য পিতা, আইনানুগভাবে এবং আইন প্রদত্ত সকল অধিকার উপভোগ করতঃ শপথ করিয়া বলিতেছি এবং ইহা ঘোষণা করিতেছি যে আমরা যৌথভাবে পরগণা আমিরাবাদের চৌহদ্দীর অন্তর্ভুক্ত ডিহি কলিকাতা এবং সুতানুটি ও পরগণা পাইকান এবং কলকাতার অন্তর্ভুক্ত গোবিন্দপুর ইংরাজ কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া এ সত্য ও আইনানুগ এই দলিল লিখিয়া দিলাম। তাঁহারা ইহাদের বাবদ খাজনা, অচাষী জমি, পুষ্করিনী সকল, বন, মাছ ধরিবার সত্বাদি, এবং বনবাদাড় এবং বাসকারী কারু কর্মীদের নিকট পাওনা ও তাহাদের সংলগ্ন জমি জিরেত, স্বাভাবিক, ব্যবহৃত বা দুর্নামগ্রস্ত সীমানা সরহদ সহ যাহা নাকি বিক্রয়কাল অবধি আমাদের স্বত্বভুক্ত ছিল এবং যাহা ভোগদখল করিতাম তাহা সকলই তাহাদের বর্তাইল এবং বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার একহাজার এবং তিনশত টাকার বিনিময়ে এই সকল সত্ব ও তাহার আনুষঙ্গিক স্বত্বাবলী বাহ্য এবং আন্তর লিখিয়া দিলাম, এবং এই ক্রয়মূল্য সেই ক্রেতার নিকট হইতে আমাদের হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং আমরা এই ক্রীত দ্রব্য তাঁহাদের হস্তান্তরিত করিলাম এবং এই ক্রয় হইতে সকল মিথ্যা দাবীদাওয়া বাতিল করিয়া দিলাম এবং তাহার জন্য একমাত্র জামিন রহিলাম এবং যদি কোন কারণে এই জমির সত্বদর্শিয়ে ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি কোন দাবীদাওয়া জানায় তাহা হইলে সে দাবীর জবাব আমরা দিব এবং অন্য হইতে

না আমরা না আমাদের কোন প্রতিনিধি পুরোপুরি এবং সর্বাত্মকভাবে কোনরূপ-ভাবেই এই চৌহদ্দীর ওপর কোনরূপ দাবী জানা'তে পারিবে না এবং এইধরনের মামলা মোকদ্দমার খরচ খরচা ইংরেজ কোম্পানীর উপর বর্তাইবে না। এই সকল কারণে আমরা ইহা লিখন করাইলাম এবং এই সকল বাক্য উল্লেখ করিলাম যাহাতে প্রয়োজনবোধে এগুলি সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে হাজির করা যায়। লিখিতং ইতি পহলা জামাদী মাসের পনরই হিজরী বর্ষ ১১১০; সম্রাটের গৌরব ও সমৃদ্ধির রাজত্ব-কালের চুয়াল্লিশতম বর্ষ।

ইংরাজি হিসাবে তারিখটা খ্রীষ্টাব্দ ষোলশ' আঠানব্বই, নয়ই নভেম্বর। এই বায়নানামাটি আবিষ্কারের কৃতিত্ব উইলিয়ম খাবভিন সাহেবের। ফার্সী থেকে এটা ইংরাজী অনুবাদও করেন তিনি। এবং এটি বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সংরক্ষিত। (অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি (Mss) নং ২৪,০৩৯ নং৩৯) দেখা যাচ্ছে, অক্টোবর মাসের একত্রিশ তারিখের এক আলোচনায় কোম্পানী দেড হাজার টাকা নবলগ দিতে রাজী হচ্ছে কলকাতার আদি জমিদারদের। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল তারা তেরশ টাকায় কার্যোদ্ধার করল। এর জন্যে অবশ্য আজিমুশ্বানের বর্ধমান দরবারে তাদের সেলামী লেগেছিল হাজার স্বর্ণমুদ্রা বা প্রায় ষোলহাজার মুদ্রা।

জমিদাররা মাত্র এই তিনটে গামের জামদারী বিক্রয় করে দিলেন এটা কেমন যেন বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে হতে পারে কিন্তু শরিয়তী আইনে জমি ব্যক্তিগত মালিকানা তো কারও ছিল না। জমির মালিকতো স্বয়ং সম্রাট। সবই খালসা সম্পত্তি। কাজেই স্বয়ং সম্রাট প্রতিনিধি যখন রাজী তখন ঠেকায় কে? তবু বোধ হয় যাতে এ নিয়ে কোনরকম ঝুট ঝামেলা না হয়, তাই ইংরেজরা কিছু টাকা-কড়ি দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করেছিলেন। কেননা এই বছর পয়লা আগষ্ট কাজীর শীলমোহর করা নিশানের তিনটি নকল কলকাতায় ইংরেজ কুঠিতে পৌঁছে গিয়েছিল। কাজেই মনোহর, রামচাঁদ, রামভদ্র, প্রাণ এবং মনোহর সেদিন যা হস্তান্তরিত করে-ছিল ইংরেজদের সেটা খুব সম্ভব এই তিনটে গ্রামের রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের সত্ব। প্রখ্যাত মুঘল সেনাপতি মানসিংহের গুরু কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশধর এরা। আর কিছুই নয়। অর্থাৎ জমিদারী স্বত্ব। এ'সম্বন্ধে ভিন্নমত হচ্ছে এটা এদেরই জমিদারী, পেয়েছিলেন মান সিংহের গুরুদক্ষিণা হিসাবে এবং এই বিক্রেতারা তাঁরাই। এঁরা কামদেবের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের অধস্তন শাখা প্রশাখারা। এ কে রায়ের এবং উইলসন সাহেবের হিসেব মিলিয়ে এই মজুমদার বংশের বংশতালিকাটা দাঁড়ায় এইরকম:



কবিরামের দিগ্বিজয় প্রকাশে' এই কামদেবের পুত্রের মান সিংহের দেওয়া জায়গীর পাওয়ার কথা আছে। উইলসন সাহেব এই কাহিনী মানেননি। মানসিংহ যে বাংলাদেশে ভুঁইয়া প্রতাপাদিত্যকে পর্যুদস্ত করার সময়ে এখানে এসেছিলেন—সে কথা তো ভারতচন্দ্রের 'মান সিংহ' কাব্যের বিষয়বস্তু। সেখানে এই দাক্ষিণ্য পেয়েছিলেন ভবানন্দ মজুমদার। এবং এই বংশেই তো নদীয়ার বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' ও 'অন্নদামঙ্গলের' ঐতিহাসিক দিকটার গল্পরূপ। কাজেই এই কাহিনীকে ভ্রান্ত বলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে কি? কামদেবের ছেলে লক্ষ্মীকান্তই বড়িশার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের আদিপুরুষ। পরগণার জমিদারী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা উপাধি পেল চৌধুরী। লক্ষ্মীকান্তর একছেলে গৌরী বা গৌরহরি হ'ল মজুমদার। দমদমের কাছে বিরাটিতে তাঁর বাস। সঙ্গে পৌত্র শ্রীমন্ত। এই শ্রীমন্তের পুত্র কেশব মুর্শিদকুলির সময়ে তাঁর রাজস্ব আদায় করতেন। বাপ পিতামহের মতন এবং সেকাজে খুবই নাম করেন। তবে তিনি তাঁর পৈতৃক জমিদারী বড়িশায় ফিরে যান। ফিরে যান সেই পুরনো টাইটেল চৌধুরীতে। তাদের গোত্র সাবর্ণ—তাই থেকে পরিবারের নামই হয়ে গেল সাবর্ণ চৌধুরী। এঁদেরই বড় তরফের কর্তা বিদ্যাধর চৌধুরী। তাঁরই প্রতিষ্ঠা করা কালিঘাটের মা কালী। এদের কুলদেবতা শ্যামরায়। যাঁর দোলে লালদিঘীর জল নাকি লাল হয়ে যেত।

কিন্তু এসব কতটা ইতিহাস কতটা নয় তা আরও পরীক্ষার অপেক্ষা রাখে। তবে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে, সেটা এই যে তিনি কলকাতা আর সুতানুটি পরগণা আমিনাবাদের মধ্যে পড়ে। কবিরামের দিগ্বিজয় প্রকাশে যেসব পরগণা লক্ষ্মীকান্তকে দেন মান সিংহ, তার মধ্যে এটা নেই। তবে?

এসব সমস্যা যাই থাকুক না কেন, জন কোম্পানী তার কলকাতা কুঠি বেশ দিনকে দিন শুক্লপক্ষের শশীকলার মত দিব্যি বাড়িয়ে চলেছে। পরের বছর নয়ই

ফেব্রুয়ারী তারা একটা ইঁটের তৈরি বারুদঘর বানিয়ে ফেলবার প্রস্তাব নিলে। গত দুই বছর কোম্পানীর গুদাম ঘরের মাথায় এই বারুদ থাকত এবং সেই কারণে তার পাশেই একটা ভালো ঘর কোম্পানী ব্যবহার করতে পারত না। তাছাড়াও, জলে ভিজে বারুদ নষ্ট হয়ে যেত। কাজেই কোম্পানীর কলকাতা কুঠি বা দুর্গ যাই বলা হোক না কেন, তার একদম গায়েই দক্ষিণপূর্ব কোণে এই নতুন বারুদঘর তৈরি হয়। সিরাজদ্দৌল্লা কলকাতা আক্রমণের সময়েও এটা এইখানেই ছিল। একেবারে ইংরেজদের তোপের আশ্রয়ে।

এই সময়ে হুগলী নদীর নাব্যতা নিয়ে এক নতুন আইন হয়। তখন জাহাজ বন্দরে ঢুকলেই সবাই জাহাজের পাথরগুলো নদীগর্ভে নিক্ষেপ করত। বলা বাহুল্য এই রকম করে নদীর নাব্যতা নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। কোম্পানী আইন করলে পাথর নদীতে ফেলা চলবে না। তীরে এনে বালুবেলায় ফেলবে পাথর। তারপর যার যা দরকার তারা নিয়ে যাবে। বিশেষ করে বর্ষার সময় কাদা ভেঙে রাস্তা চলাচল তো দুষ্কর। সে সময় এগুলি দিয়ে রাস্তা ভরাট করা যেতে পারে। কোম্পানী সেক্রেটারীকে জানিয়ে দিল যে এ ব্যাপারে কোন অন্যথা চলবে না এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্যে এই আদেশ ঘাটে, বাটে মাঠে টাঙিয়ে দেওয়া হল।

ইংরেজ কুঠির উত্তরে রাস্তার ওপর একটা পুকুর পড়ল। যাতায়াতে অসুবিধা হত কোম্পানীর। সেটাও কোম্পানী বুজিয়ে ফেলে, বলা বাহুল্য, 'দৈর্ঘ্য প্রস্থে কুঠিটি সমান হবে দড' এই কারণে। কুঠির পাকা গাঁথনীর জন্যে যশোর থেকে হাজারখানেক শাল কাঠ আর শ্রীপর (১) থেকে শ' দুই তিনেক কাঠ আনিয়ে নেয়। আরও একটা মস্ত কাজ করে কোম্পানী। কুঠির পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের চৌহদ্দী ঠিক করে একটা করে ইট আর কাদার পিরামিড বানিয়ে ফেলে। এবং তার ওপর চুনের পলেস্তারা করে দেয়। পশ্চিমে ত সুরধনী গঙ্গা। সেখানে আর কোন সীমানা নির্দেশক দরকার হয়নি।

কিন্তু দুর্গের নাম ফোর্ট উইলিঅম হল কবে? ইংরেজরা কেতাদুরুস্ত জাত। খাস সদর দপ্তর থেকে কোনরকম নির্দেশ না এলে, এ কাজ স্থানীয় কুঠির কর্তারা অবশ্যই করেনি। বিশে ডিসেম্বর ষোলশ' নিরানব্বই-এ লণ্ডনের কোর্ট অব ডিরেক্টরস থেকে যে চিঠি আসে তাতেই এই দুর্গের নাম দেওয়া হয় ফোর্ট উইলিআম—ইংলণ্ডেশ্বর উইলিয়ম থার্ডের নামানুসারে। এই সঙ্গে আরও একটা কাজ করে কোম্পানী। বাংলাকে এক প্রেসিডেন্সির মর্যাদা দেয় এবং জব চার্নকের জামাই সার চার্লস আয়ার যিনি নাইট হয় লাভ করে সার উপাধি পেয়েছেন—তাঁকে এই প্রেসিডেন্সির প্রেসিডেণ্ট এবং গভর্নর পদে নিযুক্ত করে।

জন বিয়ার্ড তখন কলকাতা কুঠির বড় কর্তা। এই খবরটা অবশ্যই তাঁর ভালো লাগেনি। তবু তাকে সেই চিঠিতে খুবই তোয়াজ করে কোম্পানী। বলে যে তার সঙ্গে কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের যে যোগাযোগ আছে, তা যথাপূর্ব চালু থাকবে। এবং কোম্পানী তার বর্তমান মাহিনা দুশো পাউণ্ড এবং বছরে একশ' পাউণ্ড 'গ্রাচুইটি'—সবই দিতে থাকবে।

এসব কথা ছাড়াও লাখ কথার এক কথা সদর দপ্তর সেই কুঠিটাকে 'ফরটিফায়েড' শক্তিশালী করে তোলার জন্যে চাপ দিতে থাকে। জন কোম্পানীর বড়কর্তাদের ধারণা 'মুর'দের এত ভয় খাবার কিছু নেই। বরঞ্চ সামনেই মস্তবড় একটা অনিশ্চয়তা আসছে। সে সময় একটা শক্তিশালী দুর্গ খুবই কাজে দেবে। কাজেই উঠে পড়ে লেগে দুর্গটা মজবুত করে ফেল। নান্যপন্থাঃ। করেও ছিল। অবশ্য সার্ চার্লস আয়ার বিশেষ করেননি। করবেন কি করে? তিনি তো মাস কয়েক থাকার পর তাড়াহুড়ো করে বিদায় নিলেন এদেশ থেকে। আর সে কাজটা বর্তাল সেই জন বিয়ার্ডের ওপর।

জন বিয়ার্ড এই বাঙলাদেশের জলহাওয়ায় মানুষ। সেই কবে যে দেশ ছেড়ে এদেশে এসেছিলেন, মনেই পড়ে না। ঘুরে ঘুরে এই কলকাতা। চার্নকের মত রগচটা নন। আয়ারের মত করিৎকর্মা নন। সব কিছুই ধীরে সুস্থে এগোন। কলকাতা ফোর্ট উইলিআম তৈরির কাজও এগোতে লাগল তবে যতটা দ্রুত লণ্ডন থেকে চাওয়া হয়েছিল, ততটা দুদ্দাড় করে নয়।

এরই মধ্যে অবশ্য সতেরশ' দু' সালের ছয়ই অক্টোবর আসন্ন শীতের এক প্রসন্ন প্রভাতে ফোর্ট সেণ্ট জর্জে যেমন পতাকা উত্তোলন করা তেমনি ব্যাণ্ড বাজিয়ে সমারোহে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে পতাকা উত্তোলন করলেন জজ বিয়ার্ড। সে খবর কোম্পানীকে জানিয়ে বিয়ার্ড তার বাধ্য অথচ স্থির গলায় বললে, যদিও আমাদের আরক্ষা ব্যবস্থা ঠিক যতটা হওয়া উচিত ততটা নয়, তবু আমরা আমাদের রক্ষা করতে পারব। রক্ষা করতে পারব হুজুরদের সম্পত্তি যে কোন আকস্মিক আক্রমণের হাত থেকে।

কিন্তু দিন যেতে না যেতে নতুন একটা সমস্যার উদ্ভব হয়ে কোম্পানীর এই কাজে বাগড়া পড়ে গেল। খাস লণ্ডনেই এক নতুন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৈরি হয়ে গেল। শুধু হল তাই নয়, উইলিঅম দি থার্ড তাদের নতুন সনদ দিলেন। সেই তারা সার্ উইলিয়ম নরিশকে দূত পাঠালে খোদ সম্রাট আরঙ্গজেবের দরবারে। ঠিক সার্ টমাসরোর মত। কিন্তু তখন সব পাল্টে গেছে। সার্ টমাসরো যখন আসেন তখন দিল্লীর মসনদে জাহাঙ্গীর—আকবরের আদরের

দুলাল। খুশমেজাজী দিলখোলা ভদ্রলোক। আর এখন ক্রুর এক রাজনীতিজ্ঞ। শ্যেনদৃষ্টি। মুখে অবিশ্বাসের হাসি খেলা করে যায়। তার বরফের মত সাদা কপালে মাঝে মাঝে কি ভেবে বলীরেখা ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যেন মানুষের মন চিরে চিরে দেখে।

নরিস ও তেমন কালের লোক নন বোধ করি। বাদশাকে মোটেই কায়দা করতে পারলেন না। ফরমানতো পেলেনই না উপরন্তু কয়েকদিন কয়েদ খাটলেন। শুধুহাতে ভগ্ন মনোরথ এই রাষ্ট্রদূতকে দেশে ফিরতে হল। কিন্তু পৌঁছাতে পারলেন না। ফেরার পথে দুরারোগ্য আমাশায় সেণ্ট হেলেনায় দেহ রাখলেন।

এই প্রসঙ্গে লণ্ডনের ব্যাপারটা বিশদ করে বলে নেওয়া যেতে পারে। পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তিমকাল। রাণী এ্যান মারা গেছে। উইলিয়ম দি থার্ড একাই রাজ্য শাসন করে চলেছেন। তখন তাঁর জ্ঞাতবৈরী ফরাসীদের সঙ্গে তুমুল ও দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চলেছে। রাজকোষে স্বভাবতঃই টাকার খাঁকতি! কে মেটাবে, না সেকালের ইংলণ্ডের কামধেনু—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। প্রাচ্যে ব্যবসা করে তাদের তখন খুবই ভালো অবস্থা। বললে, টাকা চাও দিচ্ছি। সাতলক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু একটা কাজ করে দাও। পার্লামেণ্টে ভারতের বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারটা পাকা করে দাও নতুন করে। এই সময়ে একদল ছোটখাট ব্যবসায়ী মিলে উপরপড়া হয়ে বললে, তারা বিশ লক্ষ পাউণ্ড ধার দেবে। সুদ শতকরা আট। তাদের প্রাচ্যে বাণিজ্যের সনদ দেওয়া হোক। জন কোম্পানীর তখন বাড়বাড়ন্ত। কাজেই অনেকেই তাদের ঈর্ষা করত। কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট অনেক ধন বিলোলেন। ঘুষ দিলেন। কিন্তু এই ঈর্ষা নষ্ট করতে পারলে না। তাদের মনোপলিটা চলে গেল। উইলিঅম থার্ড এই নতুন কোম্পানীকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার দিয়ে সনদে সই করে দিলেন—নতুন কোম্পানী, নতুন নামকরণ। ইংলিশ কোম্পানী ট্রেডিং টু দি ইষ্ট ইণ্ডিজ। পাঁচই সেপ্টেম্বর। যোলশ' আটানব্বই। পুরনো কোম্পানীরও নতুন নাম হল লণ্ডন কোম্পানী। তাকে একেবারে বঞ্চিত করা হল না। কিঞ্চিৎ দেওয়া হল। তিন বছরের জন্য তাদের কাজকারবার করতে দেওয়া হল।

নতুন কোম্পানী অবশ্য লণ্ডন কোম্পানীকে বলেছিল মিলেমিশে ব্যবসা করার। কিন্তু পুরনো কোম্পানী তখন রাগে গরগর করছে। পাত্তাই দিলে না নতুন কোম্পানীকে। নতুন কোম্পানী তখন শুধু দূত পাঠালে না দিল্লীতে, আর একটা কাজ করলে। সার্ এডওয়ার্ড লিটলটনকে—ইনি পুরনো কোম্পানীর একদা কর্মচারী—প্রেসিডেণ্ট করে তিনজনের এক বোর্ড করে পাঠালে বাঙলাদেশে। এঁকে

কোম্পানী তাদের কলকাতা কুঠিতে বা কেল্লায় থাকতে দেয়নি। তবে কলকাতায় থাকতে দিয়েছিল। কেল্লার বাইরে। এঁর সঙ্গে কলকাতা কাউন্সিলের বড়কর্তা জন বিয়ার্ডের জোর লেগে গিয়েছিল। লিটলটন দাবী করলেন কোম্পানীর হয়ে দস্তক দেবার অধিকার একমাত্র তাঁর। বিয়ার্ড রেগে গিয়ে বললে, কলকাতা তাঁদের কেনা সম্পত্তি। সেখানে যারা থাকবে তারা যেন লিটলটনকে কোনরকম পাত্তা না দেয়।

কিন্তু এসব ঝামেলা মিটে গেল। মিটে গেল অন্য কারণে। দাক্ষিণাত্যে তখন সম্রাট ঔরঙ্গজেব। এই সময়ে সুরাট থেকে হজ্বযাত্রীদের ওপর বোম্বেটেদের পরপর কয়েকটা হামলা হল। নতুন কোম্পানী বলে ওরা করেছে হুজুর। পুরনো বলে ওরা। সম্রাট বললেন, দুই ব্যাটাকেই বাঁধো। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর। সারা ভারতবর্ষে যেখানে যত কুঠি আছে সব বাজেয়াপ্ত।

পরোয়ানা গেল কুঠিতে কুঠিতে। পুরনো কোম্পানী পাকাপোক্ত। তারা বেশীর ভাগ মাল কলকাতায় এনে জমা করেছিল। কাজেই নতুন কোম্পানীর ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল। হাজার হাজার টাকার মাল তাদের এক ধাক্কায় ফৌত। এবং এই ঝড়ের দিনেই দুটো কোম্পানী এক হয়ে গেল। হল য়ুনাইটেড কাউন্সিল।

করলে বটে, কিন্তু তার আগেই সব এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। মুঘল আমলারা এই মওকায় দুহাতে ঘুষ লুটতে লাগল। সম্রাটের প্রথমটা ধারণা হল সাদা কুত্তাদের এও ফাঁকি দেবার এক ফন্দি।

অনেক কাকুতিমিনতি অনেক লোকজন ধরে অবশ্য সম্রাটের মন ভিজল। নিষেধাজ্ঞা তিনি তুলে নিলেন। সুদূর দিল্লী থেকে সুবেবাঙলায় সে খবর আসতে বা সে আদেশ মানাতে অনেক দেরী হল শুধু নয়, বাঙলার নবাব আজিমুশ্বান বললে, টাকা দাও তবে যৌথ কোম্পানীকে মানব। দাও টাকা ঘুষ বা পেশকানা। এদিকে হুগলীর শুল্কও তিনি বাড়িয়ে দিলেন-মুসলমান সওদাগরের জন্যে শতকরা আড়াই টাকা ক্রীশ্চানদের জন্যে শতকরা সাড়ে তিন টাকা আর হিন্দুদের জন্য শতকরা পাঁচ টাকা।

এছাড়াও হুগলীবন্দরে কয়েকটা জিনিসের একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার নিজেদের হাতে নিলেন। সেগুলো কমদামে কিনে অনেক চড়া দরে বিক্রি করতে লাগলেন।

এদিকে কিন্তু সকলের আগেকার শহর কলকাতা, ডিহি কলকাতা, সুতানুটি আর গোবিন্দপুরের বনজঙ্গল, শাল, বাঁশ, হোগলা বনের অন্ধকারে কোম্পানী তার সাধের দুর্গ সাধ্যমত বাড়িয়ে চলেছিল, বানিয়ে চলেছিল। রোম যেমন একদিনে

হয়নি, কলকাতার দুর্গও হয়নি এক আধ বছরে। দিনে দিনে, তিলে তিলে, গড়ে উঠেছে এই ইংরেজদের তিলোত্তমা। বিয়াড সাহেবের আমলেই এই দুর্গের পশ্চিমের দুটো দুর্গ প্রাকার আর নদীর ধারের দেওয়ালের অনেকটা তৈরি হয়ে যায়। বিয়ার্ডের পর এণ্টনী ওয়েল্ডডেন, জন রাসেল এবং হেজেসের ভাইপো রবার্ট হেজেস এই তিনজনের আমলে গড়টা মেটামুটি তৈরি হয়ে যায়। সতেরশ' ষোল সতের নাগাদ।

ইংরেজদের কলকাতার গড়ের কথা চিন্তা করতে গেলে ভাবতে হবে সেই অনেকের কথা আজকের যে স্ট্রাণ্ডরোড, যার ওপর দিয়ে এই সেদিনও ঘরঘর করে ট্রাম চলত, এখনও ট্যাক্সি, বাস, লরী, টেম্পো চলে, অফিসের সময় হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ চলাচল করে সেটা পুন্য-তোয় ভাগীরথীর গর্ভে এখন যেখানে পূর্ব রেলের সদর দপ্তর-বুকিং-অফিস সেখানেই ছিল সেই পুরানো পাড়ের উত্তর পূর্ব দেওযাল যেটা সাদামাটা গভর্নর বিযার্ড সাহেব সেটা সতেরশ' একসাল নাগাদ গড়ে ফেলেছিলেন। এই গড়ের যে হৃদপিণ্ড অর্থাৎ মধ্যিখানে যে কুঠি বল কুঠি, গভর্নরের বাসগৃহ বল বাসগৃহ, সেটা তৈরি স্থরু হয় পরের বছর। কিন্তু শেষ হতে লাগে বছর ছয়েক। সতেরোশ, নাগাদ। রোটেশন গভর্নমেণ্ট তখন পুরোদমে চলছে। আর যেই সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দেহান্ত হল দুর্বোর উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম দুটো প্রকারই দ্রুত গেঁথে ফেলে কোম্পানী। নদীর ধারের দেওয়াল সতেরশ দশের ফেব্রুয়ারী মাসে তৈরী করা স্থরু হয়। এও সাঙ্গ হতে লাগে বছর দুই। একেবারে কামান বসানর ঘাটি সমেত।

দুর্গের কুঠিয়ালদের জন্যে একটা চার্চ তৈরি হয়ে যায় আগেই। ঠিক বি বা দী বাগের উত্তর পশ্চিম কোণে। ঠিক কেল্লার সদর দরজার সামনেই। সতেরশ নয়। পাঁচই জুন। এই সময়েই লালদিঘীটা আরও গভীর করে সেখানে কেল্লার জন্যে মাছের চাষ স্থরু হয়। এবং চারদিকে বাগানে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় সাহেব মেয়েদের বৈকালী ভ্রমণপর্ব শুরু হয়।

তবে কলকাতাও যেমন থেমে নেই, তেমনি থেমে ছিল না কেল্লার সংযোজন, পরিবর্তন, পরিমার্জন। আজকে দুটো ঘরা। কাল দুটা গুদাম, কাল রসুইশাল. বছরের পর বছর একটা না একটা যোগ বিয়োগ হতেই থাকল। এবং এক সময় কলকাতার প্রাণ কেন্দ্র স্থতানুটি থেকে সরে গিয়ে কলকাতায় চলে গেল। কেল্লার নামে চিঠি চলতে লাগল। চলতে লাগল 'কালিকটের' কাছাকাছি নাম কলকার মান। আর স্থতানুটি শুধু খাতায়-কলমে জন কোম্পানীর টাকার থলি ভরার. কাজে হতে থাকল!

এতো গেল তিনটি গ্রাম কেনার কাহিনী। এইবার শুনুন ইংরেজদের আরও আটত্রিশটি গ্রাম কেনার গল্প। তিনটে গ্রাম দিয়েছিল বাবা বর্ধমান থেকে নিশান, জারি করে। আর আটত্রিশটি গ্রাম দিল ছেলে-খাস দিল্লীতে বসে। ফরমান দিয়ে এই আটত্রিশটি গাঁয়ের নাম এই উপলক্ষে একবার আবৃত্তি করে নেওয়া যাক—শালকে, কাসুন্দে, ব্যাটরা, দক্ষিণপাইকপাড়া, হোগলকুড়ে, দক্ষিণবাড়ী, রামকৃষ্ণপুর, (বলা-বাহুল্য এরা আজকের কলকাতার সীমানার বাইরে হাওড়ায়, গঙ্গার পশ্চিমকূলে,)—চিৎপুর, উল্টাডিঙি, গোবরা, ইণ্টালী, হগানী, কাঁকুড়গাছি, শুঁড়ো, বাহির শুঁড়ো, ধলন্দা, তালতলা, সাপগাছি, কলিঙ্গা, জলা কলিঙ্গা, বেলগাছিয়া, সিমলা, আর্কুলি, বাঘমারী, গোঁদলপাড়া, কুলিয়া, ট্যাংরা, শিয়ালদহ, বির্জ্জি (তলা ?), তোপসে, চৌরঙ্গী, চৌবাঘা, মির্জাপুর, শেখপাড়া, মাকন্দা ও কামারপাড়া। আধুনিক হাওড়া কলকাতার গায়ে এই পুরানো গ্রামগুলির নাম দেখে আজকের কলকাতাবাসীরা হয়ত চমৎকৃত হবেন।

কিন্তু এই আটত্রিশটা গাঁযে, ইংরেজরা ফাররুকশীয়ের কাছে আরও কিছু চেয়ে-ছিল। চেয়েছিল, কলকাতা কুঠির শীলমোহরে করা 'দস্তক' বা ছাড়পত্র দেখালে, কোন মুঘল আমলা, কোন ছলেই তাদের নৌকা আটকাতে পারবে না এবং কোম্পানীর কাছে ঋণ করে পলাতক কোন লোক মুঘল সরকারের আশ্রয় চাইলেও পাবে না, ইংরেজরাও তেমনি মুঘল সরকারের কাছে ঋণগ্রস্ত বা দোষী সাব্যস্ত কোনো ব্যক্তিকে আশ্রয় দেবে না। আরও একটা বাঞ্ছা ছিল তাদের সম্রাট সকাশে। রাজমহলে ইংরেজদের ট্যাঁকশাল ছিল। হুগলীতেও তারা ট্যাকশালের আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু তাদের ব্যবসা তখন রমারম: অবস্থা। তারা বললে, নতুন ট্যাঁকশাল না হয়, মুর্শিদাবাদের ট্যাঁকশালে তাদের প্রয়োজন বোধে সপ্তাহে তিনদিন কোম্পানীর টাকা তৈরি হবে। মোটা-মুটি এই হচ্ছে কলকাতা কুঠির ভিক্ষা।

মেয়েটির নাম অ্যানা। ছেলেটির নাম উইলিঅম। মেয়েটি করে ঘর গৃহস্থের কাজ। ছেলেটি পড়ে ডাক্তারি। গ্লাসগো য়ুনিভার্সিটি। মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে রাজনীতি করে। রাজা তৃতীয় উইলিঅমের বিরুদ্ধে কোনরকম ষড়যন্ত্রের আভাস দেখলেই সরব প্রতিবাদ তোলে। মাঝে মাঝে প্রতিবাদপত্র 'প্যাম্ফলেট'ও লেখে। আর পড়ন্ত বৈকালে অ্যানার হাত ধরে ক্লাইড নদীর তীরে বসে আলতো বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ-এর ওঠানামা দেখে। স্কটল্যাণ্ডের আকাশে সূর্যাস্তের রঙ আগুন ধরিয়ে দেয়। নদীর জলে তার ছবি পড়ে। আভাস লাগে। তার ঢেউ-এ লাগে রক্তের ছিটে। মনে হয় কুচি কুচি হীরা-মুক্তা পোখরাজের রাশি তালে তালে দোল খাচ্ছে। অনবরত ক্লান্তিহীন। সেই রঙের ছিটে লাগে উইলিঅমের মুখে। অ্যানার আননে। তাদের বিহ্বলমুহূর্ত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। আনমনা ক্লাইডের জল চঞ্চল হয়। কলতান তুলে বয়ে যায়। সেই কলধ্বনির সঙ্গে স্বর মিলিয়ে উইলিঅম এক সময়ে বলে, তোমাকে আমি চাই অ্যানা। অ্যানার সলজ্জ চোখে, তার ব্রীড়ানত মুখে সেই আবেদনের উত্তর লেখা থাকে। কথার দরকার হয় না। সময় কাটতে থাকে। এক সময় আকাশের রঙ মিলিয়ে যায় আসন্ন সন্ধ্যার আঁধারে। আর ক্লাইডের তীরে সেই তরুণ-তরুণীর মুখও কেমন যেন ম্লান হয়ে যায়। তাদের মনে পড়ে, যা তাদের সাধ তা তো সাধ্য নয়।

—না অ্যানা, টাকা আমি উপায় করব। 'আই উইল মেক দি ক্রাউন এ পাউণ্ড।' বড়লোক হব আমি। নিগূঢ় ব্যথায় ছটফট করতে করতে এক সময়ে প্রায় চিৎকার করে ওঠে উইলিঅম। নির্জন নদীতট সেই দামাল যৌবনের আর্ত-নাদকে যেন ভেঙচি কেটে প্রতিধ্বনি করে ওঠে। আকাশে কয়েকটা শীতের বালি-হাঁস পাখসাট দিয়ে চলে যায়। আর তার হতাশভরা ডাগর চোখজোড়া নিয়ে অ্যানা তাকিয়ে থাকে। অস্থির উইলিঅম এক সময় বলে, না এবারে আমি ঠিক করে ফেলেছি। সেটলড। অ্যানা বলে কি? ফিসফিস করে কানে কানে বলার মত গলায় বলে সেই তরুণ ডাক্তারটি—আমি ইণ্ডিয়া যাব। ইস্ট ইণ্ডিজ। জন কোম্পানীতে আমি চাকরীর চেষ্টা করছি অ্যানা।

—জন কোম্পানী। ইণ্ডিয়া। বিড়বিড় করে আপন মনেই যেন বলে সেই অষ্টাদশী তরুণী, সে তো অনেক দূরের পথ উইলিঅম। অনেক অনেক দূর।

—তা হোক অ্যানা। আমি যাব। সোনার দেশ, মশলার দেশ ইণ্ডিয়া—সেখানে দারুচিনি বনের গন্ধ। সেখান থেকে আমি বড়লোক হয়ে আসব অ্যানা। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো।

—অ্যানা উইলিঅমের জন্যে অপেক্ষা করেছিল কিনা, গন্থময় ইতিহাস সেই তরল কাহিনী নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধেই উত্তরকালের জন্যে সযত্নে তুলে রাখার দরকার মনে করেনি। তবে উইলিঅমের মনে অ্যানার নাম তার প্রেরণা, তার জীবনের শেষ দিনটা পর্যন্ত কখনও মোছেনি, কখনও হারিয়ে যায়নি, ইতিহাস সেটুকু বলতে ভোলে নি।

কিন্তু এ সব ত অনেক পরের কথা। বারই নভেম্বর। 'সতেরশ' নয়। লণ্ডনের লিভেন হল স্ট্রীটের মোড়ের দোতালা বাড়ীর ক্যাস কাউন্টার থেকে সাত পাউণ্ডের অগ্রিম বিলে সই করে সেই উদ্ধত তরুণটি সেদিন দ্বিপ্রহরে বেরিয়ে এল রৌদ্রকরোজ্জ্বল রাজপথে, সেই ডাক্তারের নাম উইলিঅম হ্যামিল্টন। কয় দিনের মধ্যে সে শেরবোর্ণ জাহাজটা ছাড়বে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে, তারই যাত্রীদের শারীরিক তত্ত্বাবধানের দায়দায়িত্ব তার। তার পকেটে গোঁজা জন কোম্পানীর নিযোগপত্রে অন্তত তাই লেখা ছিল। আর যেটা লেখা ছিল না, সেটা তার তরুণ মনের উত্তাপ-ভরা আকাঙ্খা—ভারতবর্ষে সে অনেক টাকা রোজগার করবে। পাবে অনেক অর্থ, প্রতিপত্তি। আর তার অ্যানাকে।'

আর সেই উইলিঅম হ্যামিল্টন যে জাহাজের ডাক্তার, কর্ণওয়াল হেনরি কর্ণ-সেই জাহাজের ক্যাপ্তেন। কাপ্তেন বেশ দুঁদে। উদ্ধত। মেজাজী। কথায় কথায় কটু। তিক্ত। আর শেরবোর্ণ তো একটা আধা যুদ্ধজাহাজ। আড়াই শ' মনী ফ্রিজেট। তাতে বাইশটা কামান। উনিশজন সৈনিক। আর কাপ্তেন অফিসার নিয়ে বাহান্নজন। কাপ্তেন বল কাপ্তেন, কমাণ্ডার বল কমাণ্ডার হেনরি কর্ণওয়েল। মাসে মাইনে দশ পাউণ্ড। বিষম তিরিক্ষী তার মেজাজ। যতক্ষণ জেগে থাকেন, ততক্ষণ রেগে থাকেন। আর লোকলস্করকে কথায় কথায় বেত। চাবুক। একেবারে ছাল চামড়া তুলে আনে। একটা চাপা অসন্তোষ জাহাজীদের মধ্যে তুঁষের আগুনের মত ধিকধিক জ্বলতে থাকে। বুঝি জোর বাতাসের অপেক্ষা। বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ফেটে পড়বে। সেই জাহাজেরই সার্জেন উইলিঅম হ্যামিল্টন। মাইনে মাসে সাড়ে তিন পাউণ্ড। তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট—আরচিবল্ড লিস্টন। মাইনে পাউণ্ড দুই। মেজাজ ঠাণ্ডা। ভারী ঠাণ্ডা। কথা কম বলে। নিজের কাজ আপন মনে করে যায়। কারও সাত-পাঁচে থাকে না।

শেরবোর্ণ চলেছিল সিংহল দ্বীপের পাশ দিয়ে। আকাশটা পরিষ্কার। নিখুঁত

নীল। নীচে ভারত মহাসাগরের অতল সমুদ্রে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। মৃদু মৃদু বাতাসে পাল তুলে ভেসে চলেছে জন কোম্পানীর ফ্রিজেট। সন্ধ্যা হয় হয়। আকাশে একটা-দুটো করে সবে তারা ফুটতে শুরু হয়েছে। এমন সময় ঘটল অঘটন। জাহাজটা হঠাৎ নিশ্চল হয়ে গেল। পয়লা সেপ্টেম্বর। সতেরশ' দশ। কর্ণওয়াল সাহেব তাঁর ঘড়িতে দেখলেন, ছটা বেজে গেছে। ফাস্ট মেট জন কুক। কাপ্তেনকে এসে জানালে ম্যাপে জায়গাটার নাম মুল্লাইতিভু। ত্রিকোণমালির দক্ষিণে।

কাপ্তেন দাঁত মুখ খিচিয়ে জাহাজীদের পাঁচ রকম চেষ্টা করতে বললেন। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। দেখা গেল, চেষ্টা যা হল তা সবই কথায়। কাজে নয়। এবং ক্ষুব্ধ কাপ্তেন এক সময় গভীর রাত্রে, ডিঙি ভাসিয়ে চললেন, তীরভূমির উদ্দেশ্যে। সাহায্যের জন্যে—জাফনা পত্তমের উদ্দেশ্যে। সেখানে ওলন্দাজদের ঘাঁটি। ফল হল ভালই ডাচ গভনর কর্ণওয়েলকে সকল সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। লোকজন দিলেন। খুশী মনে কর্নওয়াল যখন জাহাজে ফিরলেন, দেখলেন, সেখানে নতুন এক বিপদ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। তাঁর জাহাজের লোকেরা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছে। তারা কাজ করবে না।

কিন্তু এহেন অবস্থায় কর্ণওয়াল ভেঙে পড়েননি। ওলন্দাজদের সহায়তায় জাহাজটাকে ফের সচল করে নিয়ে আসা হল বাংলাদেশে। এবং অসন্তুষ্ট, ক্ষুদ্ধ লোকজন নিয়েই শেরবোর্ণ পৌঁছল মাদ্রাজে। মাদ্রাজ থেকে কুদালোর। ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড। এবং এখানেই দেখা গেল, যে ঠাণ্ডা মাথার লোকটি এতদিন সরাসরিভাবে কর্ণওয়েলের সঙ্গে ঝগড়া করতে নামেননি, সেই ডাক্তার হ্যামিণ্টনই এখন বেগড়বাঁই শুরু করেছেন। শেরবোর্ণ জাহাজে আর তিনি থাকতে চান না।

কিন্তু জন কোম্পানীর আইন বলে একটা কথা আছে না। না বললেই তো আর না হয় না। ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডে তখন অবশ্য একজন ডাক্তার দরকার। কিন্তু কাপ্তেন কর্ণওয়েল ব্যাপারটা আঁচ পেয়েই খাস কাউন্সিলের কাছে দরবার শুরু করে দিলেন। ডাক্তারকে তিনি ছাড়বেন না। সেণ্ট ডেভিডের ডেপুটি গভর্নর ফারমার বললেন, হ্যামিণ্টন শেরবোর্ণেই থেকে যাক। কিন্তু অন্যতম সভ্য বেকার বললেন, না বাপু, জাহাজ ছেড়ে তুমি ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডে চলে এস।

বেকার বেশ করিতকর্মা লোক। তিনি শুধু বলেই দিলেন না, দেখা যাচ্ছে একটা সরকারী আদেশপত্র কেমন করে যেন সই করিয়ে পাঠিয়ে দিলেন শেরবোর্ণের সেই ডাক্তার হ্যামিণ্টনকে। এবং সেই চিঠিখানি কাপ্তেন কর্ণওয়েলের অবগতির জন্য রেখে দিয়ে অনেক অনেক রাত্রে, দেখা গেল, ডাক্তার সাহেব একটা ডিঙিতে চেপে বসেছেন। কাপ্তেনকে অবশ্য বলা হল, তিনি মাদ্রাজে যাচ্ছেন। তাঁর এক

আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সেই যে তাঁর শেষ যাওয়া, সেটা আর কেউ না জানুক, হ্যামিল্টন জানতেন। এবং জানতেন বলেই, মাদ্রাজে পৌঁছেই তিনি এমনভাবে গা-ঢাকা দিলেন যে, কেউ তাঁকে খুঁজে পেল না। না মাদ্রাজের ইংরেজ গভর্নর। না অন্য কেউ। কেবল জাহাজে ফিরে যাবার একটা আদেশ মাদ্রাজের ইংরেজ কুঠি থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে জারী হয়ে গেল!

নিরুদ্দেশ সার্জেন হ্যামিল্টন তাঁর অজ্ঞাতবাস শেষ করে আবার জন কোম্পানীর যে আসরে উদয় হলেন, তার নাম শহর কলকাতা। সতের শ' এগার। ডিসেম্বর। বেশ কড়া শীত পড়েছে কলকাতায়। অ্যান্টনি ওয়েণ্ডেনের চাকরী গেছে। জন বিয়ার্ড কোম্পানীর গভর্নর। হ্যামিল্টনের চাকরী হল ফোর্ট উইলিয়মে। সেকেণ্ড সার্জেনের চাকরী। পয়লা সার্জেন, কুখ্যাত ডক্টর ওয়ারেনের জায়গায় যিনি পাকাপাকিভাবে কাজ করছিলেন সেই উইলিয়ম জেমস। কোম্পানীর রেকর্ডে রয়েছে উইলিয়ম হ্যামিল্টনের তখন চাকরী না থাকায় উইলিয়ম জেমসের সমান মাইনে ও সুযোগ সুবিধা দিয়ে হ্যামিল্টনকে চাকরী দেওয়া হল। তারিখটা সাতাশে ডিসেম্বর। অথচ ঐ বছর নভেম্বর মাসের বাংলাদেশে কোম্পানীর চাকুরেদের, একটা 'লিস্টি'তে হ্যামিল্টন ও জেমস উভয়ের নাম রয়েছে। কাজেই হ্যামিল্টনের নিয়োগের তারিখটা বেশ গোলমেলে।

এ থেকে আরও মনে হয় যে, জেমস ডাক্তারের সম্রাটের উপহার সামগ্রী নিয়ে দিল্লী যাবার একটা কথা ছিল। আর সেই জায়গায় হ্যামিল্টনকে নেয় কোম্পানী। পরে দিল্লী যাওয়া রাজনৈতিক কারণে বাতিল হয়ে যাওয়ায় কোম্পানী দ্বিতীয় এক-জন সার্জেনকে নিয়োগ করে কলকাতার ইংরেজ কর্মচারী, মাঝিমাল্লাদের চিকিৎসা করার জন্যে।

সে না হয় হল। কলকাতায় ডাক্তার থাকার সময় হ্যামিল্টন সাহেব দেখা যাচ্ছে, যে কটা কাজ করছেন, তার মধ্যে রয়েছে এক মুমূর্ষ ইংরেজ ব্যবসায়ী উইলিঅম লয়েডের উইলে সাক্ষী দেওয়া। কোম্পানীর কাগজপত্রে পাওয়া যাচ্ছে, পরের বছর আগস্ট মাসে তিনি একটা খুনের মামলায় নিহত ব্যক্তির সুরতহাল রিপোর্ট দিচ্ছেন। আজ থেকে আড়াই শ' বছরেরও বেশী আগে এ ধরনের রিপোর্ট কিভাবে মুসাবিদা করা হত, হ্যামিল্টনের দেওয়া সার্টিফিকেট থেকে তার একটা আদল পাওয়া যাবে—

We do declare accordingly to the best of our skill upon the opening of the body of William Hall who had received a wound by a Rapier in the lower part of his Relly on the righe sidt of his

Belly on the right side obliquely passing under the Gults wounding the coats of the Nervs of the Kidney. Emaigent arteiies and great Lacteal views from which wounds he received his Death. এটা সতের শ' তেরো সালের কথা।

সে ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত এই রকম। উইলিঅম হল ও জ্যাঁ সুঁই এক বাড়ীতে থাকতেন। সেদিন শনিবার। রাত ন'টা। হল সদর দরজায় এসে হৈ-চৈ লাগালে। 'দরজা খোল।' বাড়ীর অন্যান্য বাসিন্দেরা বললে, এত রাতে দরজা তারা খুলবে না। হল যেন কাল আসে। কিন্তু হল তখন পদ্মবনে মদমত্ত করীর মত। সটান পাঁচিল টপকে ঘরে ঢুকলেন তিনি। আর হলের কাছে তলোয়ার দেখে জ্যাঁ সুঁই ঘর থেকে একটা তলোয়ার নিয়ে এল। সুঁইকে তলোয়ার আনতে দেখেই হল তাকে আক্রমণ করলেন। সুঁই আত্মরক্ষার্থে তলোয়ার চালালেন। এবং তাঁর বেকায়দা আঘাতে হল সাহেব হলেন ধরাশায়ী। কুপোকাৎ। কোম্পানী বিচারে বসে সব কথা শুনে এবং সাক্ষীসাবুদ সবাই ব্যাপারটা সত্যি বলে সনাক্ত করলে, ইংরেজ খুন করা সত্ত্বেও ফরাসী বণিক জ্যাঁ সুঁইকে ছেড়ে দিলে।

এই সময় কলকাতায় মনে রাখবার মত আর একটা কাজ করেন ডাক্তার হ্যামিল্টন। কলকাতায় যে হাসপাতাল ছিল আজকালকার পাথুরে গির্জা বা সেণ্ট জন চার্চের কাছে, তার জন্যে বেশ কয়েকটা নিয়মাবলী প্রস্তুত করে দেন। এই হাসপাতালটির বদনামের কথা আর এক হ্যামিল্টন সাহেব লিখে রেখে গেছেন, কিন্তু এটিকে সত্যিকারের এক আরোগ্য নিকেতন করে তোলার চেষ্টা যে ডাক্তার হ্যামিল্টন করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে।

কিন্তু যে কারণে হ্যামিল্টন ডাক্তারের নাম আজ ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে খোদাই করা আছে, সে কাহিনী অনেক পরের। দিল্লীর তখত-ই তাউসে তখন আজিমুশ্বানের পুত্র ফরুকশিয়ার। যেমন বাপ, তেমনি বেটা, উভয়েরই সমান ইংরেজপ্রীতি। বাবা যখন বাংলাদেশে, বাবাকে ইংরেজ কোম্পানী ভেট দিয়ে ভোলাত, আর ছেলের জন্য পাঠাত ইংরেজী খেলনা। ভাগ্যচক্রের আবর্তনে সেই ফরুকশিয়ার তখন দিল্লীর মসনদে। সতের শ' তেরো। কাজেই কলকাতার জন কোম্পানী আর কালক্ষেপ করা সমীচীন মনে করলে না। তাদের বহু দিনের বাসনা—ফরমান লাভের জন্য একরাশ সামগ্রী নজরানা দিয়ে জন সারম্যানকে পাঠাতে মনস্থ করলে দিল্লী। ঠিক হল আরমানী খোজা সরহাদ সঙ্গে যাবে। কেননা, বাঙলার সুবেদার আজিমুশ্বানের কাছ থেকে সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম কিনে নেবার অনুমতি সেই-ই আদায় করে দিয়েছিল, সে গল্প তো আমরা

আগেই শুনেছি। তাছাড়া দিল্লী অনেক দূর। পথে সারম্যান সাহেবের ভাল-মন্দ হতে পারে। সে হেন অবস্থায় কাজ চালাবার জন্য আর একজন ইংরেজ সঙ্গে চলল। নাম এডওয়ার্ড ষ্টিফেনসন। সেক্রেটারী হিউ বার্কার। এ ছাড়াও একজন ডাক্তার গেল সঙ্গে। ডাক্তারের নাম হ্যামিণ্টন।

কিন্তু যাব বললেই ত আর যাওয়া হয় না। যাব যাব করতে প্রায় বছর খানেক কেটে গেল। সঙ্গে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার জিনিসপত্র যোগাড হল। এবং দেখা গেল সতের শ' চোদ্দ সালের পনেরই আগস্ট সারম্যান সাহেব তাঁর দৌত্যকার্যে দিল্লীর পথে পাটনায় গিয়ে পৌছেছেন। দেখা যাচ্ছে পর বছর পাঁচই জুলাই দু হাজারী এক মুঘল মনসবদার তাদের দিল্লীতে স্বাগতম জানাচ্ছেন। তাদের জন্যে এসেছে দু'শ ঘোড়া। দ্রিম দ্রিম সুরে বাজছে কাড়ানাকাড়া। সৈয়দ সালাবাত খাঁ এসেছেন জন সারম্যানকে অভ্যর্থনা করতে আর দিশী লোকেরা সবিস্ময়ে দেখছে এই গৌর বণিক দল দু হাতে টাকা ছড়াচ্ছে রাজপথের দু পাশে। এক খানদানী রাজদূত যে দিল্লীতে পায়ের ধুলো দিলেন, ঢক্কানিনাদে সেটাই যেন বলতে চাচ্ছিল ইংরেজরা।

সেদিন দ্বিপ্রহরে সম্রাট ফরুকশিয়ার যখন আম দরবারে, খান দৌরাকের মধ্যস্থতায় জন সারম্যান জন কোম্পানীর কলকাতার গভরর্নর রবার্ট হেজেসের লেখা চিঠিখানি আভূমি কুর্ণিশ করে সম্রাট সমীপে নিবেদন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করলেন হাজার এক স্বর্ণমুদ্রা, মণিমুক্তা-মাণিক্যখচিত একটা টেবল ক্লক, একটা গণ্ডারের শিং, রূপার কয়েকটা বাসন, কয়েকটা সোনার আর পৃথিবীর একটা মানচিত্র। সেদিনের সেই সমারোহের এক পাশে নিস্পৃহভাবে দাঁড়ান তরুণ যে ডাক্তারটিকে সকলেরই অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক,অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল, অনতিকাল পরেই দেখা গেল, সারম্যান সাহেবের উদ্যম, খোজা সরহাদের কূটবুদ্ধি, ষ্টিফেনসনের বেনিয়াতি সব কিছুই যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন তারই দক্ষতা, তারই দেশপ্রেম ইংরেজদের বহু সাধের বহু সাধনার ধন তাদের হাতের মুঠোয় এনে দিল। বলা বাহুল্য, সেই তরুণ ডাক্তারের নাম হ্যামিণ্টন।

কিন্তু ডাক্তারের নাম না হয় হ্যামিণ্টন, তাঁর রোগীর নাম কি? নাম ফরুকশিয়র। আজিমুশানের ছেলে। বাঙলার জল-হাওয়ার মানুষ। আর বাংলাদেশে থাকার সময়েই ইংরেজদের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা, আর তাইত, তাঁর রাজত্বেই নতুন করে এই দৌত্য। সার টমাস রো-র পর। ঠিক এক শ' বছর বাদে।

তবে ফরুকশিয়র শুধু সম্রাট নন। রূপবান সম্রাট। ফরুকশিয়রের রূপের খ্যাতি ছোট থেকেই। ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে, অমন খুবসুরত পুরুষ বুঝি বাবরের বংশে আর কেউ জন্মায়নি। তবে শুধু রূপে, গুণে নয়। ফরুকশিয়র

ঘোড়ায় চড়তে, পোলো খেলতে, কুস্তি লড়তে. তীর ছুঁড়তে, মৃগয়ায় কিসে না দড়। কিন্তু সসাগরা ভারতবর্ষের সম্রাট হতে হলে যে কূটবুদ্ধি, যে দায়িত্ববোধ, যে রাজনীতিজ্ঞানের প্রয়োজন কিছুই তাঁর ছিল না। একেবারে পলাশ ফুল। টকটকে রঙ। গন্ধ নেই।

আর এহেন ব্যক্তি হ্যামিল্টনের রোগী। সেদিন পনেরই আগস্ট। ঝম ঝম করছে দিল্লীর রাত। আকাশে তারায় তারায় ফটিক ফুটছে। দরবার-ই-খাসের আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। নিভে গেছে আমীর মনসবদারের কুঠীর আলো। কেবল তখনও সম্রাটের খাস মহলের ঝাড় লণ্ঠনের মোমবাতি আলো বিকীরণ করছে, বাঁদী-বেগমের নূপুরনিক্কণ, সরাব-পেয়ালার ঠুনঠুন, তাতার প্রহরিণীর পদশব্দ, কিছুই হয়ত শোনা যায় না। কিন্তু তবু সেদিন তখনও সম্রাট ফরুকশিয়রের খাস মহলের আলো নেভেনি, সম্রাট মাতা তখনও সেখানে। আর বিছানায় কাতরে চলেছেন দিল্লীর তখত-ই তাউসের অধীশ্বর সম্রাট ফরুকশিয়র। দরবার তাড়াতাড়ি ভেঙে দিয়ে খাস মহলে চলে এসেছিলেন তিনি। অসহ্য তাঁর যন্ত্রণা। কিন্তু সে ত তখন সন্ধ্যো রাত। তারপর অনেক দণ্ড-পল বয়ে গেছে। বেড়েছে রাত। বেড়েছে শাহন-শাহের যন্ত্রণা। মুঘল হেকিমরা চাপিযেছেন নানা দাওয়াই। পলেস্তারা। কিন্তু ব্যাধির উপশমের কোন লক্ষণই নেই। রাজমাতার কাতর চোখে নেমেছে দুশ্চিন্তার অমাবস্যা।

এমনি সময়ে খান দৌরান বাহাদুরই বোধহয় বলে থাকবেন ইংরেজ ডাক্তারের কথা। ইংরেজ দূতের সঙ্গে এক ডাক্তার এসেছে। ছোকরা ডাক্তার। কিন্তু হাতের গুণ আছে। এবং কথাটা মনেও লেগে থাকবে রাজমাতার। সঙ্গে সঙ্গেই, সেই গভীর রাত্রেই ঘোড়া ছুটিয়ে লোক চলে গিয়ে থাকবে ইংরেজ কুঠীতে যেখানে সারম্যান আর ষ্টিফেনসন সাহেবের সঙ্গে তাঁদের দৌত্যকাল কাটাচ্ছিলেন তরুণ ডাক্তার হ্যামিল্টন।

এবং হ্যামিল্টনের কপাল ভালই বলতে হবে। ফরুকশিয়র অনতিবিলম্বে সুস্থ হয়ে বসলেন। রোগটা কি? যতদূর জানা যায় তাঁর দু'দিকের কুঁচকি ফুলে উঠেছিল। এবং হ্যামিল্টন উভয় দিকেই নানা ভেষজ দিয়ে পলস্তারা বেঁধে দিয়েছিলেন।

তবে একটা কথা না বললে বুঝি সব কথা বলা হয় না। খান দৌরান সম্রাটের অন্তরঙ্গ দোস্ত। ছোটবেলার ইয়ার। তাঁর ঘোড়দৌড় কুস্তী পোলো খেলার সঙ্গী। তিনিও সহজে সম্রাটের জন্যে ইংরেজ ডাক্তারের নাম সুপারিশ করেননি। সম্রাটের আর এক দোস্ত তকারব খাঁ'র হাতটা হঠাৎ শুকিয়ে যেতে শুরু করল। শোনা যায়

খাঁসাহেব নাকি কুরআন ছুঁয়ে মিথ্যে শপথ করেছিলেন, সেই পাপেই তাঁর এই ব্যাধি। সে যাই হোক, সারম্যান এ্যামবাসীর সঙ্গে হ্যামিল্টন গিয়ে পড়েছিলেন দিল্লী। তকারব খাঁ তাঁকেই দেখালেন। তকারব শেষবেশ বাঁচেননি। কিন্তু হ্যামিলটনের ওপর তাঁর ছিল অগাধ আস্থা। অনেক দিন তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রেখেছিলেন। সেই সূত্রেই খান দৌরান সম্রাটকে এই বিদেশী ডাক্তারকে দেখাবার পরামর্শ দেন। নয়তো, সম্রাটের পেয়ারের দোস্ত হলেও দৌরানও হ্যামিল্টনের নাম তুলতে সাহস করতেন না ফরুকশিয়রের মায়ের কাছে।

কিন্তু এ ত নামে মাত্র চিকিৎসা। যতদূর জানা যায় সম্রাটের সময় তকারব খাঁর চিকিৎসার জন্য হ্যামিল্টন ঔষধপত্র কিনেছিলেন চার'শ' ছিয়াশি টাকা বার আনার মতন। অন্তত এই টাকাটাই তিনি ইংরেজদের ক্যাশে খরচ লিখিয়ে নিয়েছিলেন। টাকা যাই লাগুক, হ্যামিলটনের কেরামতির এত মাত্র সূত্রপাত। তাঁর আসল পরীক্ষা হয় বেশ কিছুদিন পর।

মাঝখানে বেশ কয়েকটা কাণ্ড ঘটে গেল। অনেকেই জানেন, জহান্দর শা' যখন আজিমুশ্বানকে হারিয়ে এবং হত্যা করে দিল্লীর মসনদে বসলেন, তখন কেউই ভাবেনি, আজিমের ছেলে আবার তার বাবার হারান সিংহাসনে বসবে। বসতও না, যদি আজিমের স্ত্রী, শায়েস্তা খাঁর বোন, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের শরণাপন্ন না হতেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় হুসেন আলি আর আবদুল্লা, নিমকের মান রাখলেন। আজিমের মহানুভবতা তাঁরা ভোলেননি। এবং তাঁদেরই বিক্রমে, কিছু বা জহান্দর শাহেরই অত্যাচারে, অবিচারে, জহান্দর শাহের পতন ঘটল। ফরুকশিয়র বসলেন সিংহাসনে। তবে আকবরের সুযোগ্য বংশধর ফরুক—সিংহাসনে বসেই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। নিজে বাদশা হয়ে আবদুল্লাকে করলেন উজির। এবং করেই ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন আত্মানুশোচনায়, এ কি করলাম!

এহেন অবস্থায় যোধপুরের রাজা অজিত সিংহ একটা কাণ্ড করে বসলেন। ছিলেন বেশ। দিল্লীতে মুঘল বাদশাদের সব নানা কলহ সংশয় দেখে তাঁর মধ্যে রাণা প্রতাপের সুপ্ত রক্ত জেগে উঠল। তিনি কর দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে তোফা স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসলেন। দিল্লী সম্রাটের নামে 'খুৎবা' ঘোষণা বন্ধ করে দিলেন। মুঘল আমলাদের দিলেন গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে।

খবরটা দিল্লী এসে পৌছল। এবং বলা বাহুল্য প্রাসাদকূটে বাদশা-উজির উভয়েরই তন্দ্রা ছুটে গেল। দেওয়ান-ই-খাসের সভায় ঠিক হল যুদ্ধযাত্রা করা হোক। ঠিক

হল করুক নিজেই যাবেন যুদ্ধে। কিন্তু অনিয়ম অত্যাচারে শরীরটা তো তিনি ভাল রাখতে পারেননি। কাজেই শেষবেশ উজিরভ্রাতা হুসেন আলিকেই এই অভিযানে নেতৃত্ব করতে হল।

আবদুল্লা—যেমন বাদশা তেমনি উজির। কুঁড়ে। আরামপ্রিয়। বিলাসী। কিন্তু হুসেন আলি লড়ুয়ে লোক। তিনি একেবারে 'যুদ্ধং দেহি' রব তুলে সোজা গিয়ে পড়লেন যোধপুর। আর দৃকপাত না করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাজপুত রাণার ওপর। রাণা ভেবেছিল মুঘলরা আর সে মুঘল নেই। তারাও যে এভাবে একেবারে তাঁর গুহায় এসে চ্যালেঞ্জ করে বসবে, সেটা তিনি ভাবেননি। কাজেই হুসেন আলির দুর্ধর্ষ আক্রমণের মুখে চরম বিপর্যয়ের ক্ষণে তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের ঐতিহ্য ভুলে সাদা পতাকা উড়িয়ে দিলেন কিন্তু চিল যখন নেমেছে, কুটো না নিয়ে তো আর উঠবে না। হুসেন আলি মুঘল আধিপত্য তো যোধপুরে পুনরায় স্থাপন করলেনই, যুদ্ধ শান্তির অন্যতম শর্ত হল রাণার কন্যার সঙ্গে মুঘল সম্রাটের বিবাহ প্রস্তাব। রাণার পুত্র গেল হুসেন আলির সঙ্গে দিল্লী। হুকুম হলে খাস রাণা অজিত সিংও যাবেন—এ রকম একটা চুক্তি হল। এটা সতের শ' চোদ্দ সালের গোড়ার দিকের ঘটনা।

কিন্তু রাজারাজড়ার বিয়ে বললেই তো হয় না। অজিত সিং তাঁর কন্যাকে ফরুক-শিয়রের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হলেন। কিন্তু তাঁকে সঙ্গে করে আনার সময় ছিল না আলি সাহেবের। তিনি তড়িঘড়ি দিল্লী ফিরলেন। পর বছর মে মাস নাগাদ সম্রাটের বিখ্যাত মামা শায়েস্তা খাঁ ভাগ্নের পাত্রীকে দিল্লীতে আনাবার জন্যে রওনা হয়ে গেলেন এবং এক সময়ে ঘুরেও এলেন অজিত সিংহের কন্যাকে সঙ্গে করে।

কন্যা এলেন। এসে উঠবেন কোথা? হুসেন আলি দাক্ষিণাত্যে। কাজেই তাঁর ভাই উজির-ই-আজম আবদুল্লার প্রাসাদ কুটিমে। চার দিন পরে যথানিয়মে, প্রচুর ধূমধামের সঙ্গে তারই বাড়িতে এলেন সম্রাট এবং বিনা বাধায়, বিনা গোলযোগে যোধপুরের রাজপুত রাণার মেয়ের সঙ্গে ফরুকশীয়রের শাদী হয়ে গেল। দিল্লীর প্রধান কাজী শারিয়ত খাঁ সেই বিবাহ নিষ্পন্ন করালেন। সতের শ' পনের। সতেরই সেপ্টেম্বর।

কিন্তু দিল্লীর সম্রাটের বিয়ে। রাজপুত রাণার মেয়ের সঙ্গে। তার একটা উৎসব হবে না? হাতী নাচবে। ঘোড়া নাচবে। ঢাই কুড়াকুড় বাদ্যি বাজবে। রোশনায়ে রোশনায়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। তবে না বিয়ে। সে সব কোথা? সে সব কিছুই হল না। যা চলা উচিত, হতে হতে মাঝপথে থেমে গেল। কারণ? কারণ, হ্যামিল্টনের সেই পুরনো রুগী—সম্রাট ফরুকশীয়র আবার অসুস্থ। বর অসুস্থ হলে

কি আর বিয়ের বাঞ্ছি ভাল লাগে? কাজেই বাজনা বাঞ্ছি, উৎসব আয়োজন লক্ষ্মীন্দরের বিয়ের মত জমে না উঠতেই মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল।

এর একটা রাজনৈতিক দিক আছে। এই বিয়ে দিচ্ছিলেন সৈয়দ ভায়েরা। এই বিবাহ উৎসব বন্ধ হতে, তাঁরাই হলেন অপ্রস্তুত। তাঁদেরই যেন কেমন খেলো হয়ে যেতে হল প্রজাকুলের কাছে। অপর দিকে রাজার ইয়ার দোস্তরা স্ফূর্তি না করতে পেরেও খুশী না হয় গেছে নিজেদের নাককাটা। আরে, শত্রুর যাত্রাভঙ্গ হয়েছে তো! সেই বৃত্তান্ত আর কি!

সে যাই হোক। আবার ইংরেজ কুঠাতে ডাক গেল। ডাক গেল ডাক্তার হ্যামিল্টনের কাছে। ডাক গেল তাঁর দোভাষী আর্মানী ব্যবসাদার খোজা সরহাদের কাছে। উভয়েই যেন বিনা বিলম্বে সম্রাট সদনে চলে আসেন। সম্রাট শয্যাশায়ী এবারে, রোগটা কি? অসহ্য যন্ত্রণা। ফিসচুলা। ভগন্দর। রাজমাতা স্বয়ং এ নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এবং শেষবেশ ফিরিঙ্গী ডাক্তারের হাতেই দিয়ে গেলেন তাঁর পুত্রকে।

দীর্ঘ দুটি মাস এই রোগীকে নিয়ে যমে-মানুষে লড়াই চলেছিল। এবং লড়াই শুধু যমের সঙ্গেই করতে হয়নি ইংরেজ ডাক্তারকে। মানুষের সঙ্গেও করতে হয়েছিল। মুঘল দরবারে বিদেশী রাজবৈদ্য ছিলেন ফরাসী ডাক্তার মঁসিয়ে মার্টিন। বলতে কি খুশী তিনিও হননি। খুশী হন নি মুঘল হেকিমরা। এবং খুশী যে তাঁরা হননি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলেন হ্যামিলটন একদিন যখন রোগী দেখে পাল্কী করে কুঠীতে ফিরছিলেন। পাল্কীটা যেই কেল্লার সিংহদ্বার পার হয়েছে, কৌতূহলে একটু পাল্কীর ঢাকনাটা সরিয়েছেন, অমনি 'ঠাঁই' করে এক টুকরো পাথর এসে লাগল কপালে। সেখানটা কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। ঘটনাটা সম্রাটের কানে গেল। কোতোয়ালের কানেও। হুকুমও হল। অপরাধীর শাস্তি বিধনের জন্যে। কিন্তু ঐ অবধি। তরুণ ইংরাজ ডাক্তারের কয়েক ফোঁটা রক্তে মুঘলাই আমলাতন্ত্রের কিছুই এসে গেল না। সে কটা শোণিত বিন্দুতে তার ভাবনার ইতরবিশেষ হয় না বুঝি!

কিন্তু হ্যামিল্টনের আগমনে অখুশী যারা, তারা বুঝি গুরুতর আরও কিছুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। দিল্লীর উপান্তে ইংরাজ কুঠীর ঘুম ভেঙে গেল সেদিন সকালে এক আশ্চর্য হৈ-চৈ-এর মধ্যে। এক রাশ অসহিষ্ণু উত্তেজিত জনতা ঘিরে ফেলেছে ইংরেজ কুঠী। কি ব্যাপার? না, ইংরেজ সার্জেনের হাতে মারা গেছে দিল্লীর সম্রাট। ইংরেজ ডাক্তারকে তারা ছাড়বে না।

অবশ্যই এটা ঘটনা নয়, রটনা। কিন্তু রটনার জিব বড়। গলা বড়। দিল্লীর

কাজী। কে তোয়াল আমীর। মনসবদাররা। সব আসে। সাক্ষী দেয়। শেষবেশ সম্রাট স্বয়ং দেওয়ানী আমে বসেন। তবে নিস্তার পান ডাক্তার হ্যামিল্টন। আর রোগ যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পান সম্রাট। বিশে নভেম্বর। সেদিন ডাক্তার পলেস্তারা সব কেটে দিলেন সম্রাটের। আরোগ্য স্নানের অনুমতি দিলেন। এবং সেদিনই দিল্লীর আম-জনতাকে দর্শন দিলেন তিনি! আর এর সাত দিন পরে, এই প্রজাকুলের সামনেই ডাক্তার হ্যামিল্টনের মাথায় পরিয়ে দিলেন মণিমাণিক্য-খচিত উষ্ণীষ, একটি পরিচ্ছদ, দুটো হীরের আংটি, একটি ঘোড়া, একটি হাতী ও পাঁচ হাজার টাকা। সম্রাটের আরও হুকুম হল তাঁর পরিচ্ছদের জন্যে হীরে বসানো সোনার বোতামের একটি সেট, এবং যেসব যন্ত্র তাঁর অসুখের সময় ব্যবহার করেছিলেন সেইসব শল্যের হাতলগুলি খাঁটি সোনার করে দিতে।

এ ত গেল সম্রাটের পুরস্কার। কিন্তু তাঁকে ডেকেছিল কে? স্বয়ং রাজমাতা না? তাঁর পুরস্কার বলতে কি কিছু নেই নাকি? তা কি হয়? রাণীমা পাঠালেন একটি শিরোপা, একটি ঘোড়া ও এক সহস্র মুদ্রা। সেটা সেপ্টেম্বরের আটাশে। সতের শ' পনেরে। কিন্তু এ সবই বাহ্য। আসল পুরস্কার পেল জন কোম্পানী। পেল ইংরেজ জাতি। পেল বাঙলায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার। পেল আখিরে পলাশীতে লড়াই করার একটা জবর দলিল। সেইটেই হ্যামিল্টন ডাক্তারের আসল পুরস্কার।

ব্যাপারটা খোলসা করে বলা যাক। হ্যামিল্টনের হাতযশে সম্রাটের রোগ মুক্তির ফলে রাজনৈতিক জিতটা সবচেয়ে বড় হল কাদের? সৈয়দ ভায়েদের। তাঁরাই বিয়েটা দিচ্ছিলেন। বিধি বাম হয়েছিল। এমন কাঁটা সরালেন হ্যামিলটন। কাজেই তাঁরা খুশী হয়ে গেলেন ইংরেজদের ওপর। এবং ইংরেজরা যে উনিশ দফার একটা যাঞ্চাপত্র পেশ করলেন, তাঁরা তাতে মোটামুটি মঞ্জুরীর মোহর এঁটে দিলেন। এতকাল ইংরেজরা আর্মানী সওদাগর খোজা সরহাদের ধোঁকাবাজিতে বুঝছিলেন আসল ক্ষমতা বুঝি খান দৌরানের। কিন্তু খান দৌরান যতই সম্রাটের দোস্ত হন না কেন, ক্ষমতার চাবিকাঠি যে তখন সৈয়দ ভায়েদের বিশেষ করে উজীর-ই-আজম আবদুল্লার হাতে, এটা তাঁরা বোঝেননি। বা তাঁদের বুঝতে দেওয়া হয়নি। এখনও ঠেকে শিখে, তাঁরা সেখানে দরবার করতেই কাজ গুছিয়ে ফেললেন। হ্যামিলটন সাহেব তো তাঁদের কাজ প্রায় সেরেই রেখেছিলেন।

কিন্তু কাজ গোছালে কি হবে, কাজ গোছানো, আর কাজ গুছিয়ে মুঘল দরবার থেকে বেরিয়ে আসা এক নয়। সম্রাট ফরুকশীয়র তখন আম দরবারে। জন সারম্যান কুর্ণিশ করে বললেন, 'সাঙ্গ হল কাজ। সম্রাট বিদায় দিন।' সম্রাট

বললেন, ‘তথাস্তু’। সারম্যানের মাথায় সম্রাটের দেওয়া উষ্ণীষ। গায়ে সম্রাটের দেওয়া শিরোপা। তারপর গেলেন এডওয়ার্ড স্টিফেনসন। তিনিও ‘বাউ’ করলেন। সম্রাটের দেওয়া সম্মান ধন্য মনে গ্রহণ করে তিনিও চলে গেলেন। সম্রাট তাঁকেও যাবার অনুমতি দিলেন। তারপর বার্কার। এই দৌত্যের তিনি সেক্রেটারী। তাঁকেও যেতে দিলেন বাদশা। তারপর খোজা সরহাদ। তাকেও। তারপর এলেন তরুণ ডাক্তার হ্যামিলটন। প্রায় এক বছর সম্রাটের চিকিৎসার জন্য আর তাঁর ডাক আসেনি। তাকে তো ভুলে যাওয়ারই কথা! নিতান্ত নগণ্য একজন সাধারণ ইংরেজের মতই সেই অপসৃয়মান ইংরেজ দলটির সঙ্গে বিদায় নিচ্ছিলেন তিনি। বারটা। বৃহস্পতিবার। তেইশে মে। সতের শ’ সতেরো। ময়ূর সিংহাসনের ওপর আসীন ভারত সম্রাট ফরুকশীয়র। একে একে সবাই বিদায় নিচ্ছে। সম্রাট ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিচ্ছেন। কিন্তু হ্যামিল্টন চলে যেতেই সম্রাট চিৎকার করে উঠলেন, ‘না’ সম্রাট তাঁকে তার নিজের জায়গায় ফিরে যেতে বললেন। বলেই উঠে পড়লেন সম্রাট। অন্দরে চলে গেলেন। সেদিনের মত সভা শেষ হয়ে গেল। নিস্তব্ধ বিস্মিত সভাগৃহের দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে রইলেন গৃহগতপ্রাণ ইংরেজ কুঠির ছোট্ট দলটি! আর সেই তরুণ ইংরেজ ডাক্তারটির মন বেদনায় ভরে যেতে লাগল। কেননা এর আগে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বার বার দূত এসেছে তাঁর কাছে, অনুরোধ করা হয়েছে দিল্লীতে থেকে যাবার জন্যে। বলা হয়েছে তাঁকে তিনি যা চান তাই দেওয়া হবে। যে কোন ঐশ্বর্য। যে কোন রূপবতী নারী। যে কোন মনসবদারী কি নয়। কিন্তু বেশ দৃঢ় কণ্ঠেই তিনি তাদের জানিয়েছেন তাঁর অসুবিধার কথা। তাঁর বাড়ী-ঘরদোর। বাবা-মা-অ্যানার কথা। স্কটল্যাণ্ডের কথা। কিন্তু এ ভবী ভোলবার নয়। সম্রাটের বহু আবেদন-নিবেদনেও গররাজী। সম্রাট কিছুতেই বুঝছেন না, তরুণ ডাক্তারটির মনের কোণে আঁকা বহুদিন আগে ক্লাইডের তীরে ফেলে-আসা সেই মুখখানির কথা। সেই প্রতিশ্রুতির কথা—আমি আসব অ্যানা। আমি আসব। ‘আই উইল মেক দি ক্রাউন এ পাউণ্ড’। বিরহজর্জর সেই হৃদয়ের কাছে কি আর ঐশ্বর্যের প্রলোভন? সেদিন সন্ধ্যায় সম্রাটের খাস দূতকে বলে দিলেন ডাক্তার, ‘সম্রাট আমাকে বন্দী করে রাখতে পারেন। কিন্তু তাঁর অন্ন, তাঁর দাসত্ব কোনদিনই স্বীকার করব না আমি। সলাবত খাঁ সাহেব, শাহেনশাকে বলে দেবেন দয়া করে।’

শেষ দিকে ডাক্তার বুঝিবা কিছুটা ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর সব ওষুধ কোথা যে থাকবেন দিল্লীতে? ডাক্তারী করবেন সম্রাটের? এবং ইংরেজ দূত সারম্যান সাহেব এবার আর খান দৌরান নয় উজীর-উল-মুলক আবদুল্লাকে ধরে-

ছিলেন। এবং যখন সম্রাট দেখলেন ডাক্তার নাছোড়বান্দা, তিনি রাজী হয়ে গেলেন, ডাক্তারকে যেতে দিতে। তবে তাঁর প্রিয়-পরিজনকে দেখে নতুন ঔষধপত্র কিনে আবার যেন ফিরে আসে, এই শর্তে। শুধু মুখের কথা নয়, এই শর্তে রাজী হয়ে একটা দলিলে তার সই আর শীলমোহর দিতে হয়েছিল তরুণ ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিলটনকে।

কিন্তু হ্যামিলটনকে আটকে রাখার আসল রহস্যটা কি? এটা ঠিক সুপুরুষ সম্রাট ফরুকশীয়রের ভবিষ্যতটা সব সময়েই বেতালা যেত। এবং ডাক্তার হ্যামিলটন ওষুধপত্র দিতেন মন্দ নয়। কিন্তু সেই কারণেই তাঁকে আটকে রাখার জন্য এত পাগল হয়ে ওঠেননি ফরুকশীয়র। সসাগরা ভারত সম্রাটের নগ্নদেহ—তা' তো হ্যামিলটনের মত ফিরিঙ্গী হেকিম দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। কাজেই, তাকে ছেড়ে দিতে সম্রাটের সম্ভ্রমে বাঁধছিল।

সে যাই হোক, ফিরে আসবার মুচলেকা দিয়ে হ্যামিলটন ফিরে চললেন। কলকাতা। আগ্রা-এ্যালাহাবাদ-কাশী হয়ে এক সময়ে এলেন পাটনা। এবং সেখানে এক মান-অভিমানের পালায় আটকে গেলেন সারম্যান সাহেব। ব্যাপারটা কি না ইংরেজরা মৃত মহম্মদ মুজফফরের যে বাড়ীটা তখন সম্রাটের হয়ে তাঁর আমলারা ভোগ-দখল করছিলেন, সেটা তাদের কুঠি করার জন্যে চেয়ে নিয়েছিলেন। সম্রাট তো তখন কল্পতরু। কাজেই সাধারণত ইংরেজদের পাকা বাড়ী ইজেরা দিতে গর-রাজী হলেও, এ ব্যাপারে তিনি মঞ্জুরীর শীলমোহর দিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য শর্তসাপেক্ষে। সে বাড়ীতে নতুন করে কোন দেওয়াল তোলা চলবে না। অস্যার্থ, কোন দুর্গ বানানো চলবে না বাছা!

এখন পাটনায় তখন মুঘল দেওয়ান সরবলন্দ খাঁ। খাঁসাহেব এই সাদা চামড়ার জাতটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাছাড়া এদের দেমাক তাঁর কাছে ছিল অসহ্য। সারম্যান এদিকে ভেবেছিলেন, যখন সম্রাটের প্রভূত শিরোপা নিয়ে আসছেন তিনি দিল্লী থেকে, সরবলন্দ তাঁকে এসে সেলাম জানাবে। হায়রে, খাঁসাহেব সেই বান্দা! তাঁর বয়েই গেছে। অথচ উভয়ের দেখা হওয়া দরকার। সারম্যান কয়েক দিন অপেক্ষা করে উকিল পাঠালেন। তার মারফৎ বলে পাঠালেন, সম্রাটের হুকুম মাফিক মহম্মদ মুজফফরের বাড়ীটা তাঁদের যেন কুঠি করতে দেওয়া হয়। সরবলন্দ একেবারে হাঁকিয়ে দিয়ে বললে, 'দে গা তো জরুর। মগর পহেলে উসকো সেলাম দেনে বোলো।'

সারম্যান তখন সম্রাটের খেতাব পাওয়া লোক। তাদের ইংরেজী অভ্যাস। রাজারাজড়ার শিরোপার তাদের কাছে অনেক খাতির। কাজেই সাহেব কি

করে মুঘল দেওয়ানের কাছে যায়? অতএব একটা ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। এবং এই টানাপোড়েনে পড়ে কোম্পানীর লোকেদের না হক আটকে থাকতে হতে লাগল পাটনায়। ওদিকে হেজেস সাহেব কলকাতায় বসে দিন গুনছেন! সারম্যানের আনা সম্রাটের ফরম্যান না দেখলে তাঁর ঘুম হচ্ছে না!

শেষবেশ, কিছুই না। কুঠিবাড়ী লাভের আশা আপাততঃ জলাঞ্জলি দিয়ে সারম্যান লোকজন নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে নৌকা ভাসিয়ে দিলেন। সম্রাটের দেওয়া হাতী-ঘোড়া, দস্তক নিয়ে গজবরদার, চেলা সবাই হাঁটাপথে রওনা হয়ে গেল। আর ডাক্তার হ্যামিল্টন সারম্যানের পিছু পিছু একটা ছোট্ট নৌকায় তাঁর ওষুধ-পত্তরের বাক্স প্যাঁটরা, তুলে দিয়ে কলকাতার পথ ধরলেন এবং এই গঙ্গার বুকে দু পাশে হাজারো শাল-তমালের ছায়াঘেরা গ্রামের দিকে তাকাতে তাকাতে কেমন যেন এক সময়ে তাঁর মনে হল শরীরটা খারাপ হয়েছে তাঁর। যতই উজানে চলে গঙ্গা, ডাক্তারের দেহটা ততই বেশী খারাপ হতে থাকে। পাটনা পেরোল, মোকামা পেরোল, নৌকা যখন মুঙ্গের ছুঁই-ছুঁই, ডাক্তার বুঝছেন তাঁর জীবনীশক্তি এই নৌকার ঘেরাটোপের মধ্যে জ্বালান মোমবাতিটির মতই ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে। রোগজর্জর ডাক্তার একটু উঠতে চেষ্টা করলেন। তারপর ডাকলেন, কোই হ্যায়? বাইরে আকাশে চাঁদের সেদিন ছুটি, তারারা সব আসর জমিয়ে বসেছে। মাঝিরও বোধকরি ঝিমোন ধরেছিল। ডাক্তারের ডাকে তার ঘুম ছুটে গেল, চেঁচিয়ে বললে, 'জী'। বলেই দাড়টা আর একজনের হাতে দিয়ে সাহেবের খানসামাকে ডেকে দিতে গেল।

সাহেব কাগজ চাইলেন। তাঁর পাখীর পালকের কলমটা নিয়ে বসলেন। আর তারপর সেই নৌকার মধ্যে বসেই, সেই মোমবাতির মৃত্যুধূসর আলোয় তাঁর উইলটা লিখে যেতে লাগলেন। কেবল তাঁর দীর্ঘ ছায়াটা বিছানায় আড় হয়ে পড়ে রইল!

উইলিয়ম হ্যামিল্টনের তখন অনেক টাকা। কলকাতার বাড়ীটার দামই আড়াই হাজার! অনেক, অনেক কাল আগে এক নদীর ধারে এক আয়ত চোখের মেয়েকে বলেছিলেন ডাক্তার—'আই উইল মেক দি ক্রাউন এ পাউণ্ড'। দেখা গেল, সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছে উইলিয়ম হ্যামিল্টনের জীবনে। ধুলো মুঠো ধরতে তাঁর কড়ি মুঠো। অনেক অনেক টাকা তাঁর। আর সেই অর্থ দু হাতে দিয়ে যাচ্ছেন বন্ধুবান্ধবকে। একটা হীরের আঙটি দিচ্ছেন এডওয়ার্ড ষ্টিফেনসনকে। সম্রাট ফরুকশীয়রের দেওয়া আঙটিটা দিচ্ছেন জন সারম্যানকে। তাঁর উইলের তিনি ট্রাষ্টি। তাঁর সব সম্পত্তি পাবেন তাঁর বাবা। অবর্তমানে ভাই-বোনেরা। আর রবার্ট হ্যামিলটনের সেই রূপসী কন্যা অ্যানা, যাকে তিনি অপেক্ষা

করতে বলেছিলেন? রাজমহলের সেই গঙ্গার বুকে রোগকাতর ডাক্তারের চোখের সামনে বুঝি ভেসে উঠেছিল, সেই প্রতীক্ষাকাতর মুখখানা। লাভ, মাই বিলাভড, লাভ। উইলের কাগজে তার জন্যে রাখা ছিল পাঁচ শ' পাউণ্ড! কিন্তু সে রাতে সেই লেখার ওপর কোন ব্যাধিজর্জর হৃদয়ের রক্ত নিঙড়ানো কয়েকটি ফোঁটা অশ্রু দাগ কেটে গিয়েছিল কিনা, পৃথিবী তার হিসেব রাখে না!

কেবল দেখা গেল, ডাক্তারের আশঙ্কা বর্ণে বর্ণে সত্য। চৌঠা ডিসেম্বর নৌকাখানা পৌঁছল কলকাতা। শহর কলকাতা। আর সেদিনই কোম্পানীর খাস দপ্তরে খবর গেল, সারম্যান অ্যামবাসীর তরুণ ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিল্টন আর ইহজগতে নেই। পাথুরে গির্জার পাশেই সেকালের কোম্পানীর 'বেরিএল গ্রাউণ্ড'। সেখানেই, কোম্পানীর কলকাতার জনক জব চার্নকের সমাধির পাশেই তাঁকে চিরদিনের জন্য সমাহিত করা হল।

আর সেই নাছোড়বান্দা বাদশা? দিল্লীতে খবর যেতেই সম্রাট কিন্তু কাঁদলেন না, হাসলেন। বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বুঝি বলতে চাইলেন, বুঝি বুঝি এসব আমাকে ধোঁকা দেবার ফন্দি! তড়িঘড়ি লোক পাঠালেন কলকাতায় আসল খবর আনো। লোক এল। তত্ত্বতাল্লাস করা হল। এবং গম্ভীর মুখে সনাক্ত করল, খবর সত্যি। সেই খবরটা সম্রাট শুনলেন আর সাংঘাতিক রকম গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর তাঁর ফিরিঙ্গী হেকিমের কবরের ইংরাজি 'এপিটাফের পাশে ফার্সীতে একটা সমাধিলেখ লিখিয়ে দিলেন।

উইলিঅম হ্যামিল্টনের কবরটা আর নেই। কিন্তু সে পাথরটা আছে। যদি কোন ঘুঘু-ডাকা ক্লান্ত অপরাহ্ণে অফিসপাড়ায় কাজের ঝামেলা যখন আপনা হতেই মন্দা পড়ে, এই তল্লাটের কোর্ট-কাছারিতে উকিল-মোক্তার-আমলা-ব্যারিস্টার-এটর্ণি বাবুরা যখন লাঞ্চ-টিফিন সেরে ঝিমোয়, তখন যদি অতৃপ্ত কৌতূহলের তাড়নায় এই শান্ত কবরখানায় গাছগাছালি ঢাকা নীরবতার অন্দরে চুপিসারে ঢুকে পড়েন, তবে একেবারে উত্তরের দেওয়ালের দিক যাবেন, দেখবেন, সেই একরাশ সমাধি স্তম্ভের আর এপিটাফের ভিড়ে অপরিণত বুদ্ধি বাদশার করান ইংরিজি-ফার্সী লেখা একখানা নক্সাকাটা পাথর সেখানে পড়ে রয়েছে। জানবেন, সেটি সেই অতৃপ্ত প্রেম অশান্ত স্কচ ডাক্তারটির সমাধির শেষ স্মৃতিচিহ্ন। ডাক্তারের কবরটি নেই। পাথরটি আছে। সেই ডাক্তারের নাম হ্যামিলটন।

সতের শ' দশ সালের কলকাতা। এক দরিদ্র ইংরাজ নাবিকের একটি অপরূপ রূপসী স্ত্রী ছিল। একেবারে যাকে বলে ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো। মেয়েটি শুধু রূপবতীই নয়, মধুভাণ্ডের চারিদিকে লোভী ভৃঙ্গের অবিরাম গুঞ্জনধ্বনির মত তার চারিদিকে নানা রূপ-রসিকের কূজন গুঞ্জন তার কানে মধুবর্ষণ করত। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার অটুট যৌবনের প্রসাদ বিতরণের কার্পণ্য করত না মেয়েটি। অভাগা স্বামী তো পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে নোঙর ফেলে তার দিন গুজরান করত, আর তার বিরহের অবকাশকাল বধূটি বহুবিচিত্র প্রণয়লীলায় ভরিয়ে তুলত।

এমনি করেই কাল যায়। বধূটির প্রণয়কুঞ্জে তখন দুটি তরুণ প্রেমিকের আনাগোনা। দুজনই আরমানী। এবং একদিন কলকাতার বৃক্ষবেষ্টিত সদর রাস্তায় সেই দুই আরমানী যুবকের একেবারে একহাত লড়াই হয়ে গেল। জগৎ সিংহ আর ওসমানের দ্বন্দ্ব আর কি! এক আকাশে দুই চন্দ্রের অস্তিত্ব অসম্ভব। কলকাতার গোরাপাড়ার :মেম-সাহেবরা জানলার কাঁচ দিয়ে জলজল করে এই লড়াই প্রত্যক্ষ করল। এবং পরম পরিতৃপ্তিসহকারে শুনল, এই হাতাহাতির আনুষঙ্গিক খেউড়।

এর পর কথায় কথায় এমন মুখরোচক কাহিনীটা উঠল গিয়ে একেবারে খাস গভর্নরের কানে। তিনি তো চটেই লাল। অ্যাঁ, এ কি অনৈসরন কাণ্ড, কোম্পানীর শহর কলকাতায়! তিনি কলকাতার কোতোয়ালকে হুকুম দিলেন সেই আরমানী ছোকরা দুজনকে ডেকে আনতে। এবং আসতেই জোর ধমক লাগালেন তাদের, কি পেয়েছ কি হে শহর কলকাতায়। সমাজ ধর্ম কি কিছুই নেই নাকি? এসব ঢলাঢলি চলবে না কোম্পানীর রাজত্বে। ফের যদি শুনি কোনদিন, দুজনকেই গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেব শহর থেকে। সোজা বলে দিচ্ছি বাপু। এমনভাবে বললেন, গলায় ধাক্কা দিয়েই দিলেন আর কি! মাথা হেঁট করে দুই প্রেমিকপ্রবরই শুনলে কলকাতার গভর্নরের শাসানি। তর্জনগর্জন। আর একবার বাজখাঁই গলায় ধমকে উঠে গভর্নর বললেন, যাও এখন। কথাগুলো মনে থাকে যেন।

ছোকরা দুটো বেরিয়ে গেল ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নরের চকমিলান প্রাসাদের প্রশস্ত কক্ষ থেকে। কিন্তু একটু পরেই ফেরত এল একজন। ছোকরা একটু বেশি চালাকচতুর। 'ইয়েস। হোআট'—গভর্নর একটা মোটা বইয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন।

মুখ তুলে বললেন, 'কি চাও তুমি?' —'আমার কিছু বক্তব্য ছিল সার' ছোকরা বার দুই 'বাউ' করে আমতা আমতা করে বললে। '—হোআট' গভর্নর ভ্রূকুটি করে আর একবার যেন দাবড়ে উঠলেন। ছোকরার গলায় কাতর অনুনয় শোনা গেল— 'ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না সার'। সমাজ-ধর্মের ধ্বজাটা পতপত করে উড়িয়ে গভর্নর এবার বাজের মত ফেটে পড়লেন, 'হোআট ডু য়ু মিন।' আরমানী প্রেমিক ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বুঝিয়ে দিলে যে, মেয়েটি ছাড়া তার জীবনের কোন অর্থই হয় না এবং সেই কারণেই সে গভর্নরের শরণাপন্ন। এবং গলাটা খাদে নামিয়ে বেশ স্পষ্ট করেই বললে ছোকরা—'আই হ্যাভ ব্রট ইওর ফি সার।' দেখা গেল কথাটায় মন্ত্রের মত কাজ হল।' এ যেন সে সাহেবের গলাই নয়। অত্যন্ত ভদ্রভাবে বেশ মিষ্টি করেই সাহেব বললে, 'হাউ মাচ?' ছেলেটি আর জবাব দিলে না। শুনে শুনে পাঁচশটি মুদ্রা সাহেবের হাতে ধরিয়ে দিলে। আর তারই বিনিময়ে সেই দরিদ্র ইংরেজ খৃস্টান নাবিকের বধূটির ওপর তার ষোলআনা অধিকার লাভ করলে। এবং অচিরে সেই মেয়েটিকে নিয়ে পাড়ি জমালে কলকাতা থেকে হুগলী। সেখানে সে বেশ বড়গলায় গভর্নরের মহানুভবতার প্রশস্তি করতে লাগল! এদিকে সেই গরীব নাবিক যখন বউ-এর ব্যাপার নিয়ে কলকাতা কাউন্সিলে অভিযোগ করলে, গভর্নর তো তাকে খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে এল। যেন তার অভিযোগ এনেই সে চোরের দায়ে ধরা পড়েছে। গভর্নর তাকে অম্লান বদনে পরামর্শ দিলেন যে এখন আর জলঘোলা করে লাভ নেই। বউটাকে পরিত্যাগ কর। আহা, এ নইলে বিচার! যাঁরা ইংরেজ জাতির চরিত্রগত সততা ও দার্ঢ্যের কথা উদ্বাহু হয়ে উচ্চৈস্বরে প্রকাশ করে থাকেন, তাঁদের অবগতির জন্যে জানা প্রয়োজন—কলকাতার এই ইংরাজ গভর্নরটির নাম এণ্টনি ওয়েল্টডেন। এই ঘটনার কয়েক মাস আগেই তিনি কলকাতার শাসনকার্যের গুরু দায়িত্বভার নিয়ে খাস বিলেত থেকে এদেশে এসেছিলেন। ভদ্রলোকের চক্ষুলজ্জা এতই কম যে, তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে তাঁর ঘুষের কারখানায় দিব্যি লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁরাই অনেক ক্ষেত্রে টাকাটা ঠিক করে দিত। বুঝে নিত। করাপসনের এমনি গুরুদেব ব্যক্তি ছিলেন ইনি। যাকে বলে 'করাপসন কুলচূড়ামণি'।

এই কাহিনী যিনি বিবৃত করেছেন, তিনিও একজন ইংরেজ। নাম আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন। অনেকেই এঁর সঙ্গে ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিল্টনকে গুলিয়ে ফেলেন। ফেলেন এই কারণে যে, উভয়ে একই সময়ে কলকাতায় এসেছিলেন। আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন কলকাতায় এসেছিলেন সতের শ' আট সালের কাছাকাছি সময়ে।

সমসাময়িক কলকাতার পরিচয় পেতে গেলে কিন্তু আর এক হ্যামিল্টনের বৃত্তান্ত পড়তে হবে। তার বৃহৎ গ্রন্থ 'এ নিউ এ্যাকাউন্ট অফ দি ইস্ট ইণ্ডিজ'। সেই গল্পই বলা যাক।

কোম্পানীর কাগজপত্রে আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টনের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় সতের শ' আট সালের আটই নভেম্বর। ঐ তারিখের কোম্পানীর এক নথিতে জানা যায় ঐ সময়ে হ্যামিল্টনে তাঁর বাড়ী ২৯০২ টাকায় মর্গেজ রাখেন এবং কোম্পানী সেই ট্রানজাকশনে সম্মতি দেন। কাজেই হ্যামিল্টন এর আগেই এসেছিলেন কলকাতায়।

এঁর দুই খণ্ড বই-এ তাঁর ইস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণের কাহিনী বিবৃত আছে। আছে কলকাতা ও বাঙলা দেশের বিবরণ। এটি মূল্যবান। নিজে নাবিক বলে এতে সেকালের বঙ্গোপসাগরের মুখ থেকে কলকাতা পর্যন্ত নাব্যপথটির নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে। তাঁর বিবরণে দেখা যাচ্ছে হাওড়ার নাম ছিল তখন রামনগর। সেখানে ভালো কাপড় ও সিল্কের রুমাল তৈরি হত। ব্যাঙ্কশাল কোর্টের কাছে ছিল ডাচকুঠি। সাগরদ্বীপে তখনও বহু লোক তীর্থ করতে যেত। এবং কেবল নবকুমারকেই নয়, বহু লোককেই হামেশা বাঘে খেত সেখানে। পর্তুগীজরা সব শাহসুজার কাছে কাজ করত। মীরজুমলার কাছে সুজা হেরে যাবার পর আশ্রয়হীন পর্তুগীজরাই নাকি বোম্বেটে হয়ে যায়। হিজলীতে তখন বেশ সস্তায় শুয়োর বিক্রি হত। পঞ্চাশ থেকে আশি পাউণ্ড ওজনের একুশটা শুয়োর হ্যামিল্টন স্বয়ং কিনেছিলেন মাত্র সতেরো টাকায়!

হ্যামিল্টন যেকালের কথা বলেছেন, তখনও নক্সা ফেলে হিসেবমত গড়ে ওঠে নি ফোর্ট উইলিয়ম। হ্যামিল্টন দুর্গটাকে বলেছেন 'ইরেগুলার টেট্রাগন'। ইঁটের গুঁড়ো অর্থাৎ সুরকি, চুন আর কোতরা গুড় দিয়ে সেকালের গাঁথনি হত ইঁটের। আর সেইভাবেই পত্তন হয়েছিল আদি ফোর্ট উইলিয়মের। সেকালে শহরের বাড়ীঘরও তৈরি হত এলোমেলো। যার যেখানে খুশি, খানিকটা জায়গা ঘিরে বাড়ী ফেঁদে বসে যেত। অবশ্য সাহেবদের রুচি ছিল। সেকালেও বাড়ীর সামনে বাগান করতে ভুলত না কেউ। আর কলকাতার স্বাস্থ্য? সেকথা না বলাই ভাল। কলকাতা কমলালয় নয়, যমালয়। অবশ্য ডাক্তার না হয়েও তার কারণ নির্দেশ করেছেন। হ্যামিল্টন বলেছেন, কলকাতার তিন মাইল উত্তর-পূর্বে ছিল লবণ হ্রদ। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বানভাসি হয়ে সেই হ্রদ আর শহর কলকাতা একাকার হয়ে যেত। আর সেই সঙ্গে ভাসত হাজার হাজার মাছ। নভেম্বর-ডিসেম্বরে যখন সেই বানের জল সরে যেত, মাছগুলো থাকত পড়ে। সেগুলো পচত। শুকোত।

আর সেই পচা দুর্গন্ধে সারা কলকাতার বাতাস বিষিয়ে উঠত। এবং এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—ধুন্দুমার লেগে যেত মড়কের। হ্যামিলটন তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানাচ্ছেন যে, এক বছর তিনি নিজে এই সময় ছিলেন কলকাতায়। সে বছর আগস্ট মাসে সামরিক-অসামরিক বাসিন্দা নিয়ে কলকাতার লোকসংখ্যা ছিল বারশ'। অবশ্যই এটা গোরা বাসিন্দাদের হিসেব। এবং সে গণনায় গোরা মাঝিমাল্লারাও বাদ পড়েননি। জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে দেখা গেল চারশ ষাটজনের নাম কবরখানার রেজিস্ট্রারে ট্রান্সফার করা হয়েছে

তা সাহেব শুধু রোগের কথাই বলেননি। তাঁর বিচার আছে। তিনি হাসপাতালের কথাও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এখনকার পাথুরে গির্জার পাশেই ছিল কলকাতার প্রথম হাসপাতাল। এবং এই হাসপাতাল সম্বন্ধে তাঁর উক্তি ঐতিহাসিক। সাহেব লিখেছিলেন—'দি কোম্পানী হ্যাজ এ প্রেটি গুড হসপিটাল এ্যাট ক্যালকাটা হোআর মেনি গো ইন টু আণ্ডারগো দি পেনান্স অফ ফিজিক, বাট ফিউ কাম আউট টু গিভ আন অ্যাকাউণ্ট অফ ইটস অপারেশন।' অর্থাৎ 'কোম্পানীর কলকাতায় একটি সুন্দর হাসপাতাল আছে। অনেকেই সেখানে তাদের চিকিৎসার জন্য যায় কিন্তু কদাচিৎ কেউ তাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে ফিরে আসে।'

সেকালে কোম্পানীর গভর্ণরের জন্য একটা প্রশস্ত বাগান ছিল এবং সেখান থেকেই যে তাঁর শাকসব্জী আসত, হ্যামিলটন সে কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর জন্যে কোম্পানী পুকুরেরও ব্যবস্থা করেছিল। সেখান থেকে আসত কোম্পানীর গভর্নর-বাহাদুরের বাটা, খোরসোলা আর রুই মিরগেল মাছ!

সে সময়ের কলকাতার একটি খৃস্টান চার্চ ছিল আজকের রাইটার্স বিল্ডিং-এর পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে। সতের শ' সাঁইত্রিশ সালের ঝড়ে গোবিন্দরাম মিত্তিরের নবরত্ন মন্দিরের চূড়ার সঙ্গে তার মাথাটাও ভেঙে পড়ে। হ্যামিল্টন সেটার কথাও বলেছেন। বলেছেন সেটা নাবিকদের দানের অর্থে তৈরি হয়েছিল। তবে সেকালের চার্চে যাজক প্রায়ই পাওয়া যেত না। কেননা নিত্য যীশু-ভজনা গানও তাদের কলকাতার আবহাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারত না। কোম্পানী তখন ধরে ধরে আনকোরা সব রাইটারদের যাজকের কাজ করাত। এ কাজটা অবশ্য শুধু হাতে করতে হত না তাদের। বাড়তি দক্ষিণা পেত পঞ্চাশ পাউণ্ড—কিন্তু ঠিক কাজের জন্যে না, হ্যামিল্টন বেশ ঠাট্টা করে বলেছেন, 'ফর দেয়ার পেনস ইন রিডিং প্রেয়ারস এণ্ড সারমনস অন সাণ্ডেস।' অর্থাৎ রবিবার রবিবার প্রার্থনা গান ও বাণী দেবার কষ্ট স্বীকার করার জন্যে!

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতায় সাহেব-মেমদের দিনচর্চার একটি ছবিও হ্যামিল্টন সাহেব রেখে গেছেন। সাহেবরা সকালের দিকে কাজকর্ম করত। অফিস-আদালত যেত। কোর্ট-কাছারি করত। এবং দুপুরবেলার আহারের পর করত বিশ্রাম। গভীর বিশ্রাম। সন্ধ্যাবেলায় পাল্কি বা ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে খোলামাঠে ঘুরে বেড়াত। কিম্বা বজরা চেপে গঙ্গায় একটু ঘুরে আসা। সাহেবদের পাখী মারার শখ বা মাছ ধরার কথাও বলেছেন হ্যামিল্টন। রাতে তাঁরা এ'র-ওঁর বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন। তখন কেউ আর নিজ নিজ পদমর্যাদা সম্বন্ধে নাক উঁচু করে থাকত না। না সাহেব না মেম, কেউ না।

তবে কলকাতার কথা সাতকাহন করে বলবেন আর কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার কথা বলবেন না, এ কি করে হয়। হ্যামিল্টন সেই বেয়াড়া মানুষ—জব চার্নকের কথাও বলেছেন এবং চার্নকের মৃত্যুর মাত্র কয়েকটা বছর পরেই তিনি কলকাতায় এসেছিলেন বলে জব চার্নকের সম্বন্ধে তাঁর শোনা গল্প খানিকটা ঐতিহাসিকতারও দাবী রাখতে পারে। হ্যামিল্টন বলেছেন, তাঁর এই নতুন নগরপত্তনে চারনক থাকতেন রাজার মত—'রেনড মোর অ্যাবসলিউট দ্যান এ রাজা।' একটা বড় পাতাঘেরা গাছের জন্যেই (ফর এ লার্জ শেডি ট্রি) নাকি জায়গাটা পছন্দ হয়ে যায় চার্নকের। এবং দিশী লোকেদের ওপর তাঁর নাকি অত্যাচারের সীমা ছিল না। কোনরকমে বেগড়বাঁই করলেই তাদের নিষ্ঠুরভাবে বেতপেটা করতেন চার্নক। এবং এই নৃশংস প্রহার নাকি চার্নক যখন মধ্যাহ্নভোজনে বসতেন তখনই শুরু হত। সপাসপ বেতের ঘায়ে সেই অপরাধীর পিঠের চামড়া ছিঁড়ে আসত, তারস্বরে চিৎকার করে সে গাঁ মাথায় করত আর চার্নক তাঁর ডিনার টেবিলে বসে রসিয়ে রসিয়ে মুরগীর ঠ্যাং চর্বণ করতেন!

চার্নকের বিয়ের কথাও রয়েছে। সেই যে সেই সুন্দরী মেয়েটি যাচ্ছিল সতী হতে; আর চার্নক যাচ্ছিলেন ঘোড়ায় চেপে লোক-লস্কর নিয়ে। সেই বিধবা বধূটির পাগল-করা রূপে এমনি মজলেন চার্নক যে তাঁর স্থানকাল জ্ঞান ছিল না। লোকলস্কর পাঠিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন মেয়েটিকে তার নিষ্ঠুর আত্মীয়দের হাত থেকে।

এবং চার্নক বিয়ে করলেন মেয়েটিকে। পাটনা থেকে নিয়ে গেলেন কাশিমবাজার। কাশিমবাজার থেকে হুগলী। আর হুগলী থেকে এলেন কলকাতায়। এবং সারাজীবন বেয়াড়া মানুষ চার্নক কোন অমর্যাদা করেননি সেই রূপসীর। এমনকি তাকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কোন চেষ্টা করেননি তিনি। কেবল অনেককাল পরে যখন মারা গেল মেয়েটি; তাকে তিনি সুন্দর করে কবর দিলেন

বোধহয় পুড়ে মরা থেকে সেই যে বাঁচিয়েছিলেন, সেই গোঁ বজায় ছিল কুঠিয়ালের। তাকে মাটির নীচে চিরকালের জন্যে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন, আগুনে পুড়ে ছাই হতে দিলেন না সেই আশ্চর্য রূপকে। চার্নকের সেই দেশী স্ত্রী তাঁর অনেকগুলি মেয়ের মা। এবং খৃস্টান চার্নক একটা কাজ করতেন প্রতিবছর। প্রতিবছর তাঁর বিবির মৃত্যু-তিথিতে তার কবরের পাশে একটি করে মুরগী কেটে তার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে নিবেদন করতেন। সেকালের খৃস্টানেরা এটা কেউই ভালো চক্ষে দেখেনি। হ্যামিল্টনও না। কিন্তু চার্নক—সে তো বেয়াড়া। এমনি করেই সেই দামাল মানুষটি কাটিয়ে দিলেন তাঁর কলকাতার সংক্ষিপ্ত কাল। অন্তত হ্যামিল্টনও তাই শুনেছিলেন।

কিন্তু কলকাতা বলতে তো কোম্পানীর ফোর্ট উইলিয়ম। তা সেই দুর্গে সৈন্য থাকত কত? রক্ষা ব্যবস্থা ছিল কি? হ্যামিলটন বলেছেন, আরে সে কেবল নামেই। দুর্গে সৈন্য থাকত দু'শ থেকে তিন শ'। কিন্তু সে সৈন্য কি লড়াই করবার জন্যে? না। কক্ষনো না। পাটনা থেকে কোম্পানীর সোরা আসে না? কাঁচা রেশম, কাটা কাপড়ের চালান, কিছুবা আফিং- নৌকাভর্তি—সেগুলি পাহারা দিয়ে আনবার জন্যেই তাদের ব্যবহার করা হত। হ্যামিল্টন বলছেন, তা ছাড়া কোম্পানীর সৈন্য করবেই বা কি? মুঘল ফরমানের জোরে তাদের কলকাতায় বসতি। কে তাদের গায়ে হাত দেবে? আর খাস মুঘল দরবারের সঙ্গে লড়াই? তা হলে মুঘলরা মিছিমিছি লড়াই করবেই বা কেন? তারা কোম্পানীর বাণিজ্য বন্ধ করে দেবে। তা হলেই লড়াই শেষ।

হ্যামিলটন সাহেব সৈন্যবাহিনীর যে হিসেব দিয়েছেন, সেটা অনেকটা খাঁটি। কোম্পানীর সরকারী সূত্রে জানা যায় যে সতের শ' উনিশ সাল নাগাদ ইংরেজদের সৈন্যবাহিনী ছিল দুটি। একটি মেজর হান্টার এর অধীনে। অপরটির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কাপ্তেন ডালিবার। প্রথমটিতে সব নিয়ে এক শ' তেতাল্লিশটি লোকলস্কর। দ্বিতীয়টিতে একশ' কুড়ি। তবে তারা যে নিতান্তই নির্বিষ ভুজঙ্গ, শুধু কুলপানা চক্র ছিল, এটা বোধহয় ঠিক নয়। সতের শ' সতের-আঠার সালেই তারা বরানগর মাঠে পলাশী যুদ্ধের মহড়া দিতে শুরু করেছিল, তার প্রমাণ আছে।

হ্যামিলটনের বিবরণে কলকাতার আম-জনতা—বাঙালীদের সম্বন্ধে বড় একটা উল্লেখ নেই। তবে কলকাতার সেই আবির্ভাব লগ্নে সেখানে তারা যে দোল-দুর্গোৎ-সব-রথযাত্রার বিপুল আনন্দোচ্ছাসে অংশ গ্রহণ করত সেকথা সাহেব বলতে ভোলেন নি। তবে সেই আদ্যিকালেই পান থেকে চুন খসলেই সাহেবেরা যে বঙ্গজনের ওপরে অত্যাচার করত—জরিমানা করত কিংবা গারদে পুরত বা ধরে ধরে চাবকাত

সেটুকু হ্যামিলটন সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। সেকালের কালা জমিদার—নন্দরাম সেন, জগত দাস, রাম ভদ্র—প্রভৃতির যে দুর্গতি হয়েছিল জন-কোম্পানীর হাতে—হ্যামিলটনের এই উক্তির আলোকে ঘটনাগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এবং যাঁরা বিচার করতেন, সেই কলকাতার কাউন্সিল, তার গভর্নর, তাঁরা যে কি বস্তু ছিলেন, সে ত অনেকেই জানেন। হ্যামিলটন আরও এক কাউন্সিলের 'মেম্বার' পরে গভর্নর—রালফ শ্যেলডনের গুণের কথা শুনিয়েছেন। এই নাটকীয় ঘটনার তিনি শুধু নীরব সাক্ষীই ছিলেন না, বড় একটা ভূমিকাও ছিল আলেক্সাণ্ডার হ্যামিল্টনের।

সেটা হল পেরিন বলে এক জাহাজী কাপ্তেনের গল্প। সে বেচারা রালফ শ্যেল-ডনের কাছে পাঁচশ টাকা ধার নিয়ে একটা তমসুক লিখে দিয়েছিলেন পারশ্যে যাবার আগে। শ্যেলডনের বেনামী একটা জাহাজের কাপ্তেন ছিল পেরিন। কথা ছিল, বাঙলা দেশে ফিরেই টাকাটা দিয়ে খতটা ফিরিয়ে নেবে। এখন পারশ্যে কাজ মিটিয়ে আসবার সময় পেরিন, কি যেন মনে হল একবার গোয়ার বন্দরে জাহাজ ভেড়ালেন। এখানেই শুরু হল রঙ্গ। সেখানে শস্তায় একটা জাহাজ পেয়ে নিজের টাকায় সেটা কিনে নিলে পেরিন। আর জাহাজ যখন পেল, তখন তাতে মাল-বোঝাই করবে না, সেকি হয়। কালিকটে নোঙর গেড়ে সস্তায় মরিচ দারুচিনি পেয়ে তাতেই জাহাজ ভরে ফেলল। সস্তা পারশী সুরাও কিছু সওদা করল নিজের জন্যে। এইসব কাজ-কর্ম মিটিয়ে ঢু মারলে মাদ্রাজে। ফোর্ট সেন্ট জর্জে। কিন্তু মনে মনে যে আশা নিয়ে সেখানে নামল পেরিন, তার কিছুই পূর্ণ হল না। তার পারস্য মদের পেটি কারও পছন্দ হ'ল না। বেসাত না হতে, গুটি গুটি ফিরে এল কলকাতা।

এসেই প্রথমে পাদবন্দনা করলে মহাজন রালফ শ্যেলডনের। তার মনিবের ব্যবসার রিপোর্টই দিলে না, খোলামনে নিজের সওদার কথাও বললে। তার মালপত্র থেকে হুজুর কি কিনতে ইচ্ছা করেন? কিন্তু শ্যেলডন তখন নিষ্কাম পুরুষ। সাফ বলে দিলে 'ওসব ব্যাপারে আমি নেই বাপু। আমার যা' প্রাপ্য সুদ সমেত সেটা উসুল করে দাও। আমি তাতেই খুশী। বাজারদরে ঐ টাকায় যে মরিচ 'পেপার' হয়, সেটুকু আমার নিজের গুদামে পাঠিয়ে দাও।' তথাস্তু। যথা আজ্ঞা। পেরিন মহাজনের কথামত বস্তাভর্তি মরিচ শ্যেলডনের গুদামে পাঠিয়ে দিলে। তারপর একদিন হাজির হ'ল ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের সামনে শ্যেলডনের চক-মিলান বাড়ীতে।

শ্যেলডন তখন কিন্তু অন্য মানুষ। পেরিন সবিনয়ে তার তমসুকের কাগজখানা

ফেরৎ চাইতেই তিনি ত একেবারে খিঁচিযে উঠলেন, 'কাগজ'* কিসের কাগজ? আমার টাকা, আমার জাহাজ। আর তুমি ত দিব্যি ব্যবসা করে এলে। তোমার মত শঠ লোক ত দুনিযায় দেখিনি দুটো। তোম'র কাগজ আমার কাছে রইল। বেশি ঝামেলা করলে তোমাকে সিধে করবার এই অস্ত্র ব্যবহার করা হবে।'
পেরিনের ত আক্কেল গুড়ুম। বলে কি লোকটা। কিন্তু সেও অনেক ঘাটের জল-খাওয়া মানুষ। সে জানে শ্যেলডন কলকাতা কাউন্সিলের সভ্য। কলকাতার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। তাঁকে সে হযত বলতে পারত, আমি না হয় শঠ, কিন্তু তুমিই কি সাধু। পারশ্যে গিযে নিজে ব্যবসা করা না হয আমার অপরাধ, কিন্তু কোম্পানীর চাকুরে হযে তুমিই বা ব্যবসা কর কোন আইনে? কিন্তু জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ, বুদ্ধিমানের কাজ নয় কাজেই পেরিন সে দিক দিযে গেল না। বললে, 'কসুর মাপ হয হুজুর। আপনি মহানুভব। দযালু। ক্ষমা ঘেন্না করে তমস্থকটা যদি দেন, তাহলে আপনার জযধ্বনি দিতে দিতে চলে যাই'

কিন্তু শ্যেলডন সে বান্দাই নয। পেরিনকে স্রেফ হাঁকিযে দিলেন তিনি। শুধু তাই নয, পাযে পা দিযে ঝগড়া শুরু করলেন। তিনি রটাতে লাগলেন যে, পেরিন পারশ্যের যে মদের পেটি এনেছে সেগুলি একেবারেই বাজে মাল। ঘরে ঘরে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। 'আব যা' রটে তাব কিছুটা বটে। সেই ভেবে কলকাতার সাহেববা কেউ সে মাল নিলে না। পেরিন যাকেই বলে সেই মুখ ঘুরিয়ে নেয। প্রকারান্তরে শ্যেলডন চাইছিলেন পেরিন মালটা কম দরে তাকেই দিয়ে দিক। বলাবাহুল্য পেরিন তাতে গররাজী।

এহেন সময হ্যামিল্টনের সঙ্গে পেরিনের মোলাকাৎ হযে গেল। সেদিন আসন্ন সন্ধ্যার রাঙা রঙে কলকাতার পশ্চিম আকাশ ছেযে ফেলেছিল। তারই প্রতিসরিত আলোয ফোর্ট উইলিযমের শিখরগুলি লালে লাল। রক্তের রঙ ধরেছিল কোম্পানীর সদ্যগড়া চার্চের চূড়োয। রেড ট্যাঙ্কের জলে। আর ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের ছাযা নিবিড় বনতলে। সেখানে দক্ষিণ বাতাসের আলোড়নে সবুজ ঘাসের আশ্চর্য সুষমায চোখ জুড়োয। মন ভরে ওঠে। আর রৌদ্রদগ্ধ নর-নারীর ভিড় বাড়ে।

কথায কথায পেরিন বললেন হ্যামিলটনকে তাঁর দুঃখের কথা। দুর্দৈবের কথা। ব্যবসা ত বন্ধই। শ্যেলডন তার জাহাজের কাপ্তেনের চাকরী থেকেও নাকি সরিযে দেবে পেরিনকে। হ্যামিল্টন তখন তিন-চারটে বড় বড় জাহাজের মালিক। কিন্তু কলকাতার ইংরেজ সরকারের তিনি বড় বিরাগভাজন। কেননা, তিনি ইণ্টার-লোপার। ইংরেজদের আইনকানুন বড় একটা মানতে চান না। তাঁর নিজের সুবিধে অনুযায়ী ব্যবসা করেন। পেরিনের দুঃখ তিনি তাই বুঝলেন বটে, কিন্তু

বিশেষ কিছু করলেন না। কেবল বললেন, যদি শ্লেলডনের জাহাজ থেকে তাঁর চাকরী যায়, তিনি তাঁকে নিয়ে নেবেন।

কিন্তু পেরিনের তখন মস্ত মুস্কিল তার পারশী মদের পেটি নিয়ে। সেগুলি জাহাজে পড়ে আছে। মাদ্রাজে যে সেগুলি বিক্রি হয়নি, সেকথা কি করে জানি চাউর হয়ে গেছে। তাছাড়া মদটাও যে খারাপ শ্যেলডন ত সেকথা কাউকে আর বলতে বাকী রাখেননি। পেরিন গিয়ে ধরল হ্যামিলটনকে। হ্যামিলটন বললেন, মদের পেটিগুলো নৌকা করে তাঁর জাহাজে তুলে দিতে। কেউ যেন খবরটা বিন্দুবিসর্গ না জানতে পারে। পেরিন তাই করলে। আর কদিন পরেই হ্যামিলটন যে সব সাহেব বাঙলাদেশ ছেড়ে বিলেতে চলে যাবেন সেই মাসে, তাদের একটি ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন। কলকাতার ছোট-বড় রহিস সবাইকেই বললেন সেই সান্ধ্যভোজে। আর মনোরম সেই ভোজসভায় পরিবেশন করলেন পেরিনের আনা মদ্য।

একপাত্র পেটে পড়তে যা' দেরী। সবাই ধন্য, ধন্য, করতে লাগল। সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, এমন খাসা মাল হ্যামিলটন পেলেন কোথা থেকে? হ্যামিলটন হেসে বললেন, জানেন ত ব্যবসায়ী মানুষ। এবারে বাজারে যে মদের টান হবে, সেটা মোটামুটি আন্দাজই করা ছিল। তাই এক জাহাজ মাল সুরাটে কেনা ছিল। এই কদিন আগে, কলকাতায় আনিয়ে নিয়েছি। সবাই এক এক পেটি মদের জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। হ্যামিলটন ঝানু ব্যবসাদার। বললেন, 'এত কি হবে? দেখি, আপনাদের বরাত দিয়ে যান, যতটা হয় পাঠিয়ে দেব।'

সবটাই অবশ্য পরের দিন পাঠিয়ে দিলেন। তবে দাম নিলেন পেটি প্রতি দ্বিগুণ। অবশ্য পেরিনকে দাম দিলেন সেই আগেরই হিসেবে। এবং এর ফলে পেরিন সাহেব তার বাজারের দেনাপত্তর মিটিয়ে দিল। কিন্তু যেটা মেটাতে পারলে না সেটা রালফ শ্যেলডনের রাগ। এবং তাঁর ক্রোধবহ্নি মাথায় নিয়েই একদিন সে মারা গেল। শ্যেলডনের সেই তমসুকখানি তখনও সে ফেরৎ পায়নি।

সদ্য-গড়া কলকাতার সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির সব ছবিই আজ দুষ্প্রাপ্য। কিছু বা কালের নিষ্ঠুর হস্তাবলেপে বিবর্ণ। সেই অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে যেগুলি বেঁচে আছে হ্যামিলটনের কলকাতার বিবরণ তাদের মধ্যে অন্যতম। এবং সেই কারণেই সেগুলি মূল্যবান।

শহর কলকাতায় প্রথম সরাইওলা কে? সে পদ-গৌরব বোধকরি তাঁকেই দেওয়া যায়, কলকাতার জলাভূমির বুকে যিনি নগর পত্তনের স্বপ্ন নিয়ে একদিন হাটখোলায় নৌকা ভিড়িয়েছিলেন—সেই জব চার্ণককে। যদিও ইংরেজ রাজত্বের সেই উষালগ্নে অতি দুঃসাহসী জব চার্ণকও তাঁর হোটেলের ব্যবসা স্বনামে চালাতে সাহস করেননি। সরাইটা ছিল বেনামীতে। খাতা-কলমে তার মালিক ছিলেন কাপ্তেন হিল। চার্ণকের কলকাতা উপনিবেশের যিনি ডান হাত। এবং যাঁর জন্যে অনেকে মনে করেন, চার্ণকের বরাতে শুধু অনেক উপরিই জোটেনি বহু বদনামও জুটেছিল।

হিল সাহেব জবরদস্ত লোক। দুর্দান্ত দাপট। রাখিলে রাখিতে পারেন, মারিলে মারিতে। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন কাজেই পিছপা নন। তার উপর স্বয়ং চার্ণক তাঁর মুরুব্বি। সাহেবের সঙ্গে এঁটে ওঠে কে? শোনা যায়, সেই মহামান্য হিলের সঙ্গে কেউ একটু বেগড়বাই করলেই সাহেব লোকজন দিয়ে তাকে দিতেন বেদম প্রহার। অন্যথায় ডুয়েলের আহ্বান। আর তার বউ? যেমনি রণচটা, তেমনি দজ্জাল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কলকাতার এই আদর্শ দম্পতি হিল ছিলেন আদর্শ সরাইওলা। বলবার মত 'টাভার্ন' বলতে তাঁরই।

জব চার্নক ও কালকাতা প্রসঙ্গে আমরা আদ্যি কালের কলকাতার অবশ্য চারটে হোটেলের লাইসেন্স দেবার কথা উল্লেখ করেছি। তাদের লাইসেন্স ফি ছিল পঞ্চাশ টাকা করে। মনে হয় এই চারটে ভিকচুয়ালিং হাউসের একটা ছিল বিখ্যাত হিল সাহেবের।

অবশ্য এই ট্রাডিশন সমানে চলেছিল, কেননা কলকাতার প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্ত্রী শ্রীমতী ইমহফেরও একটা 'টাভার্ন' ছিল। তাঁর মুৎসুদ্দি পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ পরিবারের আদিপুরুষ—শ্রীমতীর বেনিয়ান—সেটি চালাতেন আর দু'হাতে টাকা কামাতেন।

নীলদর্পণের মামলাখ্যাত রেভারেণ্ড লঙ বলছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি লালবাজারের কাছে অ্যাপলো টাভার্ন নামে একটা সরাই ছিল। সেকালের বেশ ফ্যাশনবেল সরাই। তারই এক অনুজ্জ্বল সভাগৃহে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলের এক জরুরী সভা বসেছিল। সতের শ' আটচল্লিশ। বারই ডিসেম্বর। কলকাতার গভর্নর তখন উইলিয়ম বারওয়েল। কোম্পানীর জাহাজের বোহেড লোকলস্কর রবার্ট উইলসন বলে এক ব্যবসায়ীর জাহাজে এসে হামলা করে। জাহাজ

পুড়িয়ে দেবার হুমকি দেয়। উইলসন কোম্পানীর সাহায্য চেয়ে পাঠান। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। বিশেষ বেকায়দায় পড়ে উইলসন করলেন খাস কাউন্সিলে এই আবেদন। সেকালের পুরানো নথিপত্রে দেখা যায় সেই মামলার বিচার করে কাউন্সিল এই অ্যাপলো হোটেলের কামরায়।

কিন্তু বলতে কইতে বেশ বড়সড় হোটেল বসে কলকাতায় পলাশী যুদ্ধের বছর-খানেক বাদে। এর জন্যে নাকি হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হয়েছিল! বিজ্ঞাপন ছাপান হয়েছিল। সেকালের কাশীতলা বাজার, এখনকার বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট থেকে বেরোন মেরিডিথ লেনে সেই সরাইখানাটি খোলেন জে-ট্রেশাম নামে এক করিৎকর্মা ইংরেজ। ট্রেশাম তাঁর নব-প্রতিষ্ঠিত সরাইখানার দেদার ঢাক পিটিয়ে বলেছিলেন—'লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন মে বি ফারনিশড য়ুইথ ডিনারস, সাপারস, কোল্ড কোলেশনস অন দি সর্টেস্ট নোটিস। বিসকিটস অফ অল কাইণ্ডস, টার্টস এণ্ড টার্টলেটস ফ্রেশ এভরি ডে।' অর্থাৎ বলার সঙ্গে সঙ্গে শুধু মধ্যাহ্নে বা নৈশভোজনের আয়োজনই করা হয় না, ভদ্রমহোদয় এবং মহোদয়াদের জন্য শীতল লঘু আহারেরও বন্দোবস্ত রয়েছে। সবরকম বিস্কুট, ফলফুলুরি, ফুলুরি কচুরির সরেস আয়োজন প্রতিদিন। সাহেবদের কলকাতা ছেড়ে মাঝে মাঝে বেশ দীর্ঘ নৌযাত্রা করতে হত। অনেক সময় বাইরে যেতে হত দীর্ঘদিনের জন্য। পথে যাতে খাবার কষ্ট না হয়, ট্রেশাম সাহেবের সরাই খানা থেকে তাই বিক্রি হত কৌটায় ভরা রান্নামাংস। তা সে সব রকম। এসব ছাড়াও কেক,জ্যাম, মার্মালেড—চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় কিছুই বাদ ছিল না ব্যবস্থার।

ট্রেশাম সাহেবের এই সরাইখানা কিন্তু বেশীদিন তাঁর হেফাজতে থাকেনি। লক্ষ্মী চঞ্চলা। কয়েক মাসের মধ্যেই ব্যবসাটির হাতফের হয়। তাই বুঝি রেওয়াজ ছিল, ছ মাস—এক বছরের জন্যে লোকে 'লিজ' নিত। তারপর আবার অন্য মালিক। তবে এই অল্প সময়ের মধ্যেই মালিকদের বেশ দু পয়সা দিয়ে যেত। কেননা, সরাই-এর ব্যবসা যে লাভজনক এবং অনেক সময় মহিলারা পর্যন্ত সরাই চালিয়ে তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়েছিলেন, সেকালের সরকারী কাগজপত্রে তার প্রমাণ আছে। কোম্পানীর এক পল্টনের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী ফ্রান্সিস তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর কোম্পানীর কাছে একটা ছোটখাট সরাইখানা রাখার অনুমতি প্রার্থনা করেন তাঁর সংসার চালানোর জন্যে।

এ থেকে আর একটা খবর পাওয়া যাচ্ছে। সরাইখানা, যা নাকি, সেকালের টাভার্ন, পাঞ্চ হাউস বা গার্ডেন হাউসের বংশাবতংস—সেগুলি চালাবার জন্যে কোম্পানীর লাইসেন্স লাগত। ফি ছিল গোড়ার দিকে পঞ্চাশ, পরে বেড়ে হয় পাঁচশ।

হিকির কাগজে সতের শ' একাশিতে একটা বিজ্ঞাপন বেরোয় : কলকাতায় আর একটা নতুন সরাই। এর উদ্যোগী ইংরাজ সিংহ—রবার্ট বিসটন। করতেন মদের ব্যবসা, খুললেন হোটেল। এবং তাঁর পুরনো পেট্রনদের নতুন করে ও অধিকতর যোগ্যতাসহকারে সেবার জন্যই যে তাঁর এই নবতম উদ্যম, বিজ্ঞাপনে সেকথাও তিনি জানাতে কার্পণ্য করেননি। এবার হোটেলে যে প্রতি সপ্তাহে 'শেল ফিস' সরবরাহ করা হবে, তাও সগর্বে ঘোষণা করা হয়েছিল।

তবে সেকালের বেশ বড় সরাই ছিল নাকি লে গ্যালিস। বড় এই অর্থে, এর কারবার সব খানদানী লোকজনদের নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য রিচার্ড বারওয়েল মাসে অন্তত বার দুই তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে এখানে ফুর্তি করতে আসতেন। এই সরাইখানা থেকেই নন্দকুমারের মামলায় তাঁর বিপক্ষ দল মোহনপ্রসাদের উকিল-মোক্তারদের খানা যেত। আট দিন ধরে এই বিচার চলে। আর ষোলজন লোকের প্রত্যেকের আটটা ডিনার আর নয়টা সাপার লে গ্যালিস থেকেই সরবরাহ করা হয়। একটা মিলের চার্জ ছিল কম নয় ডিসপিছু সওয়া দু টাকা একুনে ছয় শ' উনত্রিশ টাকা। আর সেই নিয়েই চলে আর এক মামলা। নন্দকুমারের মামলার অন্যতম বিচারক জাস্টিস হাইডের নোট বইয়ে এই কাহিনী রয়েছে। সতের শ' ছিয়াত্তর। মার্চ ছাব্বিশ। জজ সাহেব তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন—নন্দকুমারের বিচারের সময় মোহনপ্রসাদের কৌঁসুলী, অ্যাটর্নী এবং তাঁদের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খাবারদাবার এবং অন্যান্য কিছু সরবরাহ করার মূল্য বাবদ লে গ্যালিসের প্রাপ্য বিলের টাকা আদায়ের জন্য একটি মামলা দায়ের করা হয়।

সতের শ' উননব্বই সালের কলকাতার নববর্ষের ভোজসভার আয়োজনও হয়েছিল এই লে গ্যালিসে। সংবাদে জানা যায় গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সেদিন খানা খেতে এসেছিল কলকাতার সম্ভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়। ভোজনপর্বে ছিল কাঁকড়া, টার্কি পাখির মাংস, এবং অন্যান্য স্বাদু স্বাদু পদাবলী। চব্বিশবার ইংলণ্ডেশ্বরের স্বাস্থ্য কামনা করে গ্লাস চিন্ চিন্ করা হয় এবং প্রতিবার টোস্টের পর ফোর্ট উইলিয়ম থেকে দাগে তোপ। এবং এইসব সরব সমারোহের নীরব সাক্ষী লে গ্যালিসের সেই আলোকোজ্জ্বল বর্ণাঢ্য রাত্রি।

ফরাসী সরাইওলা গ্যালিস সাহেব মারা যান সতের শ' একানব্বই সালে। বয়স চুয়ান্ন। তবে সাহেব মরলেও বিবি হোটেল চালিয়েছিল অনেক দিন। এবং সমান কৃতিত্বের সঙ্গে। কলকাতার ফিরিঙ্গীদের প্রথম সেণ্ট এনড্রুজ ডে তে ডিনারের আয়োজন হয় এই হোটেলেই। টাউন হল তৈরির জন্য যে সভা হয় এবং যে সভায় সে জন্যে লটারী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—সেটাও বসেছিল এই হোটেলেই।

লে গ্যালিস মনে হয় প্রায় শতায়ু হয়েছিল। হয়ত বা বহু হাতফেরতা হয়ে, কেননা, আঠার শ' সত্তর সাল নাগাদ মসিয়ে জ'া পল ক্রশো এসেছিলেন কলকাতায়। ক্রশো বহুদ্রষ্টা স্থাপত্যরসিক। এখানে এসে তিনি উঠেছিলেন এই হোটেলে। ক্রশোর বর্ণনায় দেখা যায় হোটেলটা ছিল ধর্মতলায়। স্ট্র্যাণ্ডের কাছেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতার এক নামকরা সরাইখানা—হারমনিক ট্যাভার্ন ছিল লালবাজারে। সেকালের সোসাইটি হোটেল কলকাতার সবচেয়ে দেখন-শোভন বাড়ি। এর মুরুব্বি ছিলেন সব তাবড় তাবড় খানদানী লোকেরা—মায় গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস পর্যন্ত। শ্রীমতী ফের কলকাতা দর্শনে এর উল্লেখ আছে। মাসে পনর দিন অন্তর এখানে পার্টি বসত। কিছু গান কিছু বাজনা-বলনাচ এবং সর্বশেষ খানাপিনা। এই মহোৎসবে হাজিরার একদা এক টিকেট পেয়েছিলেন শ্রীমতী ফে। কোন এক শ্রীমতী জ্যাকসনের দৌলতে। টেলর সাহেবের পার্টি। শ্রীমতী ফের রোজনামচা অনুযায়ী পার্টি ভারী জমেছিল। কোন এক খাস মেমসাহেব বাদ্যযন্ত্রে সোনাটা শুনিয়ে উষ্ণ আবেশ সৃষ্টি করেছিলেন কলকাতার সেই কুকুরকুণ্ডলী শীত সন্ধ্যার অতিথি সুজনের হৃদয়ে।

হেষ্টিংস-প্রণয়িনী মেরিয়া ইমহফ এসেছিলেন সবার শেষে। দেরী করে। বসেছিলেন শ্রীমতী ফে-র কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে। শ্রীমতী জ্যাকসন জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীমতী ফে মেরিয়াকে শুভসন্ধ্যা জানিয়েছেন কিনা। ফে বললেন, না। জ্যাকসন পত্নী বললেন, করেছেন কি ? এ যে অশালীনতা। বলেই একটা ফন্দি বাতলে দিলেন। কোনরকম চোখের পাতা না ফেলে শ্রীমতী হেষ্টিংসের দিকে চেয়ে থাকুন। এক সময়ে ওঁর সঙ্গে চোখাচোখি হবেই। এবং সেই সুযোগে—

যাকে বলে সাহেবী ম্যানার্স। তাই সই। অবশ্য বেশিক্ষণ তাকাতে হয়নি শ্রীমতী ফে-কে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চার-চক্ষুর মিলন। ফে-পত্নী নমস্কার করতেই শ্রীমতী হেষ্টিংস উঠে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে গেলেন। সতের শ' একাশি। জানুয়ারি।

হোটেল হারমনিকের হিকিও খদ্দের ছিলেন। কটুভাষী সাংবাদিক উইলিয়ম হিকি। তিনি যে একবার এখানে চল্লিশ জনকে একটা পার্টি দিয়ে বেশ সুনাম কিনেছিলেন, সেটা ত তাঁরই স্বীকারোক্তি। একালের মত সেকালেও এই নগরীর পান্থশালায় র‍্যালা যে বড় কম ছিল না—মদ, জুয়া. দীর্ঘরাত পর্যন্ত চিৎকার, হট্টগোল মাঝে মাঝে মারামারি, হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াত, হিকি সাহেবের কল্যাণে তারও নজির রয়েছে। এমন কি শেষ পর্যন্ত হোটেলের বাসনপত্র আসবাব পর্যন্ত রেহাই পেত না !

বল নাচ শেষ হতে মধ্যরাত। মহিলারা একে একে ঘরে ফিরতেন। কেউবা ভৃত্য পরিবৃত হয়ে। কারও বা পাশে থাকত ভাগ্যবান স্বামী। আর কাউকে পালকী বা চৌঘুড়িতে তুলে দিয়ে আসত তার কূজনমুখর ভালবাসার জন। বলত, তাদের অধীর হৃদয় বেদনার কথা। প্রণয়ের, প্রতিশ্রুতির কথা। গুনগুনিয়ে বলত তাদের গৃহমুখী প্রেয়সীর কানে কানে। আর আকাশে হাজার তারা অত রাত্রেও বসে বসে সকৌতুকে সেই রঙ্গনাট্য দেখতে থাকত।

কিন্তু মহিলারা চলে যেতেই হারমনিকের আর কোন 'হারমনি' থাকত না। তখন শুধু কর্কশ কণ্ঠের কলহ আবহাওয়া একেবারে উল্টো। কে বলবে কয়েকদণ্ড আগেই এখানের বাতাসে প্রণয় কূজনের মৃদুকোমল ধ্বনিতরঙ্গ ভেসে উঠে মিলিয়ে গেছে। কে কাকে কন্ট্রাক্ট দিয়ে ঘুষের টাকা পায়নি। ঘুষ দিয়ে পায়নি কাজ। তর্ক। মারামারি। চুলোচুলি। ঘুষোঘুষি—কি নয়। কিন্তু এইখানেই যদি নাটকের শেষ হত। সরাইওলা দু' শ লোকের খাওয়ান খরচ চেয়ে বসল উনিশ শ' সাতানব্বই সিক্কা টাকা। ভোজ যাঁরা দিয়েছিলেন, তাঁরা চোখ বড় বড় করে বললে, এ ত চাজ? আসলে মারামারির সময় বহু বাসনকোসন ভেঙে চুরমার। বিলে সরাইওয়ালা তার দাম ধরে নিয়েছিল। এই ঘটনা নিয়ে কবিতা ছাপিয়েছিল হিকির গেজেট।

এই হারমনিকের জীবন অনেকটা আতসবাজির মত। জ্বলে উঠে একেবারে হঠাৎ ই নিভে যায় হারমনিক। বাঁচবার চেষ্টা হয়েছিল লটারী করে। কিন্তু হল কই? এই বাড়িতে অবশ্য আর একটা নতুন হোটেল খুললেন বিয়ার্ড সাহেব। ফরাসী বাবুর্চি আনিয়েছিলেন। আঠার শ' চার সালের পয়লা জানুয়ারী এই নতুন হোটেলের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। এই সময়েই আরও একটা হোটেল খোলে ভ্যান্সিটার্ট রোতে। লালদিঘির দক্ষিণে। নাম লণ্ডন ট্যাভার্ন।

সেকালের এক হিসেবে জানা যায় আঠারশ' সালের কলকাতায় আটটা হোটেল, এগারটা ভাটিখানা তাছাড়া অনেকের বাড়ি-বাড়ি থাকা-খাওয়ার বেসরকারী বন্দোবস্ত। এদের মধ্যে আরও দুটো হোটেলের নাম জানা যায়—নিকল ট্যাভার্ন আর কাশীতলা বাজ'রের ইউনিয়ন ট্যাভার্ন।

সেকালে হোটেল ছিল আর মাছি ছিল না, সে কি হয়? এই মাছির উৎপাত নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলেন কলকাতার এক সাহেব সাংবাদিক -হোয়েন দি বাটার ওয়াজ মেল্টিং, দি ফ্লাইজ এট আপ দি কেক।' অর্থাৎ—মাখন যখন গলছিল মাছিগুলো কেকটা খেয়ে ফেলল। এতই দৌরাত্ম্য। আর এই মাছির মতই হোটেল ভাটিখানায় ভ্যান ভ্যান করত নিত্য নানা ঝুটঝামেলা—না' বেলেল্লাপনা, খুনো-

খুনি। তারই নজির হিসেবে অষ্টাদশ শতকের কোর্টের নথিপত্র হাতড়ালে বেশ কয়েকটা ফৌজদারী মামলার খবর পাওয়া যায়। যেমন ঘটেছিল টমাসের ট্যাভার্ন নিয়ে। জন টমাসের সরাই একেবারে কলকাতার পূর্বে মারাঠা খালের কাছে। এক কাপ্তেনের বয় হয়ে সাহেব এসেছিলেন কলকাতা। মনিবের সঙ্গে বনিবনা হল না। সাহেব খুললে ভাটিখানা-কাম-সরাই। মধু থাকলেই মাছি আসে। ভাটিখানার সঙ্গে বেলেল্লাপনা। হৈ-হুল্লোড়। ব্যাভিচার। কচিকচি গোরা ক্যাডেটদের মাথা চিবিয়ে খাবার একেবারে আখড়া একটা। কর্তাদের এক সময় টনক নড়ল। শেরিফ বললেন, 'তল্পী গুটোও-বাছা।' যেই বলা, সেই কাজ। কয়দিনের মধ্যে অক্সফোর্ড নামে একটা জাহাজ ছাড়ছিল তাতেই তুলে দেওয়া হল জন টমাসকে।

কিন্তু এর চেয়েও রোমাঞ্চকর কাহিনীর পটভূমি স্মিথের ট্যাভার্ন। স্মিথ আর তাঁর স্ত্রী অ্যানের যৌথ প্রচেষ্টা এই সরাইখানা। সেখানে নিত্যি গোলমাল। ঝঞ্ঝাটের নিত্য অন্ত নেই। ব্যতিব্যস্ত কলকাতার কোটাল দেখলে ভ্যালা বিপদ। শান্তি রক্ষা দুষ্কর। অনেক হুমকিতেও যখন কাজ হল না, শেরিফ বললেন, ঘরের ছেলে, ঘরে ফের বাপু। কলকাতায় থাকা চলবে না। কিন্তু কে কার কড়ি ধারে। স্মিথ কারও বান্দা নয়। অগত্যা সেপাই পাঠাতে হ'ল। স্মিথ বেঁকে দাঁড়াল। হাতে বন্দুক ভাটিখানায় সে পুলিশ ঢুকতে দেবে না। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের দ্বারদেশে লক্ষ্মণ। ভিতরে ঢোকা কারও চলবে না। কভি ভি নেহী।

সিপাহীরা কি করে। সরকারী হুকুম। জোর করে এগোতে লাগল। আর ক্ষিপ্ত স্মিথ সত্যিসত্যিই এক সময় গুলি চালিয়ে দিলে। রক্তাক্ত সিপাহীর মৃতদেহ ভাঙা একটা মদের বোতলের মত ভাটিখানার দরজা রক্তে ভিজিয়ে পড়ে রইল। অন্যান্য সব সিপাহী মিলে উইলিয়ম স্মিথকে ধরে ফেলল। আঠার শ' সালের জানুয়ারি মাসে সরাইওলা স্মিথের ফাঁসি হয়ে গেল।

কিন্তু এত গেল অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহেবদের সরাইখানার কথা। সেকালে কি বাঙালী সরাইওয়ালা ছিল না? গোবিন্দসুন্দর বলে একজনের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু আসল বাঙালী হোটেলওয়ালারা তখন সারা বাঙলাদেশে ছড়িয়ে। দেশজোড়া সেই নৈরাজ্যের যুগে সারা বাঙলাদেশই তো তখন একটা বিরাট সরাইখানা হয়ে বসেছিল। এখানে তখন নিরাশ্রয় সাহেবদের জন্য ঘরে ঘরে আশ্রয় আর আহার—বোর্ডিং আর লজিং-এর ব্যবস্থা। এমনি এক কাহিনী—হেস্টিংস আর কান্ত মুদীর। কবি কৃষ্ণরাম ভাদুড়ী যা ছড়ায় বেঁধে রেখে গেছেন—

ঘরে ছিল পান্তাভাত আর চিংড়িমাছ
কাঁচা লঙ্কা বড়ি পোড়া কাছে কলাগাছ।

হেস্টিংস ডিনার খায় কান্তের ভবনে।

অবশ্য কথা এই, ডিনার-সাপার আর ব্রেকফাস্টে সেই হোটেলের বিল বড কম উসুল করে নেননি সেকালের উদ্যোগীধূর্ত বঙ্গতনযেরা। কিন্তু সে তো এক ভিন্ন কাহিনী।

তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। সরাই-এর ব্যবস্থা শুধু সুতানুটির বুকেই নয়। সেকালের সারা বাঙলাদেশেই ইতঃস্তত ছড়িয়ে ছিল। উইলিয়াম হিকি বলে যে আইন ব্যবসাযী এসেছিলেন এদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে, তিনি কুলপিতে জনা দুই বন্ধু সমেত এক সরাইয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সেই সরাই যথেষ্ট নোংরা ও জরাজীর্ণ ছিল বটে কিন্তু তার খানা যে চমৎকার ছিল, সেকথা তার মেময়ার্স-এ সাহেব স্বীকার করে গেছেন। খুব ভালো রুটি, তেমনি ভালো মাছ। মুরগীর মাংস, ডিম ও বেকন—মাত্র দেড ঘণ্টার মধ্যে এই উৎকৃষ্ট খানা সরবরাহ করা হয়েছিল সাহেব ত্রযীকে, তাঁদের সঙ্গে অবশ্য মদ ছিল। শুধু নৈশাহার নয়, প্রাতরাশে সেই সরাযে সাহেবরা খেযেছিল চা-কফি. হট ও পাইপিং, সিদ্ধ মুরগী ও অন্যান্য খাবার। পথে উলুবেড়িয়ার সরাযে সাহেবদের অবশ্য দেওয়া হয়েছিল গরম ভাত মাংস। কাজেই হোটেলের ব্যবসা শুধু সেকালের কলকাতায় নয়, তার আশেপাশেও ভালই চলত!

কিন্তু সেকালের কলকাতার পান্থশালার কথা শুনবেন আর তপসে মাছের কথা শুনবেন না, সে কি হয়? সেকালের ইংরেজীখানার সেরা খাবার এই তপস্বী মৎস কথাএকটু বিবৃত করি, শুনুন।

জানি একালের এই নিদারুণ মৎস্যাভাবের দিনে যে কোন মৎস্য চর্চ্চাই বাঙালীর কাছে এক নিষ্ঠুর রসিকতার সামিল। তবে, এই ভেবে অন্তত মনকে স্তোক দেওয়া যায় যে, তপসে মাছের সঙ্গে বাঙালীর সম্বন্ধ হয়ত বা ততটা সুদীর্ঘ নয়। এই মাছ নিতান্তই ক্যালকেশিয়ান, এবং সেকারণেই অর্বাচীন। বাঙালীর সুপ্রাচীন মৎস্য-ট্রাডিশনে একবারও সে পঙক্তিতে বসবার পিঁড়ে পায় নি। সদুক্তিকর্ণামৃতের বাঙালী কলাপাতে স্ত্রীর পরিবেশন করা গরম গরম ভাত গাওয়া ঘি মেখে খেয়েছে। শেষ ভাগে দুগ্ধ সংযুক্ত হয়েছে তার অন্নের গ্রাসে এবং মৌইলি মচ্ছা বা মৌরলা মাছ সেই পুণ্যবানের ভোজন-তৃপ্তি ষোলকলা পূর্ণ করেছে। তখন কোথায় এই তপস্বী মাছ?

আকবরের বন্ধু ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল ফজল দিল্লীতে বসে বাঙালীর মৎস্য-প্রীতির কথা শুনেছিলেন। তাঁর কেতাবে বাঙালীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে মাছে-ভাতে বাঙালী, সে কথা বলতে ভোলেন নি। বাঙালী পাঁচালি-কারেরাও চান্স পেলেই এ দেশের খাল বিল নদী নালা পুকুরের নানা জাতের মাছের কথা বলেছেন। বলেছেন মাছ বান্নার একাদশ-পর্ব মহাভারত। আশ্চর্যের কথা, সেই মৎস্যঠিকুজি কারিকায় তপস্বী মৎস্যের কথা নেই। অবশ্য নেই বলেই যে তপসে মাছ ছিল না, তা শপথ করে বলা শক্ত। তপসে মাছের হয়ত অন্য নাম ছিল। বা সেকালের বাঙালী কলকাত্তিয়া বঙ্গজনের মত তপসে মাছের রসগ্রহণ করতে পারে নি।

তবে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্যে সমাজবিজ্ঞানীদের ওপর বরাত দিয়ে এটুকু স্বচ্ছন্দে বলা যায়, কোম্পানীর আমলেই তপসে মাছের বোলবোলাও। কোম্পানীর কলকাতার নিজস্ব মাছ তপসে। আর তাই খাস কলকাতার প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্ত ডিম-ভরা তপসে মাছের উদ্দেশ্যে স্তুতিকাব্যের একেবারে ফোয়ারা খুলে দিয়েছেন:

> একবার রসনায় যে পেয়েছে তার
> আর কিছু মুখে নাহি ভালো লাগে তার।
> না করে উদরে যেই তোমায় গ্রহণ
> বৃথায় জীবন তার বৃথায় জীবন।

তপসে মাছের নামকরণ সম্বন্ধে হদিশ দিতে গিয়ে গুপ্ত কবি বলেছেন—'গালভরা গোঁফ দাড়ি তপস্বীর প্রায়।' 'সেকালের হোটেলের কাহিনী' লিখতে গিয়ে হবস

সায়েবও একই কথা বলেছেন, তপসে মাছের এই বিদ্‌ঘুটে নামের ব্যাপারে। তপসে মাছের সঙ্গে তপস্বীদের আর-এক সাধর্ম্য সায়েবের চোখে পড়েছে। সায়েব লিখেছেন যে, বর্ষাকালে পথে-ঘাটে যেমন তপস্বীরা বিরল, তেমনি মেঘমেদুর অম্বর বর্ষার ঘনঘটা প্লাবনের সময় তপসে মাছ দুর্লভ। তপসে মাছ শীতকালের মাছ।

গায়ের রঙের জন্যে তপসে মাছকে সায়েবরা ডাকত "ম্যাঙ্গো" ফিস বলে। কবি হেমচন্দ্রও সেই নামেই ডেকেছেন। ইলবার্ট বিলের ওপরে ভারতবর্ষীয় ইংরাজদের ক্রোধের কথা লিখতে গিয়ে কবি তাঁদের বাঙালী কালচারের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বলছেন, বাঙালীরা দেখাইল বাড়ী গাড়ী জুড়ী বাছা বাছা। 'ম্যাঙ্গো ফিস' আনন্দের মনোহর খাঁচা।

হেমচন্দ্র কিছু বাড়িয়ে বলেননি। বাস্তবিকই সেযুগের কলকাতার সায়েবদের কাছে তপসে মাছ ছিল মস্ত আকর্ষণ। গুপ্ত কবির কাব্যে তার বর্ণনা রয়েছে :

ডিস ভোরে ফিস লয় মিস বাবা যত।
পিস করে মুখে দিয়ে কিস খায় কত॥

এটা একেবারে সেকালের সায়েবদের তপসে প্রীতির হুবহু ছবি। সতেরশ' একাশি সালের চব্বিশে ফেব্রুআরি হিকির বেঙ্গল গেজেটে একটা মজার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল—'আগামী মঙ্গলবার বোর্ড অব ট্রাস্টিস নিউ টাভার্নে তপসে মাছ খাবার জন্যে মিলিত হচ্ছেন। সেখানে কমিটির সভ্যরা তপসে মাছের রসাস্বাদন করবেন ও অন্যান্য বিশেষ বিষয় আলোচনা করবেন। ঠিক বারটায় মুল সভাপতি স্যার জ্যাকব ভাইনার আসন গ্রহণ করবেন। মূল বিজ্ঞাপনটি ছিল এই :

"The Board of Trustees assemble on Tuesday next at the New Tavern Where the committee meet to eat Mango fish for the benefit of the subscribers and on special affairs. The Supreme President Sir Jacob Viner will take the chair precisely at twelve.

অবশ্য আজ প্রায় দু'শো বছর পেরিয়ে, খাস কলকাতায়, সায়েবরা তো কোন্ ছার, কোন মৎস্যরসিক গৌড়জন যদি সাড়ম্বর অনুষ্ঠান করে তপসে মাছ খাবার কথা বিজ্ঞাপিত করে, আশ্চর্যের কিছুই থাকবে না। ইতিহাসের সেই সপরিহাস পুনরাবৃত্তির জন্যে বঙ্গভূমি মোটামুটি প্রস্তুতই আছে।

সেকথা যাক। হিকির গেজেটের বিজ্ঞাপন থেকে সেকালের সায়েবসুবো মহলে তপসে মাছের কদর বোঝবার কোন কষ্টই হয় না। সমসাময়িক বিবরণে তার আরও প্রমাণ রয়েছে। বাজারে তপসে মাছের আবির্ভাবের জন্যে কোম্পানীর কলকাতার সকল বাসিন্দা সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকত। তার মধ্যে যাঁরা সঙ্গতি-

সম্পন্ন, তাঁদের আর তর সইত না। জাহাজ ভাড়া করে তাঁরা ফোর্ট গ্লস্টার পর্যন্ত চলে যেতেন। অবশ্য সঙ্গে থাকত 'রামের' বোতল। নয়ত তপসে মাছ জমবে কেন!

অবসরপ্রাপ্ত এক ব্রিটিশ কর্নেল একবার বলেছিলেন যে, কলকাতায় আসবার বাস্তবিকই যদি কোন 'সার্থকতা থাকে তবে সেটা তপসে মাছের জন্যে। আর একজন বলেছিলেন, 'হ্যাঁ কলকাতা আমার লিভারটাকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে বটে কিন্তু ভুললে চলবে না, আমি তপসে মাছ খেয়েছি।'

'ফিফটিন ইয়ার্স ইন ইণ্ডিয়া'র গ্রন্থকার আর জি ওয়ালেস তপসে মাছের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আঠার শ' পাঁচ থেকে বিশ সাল পর্যন্ত ওয়ালেশ ছিলেন কলকাতায়। তিনি বলেছেন, হুগলী নদীর তপসে মাছের তুলনা হয় না দুনিয়ায়। এর চেয়ে মুখরোচক খাবার আর হয় না। কোম্পানীর সাহেবদের ক্রিসমাস ভোজনপর্বের একটি অতি অবশ্য পদ ছিল তপসে মাছ। ঠিক 'টার্কির' মতই। কলকাতার যে চোদ্দটা মাছের বাজার ছিল সেকালে, বছরে মাস দুই তাদের কোল আলো করে থাকত তপসে মাছ।

স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে, সেকালে এই মাছের দাম ছিল কেমন? যতদূর জানা যায়, তপসে মাছ তখন ওজনে নয় গুণতিতে বিক্রি হ'ত। চার টাকা শ'। উনিশ শ' তেতাল্লিশ সালে হবস সাহেব একটা হিসেব দিচ্ছেন যে, তখনও প্রায় ঐ দরেই তপসে মাছ বিকোতো কলকাতার বাজারে। তবে উলুবেড়ের মাছই তপসেকুলে কৌলিন্যের ধ্বজা উড়িয়ে আসত তখন। তপসে মাছের নানা রকম রান্নার কথাও শোনা যায়। সেকালের কলকাতার হোটেলে হোটেলে একটা বিখ্যাত পদ ছিল, 'স্মোকড ম্যাঙ্গো ফিশ'। এই সম্বন্ধে গর্ব করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ত কাগজে। সে রান্নার আজ আর চল নেই। তবে গুপ্ত কবি বলেছেন, এবং সে কথা কলকাতার খানদানী বাসিন্দা মাত্রেই বলেন, তপসে মাছের ভাজাই ভালো।

—কুড়ি দরে কিনে লই দেখে তাজা তাজা
টপাটপ খেয়ে ফেলি ছাঁকা তেলে ভাজা।

* * *

কিন্তু এই মাছ নিয়েই মহামারী। পুরনো কলকাতার আদ্যিকালে বছর বছর শীত পড়ার আগে যে রোগডেরি মহামারী আকারে দেখা দিত, তার মূল কারণ ছিল পচা মাছ। সে কাহিনী একটু বিশদ করে শোনা যাক।

কথায় বলে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, এও দেখি সেই বৃত্তান্ত। ইংরেজ ডাক্তাররা মুঘল রাজসভায় ইংরেজদের প্রাধান্য বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করলেও সেকালে ইংরেজ মহলে ডাক্তারদের যথেষ্ট 'প্রাপ্য' ছিল বলে মনে হয় না। প্রতিটি বিদেশী জাহাজে একজন করে ডাক্তার রাখার রেওয়াজ থাকলেও ইংরেজ সমাজে তাদের পাকাপাকি 'দর্শনী' পাওয়ার রেওয়াজ আদায় করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এমনকি সেকালের কাগজপত্রে দেখা যায় যে সুরাটে তাদের সঙ্গে এক জন দিশি হেকিমকে শুতে দেওয়া হত টাকা যখনই নেই কোন আহম্মক তখন চিরটাকাল শুধু খাতিরের জন্যে এই বৃত্তি নিয়ে বসে থাকবে, ধুয়ে ধুয়ে জল খাবে? তাই, দেখা যেত যে কোন সার্জেনই বেশি দিন কোম্পানীর কাজে লেগে থাকেনি। এবং সেই কারণেই বোধ হয়, বহু ক্ষেত্রে ডাক্তারীশাস্ত্রে সামান্যতম জ্ঞান না রেখেই বহু লোকই সার্জেনের কাজে লেগে পড়েছে। হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে জনপদের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব বর্তেছে আকছার।

তবে যথেষ্ট টাকা না থাকলেও, যারা খাস বিলেতী ডাক্তার, তাদের বেশ খাতির ছিল। সতের শ' ছয় সালের একটা ঘটনায় দেখা যাচ্ছে আর্থার কিং বলে এক কুঠিয়াল কলকাতা কাউন্সিলকে একটা চিঠি লিখেছেন। তাঁর অভিযোগ এক সার্জেনের বিরুদ্ধে। না, আরও স্পষ্ট করে বলা যায় অভিযোগ তাঁর স্ত্রীর এক সার্জেনের স্ত্রীর বিরুদ্ধে। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, কোন এক রবিবার গির্জায় প্রার্থনা করবার সময় সার্জেনের স্ত্রীকে আসন দেওয়া হয়েছে কুঠিয়ালের স্ত্রীর আগে। এবং ফ্যাক্টর সাহেবের মর্যাদায় তাতে যথেষ্ট হানি হয়েছে বৈকি।

দেখা যাচ্ছে, প্রথমদফা এই অভিযোগ কোনরকম কর্ণপাত করেনি কাউন্সিল। কিং ত খাপ্পা। কোন স্বামী ন হয়। কাউন্সিলকে এইবার কড়া করে লিখল কিং, শাসাল—এর যদি কোন বিহিত না হয়, তাহলে গির্জার ভেতরে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে কিং তার জন্যে দায়ী থাকবে না। ঐ ধরনের অসম্মান সে কখনও বরদাস্ত করবে না।

এই ধরণের শাসানির কোন ফল ফলেছিল কিনা, সে খবর সংগ্রহ করা যায়নি, তবে এ' থেকে সামাজিক দিক দিয়ে সার্জেনদের যে একটা মর্যাদা ছিল আদ্যিকালের ডিহি কলকাতায়, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

মর্যাদা যে ছিল সেটা মাইনে দেখেও বোঝা যায়। যখন এ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট

রবার্ট হেজেসের মাইনে বছরে চল্লিশ পাউণ্ড, সতেরশ পনের সালের কথা, কলকাতায় কোম্পানীর তিন সার্জেন—রিচার্ড হারভে, অলিভার কোল্ট আর শ্রুতকীর্তি উইলিয়ম হ্যামিল্টনের মাইনে—প্রত্যেকেরই ছত্রিশ পাউণ্ড করে। বলা দরকার, সে সময়ে রাইটারদের বছরে মাইনে ছিল পাঁচ পাউণ্ড আর জন কোম্পানীর ছোটবড় মার্চেন্টের তনখা বছরে দশ থেকে কুড়ি পাউণ্ডের মধ্যে।

ডাক্তারদের মান যে কিরকম ছিল তার আরও কয়েকটা পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে। সতের শ' চোদ্দ সালের চৌঠা মার্চ জন কোম্পানীর খাতায় একটা মজার হুকুম রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে এবারে দারুণ গরম পড়ার জন্যে আমাদের ডা''রের 'মেট' (কমপাউণ্ডার-?) এর পক্ষে পাল্কী ছাড়া কাজ করা অসম্ভব। রোদবৃষ্টির হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে তার পাল্কী বইবার জন্যে চারটি গোয়ালা নিযুক্ত করার হুকুম দেওয়া গেল। এর জন্য ব্যয়কুণ্ঠ কোম্পানী মাসিক আট টাকা মঞ্জুর করে।

রোগডেরির দেশ কলকাতায় অবশ্য তখন কোম্পানীর নিজস্ব ডাক্তাররা ছাড়াও অন্য ডাক্তাররা ছিলেন। এমনি একজন ডাক্তার রবার্ট ব্রডফোর্ডকে দেখা যাচ্ছে স্যামুএল বার্টি নামে এক সরকারী সার্জেন্ট তাঁর উইলের ট্রাষ্টি করে যান। তাঁকে একটি পুরনো আঙটি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দানও করে যান বার্টি। আদ্যিকালের কলকাতায় কোম্পানীর কোন রাজপুরুষই অবশ্য সুস্থ জীবন যাপন করতে পারেননি। অনেকেই এখানে দেহ রেখেছেন এবং কলকাতার কবরে চিরকালের জন্যে শুয়ে পড়বার আগে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে উজানে নদীয়ার দিকে ঘুরে এসেছেন। এবং এই সময় কলকাতার সরকারী ডাক্তাররা তাঁদের সঙ্গে যেতেন। দরকার মনে করলে, অনেক সময় নতুন ডাক্তারকে চাকরি দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হত। প্রেসিডেন্ট জন রাসেল যখন এমনি বায়ু পরিবর্তনের জন্যে যান, রিচার্ড হার্ভে বলে এক ডাক্তারকে এমনি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সব সরকারী ডাক্তারই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে চলে যাওয়ায় কলকাতার সাহেব বাসিন্দাদের খুব অসুবিধা হ'ত। এমনি ঘটনার কথা কোম্পানীর পুরনো নথিপত্রে রয়েছে। সতের শ' তের সালের তেসরা মার্চের এক খবরে রয়েছে এডমণ্ড ম্যাসন বলে এক কর্মচারী প্রায় মরমর। খবর গেল হাসপাতালে। ডাক্তাররা ত কলকাতা ছাড়া। কাছেপিঠে এক ফরাসী ডাক্তারকে পাওয়া গেল। তাঁকেই 'কল' দেওয়া হ'ল। রোগী ভালো হয়ে গেলে ডাক্তারবাবু চৌত্রিশ আর্কটি টাকার এক বিল পাঠালেন। কোম্পানীর খাজাঞ্চী টাকাটা দিয়ে দিলেন।

এমনি আর এক ঘটনা। টমাস কুক বলে এক কর্মচারী হুগলী থেকে সোরা কিনতে গিয়েছিলেন। সোরা ত ওজন করা হ'ল। হিসেবপত্র ত বুঝে নেওয়া

হ'ল। কিন্তু তারপরই গোলমাল। কুক সাংঘাতিক অসুস্থ। বাঁচে কিনা এমন অবস্থা। কলকাতায় খবর গেল। কিন্তু সেখান থেকে ডাক্তার গেল না। স্থানীয় এক ওলন্দাজ ডাক্তারকে দেখান হ'ল। সতের শ' সতের সালের আঠারই জানুয়ারী তাঁর পয়তাল্লিশ টাকা বার আনার বিলটা 'পাশ' করে দেয় কোম্পানীর বক্সি জন ডীন।

এই প্রসঙ্গে একটা বিচিত্র গল্প বলে নেওয়া যেতে পারে। উইলিঅম স্পেন্সার ছিল কোম্পানীর কর্মচারী। হঠাৎ তার পায়ে একটা চোট লাগে। এ'ডাক্তার সে' ডাক্তার, স্পেন্সার আর সারে না। সার্জেনরা বললে, পা'টা বাদ দিয়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু টপ করে পা-টা বাদ দিতে চায় কে? বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এই সময় শোনা গেল হুগলীর এক সন্ন্যাসী নাকি অসম্ভবকে সম্ভব করেন। সিলিতি সাহেব সেই দিশি ফকিরেরই শরণাপন্ন হল। এবং তাজ্জব কি বাত—দেখা যাচ্ছে উইলিয়ম স্পেন্সার সাহেবের পা ভালো হয়ে যায় এবং জনকোম্পানীর খাতায় লেখা হয়েছে সেই সন্ন্যাসীকে কোম্পানী দু'চার টাকা নয় গোটাগুটি একশ' টাকা প্রণামী দেয়। এটা তিরিশে জুলাই, সতের শ' এগার সালের কথা।

তবে কোম্পানীর ডাক্তাররা যে কোম্পানীর ভি-আই-পিদের 'চেঞ্জে' যাবার সময় সঙ্গে যেতেন, তা' নয়, কলকাতার বিষাক্ত আবহাওয়া ছেড়ে তাঁদের নিজেদেরও অনেক সময় হাওয়া খেয়ে আসবার দরকার হয়। সতের শ' এগার সালের খবর। ফ্যাক্টরী সার্জেন ডাক্তার ফিলিপ রিচার্ডসন ও তাঁর সহকারী জন পার্নে—দুজনই বায়ু পরিবর্তনের জন্যে কোম্পানীর কাছ থেকে অব্যাহতি চান। পরের বছর বেঞ্জামিন গ্রীন বলে ডাক্তারের একজন 'মেট' ত মারাই গেলেন।

যে সময়ের কথা বলা হ'ল, তারই বছর কয়েক আগে—বিশেষ করে সৈন্যদের চিকিৎসার জন্যে কলকাতার একটা হাসপাতাল তৈরীর কথা ওঠে কাউন্সিলে। স্থানীয় অধিবাসীদের দাবী তো ছিলই, কোম্পানীর মাইনে করা ডাক্তাররাও এর জন্যে জোর তদ্বির করতে লেগে গেলেন। সবচেয়ে বড় চাপ দিচ্ছিল বোধকরি কলকাতার বিষাক্ত আবহাওয়া!

এত জায়গা থাকতে জব চার্নক সায়েব কেন যে সুতানুটির মত অস্বাস্থ্যকর জায়গায় তাঁর সাধের নগরটির পত্তন করেছিলেন, সেটা আজ আর দুর্বোধ্য নয়। হুগলী থেকে পালিয়ে জব চার্নক সামরিক দিক দিয়ে সুরক্ষিত একটা জায়গা খুঁজ-ছিলেন। সুতানুটিতে এসে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। ভাগীরথীর সুগভীর জল-প্রবাহে নৌ চলাচলের কোন বিঘ্ন ছিল না। তাছাড়া এখানে বড়সড় একটা সুতোর বাজার ছিল। এইসব সাতপাঁচ ভেবে ঝানু লোক চার্নক সাহেব মনস্থির করে-

ছিলেন। আর উত্তরকাল তাঁর এই মনোনয়নকৃতিত্ব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে। কিন্তু এত সুবিধা সত্বেও সুতানুটির সবচেয়ে বড় একটা অসুবিধা ছিল—সেটা তার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। খারাপ বলে খারাপ, সুতানুটি ছিল সেকালের সাহেবদের কাছে নিছক মৃত্যুপুরী। আর সেই তত্ত্ব স্বয়ং জব চার্নককে তাঁর জীবন দিয়ে বুঝতে হয়েছিল। নগর পত্তনের বছর দুয়েকের মধ্যেই চার্নক সাহেব দুরারোগ্য কলেরা রোগে দেহ রাখেন।

জঙ্গল, বাঁশবন, নোনাজল আর জলাভূমি পরিব্যাপ্ত সুতানুটি স্বাভাবিকভাবেই ম্যালেরিয়া, কলেরা আর আমাশা রোগের একটা ডিপো ছিল। সতের'স আটষট্টিতে ডাক্তার লিণ্ড তাঁর 'এসেজ অব ডিজিজ'-এ বোম্বাই, মাদ্রাজ আর কলকাতা এই তিনটি প্রেসিডেন্সীর মধ্যে কলকাতার আবহাওয়াকেই সবচেয়ে বেশী খারাপ বলে উল্লেখ করেছেন। কলকাতার আবহাওয়া খারাপ হওয়ার অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিল। সুতানুটির উত্তর-পূর্ব দিকের নোনা জলের জলাভূমি বর্ষাকালে সহজেই ভেসে গিয়ে কলকাতাকে প্লাবিত করে দিত। পরে জল সরে গেলে জলের সঙ্গে যেসব মাছ ভেসে উঠ্‌ত সেগুলো পচে এক বীভৎস আবহাওয়া সৃষ্টি করত এবং আগস্ট থেকে অক্টোবর - এই তিনটে মাস বছর বছরই মহামারী দেখা দিত।

শুধু কলকাতার বাসিন্দাদের মধ্যে নয়, দশ বার বছরের মধ্যে ভিনদেশী নাবিকদের কাছেও কলকাতা বিষম দুর্নাম কিনেছিল। কলকাতার গোলঘাট তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল বাইবেলের শমনপুরী গোলগাথা। এখানে এলেই নাবিকরা অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ত এবং কলকাতার কবরেই চিরশান্তি লাভ করত। এমনকি শীতকালে পর্যন্ত নিস্তার ছিল না। ভাগীরথীর জল থেকে জেগে ওঠা রাতের কুয়াশা লেগে নাবিকরা প্রায়ই অসুখে পড়ত।

ব্যাপারটা এমনই গুরুতর আকার ধারণ করেছিল যে জব চার্নকের মৃত্যুর পর কলকাতার এই অস্বাস্থ্যকরতার কথা নিবেদন করে এখান থেকে কারবার তুলে দেবার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লিডেন হল স্ট্রীটের সদর দপ্তরে লেখা হয়েছিল। কিন্তু কোম্পানী মানেনি। জবাবে বলেছিল,—'উই হ্যাভ নো থটস অফ রিমুভিং আওয়ার চিফ্ এ্যাণ্ড কাউন্সিল ফ্রম দ্যাটপ্লেস হ্যাভিং রিজন টু বিলিভ ইট মেবি এ্যাজ হেল্‌থফুল এ্যাজ এনি আদার পার্ট অফ বেঙ্গল, অফ হুইচ ইউ হ্যাভ ইএট হ্যাড নো ফুল এক্সপেরিমেণ্ট, বিকস ইন অল প্লেসেস নিআর দি ট্রপিকস, দেআর হ্যাজ বিন অফ লেট ইয়ারস অল দি ওয়ারল্ড ওভার এ্যান আনইউজুয়াল সিকনেস অ্যাজ ওয়েল ইন দি ওয়েস্ট এ্যাজইন দি ইষ্ট ইণ্ডিজ'।

—অর্থাৎ বাঙলাদেশের অন্যান্য অংশের আবহাওয়া যখন মোটামুটি ভালো তখন

কলকাতার আবহাওয়া এমন মারাত্মক রকম খারাপ হবার যথার্থ কোন যুক্তি নেই। তা'ছাড়া কোম্পানী খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে আলোচ্য বছরে ক্রান্তি দেশীয় পূব বা পশ্চিম দ্বীপমালা অঞ্চলে এমনি অসুখের একটা সাময়িক ঢেউ এসেছে। কাজেই কলকাতার এই অস্বাস্থ্যকরতা নিতান্তই আকস্মিক। কিছু বরাবরের ব্যাপার নয়।

কিন্তু একথা বলে কোম্পানী বেশীদিন চুপ করে থাকতে পারেনি। অল্প দিনের মধ্যেই তাদের টনক নড়েছিল। সতেরশ' তিনের এক হিসেবে দেখা গেল যে একশ' জনের একটা সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখতে হলে বছরে পনর থেকে বিশজন নতুন গোরা সৈন্য দেশ থেকে আমদানি করতে হয়। একজন সৈন্যকে গড়ে সাত থেকে দশ বছরের বেশী ফোর্ট উইলিয়ামের চাকুরীতে বহাল থাকতে হচ্ছে না। তার আগেই পরপারের ডাক আসত কবরের ডাক। কোম্পানীর স্বার্থে ঘা পড়ল। এড়িয়ে যাবার উপায় রইল না। একটা হাসপাতাল খোলার ব্যবস্থা করতে হল। ঐ বছরেই কোম্পানীর গুদামগুলোর সংলগ্ন জায়গায় একটা সাময়িক হাসপাতাল খোলা হ'ল।

নতুন হাসপাতালে আসতে লাগল শুধু সৈন্যরা। শহরবাসীদেরও দুর্দশা তথৈবচ। সতেরশ' পাঁচ থেকে সাত কলকাতায় ম্যালেরিয়ার মহামারী। মাত্র এক বছরে জনপদের কিঞ্চিদধিক একতৃতীয়াংশ গঙ্গার ধারে কারখানায় চিরতরে শান্তিলাভ করল কাজেই হাসপাতালের দাবী নিয়ে অধিবাসীরা সব হৈচৈ করতে লাগল। তাদের মদৎ দিতে লাগল ডাক্তাররা।

শেষবেশ কোম্পানী আর থাকতে পারল না। সতেরশ' সাত সালের ষোলই অক্টোবরের ফোর্ট উইলিয়মে নেওয়া কলকাতা কাউন্সিলের এক সিদ্ধান্তে দেখা যাচ্ছে কলকাতায় হাসপাতাল তৈরী করার জন্যে কোম্পানীর তোষখানা থেকে দু'হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। তবে বেনে কোম্পানী তো। টাকা-আনা-পাই-এর হিসেব খুব বোঝে। বললে চাঁদা তোল। দিশি বিদেশী যে সব জাহাজ যাবে কলকাতা হয়ে—তাদের কাছে টাকা আদায় কর। কলকাতা জনপদের অধিবাসী-দেরও রেয়াত দেওয়া হয়নি। কাউন্সিলের এ্যাকাউন্ট্যান্ট—আব্রাহাম অ্যাডামসের উপর ভার দেওয়া হ'ল—তাঁরই তদারকীতে এই হাসপাতাল বাড়ী তৈরী হবে। খরচের কোন কার্পণ্য হবে না। আরও ঠিক হ'ল, ফোর্টের কাছে সুবিধামত একটা জায়গায় এই হাসপাতাল হবে।

হলও। সিরাজদ্দৌল্লার কলকাতা আক্রমনের প্রায় বছর তিনেক আগে—সতেরশ' তেপান্নয় আঁকা ফোর্ট উইলিয়ম ও কলকাতা টৌনের একাংশের একটা ম্যাপ আছে। বাংলার গোলন্দাজ বাহিনীর লেফ্‌টেন্যান্ট উইলিয়ম ওয়েলসের আঁকা

ম্যাপটি। তাতে দেখা যাচ্ছে গঙ্গার ধারে রামকৃষ্ণ ও রাসবিহারী শেঠের বাড়ীর সামনে যে কবরখানা ছিল তার পূব কোনে ছিল এই হাসপাতালটি। এই কবরখানাই হচ্ছে আজকের পাথুরে গিজে। হাসপাতালটা ছিল আজকের গাষ্টিন প্লেসে।

হাসপাতাল ঠিক কবে নাগাদ খোলা হয়েছিল তা' সঠিক বলা শক্ত তবে সতেরশ আটসালের অক্টোবরে অ্যাডামস সাহেবকে আরও পাঁচ হাজার টাকা দেয় কোম্পানী হাসপাতাল তৈরী শেষ করতে। আবার হাসপাতালের ব্যারাক ও দেওয়াল তৈরীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সতেরশ' দশ সালে। কিন্তু সেটার জন্যে বেশ কয়েকটি বিধি-নিষেধ ঠিক করে তাকে আরও সুনিয়ন্ত্রিত করে তোলেন আর কেউ নয়—সেই ইতিহাসখ্যাত ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিলটন। তিনি ও রিচার্ড হাভে সতেরশ'তের সালের বিশে আগষ্ট ছয়টি অনুশাসন দেন হাসপাতালটির জন্যে। বলাবাহুল্য, জনকোম্পানীর কর্তারা সেগুলি মেনে নেন। এতে বলা ছিল কোম্পানী হাসপাতালে তিরিশটি খাট আর গদী এবং রোগীদের জন্য বিশটি গাউন এবং কুড়ি প্রস্থ গড়া কাপড় সরবরাহ করবে। যে কোন অবিবাহিত সৈনিক অসুস্থ হলেই হাসপাতালে যেতে বাধ্য থাকবে। হাসপাতালে থাকাকালীন খাই-খরচ হিসেবে প্রতিটি সৈন্য দেবে প্রত্যহ চার আনা করে, প্রতিটি কর্পোরেল দেবে ছয় আনা করে এবং প্রতি সাজেণ্ট দেবে আট আনা করে। হ্যামিলটন আরও আইন করে দেন যে অসুস্থ সৈন্যরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারেন সেজন্য একজন পাহারাদার থাকবে। কড়া কোন মাদক দ্রব্য যাতে হাসপাতালে নিয়ে যেতে না পারে পাহারাদার সেটাও দেখবে। হাসপাতালের একজন স্টুআর্ড থাকবে। হাসপাতালের জামাকাপড় সবই থাকবে তার জিম্মায়। দরকার হলে সেই রোগীদের সরবরাহ করবে। মাইনে তার তিরিশ টাকা। তার জ্বালানী কিংবা তেলের খরচের জন্য অতিরিক্ত কিছু দেওয়া হবে না। হ্যামিলটন আরও চেয়েছিলেন, তাঁর হাসপাতালের জন্য ছয়টা পেতলের পাত্র, ছয়টা সসপ্যান, বারটা বাটী, এবং কুড়িটা চামচ সমেত কুড়ি সেট প্লেট।

কোম্পানী যদিও খাতায় কলমে রাজী হয়ে যায়, অনেকে মনে করেন, হাসপাতালে রোগীদের শোবার জন্য খাট-বিছানার জায়গায় 'হ্যামক' বা রেলের বাঙ্কের মত বিছানা চালু ছিল। বেশ কিছু বছর পরে তবে কটের আবির্ভাব হয় হাসপাতালে। বছর তিনেক পরে সতেরশ ষোল সালে আবার এক নববিধানের বলে কোম্পানী ডাক্তার-দের প্রেসক্রিপসনে লেখা ঔষধ বাজার থেকে কিনে হাসপাতালের স্টোর থেকে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ছাড়াও সরবরাহ করতে থাকে রোগীদের খাট-তক্তাপোষ, কম্বল, কাপড়, কাঠ, কাঠকয়লা এবং প্রয়োজনমত বিভিন্ন পাত্র—'পট' আর 'প্যান'। রোগ ডেরির বেশি প্রকোপ হলে হাসপাতালে কাজ করার জন্য ছয়জন হাড়িকে হাসপাতাল

চাকরিতে বহাল করা হয়। অপেক্ষাকৃত কম ব্যস্ত সময়ে এই হাজ্জিদের সংখ্যা কমিয়ে করা হয় চার। দুজন ধোবাকেও নিযুক্ত করে কোম্পানী হাসপাতালের জন্য।

রোগীর পথ্য, মোমবাতি, তেলের খরচ সবই রোগী-সৈনিকদের মাসিক বেতন থেকে কেটে নিয়ে স্টুআর্ডকে দেওয়া হবে তবে এই কাটার পরিমাণ কখনই দৈনিক চার আনার বেশি হবে না। হাসপাতালের সব বাসনকোসন স্টুআর্ডের জিম্মায় থাকবে।

এই নববিধানের সঙ্গে জন কোম্পানী রিচার্ড ওয়ারেনকে হাসপাতালের স্টুয়ার্ড পদে চাকরি দেয়। তাকে হাসপাতালেই থাকবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তার খাবার জন্য মাসিক দশটাকা অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হয়।

কিন্তু হাসপাতালটা দোতলা হয় কবে? দোতলা হবার আগেই মনে হয়, কলকাতার নোনা আবহাওয়ায় বাড়ীটার জীর্ণদশা কোম্পানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সতেরশ আটাশ-উনত্রিশ সাল থেকেই সেটাকে মেরামতের জন্যে টাকা চাওয়া হতে থাকে। সাহেবরা কেতাদুরস্ত মানুষ। তারা বললে, নগর বাস্তুকার টমাস স্লো ও জন এ্যালোফিকে হাসপাতাল পরিদর্শন করে একটা রিপোর্ট দিতে। সতেরশ তিরিশের এগারই মার্চ সেই রিপোর্টে বলা হয়, হাসপাতালের সব কড়িবরগা, জানলা দরজার ফ্রেম পচে গেছে। এবং তাঁদের আশঙ্কা শীঘ্র যদি মেরামতের কাজে হাত না দেওয়া হয়, এই বর্ষায় ছাতটা ধ্বসে পড়বে।

মনে হয় বর্ষার পরই মেরামতির কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল এবং বছর পাঁচেক পরে হাসপাতালের এক দিকে দোতলায় দুটো ঘর তৈরীর হুকুম দেওয়া হয়। একটাতে থাকবে ডাক্তার। অপরটায় হবে ঔষধ দেবার ডিসপেনসারী।

এত না হয় গেল হাসপাতালের আয়তন বৃদ্ধির খবর কিন্তু তার চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল কেমন? সেত পর্যটক আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের বিখ্যাত উক্তি:

'মেনি গো ইনটু ইট অ্যাণ্ড আণ্ডারগো পেনান্স অফ ফিজিক, বাট ফিউ কাম আউট টু গিভ এ্যান অ্যাকাউণ্ট অব ইটস অপারেশনস্'—শারীরিক কষ্ট সহ্য করার অনেকেই এর ভেতরে যায় কিন্তু সেখানকার ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে কেউ ফিরে আসে না—একেবারে ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক! অনেকে হয়ত এটাকে এই পর্যটকের হাসপাতালের অকারণ বিষোদ্গার বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু তা নয়। সেকালের সরকারী নথিপত্রেও এই অভিযোগ স্বীকার করা হচ্ছে। সতেরশ আঠার সালের ডিসেম্বর মাসে ফোর্ট উইলিয়ম থেকে পাঠান এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, 'সোলজারস হ্যাট ড্রেডেড গোইং দাইদার নাউ ডিজায়ার ইট হোএন আউট অফ অর্ডার'। যেসব সৈন্যরা আগে হাসপাতালে যেতে ভয় পেত এখন শরীর খারাপ হলে যাবার ইচ্ছাপ্রকাশ করে।

দেখতে দেখতে সুখে দুঃখে হাসপাতালের কাল কাটতে লাগল। কলকাতার 'গ্রেট

স্টর্মে', কলকাতায় তাবড় তাবড় ঘরবাড়ী যখন পড়ে গেল, তখনও এই দোতলা হাসপাতাল টিকে। কোম্পানী তখন কিছুকালের জন্য এখানে গুদাম করেছিল মাল রাখার।

মাঝে হাসপাতালের ওপরে বাজও পড়েছিল একবার—কাজেই হাসপাতালটাকে সারাবার প্রয়োজন দেখা দেয়। রিচার্ড পিকস-এর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে, বাড়ীটার কলিফেরান, চুনবালির পলেস্তারা লাগান, কড়ি বরগা লাগান, ফাটল বোজান প্রভৃতি কাজে হাত দেওয়া হয় এবং এর গুণেই বোধ করি সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের ডামাডোলেও বাড়ীটি টিকে যায়।

পলাশীর যুদ্ধের পর অবশ্য গ্রে সাহেবের বাড়ীটা পনের হাজার টাকায় কিনে নেওয়া হয়। কিন্তু তখন কলকাতার লোকসংখ্যা বাড়ছে দ্রুত। রোগীর সংখ্যা স্বভাবতই বাড়ছে দ্রুততর, কাজেই জায়গা চাই। মাঝে কাঠ খড় দিয়ে একটা সাময়িক হাসপাতাল তৈরী করা ঠিক হয়! কিন্তু শেষ অবধি ফোর্ট উইলিয়ামের ভেতরে হাসপাতালটাই চালান হয়। পুরনো হাসপাতাল ও গ্রে-র বাড়ীটা বিক্রি করে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবং সতেরশ উনসত্তর সালে ষাট বছরের এই বাড়ীটা চারশ চৌদ্দ টাকায় সত্যি সত্যি বিক্রি করে দেওয়া হয়।

অবশ্য কলকাতার সায়েব বাসিন্দাদের ব্যাপকতর চিকিৎসার জন্যে কোম্পানীকে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলেনি। ফোর্ট উইলিয়মের দক্ষিণে শহর কলকাতার একটু দূরে একজন দেশী ভদ্রলোকের বাড়ি কিনে সেখানে একটা তেতলা বাড়ি তৈরি করা হল। সেখানেই—শহর কলকাতার সেই অন্যতম প্রাচীন তেতলা বাড়িতেই—একটা বড় সড় হাসপাতাল শুরু করা হয়। সেখানে সামরিক ও নাগরিক—দু' শ্রেণীর রোগীরই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এই হাসপাতালটাই হচ্ছে বর্তমানের সুখলাল কারনানী হাসপাতাল - যার পুরনো নাম ছিল প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল।

কিন্তু এ ত গেল হাসপাতালের কথা। প্রসঙ্গত কলকাতার রোগভেরি চিকিৎসার কথাও বলতে হয়। সেকালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস দুটো শহরবাসীদের কাছে এতই ভয়াবহ ছিল যে এই দুটো মাস ভালোয় ভালোয় কাটলে পনেরই নভেম্বর তারা উৎসব করত। এই উৎসবে যাঁরা ঐ মৃত্যু-ঋতু পেরিয়ে আসতে পেরেছেন—তাঁরা পরস্পরকে অভিনন্দিত করতেন। যাঁরা দেহরক্ষা করেছেন তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করা হ'ত।

তবে কলকাতার অস্বাস্থ্যকরতাই যে তার বাসিন্দাদের অধিক মৃত্যুহারের কারণ, সেটা পুরোপুরি সত্য নয়। সেকালের কলকাতার অধিবাসীরা অত্যন্ত শিথিল জীবনযাপন করতেন। সতেরশ' পয়ষট্টি সালে টপহ্যাম সায়েব কলকাতার কথায়

বলেছেন যে জ্বর বা কম্পজ্বরের চেয়ে অমিতাচার রোগেই অধিক লোক সেকালে মারা গিয়েছিলেন। উইলিয়ামসন সায়েবও তাঁর গ্রন্থে এটা স্বীকার করে গেছেন।

অমিতাচারই যে মৃত্যুর কারণ তার বড় কয়েকটা পরোক্ষ প্রমাণ আমাদেরও হাতে রয়েছে। সে আমলে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরাজ বহুদিন ধরে কলকাতায় বাস করে বহাল তবিয়তে কালাতিপাত করেছিলেন। এবং তাঁরা সকলেই অত্যন্ত সংযত জীবন যাপন করতেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের কথাই ধরা যাক। তাঁর জীবনযাত্রার যে হিসেব পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায়, যে তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। প্রাতরাশের আগে পাক্কা আট মাইল ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন। বাঙলাদেশের রেওয়াজ অনুযায়ী ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন। দুপুরে খাওয়ার সঙ্গে ঠাণ্ডা জল বা চা-এর বেশী কিছু খেতেন না। রাত্রে অনেক সময় কিছু না খেয়েই শুতে যেতেন। সার জন শোর, লর্ড কর্নওয়ালিশ বা লর্ড ওয়েলেসলি সবায়েরই জীবনযাপন এমনি নিয়মিত ও সংযত ছিল।

সেকালের অন্যতম প্রধান রোগ ছিল কলেরা। উইলিয়ামসন তাঁর কেতাবে এই রোগের যে চিকিৎসার উল্লেখ করেছেন, তা-ও বেশ বিচিত্র। সেকালের ডাক্তারদের মতে কলেরা হত অত্যধিক মাছ ও মাংস একসঙ্গে খাওয়ার ফলে। এবং এর চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল সাংঘাতিক। লাল টকটকে গরম লোহা দিয়ে রোগীর পায়ের গোড়ালিতে ছ্যাঁকা দেওয়া হ'ত। ক্যাপ্টেন সিমসন সায়েব ঐ রোগের একই দাওয়াই বাত্‌লেছেন। দাস্ত বা যকৃতের গোল-মালে তখন রেউচিনি এবং ইপে-কাকুনহা প্রয়োগ করা হ'ত। লিভারের জ্বরে প্রথমে রক্তমোক্ষণ করান হ'ত পরে রোগীকে 'বিরেচক' এবং 'ক্যালামেল' খেতে দেওয়া হ'ত। অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নৌজাহাজের ডাক্তার ইভস অন্তত এই প্রেসক্রিপশন ব্যবহার করেছেন। ডাক্তার লিণ্ড বলে অন্য একজন ডাক্তার রক্তমোক্ষণ সমর্থন করেননি। এদেশের নানা রোগের কারণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভিন্ন। এলেমেলো বাতাস, মাছি, গাঢ় কুয়াশা, কশায়ের খারাপ মাংস আর বেলে মাটি—তাঁর মতে এদেশে এত বেশী রোগের কারণ। সকল অস্বাস্থ্যকর স্থানের বাসিন্দাদের তিনি কর্পূর আর ভিনিগারে মেশানো রুমাল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। ব্রাণ্ডিতে কিছু সিনকোনা গাছের ছাল, রসুন আর কাবাব চিনি বা রেউচিনি দিয়ে খেতে বলেছেন মাঝে মাঝে। ঠাণ্ডা লাগলে, তাঁর মতে, আগে বমি করে ফেলা দরকার! মশার কামড় থেকেই ম্যালেরিয়া হয়—এ ধারণা না থাকলেও জলাভূমির কাছেপিঠে জায়গা বিষবৎ পরিত্যাগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। স্কার্ভি রোগের জন্য সব্জি খেতে দিতেন ডাক্তার হাক্সম। লেবুর রসও এই রোগে ব্যবহার করা হ'ত। জে এস স্ট্যাভরিনাস তাঁর 'ভয়েজ টু দি ইস্ট ইণ্ডিজ-এ বলেছেন সতেরশ' উনসত্তর সালে টীকা দেওয়ার

রেওয়াজ ছিল বাঙলাদেশে। সেকালে সংক্রমণ-প্রতিষেধক বীজ চূর্ণ করে গলাধঃকরণ করতে দেওয়া হত। কখন কখন ইঞ্জেকশনের মত করে দেহের ভিতরে প্রবেশ করান হ'ত। রোগী তিন সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্যের মুখ দেখতেন। তবে জেনার সায়েবের টীকা দেওয়ার প্রথা এদেশে আমদানি হয় উইলিয়ামসন সায়েবের মতে, আঠারশ' দুই সালে। শম্বুকগতিতে এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা জনসমাজে প্রসার লাভ করে।

ডাক্তার লিণ্ডের দেওয়া একটা তালিকায় দেখা যায় সেকালের সাহেব বাসিন্দাদের কলেরা আর জ্বরের আক্রমণ ছিল সবচেয়ে বেশি এবং মৃত্যুর হারও তাতে ছিল সর্বাধিক তবে কাউর বা স্কার্ভি রোগেরও আক্রমণ ছিল খুব, যদিও শাকসবজী ও পাতিলেবুর রস খাওয়ানোর জন্য রোগীরা প্রায়ই বেঁচে যেত। টাইফয়েড, পিত্তজ্বর, একজ্বরী ও সাহেবদের সেকালে খুবই হত। বাত ব্যাধির প্রকোপও কম নয়। যৌন রোগের দাপটও ছিল!

সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে, সাযেবরা এদেশে এসে বেশ কয়েকটা তুক-তাক মানত। সাপে কামড়ানর প্রতিষেধক হিসেবে গলায় সোনার হারের একটা তাবিজ ঝুলিয়ে রাখত তারা যীশুর ক্রুসের পাশাপাশি। এই তাবিজে থাকত একটা কালো চ্যাপ্টা নকল পাথর। এই পাথর তৈরী করা হ'ত একরকম বিশেষ গাছের গুঁড়ি পুড়িয়ে, তার সঙ্গে একরকম মাটি মেখে তাকে আবার পুড়িয়ে ফেলে। দূষিত 'দাস্ত' ইত্যাদি রোগের জন্যে গণ্ডারের শিং খুব কার্যকরী বলে মনে করা হ'ত।

কিন্তু সেকালের কলকাতার এই ভয়াবহ অস্বাস্থ্যকরতার ছবি যদি আপনাদের পীড়িত করে তোলে, উপায় নেই। কেননা এইবার আপনাদের সেই আদি কলকাতার এক বীভৎস সামাজিক অস্বাস্থ্যের কাহিনী শোনাব যা সমান মর্মান্তিক, বেদনাবহ। সে গল্প কলকাতার অজস্র ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীদের চাপা আর্তনাদে মুখর, অশ্রুজলে ভেজা।

শহর কলকাতার ডুমতলা ঘিরে সেদিন দারুণ উত্তেজনা। ডুমতলা খাস সাহেব পাড়ার গা ঘেঁষে। আজকের এজরা স্ট্রীটের কাছটাতে। সেখানে আরমানীদের বাস। আর মুখ লাল করে সেই আরমানীদের ছেলেবুড়ো শুনল খবরটা। একটা চাপা উত্তেজনায় পাড়াটা থমথম করতে লাগল। এ যে তাদের জাতের মাথা হেঁট। সাহেবরা ক্রীতদাসী রাখে। কাফ্রী রাখে। খোজা রাখে। দিশি কালা মেয়েদের রাখে। কিন্তু আরমানী মেয়ে রেখেছে—এ অপবাদ যে মলেও যাবে না।

কে যেন দেখে এসেছিল চাঁদপাল-ঘাটে। সেখান থেকেই একান ওকান চার-কান। এক সময় খবরটা শহর কলকাতায় চাউর হয়ে গেল। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা—ল্যাণ্ড্ সাহেব ইংলণ্ড থেকে আসবার সময় লেভাণ্টের বন্দর থেকে এক জোড়া সুর্মা টানা চোখের অপরূপা রূপসী মেয়েকে কিনে এনেছে। এক টুকটুকে আরমানী মেয়েকে। ডুমতলায় তাই দারুণ উত্তেজনা—আরমানী পাড়ার ঘরে ঘরে ছেলেবুড়ো সবার মুখেই সেই এক কথা—মেয়েটাকে ফেরৎ চাই। এ অসম্মান তারা সহ্য করবে না। অপমান বলে অপমান। পারস্য উপসাগর থেকে একটা আরমানী মেয়েকে ধরে এনে যদি কলকাতার সাহেব তাকে ক্রীতদাসী করে রাখে, কলকাতার আরমানী সম্প্রদায় আর কি মুখ দেখাতে পারবে? আর সাহেবদেরও বলি—এ কি ব্যাভার? আরমানীরা রহিস লোক। তাদেরই একজন খোজা সরহাদের দৌতোই কি একদিন ইংরেজরা লাট-গোবিন্দপুর-কলকাতা-সুতানুটির জমিদার হয়ে বসেনি? আজ না হয় তারা পলাশীর যুদ্ধ জিতে সুবে বাঙলার একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসেছে কিন্তু কৃতজ্ঞতা বলে কি জগতে কিছু নেই? তাছাড়াও কথা আছে। আরমানীরা কি খৃস্টান নয়? কলকাতার বুকে তারাই কি প্রথমে গির্জা বানায়নি? তা খৃষ্টান হয়ে খৃস্টানকে ক্রীতদাসী করে রাখে কোন আক্কেলে? কোন ধর্মে?

শেষবেশ পাকা দাড়ি খোজা সাহেবরা ঠিক করলে তারা স্বয়ং ল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গেই এ নিয়ে কথা কইবে। যেই ভাবা সেই কাজ। ডুমতলা ছেড়ে কয়েকটা পালকী তাদের নিয়ে সেদিন উজ্জ্বল প্রত্যূষে 'রোপ-ওঅ্যাক'—আজকের মিশন রো দিয়ে 'হুমব্রহো' 'হুমব্রহো' করতে করতে কাপ্তেন সাহেবের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। আরমানী মুরুব্বিরা কাপ্তেন সাহেবকে সেলাম করে বললে যে, সাহেব অনেক তকলিফ করে যে মেয়েটিকে পারশ্যের বন্দর থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, তাকে তার স্বজনদের মধ্যে ফিরিয়ে নেবার জন্তে সাহেবের আমীরখানায় তারা হাজির হয়েছে।

এর জন্য অবশ্য কাপ্তেন সাহেবের গা খরচপত্র হয়েছে, সে সবই পাই পয়সা তারা দিয়ে দেবে। আরমানীদের প্রস্তাবে সাহেব কোন গররাজী দেখালে না। বরঞ্চ সাগ্রহে টাকাকড়ির কথাটা পেড়ে বসল। প্রথমেই তার বাক্স-প্যাটরা হাঁটকে একটা খৎ বার করলে। খৎ-টা তিনশ টাকার। পারশ্য থেকে কলকাতা আসার রাহা খরচ বাবদ মেয়েটাকে দিয়েছে ল্যাঙ্। সেকালে তিনশ টাকার অনেক দাম। কলকাতায় দশকুড়ি টাকার তরুণী কাফ্রী মেয়ে পাওয়া যেত। কাজেই আরমানী মুরুব্বিরা টাকার ব্যাপারে একটু হোঁচট খেলে। সাহেবকে শুধালে টাকাটা নগদ দিয়েছে সাহেব না, রাহা-খরচের বিনিময়ে লিখিয়ে নিয়েছে? সাহেব ত খাপ্পা! বললে, 'উসমে কেয়া'। আরমানীরা আর সাহেবকে ঘাঁটালে না। পাল্টা একটা প্রস্তাব করলে, সাহেব, মেয়েটা আমাদের জাত-কাঠের। একবার দেখা করা যাবে? সাহেব মোচে তা দিয়ে শীতলকণ্ঠে বললে, না। আরমানী মুরুব্বিরা পাল্কীতে গিয়ে চাপলে।

কবে বলে না গরজ বড বালাই। তাই আরমানীদেরই আবার ল্যাঙের কাছে যেতে হল। মায খৎ তারা সর্বসাকুল্যে ছশো টাকা দিতে চাইলে মেয়েটার মুক্তিমূল্য হিসেবে। সাহেব পাক দিয়ে চাইলে আটশো। আরমানীরা হ্যাঁ-না কিছু বললে না। নিজেদের মধ্যে সলাসরামর্শ করার সময় চাইলে শুধু। কিন্তু সময় চাইলেই কি সব সময় পাওয়া যায়। কেননা কদিন পরেই সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলে, ল্যাঙ মেয়েটাকে বেশি দামে বিক্রি করে দিয়েছে।

আরমানীরাও নাছোড়বান্দা। আরমানী মেয়েকে ক্রীতদাসী করা হয়েছে—এ যে তাদের ইজ্জতের প্রশ্ন। তারা সোজা গিয়ে ফোর্ট উইলিয়মে লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করলে। বললে, এ কি ব্যাপার? আরমানীরা খৃস্টান। খৃস্টান-রাজত্ব কলকাতায় খৃস্টান মেয়েকে ক্রীতদাসী করা—একি অন্যায়? একি অরাজকতা! লর্ড ক্লাইভ তাদের যুক্তি ফেলতে পারলে না। জন কুক বলে এক ইংরেজ মাতব্বরকে বললে ব্যাপারটার ফয়সালা করে দিতে।

কুক যেতেই ল্যাঙ আইনের আশ্রয় নিলে। বললে, এই দেখ কাগজ। আমি মেয়েটাকে কিনিনি। গচ্ছিত রেখেছি। কাজেই তাকে বিক্রি করি কোন্ আইনে? আরমানীরা ত থ। কিন্তু কুক ক্লাইভের লোক। ও-সবের মধ্যে না গিয়ে ফিসফিস করে সে ল্যাঙের কানে কানে কি বললে। বললে, আরমানী কর্তাদেরও। উভয়ের পক্ষকেই সমান চাপ দিলে। অন্য কারও নয়, লর্ড ক্লাইভের লোক। কেউই ফেলতে পারলে না। একটা আপোষ রফায় এসে গেল—ছশ' বিয়াল্লিশ টাকা। দিন ঠিক হল। টাকা দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে যাবে।

ঠিক দিনক্ষণ দেখে আরমানীরা পাল্কী পাঠালে। ল্যাঙের চাপরাশী খবর দিলে

সাব কোঠীমে নহি হ্যায।—কিন্তু আমাদেব যে কথা দিয়েছে সাঁহেব—আরমানীরা বোঝাতে চাইলে। আব কথা? একদিন যায়। দুদিন যায়। পর পর কয়দিনই ফিরে গেল আরমানীদেব পাল্কী। কোথায়ই বা সাহেব আর কোথায় বা সেই রহস্যময়ী আবমানী ক্রীতদাসী।

ব্যর্থ মনোবথ আবমানীবা আবাব নালিশ কবলে ক্লাইভকে। এবাব আর মুখে বলা নয়। লিখে। যাকে বলে কলকাতাবাসী আবমানীদের গণ-দবখাস্ত, মাস-পিটিশন, সেকালেব কলকাতাব এক মোক্ষম অস্ত্র। কিন্তু ক্লাইভই বা তখন কববেন কি? পাখী উড়ে গেছে। আবমানী ক্রীতদাসীই কি আব তখন কলকাতায় ছিল? তাব মেহেদীবাঙা হাত, তাব সুর্মাটানা ডাগব দুটি চোখ, গোলাপ বাঙা গাল নিয়ে সেই সুন্দবী তখন অন্য এক সাহেবেব সঙ্গে পাটনাব জন্য বজবা ভাসিয়েছে। গঙ্গাব সেই উজান টানে তার স্বজনদের হায়-হুতোশ কোথায় যে হাবিয়ে গেল।

তবে মেয়েটি আরমানী। জাতে খৃস্টান। তাই এত বঙ্গ। নয়ত সেকালেব কলকাতায় হাটে-বাজাবে হাজাব হাজার ক্রীতদাস ক্রীতদাসী। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে তাদেব নিত্যি কেনাবেচা। আলু-বেগুন কলা-মূলোব মতই। কলকাতার কাগজে তাদের আকার-প্রকাব মাপ দেখিয়ে নিত্যি বিজ্ঞাপন আব ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানীর কোষাখানায় তাদের জমিদাবীব কাছাবিতে দুহাতে জমা হচ্ছে কর—এবং তদুপরি বেজিস্ট্রেশন ফি। মাথাপিছু চার টাকা চাব আনা।

শুধু কি এতেই খুশী ছিল নাকি জন কোম্পানী। তাবা নিজেবাই দাসদাসী বিক্রিব ফলাও ব্যবসাযে নেমে পড়েছিল। ফোর্ট উইলিয়মের সবকাবী নথিপত্রে খোলসাই লেখা রয়েছে যে, ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানী খোলাখুলি হুকুম দিয়েছিল, কলকাতার তৎকালীন জমিদাব ও বক্সী আর্থাব কিংকে, যে জাহাজ এলেই যাতে অবিলম্বে ক্রীতদাস ক্রীতদাসী রপ্তানী করা যায়—কোন রকম দেরী না হয় সেই কারণে ক্রীতদাস পেলেই আগে থাকতে কিনে যেন কই-মাগুর মাছেব মত জিইয়ে রাখা হয়—buy up what slaves he can get from time to time; এই হতভাগাদেব কিভাবে একটা ঘেবা ঘবে আটকে বাখতে হবে—পাহারার ব্যবস্থা হবে কি বকম এবং যদ্দিন না বিক্রি হয়, তাদের খাওয়া-দাওযাব ব্যবস্থা হবে কি—এবং কিরকমভাবেই বা বড়সাহেবদের বাড়িতে তাবা বেগাব খাটবে—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার নির্দেশ ছিল সরকারী সেই অর্ডারে। কিং সাহেবকে সমঝে দিয়ে বলা হয়েছিল যে, তিনি যেন বেশির ভাগই দাস কেনার চেষ্টা করেন, দাসী নয়। ছোকরা হলেও চলবে, তবে স্বাস্থ্যটা যেন মজবুত হয়, সুদর্শন হয়, একটু বা মার্জিত হয়। কোম্পানীর এই নির্দেশের তারিখ—আটাশে ফেব্রুযারি সতেরশ আট। এটি নানা দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এ থেকে দিবা-লোকের মত স্পষ্ট

হয়ে যায় কোম্পানী কলকাতায় থিতু হয়ে বসবার আগেই পুরোপুরি এই মানুষ-বিক্রির ব্যবসাযে নেমে পড়েছিল। এ থেকে অবাক লাগলেও আরও জানা যায়, যে কলকাতার দাস ব্যবসার আদি যুগে মেয়েদের বাজার ছিল বেশ মন্দা। এবং এই মন্দা বাজার অন্তত বছর পঞ্চাশ চলেছিল কলকাতায় কেননা সতেরশ চৌষট্টি সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি খাস লণ্ডনের লিডেনহল স্ট্রীট থেকে এ ব্যাপারে যে পরোয়ানা আসে, তাতেও বলা হয়েছিল জাহাজের মোট দাসদাসীর কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ অবশ্যই হবে ক্রীতদাস। বয়স পনের থেকে চল্লিশ। বাকীটা ক্রীতদাসী। বয়স—পনের থেকে পঁচিশ। দাম প্রত্যেকের পনের পাউণ্ড। নাবালক-নাবালিকা অর্থাৎ দশ থেকে পনের বছরের মধ্যে হলে—দুটোকে একটা একটা ধরা হত। জাহাজের কাপ্তেন থেকে ডাক্তার সবাইকেই উপরি একটা ইনাম দেওয়া হত। একটি ক্রীতদাসকে সুস্থ শরীরে বন্দরে নামিয়ে দিলে জাহাজের বড়কর্তা পেত তের শিলিং চার পেন্স। মেট পেত ছয় শিলিং আট পেন্স। ডাক্তারের প্রাপ্য মাথাপিছু দশ শিলিং। আর কলকাতায় কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের খাতায়ও জমা পড়ত মাথাপিছু বেশ কয়েকটা টাকা-আনা-পাই।

তবে এ দাম থাকে নি। কয়েক বছরের মধ্যেই বেশ বেড়ে গিয়েছিল। সতেরশ আশি সালের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল—সুদেহী, খানসামা, বাবুর্চি ও খিদমদগারের কাজ জানা একটি কাফ্রী ছেলে বিক্রি আছে। দাম—চারশ' সিক্কা টাকা। সেকালের হিসেবে এককাঁড়ি টাকা। কেননা, পর্তুগীজরা ক্রীতদাসের দাম কখনও কুড়ি থেকে সত্তর টাকার বেশি দেয়নি। তাদের বাজারটা মনে হয় বসন্ত বজবজ-সুন্দরবন অঞ্চলে।

আঠারশ তেইশ সাল নাগাদ দেখা যাচ্ছে, কলকাতার বাজারে মেয়েদের কদর বাড়ছে। ব্যবসা দাঁড়িয়েছিল এই রকম। আফ্রিকা থেকে ছেলে আসত কলকাতায়, কলকাতা থেকে যেত মেয়ে। কলকাতার বাজারে বিদেশী ক্রীতদাসী আসত জাঞ্জিবার থেকে। আর সেখানে বেগুন বেচার মত যাচাই—কানা কুঠো কিনা। নাক ডাকে? দাঁত কিড়মিড় করে না ত? কত সব জিজ্ঞাসা। হাতে বালা। পায়ে বালা। মুখে লাল সাদা দাগ। কোমরে এক প্রস্থ নতুন কাপড়। কলকাতার বাজারে চলত মানুষ বিক্রি সমারোহ। জোয়ান ছুকরী—দাম ষাট ডলার। বাচ্চা ছেলেমেয়ে—পাঁচ-ছয় ডলার।

কিন্তু কলকাতার বাজারে এই সব ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী আসত কোথা থেকে? স্যার উইলিয়ম জোন্স, তৎকালীন কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাস্টিসের বিবৃতিতে জানা যায় সতেরশ পঁচাশি সাল নাগাদ প্রায় প্রতিদিন দাসদাসী ভর্তি বড় বড়

বজরা এসে ভিড়ত কলকাতার ঘাটে ঘাটে। স্যার উইলিয়মের মতে, এই সব মানবকদের বিক্রি করা হত এক আধ পালি চালের বিনিময়ে—নয়ত বা এরা চুরি করা। সাহেব পাড়ার বাবুরাও কিনতেন নাম-মাত্র মূল্যে এবং সেকালে কলকাতার একটিও সাহেব-বাড়ি ছিল না, যেখানে নাকি এই সব দাসদাসীরা তাদের দিনযাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানি অসহ্য বেদনায় বহন না করত।

আর দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর হলে ত কথাই নেই। মানুষ বিক্রির মরসুম পড়ে যেত। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র সেই কথা বলেছেন, 'তখন বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।...গোরু বেচিল, লাঙ্গল-যোয়াল বেচিল, বীচধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল, জোত জমা বেচিল। তারপরে মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রীকে বেচিতে আরম্ভ করিল।' এইসব ছেলেমেয়েরা আসত কলকাতার বাজারে। কপালে দাগ। সারাগায়ে লাল-কালো দাগ। পরনে নতুন কাপড়। দাম—পাঁচ ছয় টাকা।

বঙ্কিম কিন্তু আর একটা বিক্রির কথা বলেননি। স্ত্রী বিক্রির পর ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ এক সময়ে নিজেকেই বিক্রি করে দিত। আইনতঃ আত্মবিক্রয় করত দলিল করে। সেই দলিলের ধরণ ছিল এই রকম—

"ইয়াদি কীর্দ্দি সকলমঙ্গলালয়।—

"শ্রীলালাগুরুদাস রায় অওলাদে শ্রীযুক্ত মহারাজ নন্দকুমার রায় ইবনে পদ্মনাভ রায় সচ্চরিত্রেষু লিখিতং শ্রীচারু বেওয়া অওলাদে তীতু গোপ ইবনে গঙ্গারাম গোপ বন্দা আটীবি পত্রমিদং সন ১১৭৭ এগার শত সাতাত্তরি অব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে অকালে অন্নাভাবে মরি মহাশয়ের নিকট আত্মবিক্রয় হইলাম, ভরণপোষণ করিয়া দাস্যে দাখিল করিবেন। একবার বিকাইলাম ইহাতে পলাইয়া যাই ধরিয়া আনিয়া শাস্তি করিবেন, এতদর্থে বন্দা আটীবিপত্র:দিলাম, ইতি সন সদর বতারিখ ৫ জমাদিল্যোন মোতাবেক ১৪ই ভাদ্র।—শ্রীচারু বেওয়া, সাং ঘরুতা।"

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরের বছর বাংলা দেশের অন্নাভাব যে ঘোচেনি, চারু বেওয়ার এই দাসখত তারই প্রমাণ। এবং ক্রীতদাসেরা পালিয়ে গেলে তাদের ধরে এনে যে শাস্তি দেওয়া হত এই প্রতিজ্ঞা পত্রে তা' লেখা রয়েছে। কিন্তু এ থেকে বোধ করি বোঝা যাবে না পলায়িত ক্রীতদাসদের কী নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল কলকাতায়। অপরাধী দাসদাসীদের সাধারণত উলঙ্গ করে চাবকানো হত। ষোল সতের বছরের মেয়েদেরও রেহাই ছিল না, এমনকি এই নৃশংস অত্যাচার করা হত অন্যান্য দাস দাসীদের সামনে। আর এক বিচিত্র শাস্তি ছিল ডিসেম্বরের কাঠ শীতে উলঙ্গ করে গায়ে কলসীর পর কলসী জল ঢালা। এত তাড়াতাড়ি জল ঢালা হত যে ক্রীতদাসটি নিঃশ্বাস না নিতে

পেরে দম আটকে অজ্ঞান হয়ে যেত। অবশ্য লঘুদণ্ডও ছিল। কলকাতার দুই ধর্মান্তরিতা কাফ্রী ক্রীতদাসী সারা ও পেগী একবার তাদের মনিবদের ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল পেগীর সাজা হয় তিন বেত। আর সারা দাগী আসামী। আগেও একবার পালিয়েছিল। তাই তার সাজা পনের ঘা।

তবে সে কালের জঘন্যতম সাজা দিতে দেখা যায় জনৈক খানদানী মুঘল মালিকানীকে। তাঁর আট বছরের এক বাঁদি অপরাধের মধ্যে করেছিল খানিকটা চিনি চুরি। মেয়েটি অবশ্যই লোভী, কেন না আগে একদিন ভিনিগার চুরি করে খেয়ে ধরা পড়ে। এবং এরই শাস্তি স্বরূপ মুঘল ভদ্রলোকের স্ত্রী তাঁর ক্রীতদাসীর দেহ থেকে মাংস কেটে নেবার হুকুম দেন। ঐ এক মেয়ে শাইলক। কি তার চেয়েও বেশি। শাইলক তার পাউণ্ড অফ ফ্লেশ পায়নি, মুঘলানী পেয়েছিলেন এবং বলা বাহুল্য কিশোরী মেয়েটি মারা যায়। এবং আশ্চর্যের কথা সেকালের ইংরেজ আইনে এক সময়ে সে খালাসও পেয়ে যায়। অবশ্য বছর আষ্টেকের ক্রীতদাসকে খুন করার জন্য সেকালের কলকাতায় যে ফাঁসি হয় নি এমন নয়।

কিন্তু এত গেল শাস্তির কথা, পুরস্কার? তাও ছিল। সেকালের কলকাত্তিয়া সাহেবদের উইলগুলো ঘাঁটলে লক্ষ্য করা যায় যে মরার আগে অনেকেই সজ্ঞানে তাঁদের বান্দাবাঁদীদের কিছু না কিছু দিয়ে গেছেন। কাউকে মুক্তি সপরিবারে। সারা সিনক্লেয়ার সেন্ট জন চার্চের কবর খানায় দেহরক্ষা করেন। মরার আগে তিনি তাঁর ক্রীতদাসী জুবেলকে তিরিশটি স্বর্ণমুদ্রা এবং সকল সন্তান সন্ততিসহ মুক্তি দিয়ে যান। চাকর সিজারকেও তাই। আবার এক মনিব মরবার পর নতুন ওয়ারিস মনিব যে দাসদাসীদের নতুন করে বিক্রি করে দিতেন তারও আকছার নজির আছে সেকালের কলকাতায়। তবে হাট সাহেব যে কথাটা বলেছেন, সেকালের কলকাতায় ভৃত্যের অভাবের জন্যই ক্রীতদাসের বাজার এত চড়া ছিল সেটা হয়ত মিথ্যে নয়। দেখা গেছে, এমনি বাছা দাসদাসী কিনে তাদের গড়েপিঠে তালিম দিয়ে নেওয়া হত, তাদের ঘর গৃহস্থালীর কাজ শেখানো হত। অনেকেই রসুই করা শিখে নিত অনেককে আবার নাপিত বা হেয়ার ড্রেসারের কাজে পোক্ত করে তোলা হত। তা যে হত সেকথা বলছে সেকালের কাগজে এক হেয়ার ড্রেসারের বিজ্ঞাপন। তিনি অতি অল্প চার্জেই যে ক্রীতদাসদের হেয়ার ড্রেসিং-এ তালিম দিতে ব্রতী হয়েছেন সবিনয়ে সেটি ঘোষণা করেন এই সব কাজ জানা দাসদাসী সেকালে বেশ দামেই বিকোত।

সে যাই হোক এই ক্রীতদাস ক্রীতদাসীদের নিয়ে চার্ণকের জলাভূমিতে কত নাটকই না হত। সতেরশ দশ সালের কলকাতা। আগষ্ট মাস। ইশাক বার্কলি আর কাপ্তেন পেতার এক পাড়ায় বাড়ি। বার্কলির ক্রীতদাসী জাতে কাফ্রী এখন ক্রীশ্চান। আফ্রিকার

অন্ধকারে তার বাপ মায়ের দেওয়া নাম কখন যেন কলকাতার ভীড়ে হারিয়ে গেছে। সেকালে তাই যেত। ক্রীতদাস সাহেব মনিব পেত। আর পেত নতুন নাম, নতুন ধর্ম। বার্কলির ক্রীতদাসীটির নামটি ভালো, কাব্য আছে লুক্রেশিয়া। মহাকবির কাব্যের নায়িকা। গেতার ক্রীতদাসীটির নাম বারবারা।

মন্দাক্রান্তা ছন্দে দোবাস, হুকাবরদার, ছিলিম, পাল্কী নিয়ে বেশ বয়ে চলেছিল দুই সাহেবের জীবন, এমন সময় ঘটে গেল অঘটন। কি যে মতিচ্ছন্ন হল কাপ্তেন সাহেবের আব কি যে সেদিন দেখলেন লুক্রেশিয়ার চোখে, তাঁব বাড়িতে ধবে রাখলেন মেয়েটিকে —যেতে নাহি দিব। খবব গেল বার্কলি সাহেবেব কাছে। তিনি এক বিচিত্র প্রতিশোধ নিলেন এই অপরাধেব। বারবারাকে কুক্ষিগত করলেন তিনি। দুজনের তুমুল কলহ। সুন্দউপসুন্দেব এই লড়াই অবশেষে গিয়ে উঠল ফোর্ট উইলিয়ামে, কলকাতা কাউন্সিলে। প্রেসিডেট এ্যান্টনি ওয়েলডেন আর করেন কি এ-কেচ্ছার—পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ—এই আপ্তবাক্য উভয়কেই শুনিয়ে পবস্পরের ক্রীতদাসী ফেরত দিতে আদেশ দিলেন।

অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষ দিকে ডোগেল বলে এক সাহেব ম'সিয়ে দেশ গ্রাঞ্জেস নামে এক ফরাসী সরকারী কর্মচারীর বউ নয় ক্রীতদাসীকে নিয়ে এলোপ কবল। কোথায় গেল কোথায় গেল খোঁজ। খোঁজ। খোঁজ। শেষে জানা গেল মেয়েটিকে নিয়ে ডোগেল পালিয়েছে কলকাতা ছেড়ে একবার হুগলি। ফরাসী ভদ্রলোক ডোগেলের কাছে একটা চিঠি পাঠালেন—যা হয়ে গেছে, মেয়েটিকে ফেরৎ দাও বাপু। কিন্তু কে কার কথার ধার ধারে! ডোগেল নিরুত্তর। শেষে ফবাসী সাহেব হুগলির ইংরেজ সরকারকে জোব এক অভিযোগ করে পাঠালেন ডোগেলের নামে। কিন্তু মসিয়ের এমনি কপাল এরও কোন বিশেষ ফল হ'ল না।

কিন্তু ক্রীতদাসীদের নিয়ে ইলোপ করার কাহিনীই নয় সেকালের কলকাতায় হাঁপিয়ে ওঠা বন্দী মানুষের দল উন্মুক্ত আকাশের টানে প্রায়ই বেড়া টপকে পালাত। ক্রীতদাস নিরুদ্দেশের খবর সেকালের কাগজের পাতা উল্টালেই পাওয়া যেত—

Run away from his master a good looking Coffree Boy about 20 years old and about 6 feet 7 inches in height, when he went off he had a high toupie.

অর্থাৎ ছ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা। বয়স বিশ বছর। সুদর্শন একটি কাফ্রী যুবা তার মনিবের কাছ থেকে নিরুদ্দেশ। যখন তাকে শেষ দেখা যায় তার মাথায় একটা লম্বা টুপি ছিল। তারিখ উনত্রিশ ডিসেম্বর—সতেরশ একাশি। অপর একটি বিজ্ঞাপন, গত বৃহস্পতিবার রবার্ট ডানকানের চীনে বাজারের বাড়ি থেকে ইন্দ্র নামে একটি বার

বছরের কাফ্রী ক্রীতদাস উধাও হয়েছে তাকে যে ফিরিয়ে দিতে পারবে তাকে এক মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে।

বাস্টীড তাঁর একোজ ফ্রম ওল্ড ক্যালকাটা গ্রন্থে কিন্তু একটা সাংঘাতিক ইঙ্গিত দিয়েছেন। দাস ব্যবসার লোভে সেকালের ইংরেজরা নাকি আমরা যেমন গরু ছাগল পুষি তেমনি ক্রীতদাস পুষত। তাদের বিয়ে-থাওয়া দিত এবং সন্তান সন্ততি বাজারে বিক্রি করে ব্যবসা করত। ব্যাপারটা যে একেবারে অলীক কল্পনা নয় তার প্রমান সেকালের কাগজের এক বিচিত্র বিজ্ঞাপন—যার বঙ্গানুবাদটা এই রকম :

কনে চাই

চাই—পশমের মত কালো রঙ-এর দুটি মেয়ে—দুটি কাফ্রিনী। বয়স—চোদ্দর কম নয়—বিশ পঁচিশের বেশিও নয়। তাদের বয়সের মেয়েদের অনুপাতে যেন বেশ বাড় থাকে। তাদের স্বদেশীয় স্বজাতীয় এবং স্ববর্ণের দুইটি পাত্রের সঙ্গে তাদের উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হবে।'

মনে হবে যেন ছেলের জন্যে মেয়ে খুঁজছে সাহেব। আহা, হবে না বা কেন নাতি-নাতনিরাই ত ভরসা।

এক সময়ে এই হারান-প্রাপ্তি হাসি-কান্নার পালা শেষ করে কলকাতার বাজারে আঠারশ তেত্রিশ সাল এসে গেল। আইন পাশ হয়ে গেল। আঠারশ পঁয়তাল্লিশের আগষ্ট থেকে দাসব্যবসা চিরকালের জন্যে বন্ধ। ওয়ারেন হেস্টিংস ধরা পড়া ডাকাতদের বাড়ীর লোকদের ক্রীতদাস হতে বাধ্য করেছিলেন। সেও আইন করে, আবার এও আইন হল মানুষকে দাস রাখা চলবে না। মাঝে অবশ্য অ্যাডাম স্মিথ কলকাতার আমড়াতলার গলিতে আরমানী ভদ্রলোকের ভাড়াটে হিসেবে কাটিয়ে গেলেন। দেখে গেলেন ঠিক খাঁচায় যেমন পোষ না মানা বুনোপশুকে রাখা হয়, তেমনি রাখা হত ক্রীতদাসদের, সে কি সব অত্যাচার। তারপর একদিন মানুষের দরবারে মানুষের নালিশ পৌছল, বন্দী মানুষদের হাতে পায়ের বালা খুলে গেল, মানুষই খুলে দিল। মাঝখানে কেবল দেড়শ বছর ধরে কলকাতার হাটে বাজারে কয়েক লক্ষ বাঁদী বান্দা ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর ভিড়, তাদের কান্নার কোলাহল কলকাতার ক্লান্ত অতীতের দুঃস্বপ্নের মত জেগে রইল।

কিন্তু এ'ত গেল শহর কলকাতার নীচুতলার মানুষের কাহিনী। অজস্র ক্রীতদাস-ক্রীতদাসদের নিগ্রহের বৃত্তান্ত। এবারে শুনন উচ্চকোটির মানুষ—সম্পাদকদের নিগ্রহের উপাখ্যান।

কলকাতার লাটভবনে সেদিন পর পর চারজন সম্পাদক ঢুকলেন লাটবাহাদুরের আমন্ত্রণে। 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র নরেন সেন, 'বেঙ্গলী'র সুরেন বাঁডুজ্জে, 'রেইস আর রায়তে'র শম্ভু মুখুজ্জে আর 'সঞ্জীবনী'র দ্বারকা গাঙ্গুলী। আরও একজন গেলেন এঁদের সঙ্গে। ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু। ভারতীয় কংগ্রেসের গোড়াপত্তন হয়ে গেছে। দেশে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন হয়েছে। আঠারশ' সাতাশি। লাটবাড়ী আলো করে লর্ড ডাফরিন। উপলক্ষ ভারতসভা।

লাটবাহাদুর এলেন। এলেন গোমড়া মুখে। বিরস বদনে। কণ্ঠে লৌকিকতার অভাব হল না। মাননীয় অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে হঠাৎ বলেই উঠলেন, আচ্ছা ইণ্ডিয়ান মিররের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন এসেছেন কি? সৌজন্যবশে উঠে দাঁড়িয়ে লাটবাহাদুরকে তাঁর পরিচয় দিয়ে থাকবেন নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু ভাইসরয় সেসব সৌজন্যের প্রত্যুত্তরই করলেন না। বরঞ্চ অত্যন্ত কাঠখোট্টার মত জিগ্যেস করে বসলেন, আচ্ছা ভারতীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করবার জন্যে মহামান্য লাটবাহাদুর সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়াকে গোপন 'সিক্রেট' চিঠি লিখেছেন, সে খবর আপনি জানলেন কি করে? লাটসাহেবের এ ধরনের অভদ্র প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলেন না নরেন্দ্রনাথ। তবু একবার বোধ হয় থমকে দাঁড়িয়ে থাকবেন, তারপর সহজ কণ্ঠে বললেন, মহামান্য লাটবাহাদুরের এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। সেখানেই থামলেন না নরেন্দ্রনাথ। লাটসাহেবকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে কোন সম্পাদককে এই ধরনের প্রশ্ন করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ।

ডাফরিন জাত ডিপ্লোমাট। এ ধরনের কঠিন প্রত্যাঘাতে সজাগ হয়ে উঠলেন। সম্পাদকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। অন্তত এই কাহিনী পরিবেশন করে সেই কথাই বলেছেন রামগোপাল সান্যাল। তবে সম্পাদকদের এই ধরনের অসম্মান শহর কলকাতার আদ্যিকালের ইতিহাসে কিছু নতুন কথা নয়। 'আজব শহর কলকেতা। রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।'....হুতোম দাসে যাই স্বরূপ ভাষে না কেন, শহর কলকাতার আজব চরিত্র হুতোমেই শেষ হয়ে যায় নি। এখানে বারে বারে সম্পাদক—সাংবাদিকদের ওপর নিগ্রহ হয়েছে, আক্রমণ হয়েছে। এবং কেমন যেন এটা ট্রাডিশনেই দাঁড়িয়ে গেছে। সেকালের বিবর্ণ পাতাগুলির ওপর থেকে বিস্মৃতির ধুলো সরালে এই সত্যই প্রতিভাত হয় যে, বহু নামী-অনামী সম্পাদক-সাংবাদিক তাঁদের সততা, সত্যভাষণের জন্যে রাজরোষে পড়েছেন, নিগৃহীত হয়েছেন ক্রোধান্ধ সামন্ত-তন্ত্রের হাতে, কেউ বা অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন, মৃত্যুর পরও রেহাই পান নি হরিশের

অসহায় পরিবার। কাউকে কাগজকে কাগজই তুলে দিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। এই নিগ্রহের যেন শেষ নেই। শাস্তি নেই।

এবং এ ব্যাপারে সাদা-কালোর তফাৎ নেই। সাহেব সম্পাদকরাও রেহাই পায় নি। তাদের গল্প দিয়েই শুরু করা যাক। কেননা যে যাই বলুক সাহেব নিয়েই ত কলকাতা। তারাই আদি আর তারাই অন্ত। এখনও যাঁরা বুড়ো ঠাকুর্দারা কলকাতার পুরনো দিনের কথা পেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তাঁরাও সেই সাহেব-কলকাতার কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—সে রামও নেই, সে অযোধ্যা নেই। সেই লাল-নীল-সবুজে-বেগুনী কাগজের শিকলে কাটা ছুঁচলো টুপিপড়া বুড়োর বড়দিনও নেই, কিংস বার্থডে সোনালী অক্ষরে লেখা আলোঝলমল 'ন্যু ইয়ারস ডে' নেই। সেই সাহেবদের শহর কলকাতা বলতে একালের চৌরঙ্গী-ডালহৌসী-লালবাজার মায় ধর্মতলার কিছু কিছু। সেকালের ম্যাপে তা লাইন টেনে দেখিয়ে দেওয়া হত। সেই সাদা কলকাতা ত নয়, ছবি। সাহেব-মেমেরা হাঁটে। লালদীঘির সামনে ছবির মত ছায়া-ঘেরা পথে রোদ পড়লে বেড়াতে বেরোয়। কেউ গঙ্গার বুকে বজরায় চাপে।

আলিনগর খালি করে নবাবী ফৌজ মুর্শিদাবাদ পালিয়েছে। পলাশীর আম্রবনে রক্তের আলপনা লেগেছে। রবার্ট ক্লাইভ মোটা পয়সা কামিয়ে স্বদেশে 'ব্যারণ অফ প্ল্যাসী' হয়ে বসেছেন। মাদ্রাজ থেকে এই সেদিন চাঁদপালঘাটে এসে নামলেন নতুন সাহেব-বাদশা—ওয়ারেন হেস্টিংস। আর সে খবর কলকাতার সাহেব সুবোরাই নয়, কালা কলকাতাও জানতে পারলে কেল্লা থেকে বার বার একুশটা তোপের শব্দে। আর মৌচাকে যেন কাঠি পড়ল। কালা নয় গোরা কলকাতায়। সাহেব মহলে। সেখানে নানা জল্পনা-কল্পনা। ফিস ফিস। চাপা আলোচনা। কিছু হাসি। কিছু ঠাট্টা। কিছু কিছু তির্যক ইঙ্গিত। কিন্তু সে কাকে নিয়ে? ওয়ারেন হেস্টিংস?—সে ত পুরনো মানুষ। বাঙলাদেশের সাতঘাটের জল খেয়ে, কান্ত মুদির বাড়ী পান্তা খেয়ে—এবার একেবারে গভর্নর জেনারেল হয়ে ফিরেছেন। তাকে নিয়ে চোখ টাটাতে পারে। আঙুল ফুলে কলাগাছ বলে কোন কোন সাহেবের মনে জ্বালা ধরতে পারে। কিন্তু আলোচনা? না। সে রসালো কেচ্ছা জার্মান দম্পতি ইমহফদের নিয়ে। কেননা বড় সুন্দরী এই মেয়েটি—শ্রীমতী ইমহফ। কিন্তু সেখানেই ত ব্যাপারটা শেষ নয়। জাহাজে এই মেয়েটিই না প্রাণ দিয়ে সেবা করেছিলেন অসুস্থ হেস্টিংসের? আর তার মনের সিংহাসনে চিরকালের জন্য আসন করে নিয়েছিলেন!

কশাইটোলা বা লালবাজারে হোটেল-টেভার্ণগুলি তখন গজিয়ে উঠেছে। হারমনিক বা লণ্ডন টেভার্ণ ত তাদের শিরোমণি। সেখানে হুল্লোড় করতে করতে সাহেব-মেমেরা এই সব কেচ্ছাকাহিনী রসিয়ে রসিয়ে শোনে আর হাসিতে ভেঙে পড়ে। কোন

সুন্দরীর ঈর্ষা ভ্রুভঙ্গে বিরাজ করে। নৃত্যক্লান্ত তরুণ-তরুণীরা মেরিএনের কথা নিয়ে ঘোঁট পাকায়, গ্রাণ্ডের কেচ্ছার চটেচটে রসাল আঠার সৃষ্টি করে, তরুণী এম্মার নবীনতম প্রেমিককে নিয়ে করে জল্পনা-কল্পনা। আর এ সব কথার ফাঁকে ফাঁকে গভর্নরের বাড়ির সার্শীর কাঁচ নিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তাদের বেতের তৈরী জানলার ঢাকায় বোধ করি ঐ কাঁচের সুদিন আর আসবে না।

ওদিকে কৌন্সিলেও জোর ঘোঁট। হেষ্টিংসের পিছু পিছু এসেছেন ক্লেভারিং, মনসন আর নাটের গুরু ফিলিপ ফ্রান্সিস। ওই হেদোর দক্ষিণ থেকে রাজা নন্দকুমার এসে সেই নাটকে যোগ দিয়েছেন। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় তাই নিয়ে রাজন্য-কূল ব্যস্ত। হেষ্টিংস কিন্তু হালকা নাস্তা, মদ্যহীন লাঞ্চ-ডিনার আর ঘোড়ায় চেপে নিত্য প্রাতঃভ্রমণের দিনপঞ্জী নিয়ে শরীরটাকে সুস্থ রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। কলকাতার কলহ তাতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে নি।

আর এত শতয় ব্যত্যয় ঘটে নি ট্যাভার্ণ-জীবনের। সেখানে দিন-রাত আড্ডা। কখনও অফিস-পালান রাইটার, কখনও সেলর, গোরা সৈন্য। আর রাত হলেই জোড়ে বিজোড়ে সাহেব-মেম। সন্ধ্যার আকাশের তারার মত তাঁরাও উদয় হন ট্যাভার্ণে। সন্ধ্যা নামতেই। লালদীঘির কার্প, বাটা-খরসোলার স্বাদ কেমন, মাতাল গোরা-নাবিকরা সম্প্রতি শহরে সরকারী পিয়নদের সঙ্গে যে মারামারি করেছে, তাতে দোষী কে, তাই নিয়েও তর্কাতর্কির শেষ নেই। কেবল এক সময় রাত গভীর হয়। বসন্ত শেষে প্রণয়োন্মত্ত মধুপদের কূজন-গুঞ্জনের অবসানের মত কলকাতার গভীর রাত্রে ক্লান্ত প্রণয়িনীরা পায়ে পায়ে ফিটনে চেপে বসে বাড়ী ফিরলে, প্রণয়ীরা গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের বিদায় দেয়, আর আকাশে পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদ যেন বিষম খিটকেল দেখেছে, এমনিভাবে অজস্র অবাক হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে। অদূরে অনেকগুলি শেয়ালের ঐকতান রাত প্রহর ঘোষণা করে বাঁশ আর হোগলা বনে। কখনও কখনও বাঘের গর্জন শোনা যায় আর গড়ের সামনে গোরা সান্ত্রীর রোঁদ দেওয়ার ভারী বুটের শব্দ যেন রাত্রির নিশ্চিন্ত শাসনের ব্যাঘাত করে।

আর এই কলকাতার কাহিনী এক পাগল সাংবাদিক নিত্যনিয়ত লিখে রাখে। না ডায়ারিতে নয় ছাপার হরফে। বড়ঘরের কেচ্ছা ত বেশী মুখরোচক, মুচমুচে, মজাদার। তার চাহিদাই ত সাহেব সমাজে সবচেয়ে বেশী। সাংবাদিক তাও খুঁজে পেতে লিখে। কাউকেই বাদ দেয় না। স্বয়ং গভর্নর, চীফ জাষ্টিস থেকে শুরু করে ছোট-খাট রাইটার—তার কিস্‌সায় কে নেই ?

সাহেবের নাম হিকি—জেমস অগাস্টাস হিকি। ভদ্রলোক সম্বন্ধে সেকালে কেউই খুশী নয়। বাস্টীড় ত বলেছেন, 'ইললিটারেট।' কেন বলেছেন কে জানে। তাঁর

গেজেটে যে লেখা বেরোত সেটা, আর যাই হোক অশিক্ষিত লোকের নয়। তবে সাহেবদের এত গায়ের ঝাল কেন ? বোধ করি এই কারণে যে তাঁর কাগজে সেকালের সাহেবসুবোদের জীবনচর্চার যে ছবি আঁকা হয়েছে তা আর যাই হোক সুস্থ জীবনাদর্শের নয়। আর হিকির তো বাদবিচার নেই—ছোট মুখে বড় কথা, এঁ্যা ?

আর তাই নিয়েই বেঁধে গেল খটামটি। হেস্টিংসের চোখ সর্বত্র। তাঁকে নিয়ে, মেরিএনকে নিয়ে ব্যঙ্গ, তার আঁতে ঘা লাগবে বৈকি! প্রথমেই তাকে ভাতে মারবার ব্যবস্থা করা হল। সমকালীন সরকার সমর্থিত আর একটা কাগজকে প্রাধান্য দেবার জন্যে হিকির কাগজের ডাকে পাঠাবার মাশুল সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু হিকির কাগজের তখন বিস্তর চাহিদা। ছেপে উঠতে পারে না। এতই বাড়বাড়ন্ত। হেস্টিংসের কায়দা মাঠেই মারা গেল। আর ক্রুদ্ধ হেস্টিংস তখন তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন, সতের'শ বিরাশি জুন মাস। কয়েকজন য়ুরোপীয়ান কোর্টের কর্মচারী, জনকয়েক সিপাই আর তিন-চারশ পিয়নের একটা ভারীদল একটা সরকারী পরোয়ানা নিয়ে হাজির হিকির বাড়ী। কি ব্যাপার ? না গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মানহানির দাবি দিয়ে নালিশ করেছেন আর তারই বিচারে চীফ জাস্টিস ইলাইজা ইম্পের এই সমন। বেঁধে নিয়ে যাবে হিকিকে। হিকি যোগেশ চৌধুরীর শম্বুকের মত বলতে পারত—অপরাধী জানিল না কিবা অপরাধ তার, বিচার হইয়া গেল।

হিকিও সহজ মানুষ নয়। দরজাই খুলল না। আর কোর্টের পাইক-পেয়াদা হাতুড়ী শাবল দিয়ে দুদ্দাড় পেটাতে লাগল তার বাড়ীর দরজা—প্রকাশ্য দিবালোকে, সাক্ষাৎ আইনানুসারে! দরজা ভেঙেই একদা তারা বাড়ীর ভেতরে ঢুকল দোর্দণ্ড-প্রতাপে। যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে সম্পাদক হিকি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এবং কোর্টের অফিসারকে অবলীলাক্রমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ্যারেস্ট করতে এসেছেন ? পরোয়ানা কই ? ওয়ারেণ্ট অফ এ্যারেস্ট ? আর ওয়ারেণ্ট! হিকি যেন বিলেতে বাস করছেন। এটা কলকাতা ? হেস্টিংস-ইম্পের হুকুমই এখানে আইন। সেসব প্রশ্নের কোন জবাব দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলে না কোর্টের লোক। অনেকটা পিছমোড়া করে বেঁধেই বোধ হয় কলকাতার প্রথম সাংবাদিক-সম্পাদককে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আদালতে। কিন্তু হিকির কপালে সেদিন ঘোরতর দুঃখ। সেই কোর্টের পেস্কার আমলা পরিবৃত অবস্থায় কোর্টে পৌছবার আগেই জজেরা সব সেদিনকার মত বিদায় নিয়েছেন। সেকালে প্রধান বিচারপতি পুলবন্দী জজ সার ইলাইজা ইম্পে বেলা একটার পর আর বিশেষ কোর্ট করতেন না। আর বামুন গেল ঘর ত লাঙল কাঁধে কর। অন্যান্য সব জজরা ইম্পের মহাজন-পন্থা অনুসরণ করবেন, এ আর বিচিত্র কি ? কাজেই জেমস অগাস্টাস হিকির কপালে সেই রাত্রের জন্য বিনা বিচারে হাজত-

বাস পর দিন সকাল নয়টায় কোর্ট বসলে সারা রাত বিনিদ্র রাঙ্গা চোখ হিকিকে তাঁর বিরুদ্ধে রুজু করা দুটো মামলারই অভিযোগ শোনান হল। দাবী করা হল চল্লিশ হাজার টাকার জামিন। আজকের মত পার্সেন্টেজ নয়। একেবারে মবলগ চল্লিশ হাজার টাকা।

সবসাকুল্যে পাচ হাজার টাকার মত জোগাড় করতে পারলে হিকি। কিন্তু কোর্ট বললে ওতে হবে না! হিকি ত আর হেজি পেজি নয়। সে একটা দারুন আপত্তি দিলে। বললে জুনিয়াসের চিঠি—যা অনেকেই মনে করেন ফিলিপ ফ্রান্সিস লিখতেন ছদ্মনামে রাজাদের ঘরের কেচ্ছা নিয়ে তার প্রকাশকের কাছে বিশ হাজার টাকার বেশী জামিন দাবী করা হয় নি। কিন্তু, কে কার কথা শোনে!

কিন্তু হেস্টিংস হিকির ওপর খেপেই বা গেলেন কেন? ঐ যে বলা হল, বড় ঘরের কেচ্ছা। হিকি তাঁর কাগজে একটা কল্পিত কথোপকথন লিখেছিলেন। এক চাকুরীখোয়া সিবিলিয়ান তাঁর বন্ধুকে জিগ্যেস করলে, হ্যাঁ হে, একটা মোটা মাইনে চাকরী পাবার উপায় কি বলত? বন্ধু জবাব দিলে, হয় মেরিএন আলিপুরীর শরণাপন্ন হও, না হয়ত পুলবন্দী জজের কাছে তোমার আত্মবিক্রয় করে দাও। বলা বাহুল্য, মেরিএন আলি-পুরী হেস্টিংসের সেই জাহাজের প্রণয়িনী। আর পুলবন্দী জজ—ইলাইজা ইম্পে। হেস্টিংসের আনুকূল্যে তিনি সেকালের ব্রিজ বা পুল মেরামতের সব কয়টি কন্ট্রাক্ট জোগাড় করে টাকার আণ্ডিল কামিয়ে ছিলেন। এবং সেকালের খবর যতদূর জানা যায় হিকির অভিযোগ, আর যাই হোক মিথ্যা নয়! আর তাই বুঝি রাগটা এত প্রচণ্ড। শুধু হেস্টিংসেরই নয়, ইম্পেরও। এবং তাই এই সাঁড়াশি আক্রমণ।

নয়ত হিকির উনিশ মাসের জেল আর আড়াই হাজার টাকার জরিমানা হয় কেন? অবশ্য এই সব মামলা দায়ের করার আসল উদ্দেশ্যে, হিকির কাগজটা বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু অত সহজে হার মানবার বান্দা নন হিকি, জেলে বসেই তিনি কাগজ চালাতে লাগলেন। এবং তাঁর এই দুর্দমনীয় সাহস 'হিস বোল্ড ফ্রন্ট সীমস টু হ্যাভ এনলিস্টেড মাচ সিমপ্যাথি ইন দি কমিউনিটি' ইংরেজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সহানুভূতি সৃষ্টি করেছিল। এবং এটাই বোধ হয় শাসক শ্রেণীকে খুবই আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল। নয়ত মার্চ মাসে কোর্টের আর এক রায়ে হিকির বেঙ্গল গেজেটের সব টাইপ এবং ছাপার যন্ত্রাদি সব বাজেয়াপ্ত করা হল কেন? মাত্র বছর তিনেক এই রকম দুর্দৈবের মধ্যে চলে কলকাতার প্রথম সাপ্তাহিকের জীবনে যবনিকা নেমে এল!

কিন্তু সম্পাদকের কারাবাস তখনও চলছে। অসভ্য এক দঙ্গল চোর-ছ্যাচোর গাঁটকাটার মধ্যে, বিশ্রী চিৎকার, নোংরা গালিগালাজ, আরও জঘন্য পরিবেশের মধ্যে কাটতে লাগল হিকির কারাবাসের কাল। কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল হিকির

পরিবারের ভরণপোষণ। সে ত বড় কম নয়—বারটি পেট। তাঁর সঞ্চয়ের তহবিল আস্তে আস্তে শূন্য হয়ে গেল। বাড়তে লাগল পাওনাদারের ভিড়। অনাহারে অসহায় পরিবারের দুঃখ দেখে বাডতে লাগল হিকির ক্ষোভ। কিন্তু তখনও আশা ছাড়েন নি তিনি। ভাবছেন : 'এখনও যদি ছাড়া পাই, আবার আমি নিজের পায়ে দাঁড়াব। সব ঋণ শোধ করে' ইংলণ্ডে ফিরে যাব হাজার ছয়েক পাউণ্ড হাতে করে যাতে আমার বার্ধক্যের দিনগুলি স্বাধীন ও মুক্ত দেশে কাটে। সেখানে বাগানের মাঝে ছোট্ট একটা বাড়ীতে আমি থাকব—ভরত পাখির গানে আমার ঘুম ভাঙ্গবে, নিজের হাতে বুনব মটরশুটি, বরবটি, মরসুম অনুযায়ী পুঁতব গাছ, কলম বানাব এবং সকল মানুষের সঙ্গে শান্তিতে কাটবে আমার দিনগুলি!'

সবই আশা। সাধারণ মানুষের চিরকালের আশা। সোনার স্বপ্নের সাধ। পৃথিবীতে কবে আর ঝরে। কিন্তু সে সাধ কি পূর্ণ হয়েছিল হিকির? কে বলতে পারে? বাস্টীড সাহেব লিখেছেন, 'বেঙ্গল অবিচুয়ারি' শোকগ্রন্থে তাঁর নাম নেই। কাজেই কলকাতার কবরের মাটি তাকে ঢাকা দেয় নি।

দিলেই কি সব শেষ হয়ে যেত? হেস্টিংস হিকির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত হিংস্র ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তবু হিকি মাথা নত করেন নি। তাঁর যত বদনামই থাক, তিনি স্বৈরাচারী রাজপুরুষদের সঙ্গে লডায়ে হার মানেন নি। তাঁর পক্ষে এদের আনুকূল্য কেনা অসম্ভব ছিল না, বরঞ্চ অত্যন্ত সহজই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই কাজ হিকি করেন নি।

সেই সহজ কাজ করেন নি উইলিঅম ডুয়েনও। তাঁর কাগজের নাম 'ইণ্ডিয়ান ওয়ারলড'। তিনিও ঠিক সরকারের মনোমত খবর পরিবেশন করার কাজটাকে সাংবাদিক-ধর্ম বলে মনে করতেন না। কাজেই ঠোকাঠুকি লাগল। এই নিগ্রহের নায়ক ভারতবর্ষের আর এক গভর্নর জেনারেল সার, জন শোর। ভদ্রলোক নাকি কবি ছিলেন। তা থাকুন, কিন্তু সেদিন লাটবাড়িতে যে কাণ্ডটা করলেন কাঠখোট্টা গদ্যের লোকও সে কাজ করতে লজ্জা পেত!

কি ব্যাপার, না লাটবাড়ীতে সেদিন এক অতিথি এলেন। কোন বাঙ্গালী নয়। সাহেব। কাগজের সম্পাদক। যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। কিন্তু লাটবাড়ীর অতিথি ভবনে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এলেন, লাটবাহাদুর বা তাঁর এডিকং ত দূরের কথা—সিপাই। শোর তাঁর বিরুদ্ধে সিপাই লেলিয়ে দিলেন, খাস ইংলিশ ভদ্রতা! তারপরই নিগৃহীত ডুয়েনের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতেই বোধহয় এলেন বড়লাটের দবীরখাস কাপ্তেন কলিনস। সে ভদ্রলোক ত যা-নয় তাই গালিগালাজ করতে শুরু করলেন সম্পাদককে। এবং এক সময়ে লাটবাড়ীর রঙ্গমঞ্চে

প্রবেশ করল কোর্টের পেয়াদা পুলিশ। ডুয়েনকে জেলে নিয়ে গেল, অবশ্যই মারতে মারতে। তবে আজকের মত বেটন দিয়ে না চড়চাপড় সেকথা বলা শক্ত! অপরাধ! আসল অপরাধ কি? সরকারী কার্যকাণ্ডের অবাধ নিন্দা।

অবশ্য সেদিনের বিস্ফোরণের একটা প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। এবং তাতে ডুয়েন বাস্তবিকই অপরাধী। লর্ড কর্ণওয়ালিশের মৃত্যুর গুজব তাঁর কাগজেও ছাপা হয়েছিল। তবে ডুয়েন হিকির চেয়ে অনেক নরম ধাতের লোক। ভুলটা করে ফেলেই তিনি সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বুঝতে কষ্ট হয়নি, যে গতিক সুবিধের নয়। এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তিনি কলকাতা থেকে কেটে পড়বার তাল খুঁজছিলেন। কি দরকার বাপু ঝামেলায়! এমন কি বিলেত যাবার জাহাজে টিকিট কেটেও ফেলেছিলেন। তবে পয়লা জানুয়ারির আগে আর টিকিট পাওয়া গেল না। সতের'শ পঁচানব্বই।

কিন্তু সরকারী মহল অত সহজে ছেড়ে দেবে নাকি? কবি বলেই কিনা জানি না সার্ জন শোর একটি চমৎকার চক্রান্ত করলেন। শীতের সকাল। কলকাতায় বেশ মেজাজী শীত। লাটবাহাদুর উইলিয়ম ডুয়েনকে একটু প্রাতঃভোজনের নেমন্তন্ন করে ফেললেন। লাটভবনে একটা ইংরিজি কাগজের সম্পাদকের নেমতন্ন—এ ত আর ছাই নতুন কথা নয়। এতে সন্দেহের কি আছে? ডুয়েন ফাঁদে ঠিকই পা দিলেন।

তবে ডুয়েনের ভোগান্তি অনেক কম। কেননা তাঁর জাহাজের টিকিটে ঠিকই রওনা হয়ে গেলেন তিনি। কেবল মাঝের কটা দিন হাজতের একটু যা নরক যন্ত্রণা। সে ব্যাপারটায় হিকির আমল থেকে যে বড় একটা পরিবর্তন হয়েছিল, তা ত আর মনে হয় না।

কিন্তু এসব কাহিনীতে বাঙ্গালী এখনও আসে নি। এগুলি সাহেব বনাম সাহেবের গল্প। সে সম্বন্ধে আরও অনেক গল্প এবং সেখানেও রগড় বড় কম নয়। এই ইংলিশ-ম্যান কাগজের ব্যাপারটাই বলা যাক। এই কাগজেরই প্রবর্তক-সম্পাদক জোয়াচিম হেওয়ার্ড স্টোকলার। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল এঁরই অফিসে কাজ করে-ছিলেন। স্টোকলার দ্বারকানাথ আর রামমোহনের কল্যাণে কাগজ ত বার করলেন, কিন্তু সাংবাদিক দরকার। এই কাজটা অনেকটা একালের সাব-এডিটারের চাকরীর মত। খোঁজ খোঁজ। অচিরে স্টোকলার এক ব্রিফলেস ব্যারিস্টারকে পাকড়াও করলেন। নাম চারল্স থ্যাকারে। ভদ্রলোকের বেশ কলমের জোর। কিন্তু হলে হবে কি, জাগরনের সব কয়টি মুহূর্তেই তিনি দেবী সুরেশ্বরীর সেবায় মত্ত। ব্রিফের কচকচি তাঁর ভালো লাগবে কেন? 'হরকরা' তাঁর সম্বন্ধে লিখেছে, হি ডেসপাইসড ব্রিফস এণ্ড এডোরড ব্র্যাণ্ডি। মামলার কাগজপত্রকে ঘৃণা আর ব্র্যাণ্ডিকে স্তুতি করতেন তিনি। সে যাই হোক—তাঁকেই পাকড়াও করলেন স্টোকলার। প্রাত্যহিক রচনার জন্য ঠিক হল

এক বোতল ক্লারেট আর নগদ দশটা টাকা। প্রত্যহই এগারটা নাগাদ ইংলিশম্যান কাগজের অফিসে পা দিতেন। তখনই অবশ্য বেশ তরল অবস্থা। স্টোকলার তাঁকে কাগজ কলম আর মদের বোতল দিয়ে একটা ঘরে বসিয়ে দিতেন। একটা নাগাদ লেখা বেরিয়ে আসত, সাহেব বেরিয়ে আসত, কেবল শূন্য বোতল আর দোয়াত কলমটা টেবিলের ওপর পড়ে থাকত! স্টোকলার থ্যাকারের হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিতেন।

আর থ্যাকারের সেই সব রচনায় থাকত সেকালের বড় বড় সাহেব এজেন্সীদের হাঁড়ির খবর। হাটে হাঁড়ি ফাটিয়ে সাহেব তাঁর তীক্ষ্ণ কলমে সাহেবদের মুণ্ডপাত করতেন। হরকরার মালিকদের প্রায় সাড়ে সাত লাখ টাকা দেনা ছিল আলেকজাণ্ডার কোম্পানীর কাছে। কাজেই আলেকজাণ্ডারদের নানা নোংরামির খবর বলার সাহস কোথায় তার? ম্যাকিনটোশ কোম্পানী চালাত 'ইণ্ডিয়া গেজেট'। কাজেই তারও মুখ বন্ধ। কোরিয়ারের সম্পাদক জরজ প্রিনসেপ ছিলেন পামার কোম্পানীর এক কালের অংশীদার। কাজেই তাঁর কাগজেও নিমকহারামি করে পামারদের নিন্দা নৈব, নৈব চ।

কিন্তু স্টোকলার কারও ভৃত্য নয়। মনের সুখে সুদে-আসলে সেই সব কেচ্ছা তাঁর কাগজে ছাপতে লাগলেন। থ্যাকারের কলম ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে রস-রহস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল। তবে তিনি সেখানেই থামলেন না। তিনি ত আইনের লোক। কোর্ট-কাছারীর নানা 'ব্যাকগ্রাউণ্ড স্টোরি' তাঁর অজানা নয়। কলকাতার স্মল কজেস কোর্টের জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের তিনি এক হাত নিতে লাগলেন। তাঁদের নানা রায়ের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি সাধারণের সামনে তুলে ধরতে লাগলেন। আক্রমণ করতে লাগলেন নির্মম ভাবে। তিন চারজন জজ ত এই সব খোঁচার ঠেলায় চাকরীই ছেড়ে দিয়েছিলেন নাকি শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু এ ত একেবারে মৌচাকে ঢিল! এই নিয়ে নানা হৈ চৈ। কোন পক্ষই বড় কম নয়। না কোম্পানি না জুডিসিয়ারি। তবে ভাগ্যি রক্ষে স্টোকলার সাহেবই বেশী দিন রইলেন না। তিনি ইনসলভেন্সী ফাইল করে বেঁচে গেলেন। থ্যাকারের যে কি হল তার কোন হদিশই মেলে না!

তবে সাহেব বনাম সাহেবের লড়াই-এর আর এক নায়ক বাকিংহাম সাহেব। চীফ সেক্রেটারী বেইলী লিখলেন—সাহেব যদি এমনিভাবে চল, অর্থাৎ এমনি লেখালিখি কর তোমার ক্যালকাটা জারনালে, তোমার ভারতবর্ষে থাকার লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। বাকিংহামের কলমটা বড় বেয়াড়া। লাটসাহেবকে মাফ করে চলা তার ধাতে নেই। কাজেই সাদা চামড়া হয়েও রেহাই পেলে না সাহেব। পারসনা নন

গ্রাটা করে তাঁকে একদিন বিলেত যাবার জাহাজে তুলে দিয়ে কোম্পানীর কলকাতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

যে যাই বলুক, তবে কিনা এসব বীরত্ব হরিশ মুখুজ্জের কাছে কিছুই নয়। হরিশ মুখুজ্জে শুধু হিন্দু প্যাট্রিঅট চালাতেন না, তিনিই একজন আদি ও অকৃত্রিম হিন্দু প্যাট্রিঅট। নযত কোথায় কোন নদীয়া জেলার বাগদা থানার খাঁপুর গ্রামের আমির মল্লিক প্ল্যাণ্টার লারমুরের অত্যাচারে শেষ হয়ে গেল, ভবারপুরের গনি দফাদারকে কুঠির লেঠেলরা ধরে নিয়ে গিয়ে পেষাই করল তা নিয়ে মিলিটারী অডিটার জেনারেল অফিসে বাঙ্গালী কর্মচারীর মাথাব্যথা কেন? হরমনি দাসীকে নীলকর সাহেব বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে এসে বলাৎকার করেছিল। তার হয়ে কলম ধরেছিল হরিশ। সাহেব চব্বিশ পরগণার সদর আমীনের আদালতে দশ হাজার টাকার মানহানির মামলা আনল কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রমাণ করা গেল না হরিশের অভিযোগ। যদিও লং প্রমুখ মিশনারী সাহেবরাও এই অভিযোগ এনেছিলেন অন্ততঃ—ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ত তাই বলছেন।

এই দুর্যোগের দিনে হরিশ মুখুজ্জের দেহান্ত হল। রোগ—ক্ষয়কাশ। রমাপ্রসাদ রায় তাঁর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে নিয়ে এসে রাখলেন। ডাক্তার গুডিভ তাঁর চিকিৎসা করলেন। কিন্তু না। 'অসময়ে হরিশ মল'। ইংরেজরাই বলে, মৃতের সঙ্গে কলহ করতে নেই। তারা বলে কিন্তু করেও। তাই নীলকর সাহেব ভবানীপুরের হরিশ মুখুজ্জের বাড়ী ক্রোক করে তার ডিক্রির টাকা আদায় করতে চাইলেন।

হরিশের লড়াই সাহেবের সঙ্গে। কিন্তু বাঙ্গালী বনাম বাঙ্গালীর লড়াইও কম চমকপ্রদ নয়। দেখা যায়, বাংলা কাগজের সম্পাদক-সাংবাদিকদেরও এই সব অত্যাচারের জ্বালা বড় কম সইতে হয় নি। তবে সে নাটকে কুশী-লবের পরিবর্তন হয়েছে। ইংরেজ ছেড়ে খাস বাঙ্গালীরাই তখন বিরুদ্ধ পক্ষ। এবং সম্পাদকদের প্রভূত বিত্তশালী রাজা-রাজড়ার সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হয়েছে সম্মুখ সমরে।

এবং সে কাহিনী শুনতে হলে প্রায় শ' দেড়েক বছর আগেকার কলকাতার বিস্তৃত রাজপথে চলে যাই আসুন। ছাতুবাবুর বাড়ী থেকে তখন একটা কাগজ বেরোত নাম 'সম্বাদ ভাস্কর'। কাগজটা সাপ্তাহিক। বেরোত প্রতি মঙ্গলবার। ভাস্কর যন্ত্রে ছাপা। সবশুদ্ধ ছাপা হত আজকে শুনলে হাসবেন—একশ সত্তরখানা। সেকালের হিসেবে এটা কিন্তু কিছু কম নয়। কেননা সেকালের সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' ছাপা হত আড়াইশো কপি। ঈশ্বর গুপ্তের 'সম্বাদ প্রভাকর' ছাপা হত একশ' সত্তর খানার মত, রামগোপাল ঘোষের 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' ঐ একশ' সত্তর। ভবানীচরণের 'চন্দ্রিকা'—একশ কুড়ি। গঙ্গাধর 'ভট্টাচার্যের রসরাজ' সে সময়ে বেশ মুখরোচক পত্রিকা, গপ্পুনার ও। ছাপা হত দু'শ' কুড়ি খানা মাত্র।

এখন যে কথা হচ্ছিল। জানুয়ারী মাস। শীতের সকাল। সিমলের কার্যালয় থেকে যথানিয়মে বেড়িয়ে বাড়ী যাচ্ছিলেন ভাস্করের সম্পাদক। হঠাৎ হৈহৈ করে একদল সশস্ত্র লোক তাঁকে ঘিরে ফেললে। এবং হতবুদ্ধি সম্পাদকের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল। সে কি বেধড়ক মার। এক সময়ে সম্পাদকের বেহুঁশ দেহটা রাস্তায় গড়িয়ে পড়ল। এবং সেই গুণ্ডার দল তাঁর অজ্ঞান দেহটাকে একটা ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে কোন এক অনির্দিষ্ট আস্তানার উদ্দেশে রওনা করে দিলে। খবরটা দিয়ে সমাচার দর্পণ তার আঠারই জানুয়ারীর কাগজে লিখেছিল—'দিবা ভাগে কলকাতা শহরের রাস্তার মধ্যেই ঐ সম্পাদক মহাশয়কে প্রহারপূর্বক ধৃতকরণার্থে ক' একজন অস্ত্রধারী লোক পাঠাইলেন। তাহাতে ঐ সকল লোক অতি নির্দয়তারূপে তাঁহাকে মারপিট করিয়া লইয়া যায়।'

ওয়েলেসলীর তৈরী কলকাতার লাটভবনে তখন এক ব্যাচেলর গর্ভর্নর লর্ড অকল্যাণ্ড যাঁব বোনেদের নাম আজও কলকাতার লোক জেনে না জেনে স্মরণ করে কালে-অকালে। ইডেন গার্ডেন যাঁর নামে সেই এমিলি ইডেন এই লর্ড অকল্যাণ্ডেরই বোন। তখন পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের এন্তেকাল হয়েছে কিন্তু দোস্ত মহম্মদ পর্বের শেষ হয়নি কলকাতায়। এহেন অবস্থায় কলকাতার রাস্তায় 'সম্বাদ ভাস্করে'র বরেণ্য সম্পাদক শ্রীনাথ রায়ের ওপর এই ধরনের জঘন্য অত্যাচার হয়ে গেল।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? হঠাৎ শ্রীনাথ রায়ের ওপর ক্রোধ ভেঙে পড়ল কেন? কারই বা পাকা ধানে মই দিয়েছিলেন তিনি? রাজার নাম রাজনারায়ণ রায়। এবং সে কাহিনীর ওপর থেকে যবনিকা উঠল কলকাতার সিমলের সম্বাদ ভাস্করের অফিসে। সম্পাদকের নামে আসা চিঠির বাণ্ডিলগুলি সেদিন তিনি খুলে পড়ে পড়ে দেখছিলেন। হঠাৎ একটা চিঠিতে তাঁর চোখ জোড়া আটকে গিয়ে থাকবে। সেটাতে রাজানারায়ণের নানা কীর্তির অভিযোগ। নানা কুকর্মের কথা লেখাত রয়েছেই, তাছাড়া লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁর কয়েকটা অত্যাচারের কাহিনী। রামগোপাল সান্যাল 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র বিবরণ তুলে লিখেছেন যে, রায়মশাই তাঁর কাগজে এই চিঠি ছেপেছিলেন।

"alleging that the Raja had brought about a marriage of two Brahmins with low caste women, and giving currency to a rumour that the Raja's mother once threw him into the river so that there might not be any interruptions of her pleasures."

সমসাময়িক বাঙলা কাগজে অবশ্য রয়েছে উক্ত রাজা দুইজন ব্রাহ্মণকে ধর্মসভা থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। এছাড়াও আন্দুল নিবাসী একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৈষ্ণব-কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন জোর করে। রাজমাতার সম্বন্ধে অভিযোগের কথা নেই।

কপালের এমনই ফের, সম্পাদকমশায় চিঠিখানা ছেপে দিলেন। তবে কিছু রেখে-ঢেকে। রাজবংশের অতীতের কুকীর্তির কথা না বলে বর্তমানের অন্যায় আচরণের বিবরণ ছেপে নিজেও মন্তব্য করলেন: 'রাজার এই সব করা অনুচিত'। আর যায় কোথা। রাজামশায় রক্তচক্ষু ক'রে তাঁর একদল হিন্দুস্থানী লাঠিয়ালকে বুঝি বলে থাকবেন, শ্রীনাথকো শির লে আও।

তারপর ত শহর কলকাতার রাস্তায় সেই রুদ্ধবিস্ময় নাটক। কিন্তু ধোলাই দেবার পর সেই রাজার লোকেরা কি করল সেই হতভাগ্য সম্পাদককে নিয়ে? কলকাতায় ঝামেলা হতে পারে বলে তাঁকে রাজপথ থেকে নিয়ে যাওয়া হয় সোজা রাজবাড়ী। রাজামশায় বোধ হয় তখন পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে বসে বসে খোস গল্প করছিলেন আর ভুরুক ভুরুক করে আলবোলা টানছিলেন। সেকালের জমিদার বাড়ীর সঙ্গে সে ছবির বড় একটা তফাৎ নেই। পিছমোড়া করে বাঁধা কলকাতার সম্পাদককে দেখে বাবুর পারিষদগণ হৈ হৈ করে উঠে থাকবে। রাজার মুখখানা চাকের ভীমরুলের মত আরো কালো আরও গম্ভীর হয়ে উঠে থাকবে। রাজামশাই চিৎকার করে থাকবেন, 'বিছুটি নিয়ে আয়। জলবিছুটি লাগা।'

বাবু যত কহে পারিষদগণ কহে তার শতগুণ। পৈশাচিক উল্লাসে রাজার সামনে কলকাতার অপহৃত সম্পাদকের গায়ে জলবিছুটি লাগাতে লাগল রাজার দারোয়ানরা। আর যন্ত্রণাকাতর শ্রীনাথ রায় অনুনয় করতে লাগলেন, 'দোহাই রাজামশায় দোহাই।'

অন্ততঃ শ্রীনাথ রায়ের নিগ্রহের এমনি একটা বিবরণ দিয়েছিলেন ক্যালকাটা কুরিঅর। আর সেই সংবাদের উপর ভিত্তি করে 'সমাচার দর্পণ' দীর্ঘতম এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। তবে একালের সদাশয় নাগরিকদের মত সেইটুকু করেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করেননি কলকাতার সেকালের মানুষরা। সারা শহর এই নিয়ে বিষম বিক্ষুব্ধ। বিখ্যাত সাহেব ব্যারিস্টার টারটন—যার সঙ্গে কয়েক বছর পরে রামগোপাল ঘোষের ঘোরতর বাকযুদ্ধ হয়েছিল টাউন হলে হার্ডিঞ্জের মূর্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে—সেই টারটন শ্রীনাথ রায়ের হয়ে কলকাতার হাইকোর্টে হেবিয়াস কারপাসের আবেদন করলেন। সমাচার দর্পণ লিখলেন:

কোন ব্যক্তি রাজাবাহাদুর খ্যাতি ধারণ করিয়া এইরূপ কোন পত্রসম্পাদককে ধৃতকরণ পূর্বক আপন বাটিতে লইয়া যন্ত্রণা দেন ইহা নিতান্ত অসহ্য ব্যাপার।

কিন্তু রাজাবাহাদুর দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তি। অত সহজে দমবার পাত্র তিনি নন। তাঁকে আদালত হাজির হবার হুকুম দিলে তাঁর উকিল সওয়াল করল, তাঁর বাড়ী আন্দুল, কাজেই কলকাতার এক্তিয়ারের বাইরে। এবং একহাতে যেমন তিনি কোর্টকে রুখলেন অপর হাতে শ্রীনাথ রায়কে নিয়ে পড়লেন। পরের সপ্তাহে দর্পণে দেখা যাচ্ছে,

শ্রীনাথবাবুকে রাজা আন্দুলের বাড়ী থেকে সরিয়ে এনে কলকাতায় গুম করে রেখেছেন। সংবাদটিতে রয়েছে :

'কাল রাত্রে আমরা শুনিলাম যে শ্রীযুত শ্রীনাথ রায়কে পূর্বকার কারাগার হইতে উঠাইয়া লইয়া শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের কলকাতার শহরতলীস্থ উদ্যানবাটীতে কএদ রাখিয়াছে এবং অদ্য পর্যন্তও তিনি তথায় বদ্ধ আছেন। ইহা মন্তব্য, যে শ্রীনাথ রায়কে যে ব্যক্তি প্রথমে কএদ করেন এবং এইক্ষণে যাঁহার উদ্যানবাটীতে তাঁহার কারাগার হইয়াছে ইঁহারা উভয়েই ধর্মসভার অন্ত:পাতি মহাশয়।'

ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠতে লাগল। কেননা কয়দিন পরেই কাগজে লেখা হল : 'সীমলা নিবাসী সেই অতি ধনাঢ্য' বাবুর পক্ষ থেকে রাজনারায়ণের বিরুদ্ধে যে নালিশ করা হয়েছে কোর্টে তা তুলে নেবার জন্য অনেক টাকার লোভ দর্শাইয়া যত্ন করা যাইতেছে।' শুধু তাই নয়। দেখা গেল, শ্রীনাথ রায়ের কপালে অনেক দুঃখ। ছাতুবাবুর বাগানবাড়ীতে তাঁকে রাখার খবরটা বেড়িয়ে পড়তেই তাঁকে সরিয়ে রাজনারায়ণের সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখা হয়।

তবে শ্রীনাথের দুঃখের দিনের অবসান হল অবশেষে। কেননা কাগজে দেখা যাচ্ছে, 'সম্বাদপত্র পাঠে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে এইক্ষণে শ্রীনাথ রায় রাজা রাজনারায়ণের হস্ত হইতে খালাস পাইয়াছেন।' জ্ঞানান্বেষণও জানাচ্ছেন, এই মামলায় ভাস্করের জয় হয়। তবে একথাও সেকালের কাগজে রয়েছে যে শ্রীনাথ রায় যদিও ছাড়া পান তবুও লোকসমাজে আর দেখা দিতেন না। এটা সমাচার দর্পণের পছন্দ হয়নি। তবে স্টোকলার সাহেবের ইংলিশম্যান কাগজে লিখছেন যে রাজনারায়ণ আইনের প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিলেন। শ্রীনাথ রায়কে আটক রাখার জন্য তাঁর শ'স্তি বা হাজার টাকা জরিমানা হয়নি। হয়েছিল আদালত অবমাননার দায়ে। কাজেই রাজার পরাজয় হলেও শ্রীনাথের জয়ের কথা বলা হয় কোনমুখে?

তাছাড়া শ্রীনাথের এই নিগ্রহের ব্যাপারটার মধ্যে বেশ কিছুটা রহস্য আছে। অনেকেই জানেন, সম্বাদ ভাস্করের সম্পাদক হিসেবে যদিও নাম থাকত শ্রীনাথ রায়ের আসলে কাগজ চালাতেন গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য। একথা সেকালেও যে জানা ছিল না তা ত নয়। কাজেই রাজার রাগ ত তারই ওপর পড়া উচিত ছিল। এছাড়া ভাস্করের টাকার জোগান দিতেন আন্দুল নিবাসী ধনাঢ্য মথুরানাথ মল্লিকের ছোট ভাই শ্রীনাথ। রাজা রাজনারায়ণের বাড়ীও আন্দুল। রাজায়-রাজায় লড়ায়ে উলুখড় শ্রীনাথ নাহক প্রাণটা খোয়ালেন নাকি? দ্বিতীয় রহস্য—ধর্মসভা বনাম ব্রহ্মসভার সংঘর্ষ। রাম মোহন বনাম ভবানীচরণ—সেই ডামাডোলের আবর্তে কি পড়ে গিয়েছিলেন শ্রীনাথ? নয়ত ভাস্কর ত বেরোত ছাতু বাবুরই বাড়ী থেকে। তিনি শ্রীনাথের বিরুদ্ধে রাজনারায়নের

পক্ষ নিলেন কেন? নাকি আমে দুধে মিশে গেল, আঁটি খোলা বাদ গেল—এও সেই বৃত্তান্ত?

এসব প্রশ্নের জবাব পেলে সেকালের কলকাতার বাবুদের কোন্দলের চিত্র আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। তবে ছাড়া পাবার পর শ্রীনাথ যে আর কারও সঙ্গে দেখা করতেন না, অজ্ঞাতবাস করতেন তার অন্য কারণও থাকতে পারে। ঐ বছরই অক্টোবর মাসে শ্রীনাথ রায় মারা যান। রাজা রাজনারায়ণেব হাতে তাঁর এই বর্বরোচিত নিগ্রহই কি তাঁর এই অপমৃত্যুর কারণ?

সে জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যাযনি। তবে কলকাতার সম্পাদক সাংবাদিক নিগ্রহের যে ট্রাডিশন শুরু হযেছিল তার প্রথম কাগজখানি থেকেই এবং যার নানা কাহিনী সেকালের পীতবিবর্ণ কাগজের পাতাতেই ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে নির্বাক যন্ত্রণায়, শ্রীনাথ রায়ের অকালমৃত্যু সেই পর্বেরই এক বেদনান্তক অধ্যায়। তবে তার ফলশ্রুতি এই, যে কলকাতার কোন সম্পাদক-সাংবাদিকই এই সব অত্যাচার অনাচার আক্রমণ জিঘাংসার কাছে আত্মসমর্পন করেননি, মাথা নত করেননি, দুর্জয় প্রতিজ্ঞার অসাধারণ দার্ঢ্যে। সংবাদপত্র নিগ্রহের সেই গ্লানিকর কাহিনীগুলির মাঝে এই সত্যটিও বিস্মৃত হবার নয়।

আমরা সেই কবে যাত্রা স্বরু করেছিলাম। সুতানুটির সূতিকাগৃহ থেকে এখন এসেছি কলকাতার প্রায যৌবনকালে। তার চাওযা-পাওয়া, হর্ষ-বেদনার সুখদুঃখের নানা রঙের দিনগুলির মুখ্য ইতিবৃত্তকার ইংরেজরাই। এবার তার যৌবনের নতুন ছবি এঁকেছেন এক ফরাসী পর্যটক। শুনুন তিনি কি বলেন।

"কলকাতা সম্বন্ধে অনেক ফরাসাহ্ বলেছেন। এবং অনেক বলেছেন। বলেছেন মঁসিয়ে জ্যাকোমঁ। তাঁর চিঠিগুলি থেকে কলকাতার ইন্দোয়ুরোপীয় সমাজ সম্বন্ধে চমৎকার একটা ছবি পাওয়া যায়। মঁসিয়ে গ্র্যাণ্ডিআরের 'ট্যুর দু মন্দে'র পাতায় কলকাতার আকর্ষণায বিবরণ রয়েছে। আমি কেবল কলকাতা সম্বন্ধে সেইটুকুই বলব যা আমার আগের ফরাসী ভ্রমণকারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।"—এই কথাগুলি লিখে তাঁর সুবৃহৎ ভারত ভ্রমণকথার কলকাতা পরিচ্ছেদটি শুরু করেছেন ফরাসী পর্যটক মঁসিয়ে লুই রুশো। উনিশ শতকের মাঝ পেরিয়ে রুশো এসেছিলেন ভারতবর্ষে। আঠারশ' চৌষট্টি সালের বিশে জুন রুশো মার্সেই বন্দর থেকে জাহাজে চাপেন। জুলাই মাসের মাঝামাঝি পৌছান বম্বে। রুশো ছিলেন ভাস্কর। স্থাপত্য-রসিক। তাই উত্তর ভারতের বিশেষ করে সামন্ত রাজ্য ও প্রাচীন শিল্প সংস্কৃতির পীঠভূমিগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেন। শেষে আসেন কলকাতা। চার বছর পরে। কলকাতা থেকে ঘরে ফিরবার আগে পুরী ভুবনেশ্বর ঘুরে আসেন ডাক-পালকী করে।

রুশোর ভ্রমণকাহিনীতে দিনপঞ্জী নেই। আঠারশ' আটষট্টি সালে কলকাতায আসেন তিনি। ঠিক কোন সমযে, লেখা নেই। কিন্তু কতকগুলি ঘটনা পরম্পরা থেকে মনে হয, তখন চৈত্রের শেষ, বৈশাখের শুরু। কেননা রুশো 'চডক উৎসব' দেখেছিলেন। দেখেছিলেন কালবৈশাখীর ঝড়।

রুশোর বিবরণে কযেকটি গুরুতর ত্রুটি আছে। যেমন তিনি বলছেন যে, চডক পুজো হয মা কালীর তুষ্টি-বিধানের জন্য। বলছেন—'সাধারণত জুলাই বা আগস্ট মাসে দেবী কালীর সম্মানে শহরের উপান্তে একটা মাঠে মহাসমারোহে চড়ক পূজা হযে থাকে।' রুশোর দুটো ভুল। প্রথমত, চড়ক হয এপ্রিল মাসে। জুলাই আগস্টে নয। আর চড়কে বাবা তারকেশ্বরের চরণে সেবা লাগে। দেবী কালিকা সেখানে অবান্তর। মনে হয, কলকাতার সংলগ্ন কোন স্থানে চৈত্র মাসের কালীপুজো দেখেছিলেন সাহেব। চড়ককে তারই সঙ্গে জুড়ে দিযে একটা সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করেছেন। তা ছাড়া চড়কের ভক্তদের আত্মনিগ্রহ তাঁর কাছে ভীষণ দর্শনা কালীরই উপযুক্ত পুজোপচার বলে মনে হওয়া আশ্চর্য নয়! কিন্তু জুলাই আগস্ট মাস কেন বললেন রুশো?

রুশো সাধারণ চডকপুজোর কোন বর্ণনা দেননি। সেকালের বাবুদের চড়ক উৎসবের একটা ছোট্ট বিবরণ দিয়েছেন। সায়েবকে এক বাঙালী বাবু নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান, তাঁদের চড়ক উৎসব দেখবার জন্যে। মনে হয় এটা চড়ক নয়। সেকালের বাঙালীর বর্ষশেষ বা নববর্ষ উৎসব। 'হিন্দু মেলা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে

লিখেছেন—'এই মেলায় দেশের স্তবগান, গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প-ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।' রুশো সায়েব যখন কলকাতায় এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত। চৌদ্দ বছর বয়সে হিন্দুমেলায় যে অনুষ্ঠানটি দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বাঙালী বাবুর বাড়ি তারই একটা অপূর্ণ অস্পষ্ট ছবি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল লুই রুশোর।

একটু সবুজ মাঠে চার পাশে গোল হয়ে ঘিরে বাবুরা বসেছিল। মাঝখানে ট্রাপিজ, বার, দড়ি, রিং প্রভৃতি জিমনাষ্টিকের নানা সরঞ্জাম রাখা ছিল। সায়েব যাওয়ার একটু পরেই কতকগুলি বাচ্চা ছেলে ও কয়েকটি সুদর্শন যুবক এসে বেশ কয়েকটি চমৎকার খেলা দেখাল। রুশো বলছেন, দু'জন গোরা সৈন্য তাদের তালিম দিয়েছিল। তাদেরই তত্ত্বাবধানে এই খেলা দেখান হয়। ব্যায়াম-প্রদর্শনীর পরই যন্ত্রসঙ্গীত। সুরারোপ তরুণ বঙ্গ সন্তানদের। সবশেষে কতকগুলি ছেলেমেয়ে এসে বাংলায় স্তোত্র-পাঠ করে শোনাল। এরপর মধুরেণ সমাপযেৎ। আকণ্ঠ ভুরিভোজ। সায়েব লিখেছেন, তাঁর সঙ্গী তাঁকে বলেছিলেন যে, এরা অধিকাংশই শহরের গরীব লোকদের ছেলেমেয়ে। তাদের জন্যেই এই উন্নত আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করে তাঁরা শিশুদের চারপাশের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনেছেন। এর ফলে তাদের চিত্তবৃত্তি অনেক উন্নত হবে। তাদের মানুষ হতে সাহায্য করবে। রুশোর বর্ণনায়—এই ছিল সেকালের-বাবুদের চড়কপুজোর উৎসব।

সেকালের কলকাতার য়ুরোপীয়রা বাবুদের এই সব সংস্কার প্রচেষ্টাকে খুবই নাকি অবজ্ঞার চোখে দেখত। রুশো তার প্রতিবাদ করেছেন। বাবুদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে বলেছেন যে, বাঙালী বাবুদের যদি দোষের কিছু থাকে—সে তাদের নাম! রুশোর আক্ষেপ, বাবুরা কেন একটু শ্রুতিমধুর নাম রাখে না!

কলকাতার কালবৈশাখীও দেখেছিলেন সায়েব—সাইক্লোন! ঘর থেকে নয়—নির্জন রাস্তার বুকে দাঁড়িয়ে ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধা উন্মাদিনী কালবৈশাখীর নৃত্য দেখে-ছিলেন। সেদিন বেড়াতে গিয়েছিলেন এসপ্ল্যানেডে। বেলা তখন একটা বাজে। সকাল থেকেই বেশ কটকটে রোদ। হঠাৎ—একেবারে হঠাৎ—সারা আকাশখানি রাশি রাশি কালো মেঘে ছেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রুশো লক্ষ করলেন সর্বত্র যেন সাজ-সাজ রব। মুহূর্তে নামার পাল ত্রস্ত তরী যত। রুদ্ধনিশ্বাসে মাঝিরা অপেক্ষা করতে লাগল সমূহ কোন বিপদের মুখোমুখি হবার জন্য। সবিস্ময়ে আরও দেখলেন রুশো, কোন অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য সবাই উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করেছে।

রুশো কিছুই বুঝতে পারলেন না। আকাশ তখনও বেশ শান্ত। কিন্তু আর কিছু বোধগম্য হবার আগেই দেখলেন এসপ্ল্যানেডের এককোণে দূর ফোর্ট উইলিয়ামের গা

ঘেঁষে পাংশুটে ধুলোর মেঘ উঠেছে। আর দাঁড়াবার সাহস পেলেন না সায়েব। দে দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে আশ্রয়স্থলের কাছেপিঠে এসে পড়েছেন, এমন সময় পিছনে শুনলেন আর্ত চিৎকার! চোখ ফেরাতেই দেখলেন, দশ পা দূরেই এক পরিত্যক্ত শিবিকা। রাস্তার মাঝে পাল্কী ফেলে রেখে বেয়ারারা পালিয়েছে। আর সেই পাল্কীতে রয়েছেন—না, কোন মতিবিবি নয়, এক ভীত অসহায় ইংরাজ রমণী! সেই 'ড্যামসেল ইন ডিস্ট্রেস'কে রক্ষা করার জন্য শিভলরিব অভাব হ'ল না ফরাসী পর্যটকের। ভদ্রমহিলাকে আশ্বস্ত করে তাঁকে পাল্কী থেকে কোন মতে বার করে আনবেন, এমন সময় ধুলোর ঝড় এসে আছড়ে পড়ল। সজোরে মাটিতে আছাড় খেলেন রুশো। ঘাড়টা তুলে কিছু করবার আগেই নামল অঝোরে বৃষ্টি! আর বাতাসের সে কী উন্মত্ত প্রলাপ! এরই মধ্যে ভদ্রমহিলা পাল্কী থেকে বেরিয়ে এলেন। আর একটা দমকা ঝড় তাঁর পাল্কীখানা শূন্য করে তুলে এসপ্ল্যানেডের পাকা রেলিঙে নিয়ে গিয়ে ফেলল। সেটা একেবারে চুরমার!

যাই হোক, কোনক্রমে সেই ইংবাজ রমণীকে ধরে নিয়ে কাছেরই এক পান্থ-নিবাস—হোটেল গ্যালেসের দুয়ারে গিয়ে উঠলেন রুশো। হোটেলের দরজা খোলা আবার আর এক সমস্যা। ভিতরের লোকেরা দরজা জানালা ভালো করে বন্ধ করে বসে। অত ঝড়ে দরজা খোলার সাহস হবে কার?

অনেক কাকুতিমিনতির পর, খুব সম্ভব মহিলা সঙ্গে আছেন বলে—দরজা খোলা পাওয়া গেল। প্রায় সওয়া এক ঘণ্টা পর্যন্ত তুমুল ঝড় চলে। শেষবেশ হোটেলের দেওয়ালগুলিও কাঁপতে আরম্ভ করল। ভীত ত্রস্ত হোটেলমালিক বাসিন্দাদের সকলকে হোটেলের মাঝখানে একটা হলে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। সেই ঘরের দেওয়াল-গুলি বেশ মোটা এবং নাকি 'সাইক্লোন-প্রুফ'। সেকালের কলকাতায় নাকি সব বাড়িতেই এমনি একটা ঘর থাকত। ঝড়ের দাপটে সারা বাড়িটা পড়ে গেলেও সেই ঘরখানার কোন ক্ষতি হত না। রুশো খুব রহস্য করে বলেছেন যে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেই হোটেলের মাঝের হলের সাইক্লোন রোধ করার ক্ষমতার পরীক্ষা তাঁদের আর নিতে হয়নি সেদিন। ঝড় আস্তেআস্তে কমে যায়। ঝড়ের শেষে পথঘাটের বর্ণনা দিয়ে রুশো বলেছেন—পথঘাটের অবস্থা ত চোখে দেখা যায় না! এদিক থেকে ওদিক ভাঙা টালি, গাছের ডালপালা, সাইনবোর্ড, ভাঙা পাল্কীর টুকরো, জামাকাপড়, সব ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। কালবৈশাখীর সেই দয়াহীন দস্যুতার লুণ্ঠনাবশেষের মধ্যে ছিল কয়েক শ মরা কাক, চিল, বাজ আর নানারকম পাখি।

কলকাতার কসমোপলিটান চরিত্র যে সেই আদিকালেই গড়ে উঠেছিল, সেকথা রুশোর ফরাসী দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। চীনে, বর্মী, য়ুরোপীয়ানরা ছাড়াও ছিলেন

মারোয়াড়ী, উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ ও হিন্দুস্থানীরা—সেকালের কলকাতার কুসীদজীবী সম্প্রদায়। দিনমজুর বলতে ছিল উড়িয়া ও বীরভূমের লোক। পাল্কী-বেহারা হিসেবে ওড়িয়ারা ছিল একচেটিয়া—সে খবর ত অন্যসূত্রেও পাওয়া যায়।

কলকাতার বাঙালী সমাজকে চিনতে রুশোর একটুও কষ্ট হয়নি। জমিদার 'ব্লু ব্লাড অ্যারিস্টোক্র্যাসি' ভেঙে পড়ছিল আর তাদের জায়গা দখল করছিল নতুন একদল মানুষ। নিজের চেষ্টায় প্রভূত অর্থ উপার্জন করে এঁরা তখন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এই ইয়ং বেঙ্গলের কথা বলতে গিয়ে রুশো বলেছেন, যে ব্যবসাসূত্রে য়ুরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে তাঁরা শুধু অর্থসঞ্চয়ই করেননি—সমাজ সংস্কারের এক বিপুল আন্দোলনের সামনে গিয়ে পড়েছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার কদর বুঝেছিলেন তাঁরা, সন্তানসন্ততিদের জন্য স্কুল স্থাপন করে ডাক্তারী, আইন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর অচিরে ডাক-তার, রেল, শাসন পরিষদ সব জায়গায় তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

রুশোর মতে, ইয়ং বেঙ্গল জনসাধারণের ওপর তাঁদের প্রভাব হারাবার ভয়েই খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ না করে হিন্দুধর্মের সংস্কার করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম তাঁর মতে হিন্দু আর খৃস্টানধর্মের হাফওয়ে—মাঝপথ। রাজা রামমোহন রায়ের কথাও বলেছেন রুশো। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সেকালে নব্য বাঙ্গালীর গভীর অনুরাগ ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের সাধু প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ না করে পারেননি তিনি।

সহমরণের কথাও রয়েছে। রুশো বলছেন, স্বামীহীনার স্থান সেকালের হিন্দু সমাজে নাকি ছিল খুবই দুঃখের। সংসারে অমানুষিক পরিশ্রম, দুনিয়ার সব আশা-আনন্দ থেকে নিষ্ঠুর নির্বাসন এবং সকলের দাসীগিরি করাই ছিল বিধবাদের সুনির্ধারিত অদৃষ্ট। এই অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল সহমরণ।

ইয়ং বেঙ্গল যে এর বিরুদ্ধে সক্রিয় সেটুকু রুশো স্বচক্ষে দেখে গেছেন। সমাজের বুকে বহু শতাব্দীর এই সংস্কার উৎখাত করবার দায়িত্ব যে কত বিপুল সেটুকু যে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন রুশোর তা বুঝতে ভুল হয় নি। রুশো বলছেন—দিন দিন বিধবা-বিবাহের সংখ্যা বাড়ছিল!

সেকালের কলকাতার আর একটি মজার প্রাণীর পরিচয় রয়েছে রুশোর বিবরণে। তারা হাড়গিলা। মানুষের মত উঁচু লম্বা গলা হাড়গিলারা নাকি নির্বিবাদে মানুষের মতই রাস্তা দিয়ে হেঁটে বড় বড় বাড়ীর টঙে উঠে তাদের শোভাবর্ধন করত। সাহেব বলছেন, তারাই ছিল সেকালের কলকাতার অবৈতনিক মেথর মুদ্দফরাস। সেকালের কলকাতার শুচিতা তাদেরই পিছনে পিছনে ফিরত। তারা ছিল গৃহবাসে, তাই ছিল শুচি। সামান্যতম নোংরাও তাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়িয়ে যেত না। সেকারণেই আইনত

তারা ছিল অবধ্য। তাদের বিন্দুমাত্র উত্যক্ত করা ছিল আইনত দূষণীয়। কলকাতা কর্পোরেশন-এর প্রতীকে হাড়গিলা রয়েছে—সেটা কি সেকালের কলকাতার হাড়গিলাদের ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ? হয়ত বা।

ডিমপাড়ার সময় হাড়গিলারা নাকি শহর ছেড়ে চলে যেত। তিন মাস পরে আবার নিজের নিজের জায়গায় ফিরে আসত। একটুও ভুল হত না। তাদের গলার রঙ মনে রাখলে বোঝা যেত, তারা কখনও স্থান পাল্টাত না। লাটভবনের মাথায় এমনি একটা হাড়গিলা নাকি দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বহাল তবিয়তে বাস করেছিল।

কিন্তু পুরনো কলকাতার হাড়গিলাদের খবর শুধু না নিয়ে, সেকালের কলকাতার হাতি আর তাদের পিঠে ঐতিহাসিক এক হাওদার রোমাঞ্চকর কাহিনী বলি শুনুন। সে গল্পও কম বিচিত্র নয়।

মানুষটার খানদানী মেজাজের খ্যাতি আছে। বেশ কিছুটা সৌখীন। তাই অন্তত গোটা কয়েক লাট-বেলাটের ব্যবহারধন্য হাওদাটি যখন তাঁর পছন্দর জন্য আনা হল কোম্পানীর মালখানা থেকে, ভদ্রলোক স্বভাবতই নাক সিঁটকেছিলেন। বলেছিলেন, আরে ছো:। এটা আবার একটা হাওদা নাকি? কাঠের ওপর রঙ করা—রাস্তার ছ্যাকরা গাড়ির মত। আমি ত দূরের কথা, যে-কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মাহুতও এর সামনে বসতে লজ্জা বোধ করবে।

সেটা ১৮৫০ সাল। আর ভারতভাগ্যবিধাতা এই ভদ্রলোক মার্কুইস ডালহৌসী। হাওদাটা বার করার দরকার হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে। ডালহৌসী সাহেব দেখা করতে যাবেন জম্মু-কাশ্মীরের নতুন অধীশ্বর প্রখ্যাতকীর্তি ডোগরা দলপতি রাজা গুলাব সিং-এর সঙ্গে। সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছিল ওয়াজিরাবাদে।

তখনও রেল আসেনি ভারতবর্ষে। দূরগমনের জন্য হাতির শরণাপন্ন হওয়া ছাড় গত্যন্তর ছিল না। অরণ্যসঙ্কুল, পর্বতকণ্টকিত এই দেশে যোগাযোগের তখন মুখ্য পরিবহন ছিল হাতি। বিশেষ করে রাজকীয় অভিযান হলে তো কথাই নেই। জাহাঙ্গীর তো তাঁর জীবনস্মৃতিতে এক মুঘল প্রথার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, সম্রাটরা যদি পূর্বদিকে যান তবে দন্তীহস্তী চেপে যাওয়াই বিধেয়।

ইংরাজ লাটদের তেমন কোন বিধিনিষেধ না থাকলেও এই বাদশাহী চাল তাঁদেরও মনে ধরেছিল। তাই স্বভাবকৃপণ কোম্পানিকে একটা হাতিশালের খরচ বহন করতে হয় ইংরেজ আমলের প্রায় গোড়ার দিক থেকেই। ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের হস্তীপ্রীতি ত একটা মজার ছড়ার সৃষ্টি করেছিল—

হাতী মে হাওদা ঘোড়া মে জিন।
জল্‌দি চলতা হ্যায় নবাব
ওয়ারেন হেস্টিন॥

যোগাযোগের ব্যবস্থা হিসেবে হাতির ওপর এই নির্ভরতা ডালহৌসীর আমলেও বিশেষ কমেনি। তাঁর সময়েই, সিপাহী বিপ্লবের ঠিক আগের এক হিসেবে জানা যায় যে, সরকারী হাতিশালে হাতির সংখ্যা ছিল এক শ' ছেচল্লিশ!

যাই হোক, ওয়াজিরাবাদে যাবার আগে হাওদাটা 'ইনস্‌পেকসন' করতে গিয়ে বিলাসী বড়লাট ডালহৌসী সায়েব সোজা বলে দিলেন, এ সব হাওদায় হবে না। একটা নতুন হাওদা বানাও। রূপার হাওদা।

যে কথা, সেই কাজ। কলকাতার এক কোম্পানী সেই রূপার হাওদা তৈরী করে। খরচ পড়ে সেকালের মুদ্রায় দেড় হাজার পাউণ্ড। আর সেই চমৎকার হাওদাটায়

সামনের প্যানেলে 'ন্যায় বিচার' ও 'শান্তির' দুই দেবীমূর্তি ব্রিটিশ রাজমুকুট ধরে থাকার একটা ছবি ছিল।

ডালহৌসী ত এই নতুন ঝকঝকে রূপোর হাওদায় চেপে রাজা গুলাব সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, আর সেই খবর যখন বিলেতে গিয়ে পৌঁছল, সারা দেশ তোলপাড়। সে কি তীব্র সমালোচনার ঝড় সারা ব্রিটিশ জনমত ত খাপ্পা! পেয়েছে কি ডালহৌসী? নবাবীর ত একটা সীমা আছে—ইত্যাদি, ইত্যাদি এই সব বিদ্রূপ ও কটু মন্তব্যে এতই মর্মাহত হয়েছিলেন ডালহৌসী যে, তাঁর এক বন্ধুর কাছে দুঃখ করে লিখেছিলেন—

"The howdah of the Governor General was one of wood painted like a street cab, so that the very *mahout* was ashamed to sit in front of it Accordingly one was ordered at Calcutta and on this extravagance, amounting to £ 1,500 sterling, I am pilloried to the English public as fond of parade—silver howdahs and so forth—at the expense of the Company .

অর্থাৎ গভর্নর জেনারেলের হাওদাটা ছিল কাঠের ওপর রঙ করা—ভাড়াকরা ছ্যাকরা গাড়ির মত এবং অন্যে পরে কা কথা, মাহুতই রাজী হত না এর সামনে বসতে। তাই পনর শ' পাউণ্ড স্টার্লিং খরচ করে কলকাতা থেকে একটা তৈরী করে নেওয়া হয় আর তাই কোম্পানীর খরচায় এই রূপোর হাওদা ইত্যাদি করার জন্য জাঁকজমকপ্রিয় বলে ব্রিটিশ জনসাধারণের কাছে আমাকে অপদস্থ করা হচ্ছে

নিন্দার ঝড় লর্ড ডালহৌসীর ওপর দিয়ে যতই বয়ে থাকুন কেন, পরবর্তী লাটবাহাদুররা সবাই বহাল তবিয়তে এই মনোরম হাওদাখানি ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি। পঁচিশ বছর পরে সালে লর্ড নর্থব্রুক এটিকে সারতে দেন। কাজটা করে কলকাতার হ্যামিলটন কোম্পানী। কোম্পানীর খাতাপত্র থেকে জানা যায় যে, তারা ডালহৌসীর সেই পুরনো হাওদাটা শুধু মেরামতই করে দেয় না, সেটাকে একেবারে নবীকৃত করে দেয়। এই সময়ে হাওদাটা সারান হয়েছিল বোধহয় প্রিন্স অব ওয়েলস—ভাবী সপ্তম এডওয়ার্ডের ভারত আগমন উপলক্ষে। রাজকুমার এই হাওদাটা ব্যবহার করেন। ১৮৮৭ সালে লর্ড লিটনও যে সেটি ব্যবহার করেন বলে উল্লেখ আছে।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই এমন সব ঘটনা ঘটে গেল যার ফলে হাওদাটির বনবাসের আয়োজন করতে হয়। ভারতবর্ষে রেল আসার পর থেকেই হাতি চাপার রেওয়াজ কমতে শুরু করে আর সেই সঙ্গে ব্রিটিশ হাতিশালে হাতি। ১৮৮৫ সালে লর্ড ডাফরিনের আমলে কলকাতার হাতিশালে ছিল মাত্র পঁয়ত্রিশটি হাতি। তাদের কাউকেই কোন রাজকীয় সমারোহে বার করা হত না। তিন বছর পরে যখন মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন এলেন তখন হাতিশাল ত প্রায় শূন্য—মাত্র তিনটি হাতি! তাদের মধ্যে একটা জে

একেবারে অতিবৃদ্ধ। ওয়ারেন হেস্টিংকে বহন করে তিনি নাকি ধন্য। বেচারী শেষবেশ গঙ্গা পেরোবার সময় আদি পুরুষ ঐরাবতের মত স্রোতের টানে ভেসে যায়!

লর্ড এলগিন বড়লাট হয়ে এলেন ১৮৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে।

কলকাতার হাতিশালে তখন শিবরাত্রির সলতের মত টিম টিম করছে একটি হাতি। এই সময়ে হাতিশালটাকে পুনরুজ্জীবিত করবার বোধ হয় একটা কথা উঠেছিল। কিন্তু অনেক আঁক কষে দেখা গেল যে, তার জন্যে কমসে কম অন্তত আড়াই লক্ষ টাকা খরচ। সরকার পিছিয়ে গেলেন। অগত্যা হাতিশালটাকে একেবারে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ১৮৯৫ সালের জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে কলকাতার সরকারী হাতিশালটা উঠে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে হাতির সব কয়টা হাওদা ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম নিলামে চড়িয়ে ব্রিটিশ সরকার হাতিশালের শেষ স্মৃতিটুকু বিলুপ্ত করে দেয়।

কিন্তু সেদিনের কথা বলবার জন্যই বোধ করি এগারটি হাওদা এই ব্যয় কৃচ্ছ্র তার অভিযান থেকে রক্ষা পায়। দশটি শিকারের হাওদা। সেগুলি পাঠান হয় বেরিলি। আর অন্যটি লর্ড ডালহৌসীর সেই বড় সাধের রূপার হাওদাটা। সেটিকে তার সূক্ষ্ম কাজকরা ঝুল ও রেলিং সমেত পাঠান হয় সিমলা।

কালক্রমে সেটি লর্ড কার্জনের হাতে পড়ে। হাওদার সামনের প্যানেলের দেবীমূর্তি দুটি এর মধ্যে বেশ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। সেই রূপার প্যানেল গলিয়ে দুটো সুকুমার শিল্প-সম্মত গ্রীক দেবমূর্তি তৈরী করিয়ে সেখানে বসিয়ে দেন কার্জন। হাওদাটা দেখে খুবই খুশী হন তিনি। লর্ড নর্থব্রুক কার্জন সাহেবের কাছে গল্প করেছিলেন যে, আগ্রা শহরে এক রাজকীয় মিছিলে যখন এই হাওদায় তিনি চাপেন, হাতিটির প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর ভয় হচ্ছিল এই বুঝি হুমড়ি খেয়ে সবসুদ্ধ পড়লেন মাটিতে। কার্জন সাহেব সে সব কথায় বিশেষ কান দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। আসন হিসেবে হাওদা যে চমৎকার সে কথা তিনি বার বার বলে গেছেন। তাঁর বর্ণনায় হাওদার একটা সুন্দর ছবিও ফুটে ওঠে। —"সামনের প্যানেলে ছিল", – কার্জন সাহেব লিখেছেন—"একপাশে দেবী সেরেস আর অন্য পাশে দেবী মিনার্ভার নিপুণ করে খোদাই করা দেবীমূর্তি। মাথায় খোদাই করা ব্রিটিশ রাজমুকুটের নীচে ছিল স্পষ্ট করে আঁকা 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' ও সূর্য-রথের ছবি। ধারের প্যানেলে রাজকীয় ব্রিটিশ প্রতীক—'কোর্ট অব আর্মস'—আর অলঙ্কৃত বর্ডারে আঁকা ছিল গোলাপ ফুল, শ্যামরক ও থিসল গুচ্ছের সমারোহ।" প্রসন্ন আলোকে এই রূপার হাওদাটা যে এক অপূর্ব মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত সেকথাও কার্জন সাহেব বলতে ভোলেননি।

১৯০৩ সালের দিল্লির দরবারে লর্ড ও লেডী কার্জন এই হাওদায় চেপেই যোগদান করেন। ১৯১১ সালে পঞ্চম জর্জের দরবারের সময় কিন্তু এটাকে ব্যয় করা হয়নি। খুব সড়গড় হাতি পাওয়া যায়নি বলে। কেননা, ১৯০৩ সালের দরবারে জয়পুর ও কাশ্মীর

মহারাজদের কাছ থেকে হাতি ধার করে এনে ব্রিটিশ সরকারের কোনরকমে মুখ রক্ষা হয়।

কিন্তু এই ঐতিহাসিক হাওদার জীবনে সবচেয়ে বড ঘটনা ঘটেছিল ১৯১২ সালে। সেইটেই তার শেষ শোভা যাত্রা। আর সেইদিনের সঙ্গে, তার সেই অন্তিমযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাগ্রত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্মৃতপ্রায় এক রক্তাক্ত অধ্যায়। তখন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ। দিল্লিতে তখন পুরো শীত। দিনটা তেইশে ডিসেম্বর। বড-দিন। রাজকীয় মিছিলে হার্ডিঞ্জ সেই হাওদার ওপরে চেপে চলেছিলেন বিখ্যাত চাঁদনীর চকের মধ্য দিয়ে। হেলেদুলে গলার ঘণ্টায় মিঠি বোল তুলে তাঁর রাজহস্তী তুল্‌কি চালে চলেছিল দিল্লির প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে। লর্ড ডালহৌসীর সেই রূপার হাওদার গদীওলা সুখকর আসনে বসে বুঝি ব্রিটিশ ভারতের দণ্ডমুণ্ডের মালিকের চোখে তন্দ্রা নেমে এসেছিল।

কিন্তু অকস্মাৎ কান-ফাটান এক বিকট আওয়াজে শীতের মধ্যাহ্নে স্থবির দিল্লীর নিদ্রাভঙ্গ হল। দেখা গেল, রাস্তার পাশের কোন এক বাড়ি থেকে কে যেন বোমা ফেলেছে বডলাটের হাওদায়। রাজকীয় শোভাযাত্রা একেবারে ছত্রাকার। বড়লাট আহত হয়েছিলেন, হাওদার শক্তকাঠই সে যাত্রায় তাঁর পৈত্রিক প্রাণটা রক্ষা করে। কিন্তু একজন অনুচর মারা যায় আর হাওদাটার ধাতব দণ্ডের ওপর রাখা ব্রিটিশ রাজছত্রটা একেবারে চূর্ণ হয়ে যায়। ইংরেজ সাম্রাজ্যের সেই হয়ত প্রথম ছত্রভঙ্গ অবস্থা।

অনেকেই জানেন, সেই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার নায়ক ছিলেন রাসবিহারী বসু। আর বোমা ছুঁড়েছিলেন নিতান্ত অল্পবয়স্ক তরুণ বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস। তাঁর ফাঁসী হয়। সঙ্গে আরও পাঁচজনের।

আর সেই শেষবারের মত লোকচক্ষুর সামনে দেখা দিয়ে বহু বড়লাটের স্মৃতিবিজড়িত ডালহৌসীর সেই রূপার হাওদাটা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্দর মহলে চলে যায়। কেবল সিম-লার লাটভবনে উৎসব অনুষ্ঠানে বলনাচের পর মাঝে মাঝে ক্লান্ত কোন তরুণ তরুণী তার ওপর বসে তাদের ক্লান্তি অপনোদনে চেষ্টা করত। কিন্তু তাদের কেউই কখনও ভেবে দেখত না ইতিহাসের কত বিচিত্র অধ্যায়েরই না সে নীরব সাক্ষী। তার জন্মলগ্নে ব্রিটিশ জন-মতের তিরস্কার জুটেছিল আর অন্তিম দিনে মিলেছিল ব্রিটিশ শাসকদের নিষ্করুণ অবহেলা!

কিন্তু হাতির ওপর হাওদা চেপে পুরনো কলকাতার কাসুন্দী না ঘেটে আসুন আমরা সেকালের কলকাতার বিচিত্র আনন্দোৎসবের একটু খবর নিই। না, বুলবুলির লড়াই বা বাই-নাচ, পায়রা-ওড়ান বা ঘুড়ির প্যাঁচ, রাঁড়ি-বাড়ির কলকাতার প্রমোদোৎসবের গল্প তো আমরা অনেক শুনেছি। সে-সব গল্প শিকেয় তুলে রেখে, আসুন, উনিশ শতকের আধুনিক কলকাতার নিজস্ব-ধারার আনন্দ-যজ্ঞের কিঞ্চিৎ স্পর্শ নিয়ে আসি।

মনে করুন, এমনি কোন দিনে, আজ নয়, আজ থেকে একশ' বছরেরও আগে আবছা নীল আকাশে যখন মেঘের লেশ নেই, কলকাতার সকাল ঘিরে কুয়াশা নামে, শীত নামে, আমলকী ডাল কাঙাল সাজে, তখন যদি ছেলেপিলের হাত ধরে আপনার বিকেল চঞ্চল হয়ে উঠত কোন একজিবিশন দেখার বাসনায়, তাহলে জানবেন শহর কলকাতায় আপনার কুলোত না। আজেবাজে কোন মেলা নয়, একেবারে খাস প্রথম কৃষিমেলা দেখার যদি আপনার ইচ্ছে হ'ত, তাহলে জানবেন বেশ কিছুটা অর্থদণ্ডও বরাতে রয়েছে। কেননা রাস্তাটা তো বড় একটা কম নয়। ছেলেমেয়েরা প্রখর রোদ মাথায় করে অতটা কি আর হাঁটতে পারবে? তাছাড়া গৃহিণীর গঞ্জনার ভয়ও আছে। কাজেই কোন উড়ে বেয়ারার পাল্কী একটা আপনাকে ধরতেই হত। তারপর ডাকাতে চিৎপুরেশ্বরীর পথ ধরে, চৌরঙ্গী পেরিয়ে, রসাপাগলার রাস্তা ধরে, হেস্টিংসের পুল পেরিয়ে আপনি সোজা আলিপুরে গিয়ে উঠতেন। তখন তো আর চিড়িয়াখানা হয়নি। না বসেছে নবাব ওয়াজিদ আলির 'জ্যু'। কেবল এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির সন্ত পত্তন হয়েছে। এবং তারই কাছেপিঠে দেখলেন লোক থিক থিক করছে। চারদিক ঘেরা বড়সড় প্রশস্ত এলাকা। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আপনি সেখানেই ঢুকে পড়তেন। এত লোকের মেলা, বলে দিতে হত না, এটাই কলকাতার প্রথম কৃষিমেলা।

এবং যদি সেই বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল একজিবিশনে আপনি যাবেনই, যাবার আগে আগের কথা দুটো শুনেই যান না হয়। একজিবিশন দেখা ত' কলকাতার ভাগ্যে আগে ঘটে নি। বড়জোর চড়ক, রাস বা দোলদুর্গোৎসব উপলক্ষে আজব শহর কলকাতা বাইনাচ দেখেছে। মেলা দেখেছে। কিন্তু বড়সড় এমনি একটা প্রদর্শনীর জন্যে কলকাতাকে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে—প্রতীক্ষা করতে হয়েছে আঠারশ' চৌষট্টি পর্যন্ত। কিন্তু সে ত অনেক পরের কথা। আগের গল্প আগে বলি তাহলে। চাকরিটি পাবার কথা ছিল বড় ভায়ের। কিন্তু সেই মস্ত চাকরির খবর পৌঁছবার অনেক আগে অস্তলোক পৌঁছে গেলেন তিনি। আর হাতের কাছে যোগ্য কাউকে না পেয়ে চাকরিটা গেল ছোট ভায়ের হাতে। আমরা ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল স্যর্ জন লরেন্সের কথা বলছি। স্যর্ জনের কর্মজীবনের সবচেয়ে বড় কথা তিনি তাঁর পৌরুষের সৃষ্টি। মুরুব্বি ধরে তিনি এই চাকরি পাননি।

সার্ জন তখন বিশ্রামের জোগাড় করছিলেন। এমন সময় বিশে নভেম্বর, আঠারশ' তেষট্টি চন্দ্রানদীর ওপর একটা টানা দড়ির সেতু পেরোতে গিয়ে বড়লাট লর্ড এলগিনের বুকটা কেমন যেন কনকন করে উঠল। অমন দশাশয়ী চেহারাটার মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যে এমন দুর্বল ছিল, কে জানত! অবশ্য তিনি নিজে হয়ত কিছু বুঝেছিলেন কেননা মৃত্যুর আগে একটা পদত্যাগপত্র তিনি নাকি মহারাণীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। আর এই আকস্মিকভাবে খালি হওয়া চাকরিটায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শেষবেশ নিযোগ করলেন বাহান্ন বছরের প্রৌঢ় লরেন্সকে।

কলকাতার লাটভবনে ঢোকবার সময় তাঁর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর জামাইকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমি যখন গভর্নমেন্ট হাউসের সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম সেটা ছিল আমার গৌরবময় মুহূর্ত কেননা আমার মনে হচ্ছিল কোনরূপ রাজনৈতিক স্বার্থ বা প্রভাব ছাড়াই এই সর্বোচ্চ চাকরি—মহারাণীর ভাইসরয়গিরি—আমি পেয়েছি।'

কিন্তু সার্ জন জানতেন না, এর চেয়েও বৃহৎ গৌরব তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। লাটভবনে ঢোকার দিন ছয় পরেই। সেদিন সোমবার, আঠারই জানুয়ারি। আঠারশ' চৌষট্টি। ঝকঝকে রোদ ঘোড়াগুলোর গা বেয়ে পিছলে পড়ছিল। আর তারাই টেনে নিয়ে আসছিল বড়লাটের স্টেট কোচটা ক্ষুরের ঘায়ে ধুলো উড়িয়ে, টগবগ টগবগ শব্দ করে। আলিপুরের বেলভেডিয়ারের ঘড়িতে তখন প্রায় দশটা বাজে। লরেন্স গিয়ে উঠলেন সভামঞ্চে। বেঙ্গল ব্যাণ্ডে বেজে উঠল 'গড় সেভ দি কিং'। আর সেই সুরসমাহিত ক্ষণে লেফটেন্যান্ট গভর্নর সিসিল বীডন সার্ জন লরেন্সের হাতে তুলে দিলেন পতাকা তোলার দড়ি। তারপর একসময় লরেন্স গম্ভীরকণ্ঠে বলে থাকবেন, আই ডিক্লেয়ার দি একজিবিশন ওপন। এই মেলার মহিমা, তার গৌরব, তার আলোড়ন আজ এতগুলি বছর পেরিয়ে এসে বোঝা শক্ত। কিন্তু সেকালের নব্য বাঙালীর জীবনে যে এই ঘটনা কি রকম সাড়া এনেছিল সংবাদপ্রভাকরে গুপ্তকবি সে সম্বন্ধে বলেছিলেন—'যেস্থানে গমন করা যায়, সেই স্থানেই আলিপুরের মহামেলার কথাই শ্রবণ করা যায়, সমাচার পত্রাদিতেও প্রতিদিবস ঐ বিষয়ে বাহুল্যরূপে আন্দোলিত হইতেছে এবং মেলাঘটিত শুভজনক সংবাদসকল পাঠ করিয়া আমরা যথার্থই পুলকিত হইতেছি...'

এই মেলার খবর শুনেই বাঙালীর মনপ্রাণ আকুল হয়েছিল। কাজেই যেদিন সত্যিই মেলার দুয়ার খুলে গেল সেদিন সে তা' নিয়ে তারা নক্সা লিখবে সে আর বেশি কথা কি? ভুবন মুখুজ্জে তাঁর 'আলিপুরের কৃষি প্রদর্শনী'তে লিখেছেন—'আজ বেলবিডিয়ারের চিত্ত-চমৎকারিণী ও মনোহারিণী শোভা। নানাদেশের ফল, শস্য

ও পশুপক্ষী প্রভৃতি উপস্থিত করা হয়েছে। বিস্তর ভদ্রলোক উহা দর্শন কর্ত্তে আগমন করেছেন রাজা রাজড়া, নবাব ও জমিদারেরা যেন গন্ধর্বসভার ন্যায় সভা করে বসেছেন। দেশ বিদেশী ভাষায় দীর্ঘ স্পিচ হচ্ছে। আলবোলার শব্দ, নকিবের ফুৎকার ও রেসালার কলেরবে প্রদর্শনস্থল যেন মেতে উঠ্‌চে। কোলফাঁপ আটা-সোঁটারা লালপাগড়ি-বাঁধা ছোঁড়াদের হাতে এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়েছিল, বেতর সমারোহ দেখে প্রভাকর প্রভাতে যেন বিদ্যুল্লতার মত চমকে চমকে উঠ্‌চে।'

আশ্চর্যের কথা, নক্সায় সার্ জন লরেন্সের নাম নেই। তেমনি নেই সেইসব রহিস ব্যক্তিদের নাম যাঁরা সেই সভা আলো করে বসেছিলেন। মঞ্চের ডানদিকের আসনে ছিলেন নবাবনাজিম ও তাঁর পুত্র, বর্ধমানের মহারাজা, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ ও তাঁর পুত্র এবং ঢাকার নবাব খাজা আব্দুল গনি। লাটসাহেবের বাঁদিকে ছিলেন রাজা জয়মঙ্গল সিং আর অযোধ্যার নির্বাসিত রাজবংশের প্রতিনিধি। কলকাতার ইয়ং বেঙ্গলরা কি কেউ ছিলেন না? তা কি হয়। উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, এঁরাও অবশ্যই ছিলেন সেই স্মরণীয় সভায়। ছিলেন না বোধ করি রামগোপাল ঘোষ—কেননা বছর দুই আগে তাঁকে রয়েল এগ্রিকালচারাল সোসাইটি থেকে চক্রান্ত করে বার করে দেওয়া হয়েছিল।

অবশ্য নক্সায় যাঁর কথা বড়গলায় বলা হয়েছিল তিনি হচ্ছেন সিসিল বীডন। তিনিই পথ দেখিয়ে গভর্নর হাউস থেকে সার্ জন লরেন্সের সঙ্গে এসেছিলেন আলি-পুর। সঙ্গে ছিলেন চিফ জাস্টিস সার্ চার্লস ট্রেভলিঅন, এবং সার্ চার্লস নেপিআর—যাঁর কয়েকদিনের জন্য বড়লাট হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর এঁদেরই সমভিব্যাহারে বড়লাট গিয়েছিলেন কৃষি-প্রদর্শনী দেখতে।

এইসব পুরনো কাসুন্দী শুনতে শুনতে এতক্ষণে যদি ক্লান্তি বোধ করে থাকেন তাহলে সার্ জনের দলবলকে একটু তফাৎ রেখে চলুন না কলকাতার সেই প্রথম কৃষিমেলায় ঢুকে পড়ি। চোখ বড় বড় করে এই নতুন বস্তু—এক্জিবিশনটা দেখে নিই। ঢুকতেই যে একপাশে মস্ত মস্ত 'ইংলিশ বুল' দেখা যাচ্ছে—ঐগুলোর মালিক মিস্টার স্টলকার্ট। সিসিল বীডন তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন এই প্রদর্শনী করার প্ল্যান ইনিই দেন ছোটলাটকে। না, তার মানে এই নয় যে, সাহেবরাই শুধু জন্তু পাঠিয়েছিল এই মেলায়। বিদেশী নয় দেশীরাও ছিলেন। মুন্শী বজলুর রহিমের ষাঁড় দুটি আকর্ষণ করেছিল দর্শকদের। স্বয়ং নবাব নাজিমও দর্শনীয় কয়েকটা ষাঁড় পাঠিয়েছিলেন মেলায়। তবে তাঁরগুলো নামের বেলা খাট। আর ষাঁড় নিয়েই কি

গোলমাল। একটা ষাঁড কি কারণে যেন ক্ষেপে গিয়ে যাকে পায় তাকেই তাড়া করে। হুলুস্থুল ব্যাপার একজিবিশনে!

কিন্তু ঘোড়াই বলুন আর ষাঁডই বলুন, ভেড়াই বলুন আর মোরগই বলুন, সেই কৃষিমেলায় সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য ছিল, লেখা না থাকলে আজকে যার কথা কেউই বিশ্বাস করত না, একটা বামন ঘোড়া। আঠার ইঞ্চি লম্বা! দূর মুঙ্গের থেকে শাহ মহম্মদ পাঠিয়েছিলেন এইটিকে। আর তাকে ঘিরে কি ভিড়, কি ভিড! হরকরা বলে ইংরেজী কাগজ লিখেছিল যে এটাই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় দ্রষ্টব্য। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' বেরোত বৃহস্পতিবার। লিখেছিল ঘোড়াটা নাকি মেয়েদের খুবই মনোহরণ করেছিল। রসিকতা করেছিলেন কাগজের রিপোর্টার—এতই প্রশংসা জুটেছিল সেই ক্ষুদ্রকায় প্রাণীটির বরাতে, যে তার মাথা ঘুরে যায়নি, এটাই আশ্চর্য।

মেলায় যখন ঢুকেছেন তখন টাট্টু—বামন ঘোড়া দেখেই কি আর বাড়ী ফিরবেন? সবখানেই একবার ক'র ঢুঁ মেরে আসি চলুন। ঐ যে প্যারিসস্থ পর্টগাল সাহেবের উৎকৃষ্ট ফোয়ারা, ব্রহ্মদেশ থেকে সমাগত কল, কলকাতার ব্রাউন ও লিপেজ কোম্পানীর নানাপ্রকার যন্ত্র, উড্রো সাহেবের জলতোলা কল—ঐসব জায়গায় যেখানে বেশ ভিড জমেছে, চলুন, আমরাও সেখানে একটু ঘুরে যাই। বার্মার স্টলটাও বা বাকি থাকে কেন! চাষ-আবাদের সুবিধের জন্যে ব্যবহার করা যন্ত্রপাতি এই স্টল আলো করে ছিল। কিন্তু তাতে কোন কোন কাগজের সম্পাদক মুখ কালো করে বলেছিলেন, একি অবৈরণ কাণ্ড। হচ্ছে বাঙলা দেশের একজিবিসন, রেঙ্গুন, মাদ্রাজ থেকে পশুপ্রাণী, উৎপন্ন দ্রব্য এনে দেখাবার কারণ কি? বিদেশী যন্ত্রপাতি প্রদর্শনের বিরুদ্ধেও বিষোদ্গার ক'রে বলা হয়েছিল এটা হচ্ছে 'টু একজিবিট ইংল্যাণ্ড ইন বেঙ্গল।'

তবে ছিল না, ছিল না করেও সুবে বাঙালার বেশ কিছু সামগ্রী কৃষিমেলায় কোল জুড়ে ছিল। এদের মধ্যে ডাফ ইস্কুলের মেয়েদের হাতে-বোনা নক্সা-করা কার্পেটের কথা এসেই পড়ে। বিশ্বনাথ লাহা কোম্পানীর স্টলে ছিল আমদানি-করা মস্ত খড়কাটা কল, পাছড়ানো যন্ত্র ও হোসপাইপ সমেত পাম্প। এই লাহাবাবুদের স্টলেই ত আমরা দেখলাম সেই আদ্যিকালে ভারতবর্ষের বাজার নিয়ে ব্রিটিশ আর মার্কিন রপ্তানি দ্রব্যের লড়াই! সেদিনের ভিডের মধ্যে আমরাও দেখলাম বিলিতি ঘোল-মওয়া যন্ত্র কেন মার্কিন যন্ত্রের চেয়ে অনেক ভালো! গয়ার এক ভদ্রলোক আবিষ্কার করেছিলেন বলদে টানা সেচযন্ত্র। তুলো পরিষ্কারের কল। নতুন ধরনের একটা লাঙল। জুলজুল করে তাকিয়ে কলকাতার আমজনতার সঙ্গে চলুন, আমরাও ব্যাপারটা দেখে যাই।

তবে মুঙ্গের থেকে বেশ কয়েকটা জিনিস এসেছিল তারিফ করার মত। হয়-বল্লভ সিং-এর ভাগলপুরী গাইবাছুর, একশ জোড়া খুব তেজী বাছুর সমেত স্ত্রী ও পুরুষ মহিষ, বাসমতী চাল, জুসালি গম, তিল, তামাক, এমনকি নীল আর নীলবীজ যে দেখেছে সেই বাহবা দিয়েছে। চট্টগ্রামের জিনিসগুলোও ছিল খুব চমকদার। পোষাং-এর রাজার তিন বছরের গিয়াল ষাঁড় আপনার আমার মত বহু লোকেরই প্রশংসা কুড়োয। বললে, অনেকের প্রত্যয় হবে না, শুধু চট্টগ্রাম থেকে চালই এসেছিল কমসে কম পঁচিশ রকম। এদের মধ্যে কিউদমি চৌধুরীর চালই ছিল বার প্রকারের।

আবার এদিকে বেঙ্গল একজিবিশনে যেমন মাদ্রাজ থেকে ম্যাঞ্চেস্টার, বিলেত থেকে বার্মার—কারও জিনিসপত্র বাদ যায়নি, তেমনি কৃষিমেলায় বেশ কয়েকটা 'ইণ্ডাষ্ট্রিও' তাদের স্টল দিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের কথা, এঁদের কেউই বাঙালী নন। সবাই সাহেব। যেমন চলুন ঐ টি ই টম্পসন সাহেবের ইঁট তৈরীর মেশিনটা একবার দেখে আসি। উড্রো সাহেবের জল তোলার কলের কথা তো শুনেছেনই। ডাক্তার বেরীর তিসি মাড়াযের কলটা দেখে তো চোখ জুড়োয। ব্রাউন ও লিপেজ কোম্পানী তো কলেরই একটা মেলা বসিয়ে ফেলেছিল। আরে ঐখানটা অত ভিড় কেন? ওটা একটা ময়দা ভাঙা কল। শুনেছেন না, কানাকানি করে দেহাতী মানুষজন সব বলাবলি করছে, 'উপরসে গেঁহু দেতা হ্যায়, নীচেসে ময়দা নিকলতা হ্যায়।' সেদিনের বেঙ্গল একজিবিশনে এ সবই ছিল বিস্ময়কর দ্রষ্টব্য বস্তু।

নাঃ, আপনার বেশ একটু অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পারছি। আপনি শহরে মানুষ। এখান ওখান থেকে আপনি খুঁজছেন একটা ক্যাটলগ। মেলার দ্রষ্টব্য কি কি আছে, তা নিয়ে একটা ক্যাটলগ হলে আপনি খুব খুশী হতেন। মন ঠিক করে, কোথায় কোথায় যাবেন ঠিক করতে পারতেন। সুবিধে হত। তাছাড়া আপনি শুনেছেন, আঠারশ' একান্ন সালে ইংলণ্ডে যে বিখ্যাত প্রদর্শনী হয়—যাতে নাকি ভারতবর্ষের কোহিনুর দেখান হয়েছিল, মহারানী ভিক্টোরিয়া যা স্বয়ং দেখতে এসেছিলেন, এবং যে মেলা থেকে এই বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল একজিবিশনের প্রেরণা পেয়েছিলেন বাউন সাহেব, তাতে কত সুন্দর সুন্দর ক্যাটালগ বানান হয়েছিল, আর আলিপুরের কৃষিমেলায় তার একখানাও নেই, একি কম দুঃখ! এ ক্ষোভ শুধু আপনার নয় সেকালের কাগজেও এ নিয়ে লেখা হয়েছিল।

তবে অসুবিধার কথা যখন উঠল, তখন শুনুন। ক্যাটালগ না থাকার জন্যে অসুবিধে আপনার আর কি হবেছিল। আসল অসুবিধে হয়েছিল মেলার সাহেবদের। তাদের কারণটা অবশ্য ভিন্ন। ঠিক ছিল কর্তৃপক্ষরা বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালু করে তা

থেকে শক্তিসঞ্চার করে কৃষিমেলার বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় মডেল দেখাবেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সেই ষ্টিম ইঞ্জিন আর চলল না। লেপেজ কোম্পানী, ল্যাকারষ্টিন কোম্পানী কেউই তাঁদের মডেলের কেরামতি দেখাতে পারলেন না। ডাক্তার বেরীর যে চোখ-জুড়োন তিসি মাড়াই করার কলটা দেখলেন, বেরী সাহেবের ইচ্ছা ছিল তাতে একেবার তিসি মাড়াই করে দেখান। কিন্তু বেরী সাহেব কপাল চাপড়ালেন, তাঁর সে আশায় ছাই। কিন্তু সবাই কিছু মেলার কর্তাদের ওপর ভরসা করে ছিলেন না, তাই বাঁচোয়া। প্রথম কৃষিমেলার দর্শকরা কয়েকটা চালু যন্ত্র দেখেছিল। ঐ যে টমসন কোম্পানীর ইট তৈরীর কল ঘট......ঘট করে চলছে, ঐ যে ঐদিকে ষ্টিমের লাঙলে মাটি চষা দেখান হচ্ছে — ওরা সব—আপনা হাত জগন্নাথ, নিজেরাই নিজেদের আয়োজন করেছিলেন। স্বয়ংভর, তাই ভরাডুবি থেকে বেঁচেছিলেন।

ভুবন মুখুজ্জে মশায় তাঁর সমাজকুচিত্রের নক্সায় বলেছেন 'দর্শকদলে মেলাস্থল পুরে গ্যাচে'—কিন্তু দর্শনী লেগেছিল কত? আপনার —আমরা যারা সাত তাড়াতাড়ি অপেক্ষা না করে গেছি, সোমবার অর্থাৎ উদ্বোধনের দিন টিকিটের দাম ছিল পাঁচ টাকা। পরের দিন এক টাকা। এবং ক্রমে ক্রমে শেষে দাঁড়ায় এক সিকি। প্রথম দিন ছাব্বিশ হাজার টাকার টিকেট বিক্রি হয়েছিল। সাতদিন চলার পর একালেও যা হয় 'দর্শকসাধারণের অনুরোধে মেলা আরও সাতদিন চালু রাখা হয়।' যাঁদের 'সিজন' টিকেট ছিল, তাঁদের অবিশ্যি এই বাড়তি সপ্তাহের জন্যে কোন টিকেট লাগেনি। কয়েকদিন নাকি 'ফ্রি' দেখান হয়েছিল। বড় জমিদার মশায়রা নিজেরা পাল্কী, জুড়িগাড়ী করে, এসেই ছিলেন, তাদের খাস তালুকের প্রজাদের জন্যেও বিনামূল্যে মেলার টিকেট কিনে দিয়েছিলেন।

না, মেলাতলায় বেশ খানিকটা ঘোরা গেছে, সেই এসেছিলেন, বেলা তখন মাথায়, আর এখন রোদ পড়ে এল, শীতের বিকেল, গায়ে ঠাণ্ডাও কম লাগছে না, ছেলেদের তো পা ব্যথা করতে শুরু করেছে, ওরা সব পিছিয়ে পড়েছে। আপনি যতই তাড়া দিন না কেন, ওরা আর পারছে না আসুন না, ঐ পুকুরধারে একটু বসা যাক। ওখানেতে 'ঘাসের ওপর ভাঙা চেঙ্গারি ও তেকাট্টা চডা খোট্টা হোটেল খাপ খুলে সর্বদাই হাজির।' কচুরি, ফুলুরি, লঙ্কা ও প্যাঁজ ভাজার গন্ধে মেলা ম' ম' করছিল—সে গন্ধ আপনার নাকেও এসেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কি ভাবছেন বলুন ত? পকেটে রেস্ত আছে বুঝি। সাহেবী খানার লোভ হয়েছে? তা' ভাববার কি আছে, চলুন না, ঐ ত ঐদিকে খাস 'উইলসন' সাহেব হোটেলের 'ব্রাঞ্চ' খুলেছে। স্পেন্সেস হোটেলও দোকান দিয়েছে এখানে। বাদ কি আছে বলুন?

তা' খাওয়াদাওয়া যখন হ'ল, তখন চলুন বাড়ী ফেরা যাক। ঐ দক্ষিনে জাট-

সাহেবের বাড়ীর গাছগাছালির ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, আলিপুরের কোণ ঘেঁষে অন্ধকার নেমেছে, আপনি ঘরের দিকে পা বাড়াবেন বৈকি। তা' যাবার আগে একটা মজার গল্প শুনে যান। না, না, দাশুরায়ের খেউড় বা কলকাতার নবীন নাগর রসের সাগরদের কেচ্ছার কথা তো নয়। সে এই মেলার গল্প। সোমবার তো মেলা খুলল। তার চারদিন পরে অর্থাৎ বাইশে জানুয়ারি ঠিক হ'ল মেলায় সেদিন মহিলা রজনী। 'লেডিজ নাইট'। ঢাকঢোল পিটিয়ে বিকেল সাড়ে ছটার পর প্রদর্শনীর দরজা পুরুষদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। রাত্রি বারটা পর্যন্ত মেলায় কোন পুরুষ ঢুকতে পায়নি। সে একেবারে প্রমীলার রাজ্য! পরদিন কাগজে ফলাও করে ছাপালে মেলায় বাঙালী ললনার ভিড়ের খবর। কমসে কম হাজার দশ মহিলা নাকি সে রাতে মেলা দেখতে এসেছিলেন। ভাবছেন, এ আর গল্প কি? না গল্প এখানে শুরু। কাগজের রিপোর্টার ত আর নিজে দেখেন নি ভিড়। তাঁর তো কর্তৃপক্ষের মুখে ঝাল খাওয়া। আর তাই ক'দিন পরেই এই প্রচারের বেলুন একেবারে চুপসে গেল। এবং এর জন্যে দায়ী মিশনারীদের কাগজ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া। তাঁরা লিখলেন মহিলা-রজনী একেবারেই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। মাত্র আঠারজন মহিলা—এইট্টিন ভেইলড বিউটিজ—তাঁদের অবগুণ্ঠনের পর্দা না সরিয়ে এই মেলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন!

একজিবিশনের পর পুরস্কার বিতরণ করা হয়নি? অবশ্যই অবশ্যই। বহু স্টলের ভাগ্যেই পুরস্কার জোটে। সেকালের কাগজ পত্রে তারও বিবরণ রয়েছে!

কিন্তু শুধু মোলায়েম, মনোমুগ্ধকর আনন্দ উচ্ছ্বাস নয়, কিছু কিছু রক্তগরম করা উত্তেজক কাহিনী, কিছু রোমাঞ্চকর, লোমহর্ষক ঘটনার আমেজ এই পুরনো কলকাতার আপাতঃ নিস্তরঙ্গ জীবনে মাঝে মাঝে ঢেউ তুলেছিল।

সেই কাহিনী বলেই সুতানুটির কলিকাতায় উত্তরণের এই দীর্ঘ অধ্যায়ের জোড় বাঁধি।

আরব্য রজনীর স্বপ্ন দেখছে তখন উনবিংশ শতকের ক্লান্ত কলকাতা। গিরিশ-চন্দ্র ঘোষের সদ্য বেরুনো 'আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপে'র আলোকে বাংলা দেশের বহু আকিঞ্চন পূরণের ব্যর্থ কামনা মাথা কুটে মরছে। জেনারেল অ্যাসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশনের বিজ্ঞান-অধ্যাপকের প্রথম নাটকটার অভিনয় হয়ে গেল এমারেল্ড থিয়েটারে। সেই 'ফুলশয্যা'র মিষ্টি গন্ধে সারা কলকাতার হৃদয় তখন মৌ-মৌ। এ হেন সময়ে শহর কলকাতার নাট্যমঞ্চে আর এক থ্রিলিং ড্রামার যবনিকা উঠল।

রাত তখন গহন গভীর। কেল্লায় ন'টার তোপ পড়ে গেছে ঘণ্টা দুই হল। গ্যাস লাইটের বিষণ্ণ আলোয় নির্জন রাস্তাগুলোয় একটা ভুতুড়ে নীরবতা। আর সেই গা ছমছমে পরিবেশেই রাত কলকাতার প্রেতাত্মার মত একটা লোক দ্রুত হেঁটে আসছিল গড়ের মাঠের দিক থেকে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট ধরে সোজা লালবাজারের দিকে। রাস্তার ভিখিরি কুকুরটা কি ভাবে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে ডেকে উঠতে চেষ্টা করেই থেমে গেল। দূরে লাটভবনের গাছগাছালির ঝোপে রাতচরা কোন পাখীর ডানার ঝটপট শব্দে চমকে উঠে লোকটা পিছু তাকাল একবার। একটু বা থামল। তার নিজের পায়ের শব্দকেই সন্দেহ করল—কেউ বুঝি পিছু নিয়েছে। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। তারপর আর একটু গতি বাড়িয়ে সে স্কচ গির্জেটাকে বাঁয়ে ফেলে লালবাজারের চৌহদ্দীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। জ্যৈষ্ঠের দারুণ গরমে সারা সাহেবপাড়া তখনও কিন্তু হাঁসফাঁস করছে। টানা পাখার কিচ্‌কিচ্‌ শব্দে তাদের তাপহরণ করতে পারছে না!

হন্তদন্ত লোকটা খাস লালবাজারের পুলিশ সদর দপ্তরে ঢুকে পড়ল। আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে। আঠারশ' চুরানব্বই। আটাশে মে। সোমবার। বহুদিন বৃষ্টি না হওয়ায় সারা শহরের বুকে অসহ্য এক গুমটানি—এত রাতেও তার ক্ষান্তি নেই। লোকটা আসতেই লালবাজারের দোর গোড়ায় শান্ত্রী তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। লোকটা তার কানে কানে কি যেন বলতেই সে পথ ছেড়ে দিলে। তারপর আরও কয়েকজন শান্ত্রীর বেড়া টপকে সে ঢুকল ডেপুটি কমিশনারের কামরায়। সাহেব ঘরেই ছিলেন। অন্য কোনো জরুরী কাজে বোধ হয় আটকে গিয়েছিলেন। সেখানে এদিক-ওদিক চেয়ে গলা নীচু করে কি যেন বললে অনেকটা সাপের মত হিসহিস শব্দে। লালমুখ সাহেব উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে উঠে থাকবে—হোয়াট ডু য়্যু সে? লোকটা বিচলিত হয়ে বলল, নট ওয়ান অর টু স্যার, ফোর-

ফাইভ...মেনি। তার ভাঙা ভাঙা ইংরেজি ডেপুটি কমিশনারের কানের কাছে মুহূর্মুহূ বজ্রপাতের শব্দের মতো মনে হল। সাহেব আর সময়ক্ষেপ করলে না। বললে, 'কাম এলং'। এবং সোজা গিয়ে উঠল পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সার্ স্টুয়ার্ট হগ সাহেবের ঘরে। এবং সেখানে কি কথা হল কে জানে, মুহূর্তে লালবাজার চঞ্চল হয়ে উঠল। একটু পরেই একদল মাউণ্টেড পুলিশ, ডেপুটি কমিশনার, হগ সাহেব সবাইকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল একটি পুলিশ বাহিনী দল ময়দানের উদ্দেশে! লালবাজারের ঘড়িতে তখন ঢংঢং করে বারটার ঘণ্টা বাজল। অসময়ে তাদের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে সচকিত সাহেবপাড়া বুঝিবা ত্রস্ত হয়ে থাকবে।

কিন্তু তারা বোধকরি ঘুণাক্ষরে সেদিন জানতে পারেনি ব্রিটিশ প্রাসাদকূটে, হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে টুটে। মুখে না বললেও, সারা দিল্লীর তখন ঘুম নেই। বিনিদ্র রাত্রি যাপন করছেন ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তি। আর সেই গহিন রাতে লালবাজারের নাটক সেই মূল ঘটনাবর্তের ভগ্নাংশমাত্র। কিন্তু যে কথা হচ্ছিল—কতদূর গেল সে রাতের কলকাতা পুলিশ। গেল ময়দান পর্যন্ত। গড়ের মাঠে। সেদিনও ময়দান ঘিরে ঘন পত্রনিবিড় নানা গাছের ভিড়। রাত্রির সমস্ত অন্ধকার যেন তাদেরই তলায় বেবাজিয়া পরিবারের মত পরম শান্তিতে গৃহস্থালী পেতেছে। কমিশনার গম্ভীর কণ্ঠে হুকুম দিলেন, 'হল্ট'। আর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল। সেই আদেশ রাত্রির কলকাতার শান্ত দিগন্তে প্রত্যাবৃত্ত হল 'হল্ট'। পুলিশ দল থেমে পড়ল।

তারপর এক বিচিত্র খোঁজাখুঁজির পালা। পুলিশ কমিশনারের হাতে জ্বলে উঠল টর্চের আলো। তারই অন্ধকার-চেরা দ্যুতিতে সবাই গাছের গুঁড়িগুলো সযত্নে পুংখানুপুংখরূপে দেখতে লাগল। সেই টিকটিকি লোকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে থাকবে। গাছের গুঁড়িগুলোতে কে যেন গোবর মাখিয়ে দিয়ে গেছে। গোবর লেপে দিয়ে গেছে কেউ, কিংবা কোনটাতে শোভা পাচ্ছে বুঝিবা সন্ত-দেওয়া ঘুঁটে।

মনে মনে যাই ভেবে থাকুন না কেন পুলিশ সাহেব, বাইরে কিন্তু অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন তিনি, কলকাতায় হামি বহুৎ দিন আছে। মিউনিসিপ্যালিটির মেথরম্যান। এসব হামি বহুৎ দেখিয়েছে। কোই বুড্ডি ঘুটিয়া দেগয়ী। সবাই হগ সাহেবের কথারই প্রতিধ্বনি করলে। বাবু যত কহে পারিষদগণ কহে তার শতগুণ। লালবাজারের সেই টিকটিকিটা কেবল মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু মুখে যাই বলুন কৃতবিদ্য হগ সাহেব—হীরালাল শীলের সঙ্গে টক্কর দিয়ে নতুন বাজার বসানর ব্যাপারে যতই সার্থক হন না কেন, কলকাতার কেউকেটা বলে

নিজেকে জাহির করতে থাকুন না কেন, অনতিদূর ভবিষ্যতে, সে রাত্রে তাঁর ঘুম আসেনি। ঘুম আসেনি হোম সেক্রেটারিরও। কলকাতার ইংরিজি কাগজের রাতজাগা রিপোর্টাররা অবশ্য বুধবারের কাগজে এই ঘটনা নিয়ে লিখলে এটা কিছু নিষ্কর্মা লোকের একটা 'প্র্যাকটিক্যাল জোক'। উদ্দেশ্য প্যানিক' সৃষ্টি। কিন্তু খাস বিলেতে তখন এই নিয়ে সাংঘাতিক হৈ হৈ শুরু হয়ে গেছে। কলম নিয়ে তাল ঠুকে লেগে পড়েছে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যরা। অভিজ্ঞ সব ত'বড তাবড ব্যক্তিরা তাদের স্মৃতির ঝুলি ঝেড়ে জ্যোতিষ গণনা করতে লেগে গেছেন। যোগ দিয়েছেন নানা খবরের কাগজ—'স্পেকটেটর' 'পলমল গেজেট', 'টাইমস', 'ডেলি টেলিগ্রাফ'। তার প্রতিধ্বনি হচ্ছে কলকাতা, দিল্লী, লাহোর, বম্বে, পাটলিপুত্রে। কোথায় নয়?

আর পাটলিপুত্র নিয়েই ত শুরু। এবং শুরু অত্যন্ত সামান্যভাবেই। কিনা, বিহারের পূর্ণিয়া বা ভাগলপুর জেলায় কয়েকটা আমবনে দেখা গেল, আমগাছের গোড়ায় কে বা কারা কাদা লেপে দিয়ে গেছে। তাতে গোময়ের প্রলেপও আছে। গরুর লেজের চুল। কোন কৌতূহলী রিপোর্টার খবরটা তার কাগজের এককোণে ছেপে দিয়ে থাকবে। এটা এপ্রিলের শেষাশেষি। মে মাসের সূর্য তখন ক্রুদ্ধ দুর্বাসার মত কেবল যেন অভিশাপের আগুন ছড়িয়ে পৃথিবীটাকে খাক করে চলেছে। এবং দেখা গেল, একটা নয়, এমনি বিচিত্র ঘটনা বেশ কয়টা আম্রকুঞ্জে। সারা বিহার ছড়ান!

আর পড়বি ত পড খবরটা চোখে পড়ে গিয়েথাকবে সেই সাহেব ঐতিহাসিকের। জি বি ম্যালিসনের। এরই লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ সিপাহী বিদ্রোহের ওপরে। কাল বিলম্ব না করে তিনি টাইমস কাগজে একটা চিঠি লিখে বসলেন—আঠারশ সাতান্ন সালের কথা মনে আছে? সিপাহী বিদ্রোহের সেই রক্তক্ষরা দিনগুলি? বিদ্রোহ শুরু হবার আগে চাপাটি বিলি করেছিল বিদ্রোহী সিপাহীরা। এতেও কেমন যেন সেই বারুদের গন্ধ পাচ্ছি বাপু। আর অমনি চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে গেল! কেননা কাগজে কলমে যাই লেখা থাকুক না কেন, ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহে যা ধাক্কা খেয়েছিল, তা তারা বহুদিন ভোলেনি। আরও ভোলেনি বিদ্রোহের মাসটা—মে মাস। দশই মে-ই না সিপাহী বিদ্রোহের সেই রাক্ষসী দিন?

পরে অবশ্য বলা হল, আসলে বিদ্রোহটা হঠাৎ জ্বলে ওঠে! নয়ত সর্বসম্মতিক্রমে ধার্য তারিখটা তো আরও পরের। কাজেই ত্রস্ত ব্রিটিশ রাজশক্তি অতন্দ্র প্রহর গুনতে লাগল। কাগজে কাগজে নানা মুনির নানা মত। তার মধ্যে সার আলফ্রেড লায়াল বললেন, তার মনে হয়, ব্যাপারটা ধর্মের। রাজনীতির নয়!

কিন্তু এই সময়ে এল সপ্তদশ বেঙ্গল রেজিমেণ্টে একটা অসন্তোষের খবর। কি

করে ছড়িয়ে পড়ল। আর যায় কোথা ? ফিশফিশ করে বাতাসের নিশ্বাসের মত এক জনরব সারা ভারতবর্ষে ভেসে বেড়াতে লাগল—

বিদ্রোহ, বিদ্রোহ। দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ। রক্তাক্ত বিপ্লবের বিদ্যুৎ শিখা প্রেতছায়ার মত সাহেব মহলে চোখ পাকিয়ে ভয় দেখাতে লাগল। ভীত ত্রস্ত ইংরেজকুল সে কি থরহরি কম্পমান! কলকাতার তখত-ই-তাউসে তখন লর্ড ল্যান্সডাউন। তিনিও আর চুপ করে থাকা সমীচীন মনে করলেন না। কাগজের রিপোর্টারকে বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানালেন—আলফ্রেড লায়ালই তো ঠিক কথা বলেছেন। কমাণ্ডার-ইন-চীফ লর্ড রবার্টস তো তুড়ি মেরে সব উড়িয়ে দিলেন! অন্যান্য সব কাগজে, বোধ করি সরকারী উৎসাহে, রিপোর্টছাপা হতেলাগল নিজস্ব সংবাদদাতার। আরে ধ্যুৎ; বহু লোককে জিগ্যেস করেছি বিহারে, সিমলায়। সবাই বলে কি জানেন, এদেশে এই গ্রীষ্মকালে গরু মহিষদের অভ্যাসই হচ্ছে গরমে কাদার মধ্যে গাড়ুবিয়ে বসে থাকা। বেলা পড়লে তারা কাদা ছেড়ে উঠে পড়ে। তার পর গাছের গুঁড়িতে তাদের গা রগড়ায়। গাছে গাছে কাদার ছোপের আসল রহস্যটা এই!

কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। ম্যালিসন সাহেব 'টাইমস' কাগজে আবার একবার এই নিয়ে পড়লেন। ব্যাপারটা যাঁরা একেবারে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে চাইছিলেন, তিনি তাঁদের সাবধান করে দিলেন, বললেন দেখ বাপু, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। স্পেকটেটর' কাগজ যে কথা বলছে, এইসব আপাত সামান্য ব্যাপারের মধ্যে গভীর ষড়যন্ত্রের বীজ লুকিয়ে আছে—কথাটাকে তুচ্ছ করো না! 'ইট ওয়াজ মেসেজ টু এভরি ম্যান ইন ইণ্ডিয়া স্থাট সাম গ্রেট ইভেণ্ট ওয়াজ এ্যাবাউট টু হ্যাপেন, ইন হুইচ হিজ কোঅপারেশন ওয়াজ নেসেসারি।' সাহেব সাবধান করে দিলেন, তোমরা এমন অনেক কাজ করে যাচ্ছ, যেগুলির ফলে ভারতীয়রা তোমাদের হাত থেকে অব্যাহতি চায়—এমনি কাজ তোমরা দুর্ভাগ্যবশত অনেক করেছ! এই একই সুরে সুর মেলালেন 'ডেলি টেলিগ্রাফ'। জিজ্ঞাসা করলেন, কে করছে এই আশ্চর্য কাজ? কেন করছে? ভারত সরকার তারজবাব দিতে পারেন কি? ভারত সরকারের হাতে তেমন কোন ডিটেকটিভ পুলিশ আছে কি? না। সেই সিপাহী বিদ্রোহের কথা মনে করুন। কারা তৈরী করত চাপাটি? কেমনভাবে সেগুলি বিলি করা হত? এই চাপাটির মধ্যে দিয়ে কি বলতে চাইত ক্ষুব্ধ সিপাহীরা? সে সবই তো আজও রহস্যাবৃত। তবে, এই ব্যাপারটা আমরা তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করি কোন সাহসে?

'ডেলি টেলিগ্রাফ' আরও লিখলে, ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মনে এই কথাটা বলবার চেষ্টা করে হচ্ছে, একটা ষড়যন্ত্র চলছে। ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করতে তারা বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের এককালের লেফটেনাণ্ট গভর্নর সার্ রিচার্ড

টেম্পলকে জিগ্যেস করলে সাংবাদিকরা, আপনি কি মনে করেন? টেম্পল বললেন, বিলেতে থেকে ভারতবর্ষের কথা বলা শক্ত। তবু ব্যাপারটা তো পাটনা থেকেই শুরু। আর সেখানেই না ছিল সিপাহী বিদ্রোহের একটা মস্ত ঘাঁটি? তবে ব্যাপারটাকে তাচ্ছিল্য করার অবকাশ কোথায়? দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ? ডবলিউ এস কেইন তখন নামকরা এম-পি। তিনিও বললেন, ভারতীয়দের অসন্তোষের কথা। কেউ কেউ আবার বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললে, নেপালে একটা মন্দির তৈরী হচ্ছে। পশুপতিনাথের দর্শনে তীর্থযাত্রীদের ডাক দেবার জন্যেই এই প্রচেষ্টা!

রিপোর্টাররা সাহেবদের ছেড়ে ভারতীয়দের নিয়ে পড়লো। ভারতবর্ষের মডারেট রাজনীতির গ্রাণ্ড ওলডম্যান দাদাভাই নৌরাজী তখন বিলেতে। তাঁকে জিগ্যেস করতেই বললেন, চশমার কাঁচ টপকে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা কিছু বলবার চেষ্টা করা হয়েছে ব্যাপারটায়। আমার আজও মনে আছে। বম্বেতে একবার ভীষণ কলেরা হয়। কলেরা নিবৃত্তির জন্য নারকেল বিলি করা হযেছিল! কাজেই ব্যাপারটা তো সামাজিক মনে হয। রাজনৈতিক মনে করার বিশেষ কারণ তো দেখি না।

কিন্তু আনি বেশান্তকে জিজ্ঞাসা করতেই তাঁর কঠিন মুখখানা আরও গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন, আমি কিছু বলব না কেননা আমি বললেই সেটা হয়ত অশান্তিকে ইন্ধন যোগাবে। 'ইট ইজ প্লেইং উইথ ফায়ার'। আগুন নিয়ে খেলা!

তা' সে যে যাই বলুন না কেন, ঘটনার আবর্ত কিন্তু মুখের কথার জন্যে অপেক্ষা করে রইল না। দ্রুতগতিতে দুর্লঙ্ঘ্য কোন নিয়তির টানে সে যেন কোন অমোঘ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলল। পর পর বেশ কয়েকটা নাটকীয় ঘটনা কাকতালীয়বৎ ঘটে গিয়ে ব্যাপারটায় আরও জট পাকিয়ে তুলল। আরব সাগরের কূলে শহর বোম্বেতে একটি বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে গেল। কে বা কারা সার্ রিচার্ড টেম্পলের মূর্তিতে আলকাতরা মাখান বস্তা ছুঁড়ে দিলে। আর আলকাতরাতে মাখামাখি হয়ে গেল সেটা!

কয়েকদিন পরেই নাটকের আর এক দৃশ্য উঠল শহর বেরিলিতে। দু'জন ডিটেকটিভ এক রোমাঞ্চকর খবর দিলে, আজমগড় ও বেরিলি জেলায় বকর-ঈদের দিন থেকে এই বিদ্রোহ শুরু হতে পারে। যেই না খবর পাওয়া, তা' সে যতই উড়ো খবর হোক না কেন, সারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সরকারে অমনি সাজ-সাজ রব পড়ে গেল! সাতাশে মে। আঠারশ' চুরানব্বই। আরও পাকা খবর এল, রাত দুটো থেকে এই গাছে গাছে কাদার ছোপ ধরানর অভিযান শুরু হয়ে গেছে! পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল। ব্যারাকে ব্যারাকে সৈনিকরা জরুরী অবস্থার জন্য তৈরী হয়ে নিলে পঁচিশ মিনিটের মধ্যে। এবং দ্রুত সেই তারাজ্বলা আকাশের নীচে সেই নিস্তব্ধ

বনানীকে ঘিরে ফেলা হল। বিনা প্রতিরোধে। জায়গাটার স্ট্র্যাটেজি আছে। জঙ্গটা নেপাল আর উত্তর সীমান্ত প্রদেশের একেবারে সন্ধিস্থলে। এবং বিস্ময়ের কথা, বেশ কয়েকজন লোক ধারাও পড়ল! গুনতিতে হ'ল জনা বিশেক।

ভোরের ভালো যখন ধীরে ধীরে অরণ্যের মাথায়মাথাযনতুন দিনের রাঙা টোপর পড়িযে দিলে, ডেকে ডেকে বাসা ছেড়ে উড়তে সুরু করল পাখির দল, বনের বুকের অন্ধকার ফিকে হয়ে এল, লম্বা লম্বা একমুখ দাড়ি, কৌপীন-পরা ধুলিধুসর দেল জনা কুড়ি শক্তসমর্থ মানুষকে টেনে টেনে বনের বাইরে টেনে নিযে এল বেরিলে ব্যারাকের সৈন্যরা। অদূরে গ্রামের কোলে সদ্যজাগ্রত মা তার সন্তানকে জাগিয়ে দিতে তখন ডাকছিল, 'ভোর ভয়ি. ভোর ভযি।'

সাধুরা কিছুই লুকোল না। বললে, এলাহাবাদে মাঘমেলার সময়ে এই সাধু সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। এঁরা গোরক্ষার জন্য জীবন দানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই খবরটা দেহ নৈনীতালের এক সংবাদবাতা। এলাহাবাদের 'মর্নিং পোস্ট'কে। কিন্তু মজা জমে গেল কযেকদিন পরেই। কাগজে বেরাল—সরকারীভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে অস্বীকার করা হয়েছে। সংবাদটায় সত্যের ছায়া পর্যন্ত নেই—'উইদাউট এনি শ্যাডো অফ ফাউণ্ডেশন' আগাগোড় বানান। 'এ পিওর ইনভেনশন ফ্রম বিগিনিং টু এণ্ড!'

কিন্তু খাস কলকাতার বুকে সেই বিচিত্র ঘটনার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াল? দাঁডাবে কোথায় ছাই? সরকার যেন কিছুই আমলই দেয না। অথচ একটার পর একটা ঘটেই যাচ্ছে! দোসরা জুনের খবরটাই ধরুন না কেন। শনিবারের সন্ধ্যা সাহেব-মেমেরা সব স্ফূর্তিতে মশগুল। খানাপিনার আসর সরগরম। আর সেই সময়েই এই ঝামেলার কাণ্ড। ময়দানের মাঠে একজন উত্তরপ্রদেশের লোক ধরা পড়ল। গোবর মাখাচ্ছিাল ময়দানের গাছের গুড়িতে। তত্ত্বতাল্লাসে জানা গেল, লোকটার বাড়ী মির্জাপুর। লোকটাকে পুলিশের কেমন যেন পাগল বলে সন্দেহ হ'ল। তবে হ্যাঁ, অনুসন্ধান চলছে, চলবে!

খবরটা ছাপা হইতে ভারত সরকার একটা প্রেসনোট ছাড়লেন বাজারে। ভারত সরকার এ সব খবরের কোনরকম মূল্যই দিচ্ছেন না। কাগজে কাগজে সেই মর্মে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা হল। কিন্তু মূল্য সরকার দিন আর না দিন, শহর কলকাতার বুকে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহের শিখা মাঝে মাঝে সমানে মেঘমেদুর আকাশে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত দেখা দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগল। ইনসপেক্টর হ্যামিলটনের সেদিন ডিউটি। কয়েকদিন আগেই বজ্রবিদ্যুৎ সহকারে ভীষণ বৃষ্টি হয়ে ধুয়ে দিয়েছে গ্রীষ্মের কলকাতার গ্লানি। বেশ ঝকঝকে রাত। নীল আকাশে তারাগুলো জ্বলছে আর নিভছে। শুক্রবার। রাত্রি এগারটা আন্দাজ হবে। হ্যামিলটন

টপটপ করে তিনদ্রেল্লোককে ধরে ফেললে। একই অপরাধ! ময়দানের গাছের শুঁড়িতে কাদা লাগান। গোময় লাগান। একজন মুসলমান। সে বললে বাবুজী নমাজ পড়ব বলে জল আনতে গিয়েছিলাম, পুকুর থেকে কাদা আনতে নয়। গাছের নীচে ছিলাম, খোদার আরাধনা করব বলে। অন্য কোন অসদুদ্দেশ্যে নয়। অপর দু'জন কুচবিহারের মহারাজার চাকর। কাজেই।

তা'হলে দাঁড়াল কি ব্যাপারটা? হাওড়া থেকে এমন পত্রলেখক চিঠি লিখলে কাগজে, বাপু হে, তোমরা বলছ, ধর্মঘটিত ব্যাপার? তা'হলে আগে কখনও বাপের কালে এই সব ঘটনা শুনিনি কেন? জেমস মুনরো সিপাহী বিদ্রোহের বিখ্যাত সেনাপতি তো রয়েছেন কৃষ্ণনগরে। তাঁর মতামত নেওয়া হোক। তাঁকে দিয়ে এনকোয়ারি করা হোক না কেন?

কিন্তু যতদূর জানা যায়, এইসব কিছুই হয়নি। রাধাও নাচেনি, নয় মণ তেলও পোড়েনি। পণ্ডিত ভূদেব কবিরত্নকে সভাপতি করে পটলডাঙ্গা পঞ্চাননতলা হরিসভার প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল এরই মধ্যে এক রবিবারে সকাল দশটা থেকে তিনটে পর্যন্ত। রাত্রি এগারটা নাগাদ শেষ হল তাদের নগরসংকীর্তন। আর এমনি সব সংকীর্তনের উদ্দাম নৃত্যের মধ্যেই বোধ করি এক সময়ে হারিয়ে যায় কলকাতার বুকে সম্ভাব্য দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহের রোশনাই।

কিন্তু তাই কি? সিপাহী বিপ্লবের পিছনে অন্যান্যদের মধ্যে কি সক্রিয় ছিলেন না একদল স্বাধীনতাকামী মৌলভী! তা বলে কি এই অভ্যুত্থানকে ভারতবর্ষের প্রথম বিপ্লব বলে সনাক্ত করা ঠিক নয়? কাজেই প্রায় সমগ্র এই দেশের বুকে যে ক্ষোভের আগুন ভস্মাচ্ছাদিত হয়েই জ্বলে গেল, ব্রিটিশ সিংহের মস্ত গুহ শহর কলকাতার বুকেও যার আঁচ এসে লেগেছিল, প্রবল বাতাসের অভাবে হয়তবা প্রচণ্ড দাবানলে ফেটে পড়েনি, তাকে এভাবে মূল্যায়ণ করা কি অন্যায় নয়?

অবশ্যই। তবে আমরা আশা করব, অপেক্ষা করব আগামী দিনের সেই ঐতিহাসিকের জন্য যিনি পরম যত্নে, গভীর মমতায় এই খণ্ড,ছিন্ন ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনার সূত্রগুলি গ্রথিত করে' তার সকল রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবেন, প্রতিষ্ঠা করবেন তাকে তার পূর্ণ মর্যাদায়।

সেই কবে আমরা যাত্রা সুরু করেছিলাম, সেত আজকে নয়। ভারতবর্ষের সিংহাসনে তখন মুঘল মুকুটমণি প্রৌঢ় সম্রাট শাহানশাহ আকবর। ইংলণ্ডে সম্রাজ্ঞী এলিজেবেথ। দুইদেশেরই তখন স্বর্ণযুগ, সমৃদ্ধি ও বিকাশের কাল। কিন্তু ভাগ্যের

এমন বিচিত্র পরিহাস, নিয়তির এমন নির্বন্ধ যে মাত্র অনধিক একশতাব্দীর ব্যবধানে সেই সাত-সমুদ্র তের-নদী পারের মুষ্টিমেয়, পিঙ্গলচক্ষু, শ্বেতাঙ্গ, দ্বৈপায়ন মানুষের দল ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে মাকড়সার লুতাতন্তুর মত এই দেশে তাদের বাণিজ্য-জাল বিস্তার করে ফেলল। খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত এইদেশের যুযুধান রাজসভায় সুপরিকল্পিতভাবে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে, অচিরে বাণিজ্য নয়, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও এক অমোঘ নিয়ামক শক্তি হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করে ফেলল। পলাশীর আম্রবনের পিঙ্গল প্রান্তরে একটা নকল যুদ্ধের মহড়ায় তাদের এই প্রয়াস চরমরূপ লাভ করল। পলাশীর সেই অজস্র আমবনের দীর্ঘ ছায়া একসময়ে সমগ্র রাঢ়, বরেন্দ্র, সমতট-সারা বঙ্গভুমি কেন সারা ভারতভূমিকে গ্রাস করে ফেলল। সুতানুটি হল তার কেন্দ্রস্থল। আর তাই, সেই সুতানুটি একসময়ে কলকাতা হয়ে গেল। তার বাল্য-কৈশোর পেরিয়ে একসময়ে তার যৌবন-সন্ধি এসে গেল। তার সঙ্গে আমরাও যেন পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ। এ পথের শেষ নেই। তার পট পরিবর্তনেরও শেষ নেই। মহাকালের বিরাট-বিচিত্র এই লীলাবিভঙ্গের টকরো টুকরো বিস্মৃত-প্রায় কালজীর্ণ কিছু ছবি এখানে সাজিয়ে দিলাম। কত ছবি যে বাদ গেল, তার ইয়ত্তা নেই। সেই আক্ষেপ নিয়েই যাত্রায় শান্তি দিয়ে পোথায় ডোর দিলাম।



॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

English Factories in India —W. Foster
Jan Company in Cormondol —Tapan Roychowdhuny
New Aceount of the East Indies (2 vols) — Alexander Hamilton
Diary of William Hedge 3vols —H Yule
Early Annals of the English in Bengal (4 vols) —C R Wilson
Fort William 2vols — ditto
Cambridge History of India
History of Aurangzeb (4 vols) —Jadunath Sarkar
Social History of England — G M Trevelyan
Bengal in 1756—1757 3vols —S. C Hill
India Tracts —J. Z. Holwel
Considerations on Indian Appaiss. 1772-1775 —Willam Bolts
Selections from the Unpublished Records of the Government of Bengal 1748-1767—Rev. J. Long
Bengal under the Lieutenant Governors from 1854 to 1898 —E. F. Buckland
Administration of the East India Company - Sir. John Kaye
Eighteen Fifty Seven —S. N. Sen
History of Sepoy War in India 6vols —Kaye and Malleson
The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857—R. C. Majumdar
British Government in India 2vols —Lord Curzon
A Nation in making —S. N. Banerjee
India —Rousslet
Private life of an eastern king —S. B. Smith (ed.)
Nabob — T. S. Spears
The Good Old days of John Company 2vols—W. H Carrey
Early History and Growth of Calcutta —Benoy Krishna Dev

Private letters (of Lord Dalhousie) – J. G. Baird (ed)
Life of Lord Dalhousie vol. 1 —W. L. Warner
The Enbassy of Sir Thomas Roe to India—Foster
Tavernier's Travels in India 2vols – Crooke
Warren Hastnigs A Mervyn Davies
Leaves from Viceroy's Note Book · Curzon
Biography of Bengal Celebrities 2vols—Ram Gopal Sanyal
Journals of John Jourdain (Haklyut volumes) W. Foster (ed)
Short History of Calcutta —A K. Roy
Calcutta Past & Present —Kathleen Blechynden
John Barleycorn Bahadur —H Hobbs
Calcutta Myths & history S. N Mukherjee.
Rise of Bombay —Edwardes
Vestiges of old Madras —H. H Love
Echoes of old Calcutta —Busteed
An Advanced History of India —Majumdar Raychaudhari & Datta
English settlements in Bihar —K. K. Datta
Original Letter from India —Eliza Fay —E. M Forster (ed)
Memoirs of William Hickey 4vols.
Wanderings of a pilgrim etc 2vols -- Fanny Parks
The Riyaz s-Salatin—Gholam Hossain (Tr)
Seir Mutaqharin—Gholam Hossain khan (Tr.) 4 vols.
West Bengal district Gazetteers.
প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় – হরিহর শেঠ
কলিকাতা সেকালের একালের —হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
কলিকাতার ইতিহাস —সুবল মিত্র (অনু)
কলিকাতার কথা (দুই খণ্ড) —প্রমথনাথ মল্লিক
পলাশীর যুদ্ধ —তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
পলাশীর পর বক্সার — ঐ

কলিকাতা দর্পন	—রাধারমণ মিত্র
গোকুলচন্দ্র মিত্র ও সেকালের কলকাতা	—রাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
তিন শতকের কলকাতা	—নকুল চট্টোপাধ্যায়
শহর কলকাতার আদিপর্ব	—সমুদ্র গুপ্ত
সিরাজদ্দৌলা	—অক্ষয়কুমার মিত্র
বন্দর কাসিমবাজার	—সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী (সা. প. প)
শ্রী পান্থের কলকাতা	— শ্রীপান্থ
হুতোম প্যাঁচার নকসা	—কালীপ্রসন্ন সিংহ
সুতানুটি সমাচার	—বিনয় ঘোষ
কলকাতার পথঘাট	—প্রাণতোষ ঘটক
বিদেশীর চোখে বাংলা	—চণ্ডী লাহিড়ী
মুর্শিদাবাদ কাহিনী	— নিখিলনাথ রায়
কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা	—মহেন্দ্রনাথ দত্ত